নীহাররঞ্জন গুপ্ত

কিরীটী অমনিবাস

কিরীটী অমনিবাস

সপ্তম খণ্ড

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

প্রথম 'মিত্র ও ঘোষ' সংস্করণ, চৈত্র ১৪০০
ষষ্ঠ মুদ্রণ, চৈত্র ১৪০৯

—একশ কুড়ি টাকা—

KIRITI OMNIBUS VOL VII
An anthology of detective fictions by Niharranjan Gupta.
Published by Mitra & Ghosh Publishers Pvt. Ltd.,
10 Shyama Charan Dey Street, Kolkata - 700 073

Price Rs. 120/-

ISBN : 81-7293-219-7

প্রথম প্রকাশ, [অমর সাহিত্য প্রকাশন] ভাদ্র ১৩৯৪

শব্দগ্রন্থন : পাইকা ফটোসেটার্স, ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৭

মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩
হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও চয়নিকা প্রেস, ১ রমানাথ
মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ হইতে মুদ্রিত

সূচীপত্র

ভূমিকা	সুমথনাথ ঘোষ	[১]
কৃষ্ণা কাবেরী		১
রতিবিলাপ		১১৭
মদনভস্ম		২১৩

ভূমিকা

সৌভাগ্যবশতঃ বর্তমানে আমাদের সাহিত্যের আসরে এমন সব কৃতী, শক্তিধর, খ্যাতিমান লেখক রয়েছেন, যাঁদের সংখ্যা দু'হাতে গুনে শেষ করা যায় না। অসংখ্য কবি, গল্পলেখক, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, প্রাবন্ধিকের ভিড় সেখানে।

অথচ ক্রাইম বা রহস্যরোমাঞ্চ গোয়েন্দাকাহিনীর যে একটা ভয়াবহ, জটিল, বিচিত্র জগৎ—সেখানে একচ্ছত্র সম্রাটের মত দীর্ঘদিন ধরে যিনি যশের মুকুট পরে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত তিনি ডাক্তার নীহাররঞ্জন গুপ্ত, কিরীটীর স্রষ্টা, সার্থক ডিটেকটিভ কাহিনীর লেখক।

বাংলা সাহিত্যের পাঠকসমাজে বর্তমানে তাঁর মত একজন জনপ্রিয় ও সুপরিচিত লেখক আর দ্বিতীয় আছেন কিনা সন্দেহ।

"একশ্চন্দ্র তমোহন্তি"। এই উক্তিটি বোধহয় একমাত্র নীহাররঞ্জনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

বাস্তবিক পক্ষে পাঠকসমাজের একেবারে নীচের তলা থেকে ওপর পর্যন্ত এইভাবে একাধিপত্য বিস্তার করা আর কারও পক্ষে সম্ভব বলে মনে হয় না। অল্পবয়স্ক তরুণ কিশোররা স্কুলের পড়া ভুলে যায় যেমন কিরীটীর গল্প হাতে পেলে, তেমনি তাদের বাবা-দাদা খুড়ো-জ্যাঠারাও অফিস যাবার সময় ট্রামে, বাসে কি ট্রেনের মধ্যে ভিড়ে বসার জায়গা না পেয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একখানা নীহাররঞ্জনের বই হাতে নিয়ে পথশ্রমের সব ক্লান্তি ভুলে যায়। আবার তাদেরই ঠাকুরমা ও ঠাকুরদা হয়তো রামায়ণ মহাভারত সরিয়ে রেখে চোখে পুরু চশমাটা এঁটে কিরীটীর বই হাতে নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কোথা দিয়ে কেটে যায় বুঝতে পারেন না।

ডিটেকটিভ গল্প আরও অনেকেই লিখেছেন, যেমন পাঁচকড়ি দে, দীনেন্দ্রকুমার রায়, শশধর দত্ত, হেমেন্দ্রকুমার রায় ও শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। সত্যি কথা বলতে কি, গোয়েন্দা কাহিনীর পাঠক অন্য সব দেশের মত এখানেও ছিল, আছে এবং থাকবে চিরদিন।

হেমেন্দ্রকুমার রায় ও শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় মূলতঃ সাহিত্যিক, বিশুদ্ধ গল্প-উপন্যাস রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাই তাঁদের সৃষ্টি গোয়েন্দাকাহিনী পাঠক-সমাজে একটা নতুনের স্বাদ এনে দিলেও, ঠিক নীহাররঞ্জনের মত এতোখানি প্রভাব বিস্তার করতে তাঁরা কেউ পারেন নি।

তার প্রধান কারণ নীহাররঞ্জন গোয়েন্দাকাহিনীর মৌলিক লেখক—"ক্রাইম" গল্পেই তাঁর হাতেখড়ি। হেমেন্দ্রকুমার বা শরদিন্দুর মত প্রথমে গল্প উপন্যাস লেখক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করে পরে এদিকে আসেন নি। গোড়া থেকেই তিনি গোয়েন্দাকাহিনী রচনার পথে গিয়েছেন, যদিও পরে তিনি ভাল উপন্যাস কিছু লিখে খ্যাতিলাভ করেছেন। "অস্তি ভাগীরথী তীরে", "তালপাতার পুঁথি", "কোমল গান্ধার", "হাসপাতাল", "অশান্ত ঘূর্ণি" প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কিন্তু তবু স্বধর্ম ত্যাগ করেন নি।

যদিচ বিশুদ্ধ গল্প-উপন্যাস-পাঠকের তুলনায় ডিটেকটিভ বা রহস্য-রোমাঞ্চ কাহিনীর পাঠকের সংখ্যা অন্যান্য সব দেশের মত আমাদের এখানেও বেশী, তবু একথা স্বীকার করতে

হবে যে আজ এই পাঠক-সংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ নীহাররঞ্জনের গল্পের আকর্ষণ। হ্যাঁ, তিনি জানেন কি করে গল্প বুনতে হয়। উৎকণ্ঠা কৌতূহল তাঁর গল্পে গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত, পাঠকের মনকে স্থির থাকতে দেয় না। রুদ্ধনিঃশ্বাসে পাতার পর পাতা উল্টে একেবারে রহস্যের সমাধান বা চরম উদ্ঘাটন যতক্ষণ না হয়—ছাড়তে পারে না।

নীহারবাবুর কাহিনীর প্রধান আকর্ষণ : মানবমনের জটিল রহস্য তিনি স্বল্প কথায় যুক্তির সঙ্গে এমনভাবে পাঠকের চোখের সামনে উদ্ঘাটিত করে দেন যে প্রথমটা চমক লাগলেও পরে পাঠকের মন যেন সে বুদ্ধির খেলায় হার মানে।

'জোড়া খুন' নামে প্রথম যে রহস্যকাহিনী তিনি লিখেছিলেন তার মূলে ছিল নিছক সত্য। তাঁর গ্রামের এক জমিদার-বাড়ির হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে সেটি লিখেছিলেন। তার আগে তিনি খানকতক পাঁচকড়ি দের রহস্য উপন্যাস পড়েছিলেন। তিনি নিজে একথা লিখেছেন, ইতিপূর্বে 'রহস্য ক্রাইম জগতের সঙ্গে কিছুটা পরিচয় ঘটেছিল। কেবল পরিচয়ই নয়, মনের মধ্যে কিছুটা রোমাঞ্চও সৃষ্টি করেছিল। ডিটেকটিভ বা গোয়েন্দা চরিত্রটির মধ্যে রীতিমত যেন একটা আকর্ষণ অনুভব করতাম। একজন ডিটেকটিভ হলে কি করতো সে—ভাবতে ভাবতে নিজেকেই সেই চরিত্রের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হলাম।'

নীহাররঞ্জন একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক। মানুষের দেহের ব্যাধি ঔষধের দ্বারা ভাল করেন না, মনের ব্যাধিরও সন্ধান রাখেন। দীর্ঘদিন চিকিৎসা ক্ষেত্রে থাকার ফলে শত শত রোগীর সঙ্গে তাঁর যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটে, তাঁর সাহিত্যিক-জীবনের এই সাফল্যের পথে সেটা একটা মস্ত বড় মূলধন।

নীহাররঞ্জন একজন খ্যাতনামা ডার্মাটলজিস্ট, চর্মরোগ-বিশেষজ্ঞ। মানুষের এই সুন্দর দেহকে বিকৃত করে দেয় যে সব কুৎসিত ব্যাধি, দুষ্টক্ষত, বিষব্রণ, কুষ্ঠ প্রভৃতি তাদের উৎস কোথায়, মানুষের শরীরের আড়ালে দেহের অভ্যন্তরে মনের গভীর অতলে, অন্ধকার সুড়ঙ্গ পথে, হিংস্র সরীসৃপের মত যেসব বিষাক্ত রোগের জীবাণুগুলো লুকিয়ে থাকে সাধারণ মানুষ যাদের চোখে দেখতে পায় না, অথচ বিচক্ষণ চিকিৎসক নীহাররঞ্জনের দৃষ্টি এড়াতে না পেরে ধরা পড়ে যায় তাঁর কাছে। তেমনি লেখক নীহাররঞ্জনের অভ্যন্তরে যে কিরীটী রায় গোয়েন্দা তার চোখে ধুলো দিয়ে, সমাজের শত্রু সেই সব চোর-ডাকাত, খুনী, বদ্‌মাইশ স্মাগলার, চোরাকারবারীরা কোথাও পালিয়ে নিস্তার পায় না। তাই গোয়েন্দা কিরীটীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও বিশ্লেষণী শক্তির কাছে এমন কি জাঁদরেল পুলিসের কর্তারাও হার খেয়ে যান।

নীহাররঞ্জনের রহস্যকাহিনীর অসাধারণ সাফল্যের প্রধানতম কারণ এই যে তিনি নিজে চিকিৎসক, মানবমনের দুর্জ্ঞেয় রহস্যের কারণ ও তার প্রতিকার সবই তাঁর জানা। সাধারণ লেখকের যেখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ সেখানে তিনি অনায়াসে বিচরণ করতে পারেন। নির্ভুল মনস্তত্ত্বের সঙ্গে কাহিনীকে বিশ্বাসযোগ্য পথে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার যে দক্ষতা, কল্পনার সঙ্গে বাস্তবকে মিলিয়ে পাঠকের মনকে জয় করার যে দুর্লভ ক্ষমতা নীহাররঞ্জন তার পূর্ণ অধিকারী।

আমাদের বাঙ্গালীর জীবন যেমন বৈচিত্র্যহীন তেমনি সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। সেখানে রহস্য-রোমাঞ্চের চমকপ্রদ ঘটনার সাক্ষাৎ কদাচিৎ মেলে কিন্তু নীহারবাবুর জীবনে কোনদিন রোমাঞ্চক ঘটনার অভাব হয় নি। দুই শতাধিক গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন এবং

এখনো তাঁর লেখনী অক্লান্তবর্ষী। প্রতি মাসেই একখানা দু'খানা করে নতুন নতুন কাহিনী প্রকাশিত হচ্ছে, এবং সব চেয়ে বিস্ময়ের কথা পাঠকদের কাছে এখনো তাঁর লেখনীর চমক এতটুকু নষ্ট হয় নি। নিত্য নতুন কাহিনীর আস্বাদ গ্রহণ করে তারা এই নীহাররঞ্জনের গ্রন্থে। বৈজ্ঞানিক উন্নতি ও দ্রুত পরিবর্তনের ফলে আমাদের সমাজে ও জীবনে পাশ্চাত্ত্যের প্রভাব এমনভাবে এসে পড়েছে যে ওদেশের মতো এখানেও অপরাধ-প্রবণতা দিনে দিনে বেড়েই চলেছে।

তাই আমাদের সমাজ জীবনে যে সব অপরাধ অজ্ঞাত ছিল, আজকে হঠাৎ যদি তেমন কোন কিছুর সাক্ষাৎ পাই, মনে হয় বুঝি অবাস্তব, অতিরঞ্জিত। কিন্তু নীহাররঞ্জন তাঁর সুনিপুণ লেখনীর সাহায্যে বিচক্ষণ বৈজ্ঞানিক মত যুক্তিতর্কসহ বিশ্লেষণ দ্বারা সে রহস্য এমনভাবে প্রকাশ করে দেন যে তখন সমস্ত মনটা মেনে নিতে বাধ্য হয় তাকে বাস্তব বলে।

রহস্য কাহিনীর জটিল গ্রন্থগুলি রচনা করে, আবার একটি একটি করে সেই গাঁট খুলে এক করে বেঁধে দিতে নীহাররঞ্জনের জুড়ি ওস্তাদ আর নেই।

নীহাররঞ্জনের কাহিনী তাই কখনো পাঠকের একঘেয়ে মনে হয় না, তাঁর দিগন্তবিস্তৃত সাফল্যের ও জনপ্রিয়তার কারণ এইখানে।

একদিকে তিনি ডাক্তার, হাজার হাজার মানুষের মনের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ সংযোগ, অন্যদিকে তিনি সাহিত্যিক লেখক, ভাষা ও কল্পনার যাদুকর। এই দুই প্রতিভার অত্যাশ্চর্য সম্মিলন নীহাররঞ্জনকে তাঁর জগতে আজও অপ্রতিদ্বন্দ্বী করে রেখেছে এবং ভবিষ্যতেও রাখবে।

আলোচ্য সংকলনে যে তিনটি কাহিনীর কথা বলা হয়েছে তাদের নাম কৃষ্ণা কাবেরী, রতিবিলাপ ও মদনভস্ম। এই তিনটি কাহিনীই উল্লিখিত প্রতিভার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

সুমথনাথ ঘোষ

কৃষ্ণা কাবেরী

এক

ইস্পাতের তৈরী ছোরাটা।

ছোরার ফলাটা ক্রমে সরু হয়ে অগ্রভাগটা তীক্ষ্ণ, অত্যন্ত ধারালো; ছোরার বাঁটটা সুদৃশ্য কারুকার্যখচিত চন্দনকাঠের তৈরী! সুস্নিগ্ধ পাতলা একটা চন্দনের গন্ধ ঘরের বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে!

দুটি চেয়ারে মুখোমুখি বসে সি. আই. ডি-র ইন্‌স্‌পেক্টার মজিবুর রহমান ও কিরীটী রায়। সামনেই একটা ছোট শ্বেতপাথরের টেবিলের উপরে অয়েল পেপারের উপরে রক্ষিত ছোরাটা।

কিরীটী প্রশ্ন করে, তারপর?

তারপর সকালে ভৃত্য মধুই নরেন মল্লিকের শয়নকক্ষে ঢুকে প্রথম দেখতে পায়, নরেন মল্লিকের অসাড় প্রাণহীন দেহটা ডেক-চেয়ারটার ঠিক সামনেই, মেঝের কার্পেটের উপরে চিৎ হয়ে পড়ে আছে এবং বাম দিককার বুকে ঐ ছোরাটা সমূলে বিদ্ধ হয়ে আছে। গায়ে তখনও তার স্লিপিং গাউনটা পরা! The dagger pierced through and through the heart!

হুঁ! যে-ই নরেন মল্লিককে ছোরা দিয়ে হত্যা করে থাকুক—আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে লোকটা হাতে প্রচুর শক্তি রাখে! আচ্ছা স্লিপিং গাউনটা তখনও নরেন মল্লিকের গায়েই ছিল বলছিলেন ইন্‌স্‌পেক্টার, ঘরের শয্যাটা পরীক্ষা করা হয়েছিল কি?

হাঁ। আমি নিজে পরীক্ষা করে দেখেছি শয্যাটা, রাত্রে ব্যবহৃত হয় নি। এমন কি প্রতি রাত্রে নাকি শয়নের পূর্বে নরেন মল্লিকের এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল পান করা অভ্যাস ছিল, মধুর সে রাত্রে রাখা শিয়রের সামনে ত্রি'পয়ের উপরে রক্ষিত জলভর্তি গ্লাসটা পর্যন্ত ঠিক তেমনই ছিল। রাত্রি দশটায় নিজে সে গ্লাসটা জলভর্তি করে রেখে এসেছিল। ময়না তদন্তের রিপোর্টেও তাহলে মৃত্যুর কারণ ছুরিকাঘাতই—

অন্য কোন নিদর্শনই পাওয়া যায় নি?

না।

কিরীটী সম্মুখের টেবিলের ওপরে রক্ষিত অয়েল পেপারের উপর থেকে ছোরাটা তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে থাকে। ইস্পাতের তৈরী মজবুত ছোরা। ওজনেও মন্দ হবে না। অগ্রভাগটা ধারালো ও তীক্ষ্ণ।

হঠাৎ মজিবুর রহমান বলে, কিন্তু আশ্চর্য কি জানেন মিঃ রায়, ছোরার বাঁটে কোন আঙ্গুলের ছাপই পাওয়া যায় নি!

কিরীটী তখনও ছোরাটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছিল, মৃদু কণ্ঠে বলে, স্বাভাবিক।

স্বাভাবিক!—বিস্মিত রহমান কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে।

হাঁ, তা বই কি! প্রথমতঃ ছোরার বাঁটে কোন আঙ্গুলের ছাপ পাওয়া গেলে সর্বাগ্রে নিশ্চয়ই সে কথা আপনি আমাকে বলতেন। দ্বিতীয়তঃ অমন কৌশলের সঙ্গে যে খুন করতে পারে, ছোরার বাঁটে সে তার আঙ্গুলের ছাপ রেখে যাবে এমন ভাবাই তো অন্যায়! আর এসব ক্ষেত্রে by chance আঙ্গুলের কোন ছাপ পাওয়া গেলেও সেটা হত্যাকারীর কখনো হয় না, বরং

যে নিহত হয় অনেক সময় তারই আঙ্গুলের ছাপ বা হাতের ছাপ পাওয়া যায়। কিন্তু সে কথা যাক্। মৃতের কক্ষে হত্যার সূত্র বা প্রমাণ হিসেবে তার বক্ষে বিদ্ধ এই ছোরাখানি ছাড়া আর কিছুই তাহলে পাওয়া যায় নি বা নজরে পড়ে নি আপনাদের? যেমন ধরুন, কোন struggleয়ের চিহ্ন বা—

না। So far সবই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখা হয়েছে, but nothing more could be detected.

হুঁ!

এর পর কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ করে থাকে।

হঠাৎ আবার কিরীটীই ডাকে, মিঃ রহমান?

বলুন?

সেই ঘরটা, মানে পার্ক সার্কাসে মৃত নরেন মল্লিকের বাড়িতে যে কক্ষে তাঁকে নিহত অবস্থায় পাওয়া যায়, সেই ঘরটা কি এখনো আপনাদের disposalয়েই আছে?

হাঁ নিশ্চয়ই! তদন্ত এখনো চলছে, করোনার্স কোর্টেও বিচার এখনও শেষ হয় নি। নরেন মল্লিক নিহত হয়েছে গত ২৭শে পৌষ সোমবার—আর আজ বৃহস্পতিবার, মাত্র তিন দিন আগে।

বেশ। তাহলে আজ এখুনি যদি আপনার অসুবিধা না হয় চলুন না, আর একটিবার সেই ঘরটা দুজনে ভাল করে দেখে আসা যাক। আর সেই সঙ্গে বাড়ির লোকদেরও দু-চারটে কথা জিজ্ঞাসা করে আসা যাবে।

বেশ তো! আপত্তি কি, চলুন!

তবে আর দেরি নয়—শুভস্য শীঘ্রম্—চলুন ওঠা যাক।

ইন্‌স্‌পেক্টার মিঃ রহমানের গাড়িতে চেপেই কিরীটী ও রহমান সাহেব রওনা হলো পার্ক সার্কাসে নরেন মল্লিকের বাড়ির দিকে অতঃপর। এবং গাড়িতে বসেই একটা সিগারে অগ্নিসংযোগ করে ধূমপান করতে করতে হঠাৎ এক সময় কিরীটী আবার প্রশ্ন করে, আচ্ছা রহমান সাহেব, আপনি বলছিলেন নরেন মল্লিক বহুদিন বর্মা মুল্লকে ব্যবসা করেছেন। এবং মাত্র এক বৎসর আগে যদি তিনি হঠাৎ ব্যবসা গুটিয়ে দিয়ে এসে থাকেন, কেন এলেন? আর শুধু তাই নয়, এক বৎসরের মধ্যেই খুনও হলেন নৃশংস ভাবে। কিন্তু কেন, কেন—

আপনার কথাটা ঠিক আমি বুঝতে পারছি না মিঃ রায়!

মানে, বলছিলাম তাঁর অর্থাৎ মল্লিকের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে একটা details পেলে আমাদের তদন্তের সুবিধা হতো না কি?—অনেক সময় দেখা গিয়েছে এ সব ঘটনার পিছনে থাকে অনেক ব্যক্তিগত ব্যাপার জড়িত হয়ে।

সৌভাগ্যক্রমে খুনের পরের দিন সকালে তদন্তের সময়ই নরেন মল্লিকের এক পুরাতন বন্ধু, অ্যাড্‌ভোকেট সমীর রায় এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনিই বলেছিলেন, নরেন মল্লিক তাঁর বহুকালের বন্ধু এবং নরেন মল্লিক হঠাৎ চাকরি ছেড়ে কলকাতায় চলে এসে তাঁরই বাড়িতে নাকি সর্বপ্রথম ওঠেন।

এক দিন সকালে ঠিক আজ থেকে এক বছর আগে।

সমীর রায় সকালে তার বাইরের ঘরে বসে ঐ দিনকার সংবাদপত্রটার ওপরে চোখ বুলোচ্ছে, বাইরে গেটের সামনে একটা গাড়ি থামবার শব্দ শোনা গেল। সমীর একটু কৌতূহলী হয়েই জানালার সামনে উঠে এসে দাঁড়াল। বাড়ির গেটের সামনে একটা মালবোঝাই ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে, ট্যাক্সির সামনে নরেন মল্লিক ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলছে।

নরেন! এ সময়ে হঠাৎ! কোন চিঠিপত্র না দিয়ে!

একটু পরেই নরেন এসে কক্ষে প্রবেশ করল।

নরেন তুই! হঠাৎ—

হঠাৎই। বর্মার ব্যবসা গুটিয়ে দিয়ে এলাম।

গুটিয়ে দিয়ে এলি? হঠাৎ—

চলে এলাম আর ভাল লাগল না। কিন্তু তার আগে তোর চারককে বল্, আমার চাকর মধু ট্যাক্সিতে আছে, মালপত্রগুলো নামিয়ে আপাতত কোথাও গুছিয়ে রাখবার জন্য হাত দিতে।

তা না হয় বলছি—কিন্তু—

ব্যস্ত হোস নে। সব বোলবো—

সমীর ভৃত্যকে ডেকে ট্যাক্সি থেকে সব মালপত্র নামিয়ে নিচের ভিজিটার্স রুমে আপাতত গুছিয়ে রেখে দিতে আদেশ দিল।

নরেন মল্লিকের চেহারাটা সত্যই দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে। বাঙালীর মধ্যে সচরাচর এমন চমৎকার সুগঠিত, উঁচু, লম্বা, সুশ্রী দৈহিক গঠন বড় একটা দেখা যায় না। নরেন মল্লিকের বয়েস বর্তমানে ঊনপঞ্চাশ এবং বয়সের অনুপাতে দেহের কোথাও এতটুকু ভাঙনও ধরে নি। সমস্ত দেহ জুড়ে এখনো যৌবন যেন স্থির হয়ে আছে।

কেবল কপালের দুপাশের চুলে সামান্য পাক ধরেছে। গায়ের বর্ণ উজ্জ্বল গৌর। দাড়ি-গোঁফ নিখুঁতভাবে কামানো। প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর। চঞ্চল, ক্রীড়াশীল ও কৌতুকপ্রিয় স্বভাব। নরেন মল্লিককে দেখলেই মনে হয়, সত্যিই যেন সে বেঁচে আছে। এবং পৃথিবীতে বাঁচবার সমস্ত রহস্যটুকুই যেন ওর করায়ত্ত।

দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর নরেন ও সমীর মুখোমুখি বসে দুই বন্ধুতে সকালের কথারই জের চালাচ্ছিল। আজ রবিবার, আদালতও বন্ধ। ছুটি।

নরেন বলছিল, মোদ্দা কথা বন্ধু, I want to live the rest of my life, যদিও শাস্ত্রে বলেছে পঞ্চাশের পরেই বনং ব্রজেৎ, আমি স্বীকার করি না সে কথা। আমার ideal পুরুষ হচ্ছে বিখ্যাত ডাক্তার ও বৈজ্ঞানিক ভরেনহফ্। অর্থ না থাকলে বাঁচা যায় না। এতকাল সেই অর্থের ধান্ধায় ঘুরেছি, সময় পাই নি জীবনের দিকে তাকাবার, আজ অর্থ আমার করায়ত্ত, এবারে eat, drink and be merry! এবারে বাঁচতে চাই! So—

So? হাস্যোৎফুল্ল ভাবে সমীর বন্ধুর দিকে তাকায়।

So একটা বাড়ি ও একটা গাড়ি সর্বাগ্রে প্রয়োজন; তারপর শুরু করবো আমার জীবন।

বাড়ি আর গাড়ি?

হাঁ। বর্তমান দুনিয়ায় বাড়ি, গাড়ি ও ব্যাঙ্ক-ব্যালান্সই আধুনিক কালে বাঁচবার প্রচেষ্টায়

প্রথম তিনটি সোপান; শেষটি আমি সঙ্গে করেই এনেছি এবার, প্রথম দুটি তুমি সংগ্রহ করে দাও, শুরু করি আমি আমার জীবনের নতুন অধ্যায়।

বেশ!

বেশ নয়—একটি মুহূর্তও আর নষ্ট করবার মত হাতে নেই বন্ধু! জীবনের অনেকটা সময় চলে গিয়েছে অতএব আর অপেক্ষা নয়—বাড়ি তৈরী করবার ধৈর্য বা সময় আমার নেই। ৬০।৭০ হাজারের মধ্যে একটা বাড়ি ক্রয় করতে চাই আমি—আর a nice-looking car—Ford fluid-drive, ওলডস্‌মবিল বা স্টুডিবেকার—নিদেনপক্ষে হাম্বার বা রোভার-১২।

বেশ তো, টাকা থাকলে কলকাতা শহরে বাঘের দুধও নাকি মেলে—তা এ তো বাড়ি আর একটা গাড়ি!

তারপর একটু থেমে বলে, দাঁড়াও, পার্ক সার্কাস অঞ্চলে একটা চমৎকার নব্যকেতার বাড়ি আমার এক ক্লায়েন্টের ডিসপোজালেই আছে, বাড়িটা ভালই—দোতলা, উপরে নীচে খান আষ্টেক ঘর, সামনে লন, পের্টিকো, পিছনেও ছোটখাটো একটা বাগান, গ্যারাজ, গেটের পাশে দারোয়ানদের থাকবার ঘর।

চমৎকার! দাম?

সেলামী নিয়ে বোধহয় হাজার ষাটেক পড়বে—মানে যাঁর বাড়ি তিনি একটু বেকায়দায় পড়েই বাড়িটা বিক্রী করে দিতে চান, নইলে ও বাড়ি ধরে রাখলে হাজার আশি পর্যন্ত—

ডোণ্ট ওরি, এখুনি ফোন কর কিন্তু ঐ সেলামীর কথা কি বলছিলে?

থাকতে মগের দেশে, অধুনা কলকাতার সংবাদ তো রাখ না! বাড়ির problem বর্তমানে এ শহরে যা হয়েছে! ঐ সেলামী হচ্ছে বাড়ি ভাড়া ও ক্রয়ের প্রথম সোপান। তা সেলামীও বলতে পার—আক্কেল সেলামীও বলতে পার কারণ প্রয়োজনটা যখন ক্রেতা বা ভাড়া-প্রার্থীর—

ঠিক আছে, ফোন কর।

বাড়ি দেখে নরেনের পছন্দ হয়ে গেল। সত্যি চমৎকার বাড়িটা। পরের দিনই বায়না করা হলো। এবং নির্দিষ্ট দিনে নতুন বাড়ি ও ফ্লুইড্ ড্রাইভ একটা ফোর্ড গাড়ি কিনে নরেন মল্লিক গৃহপ্রবেশ করল। বাড়ির ফটকে নেম-প্লেট বসলো ঃ শ্রীনরেন মল্লিক।

গেটের দারোয়ান বহাল হলো, খোট্টাই রামখেল সিং। আরো দুজন চাকর এলো, হরি আর যদু, পনের বছরের পুরাতন ভৃত্য মধু তো রইলই। ড্রাইভার নন্দুয়া এলো, পাচক উৎকলবাসী শ্রীমান জগন্নাথ। দামী দামী সাজসজ্জায় বাড়িঘরদোর ভরে উঠলো।

নিরহঙ্কার, সদালাপী স্বভাবের দরুন শীঘ্রই পাড়ায়, অভিজাত মহলে নরেন মল্লিকের নামটা এ-কান ও-কান হতে হতে দশ কানে ছড়িয়ে গেল। লম্বাচওড়া সুশ্রী চেহারা—এখনো বিবাহাদি করে নি। বয়স যদিচ পঞ্চাশের কোঠায় চলেছে, এখনো অটুট স্বাস্থ্য ও যৌবনের প্রাচুর্যে ঢল ঢল, তার উপরে কাল্পনিক ব্যাঙ্ক-ব্যালান্সের গুজব, বাড়ি, গাড়ি এবং সর্বোপরি মিষ্টি সদালাপী অমায়িক ব্যবহার।

কলকাতার আধুনিক অভিজাত মহলে শীঘ্রই মুখে মুখে নরেন মল্লিক প্রসিদ্ধ হয়ে গেল। জাগিয়ে তুললো একটা রীতিমত সাড়া। অনেক অবিবাহিতা মেয়েদের মায়েরা নরেন মল্লিকের গৃহে প্রায়ই আনাগোনা করতে শুরু করলেন। আর এক শ্রেণীর মেয়ের মায়েরা আছেন, যাঁরা

অল্পবয়সী ছেলে—জীবনে এখনো সুপ্রতিষ্ঠিত নয়, সেই সব পাত্রের চাইতে মধ্যবয়সী প্রতিষ্ঠিত ও অর্থবান পাত্রদের ঢের বেশী পছন্দ করেন, তাঁরাও অনেকে সেজেগুজে মেয়েদের নিয়ে নিয়মিত হাজিরা দিতে শুরু করলেন মল্লিক পারলারে।

আজ পার্টি, কাল উৎসব—একটা না একটা লেগেই থাকত নরেন মল্লিকের গৃহে ; মোট কথা নরেন মল্লিক যা চেয়েছিল তা দুদিনেই হাতের মুঠোয় এসে গেল। ঐ সঙ্গে এলো প্রতিষ্ঠা।

আত্মীয়স্বজন বলতে গৃহে নরেন মল্লিকের এক ভাগ্নে, নাম সুবিমল এবং বয়স তার ৩০।৩২য়ের মধ্যে। সুবিমলও বিবাহাদি করে নি, বি. এ. পাস। ইনসিওরেন্সের মাহিনা করা দালাল। দেখতে সুশ্রী না হলেও মোটামুটি শরীরে একটা আলগা শ্রী আছে। বলিষ্ঠ দোহারা দেহের গঠন, বেশ একটু সৌখীন প্রকৃতির।

সুবিমল ছাড়া বাড়িতে পুরাতন বৃদ্ধ ভৃত্য মধু; হরি ও যদু দুটি ভৃত্য, ঠাকুর জগন্নাথ, দারোয়ান রামভজন সিং ও রামখেল সিং, ড্রাইভার নন্দুয়া এবং বিনতা। আর বাড়িতে ঐ বিনতাই ছিল একমাত্র স্ত্রীলোক। বিনতা ভদ্রঘরের ব্রাহ্মণের বিধবা, মধ্যবয়সী। প্রকৃতপক্ষে নারীহীন সংসার নরেন মল্লিকের বিনতাই সব দেখাশুনা করতো। এবং ভদ্রমহিলা সব দেখাশুনা করলেও কখনও নরেনের সামনে বড় একটা বের হতো না। আর সর্বদাই মুখের ওপর টানা থাকত একটি দীর্ঘ অবগুণ্ঠন।

নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের মধ্যে দিয়েই দিন কেটে যাচ্ছিল নরেন মল্লিকের। কোন একটি নবলব্ধ বান্ধবীর জন্মতিথি উৎসব অত্যাসন্ন—সুন্দরী, তরুণী বান্ধবী, একটা ভাল রকম প্রেজেন্টেশন দিতে হবে।

সন্ধ্যার কিছু পরে নরেন মল্লিক হীরালাল শেঠের প্রকাণ্ড জুয়েলারীর দোকানের সামনে এসে গাড়ি থেকে নামল।

আধুনিক ডিজাইন ও প্যাটার্ণের স্বর্ণালঙ্কার বিক্রেতা হিসাবে হীরালাল শেঠের দোকানে অভিজাত মহলের সুন্দরীদের যাতায়াতটা খুব বেশী। উজ্জ্বল আলোয় শো কেসের জড়োয়ার গহনাগুলো বর্ণদ্যুতি বিকিরণ করছে।

নরেন মল্লিক দোকানের মধ্যে এসে প্রবেশ করল। দোকানের ম্যানেজার যমুনাদাস শেঠ নরেন মল্লিকের পরিচিত। শাঁসালো খরিদ্দার হিসাবে মল্লিক এ দোকানে বহুবার পদার্পণ করেছে ইতিপূর্বে, সেই কারণেই ম্যানেজার শেঠজী তাকে যথেষ্ট খাতিরও করেন।

আইয়ে আইয়ে মল্লিক সাব!

যমুনাদাস নরেন মল্লিককে দোকানে প্রবেশ করতে দেখেই সাদর আহ্বান জানায়।

মল্লিক ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি নিয়ে এগিয়ে আসে, নমস্তে যমুনাদাসজী। তবিয়ৎ আচ্ছা তো?

আপকি মেহেরবানি। ফরমাইয়ে সাব কেয়া দেখাউঁ—

আসলি মুক্তাকা কৌই হার হ্যায় তো জেরা মেহেরবানি করকে দেখাইয়ে শেঠজী—

আসলি মুক্তা! চলিয়ে সাব উধার, ও কাউণ্টারকে পাশ—

দোকানের পশ্চিম কোণে একটু নিরিবিলি কাউণ্টারের ছোট একটি অংশ, স্বল্প আলো-আঁধারিতে ঘেরা। একপাশে স্ট্যাণ্ডের উপরে সবুজ ডোমে ঢাকা উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক বাল্‌ব জ্বলছে—আলোর নিচে আট-দশটা মুক্তার হার বের করে এনে ছড়িয়ে দিল যমুনাদাস, মল্লিকের সামনে।

লিজিয়ে মল্লিক সাব! সব আসলি মুক্তা!

নরেন মল্লিক হারগুলি পরীক্ষা করতে থাকে আলোয়।

হঠাৎ সামান্য দূরে কাউন্টারের অপর পার্শ্ব হতে একটা ঈষৎ চাপা ভারী গলা শোনা যায়, কোই দামী নেকলেস দেখাইয়ে সাব। হীরাকা নেকলেস। বহুৎ আচ্ছা হীরা হোনা চাইয়ে—

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতই যেন চম্‌কে ফিরে তাকায় ঐ কণ্ঠস্বরে নরেন মল্লিক। হাতপাঁচেক ব্যবধান মাত্র। লম্বাচওড়া দীর্ঘকায় এক পাঠান। পরিধানে দামী নেভী-ব্লু সার্জের স্যুট, মাথায় কালো ফেজ। মুখের একাংশ মাত্র দেখা যাচ্ছে। উজ্জ্বল আলোর খানিকটা তির্যক ভাবে মুখের দক্ষিণ অংশে এসে পড়েছে।

দীর্ঘ একটা ক্ষতচিহ্ন দক্ষিণ অক্ষিকোণ হতে গালের অর্ধাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত।

নরেন মল্লিক তাড়াতাড়ি মুক্তার হারগুলো এক পাশে ঠেলে দিয়ে বলে ওঠে, ফির দোসরা কোই টাইমমে কাল আয়েঙ্গে শেঠজী। আচ্ছা নমস্তে।—কতকটা যেন হন্তদন্ত হয়েই নরেন মল্লিক দোকান থেকে বের হয়ে আসে।

হঠাৎ পাঠান এমন সময় বলে ওঠে, এ কেয়া হীরা হায়! হীরা—ম্যায় আসলি হীরা চাহাতে হুঁ!

নরেন মল্লিক গাড়ির দরজা খুলে ঝুপ করে গাড়ির পিছনের গদীতে বসে পড়েই বলে, নন্দুয়া, বাড়ি!

সে রাত্রে নরেন মল্লিকের ভাল ঘুম হয় না। তার মনে হয় দীর্ঘকায় একটা ছায়ামূর্তি যেন তার শয্যার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। মুখে একটা কালো মুখোশ। ভীতিবিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে নরেন মল্লিক। মুখোশের দুটি গোলাকার ছিদ্রপথে, দুটি চক্ষু তো নয় যেন দুটি অগ্নিগোলক জ্বলজ্বল করছে। ধীরে ধীরে মুখোশধারী এগিয়ে আসছে শয্যার দিকে, পায়ে পায়ে নিঃশব্দে। এসে দাঁড়াল একেবারে শয্যার গা ঘেঁষে।

তারপর একটু একটু করে মুখোশটা যেন উন্মোচন করে ছায়ামূর্তি।

কে! কে! ঘুমের ঘোরেই চিৎকার করে ওঠে নরেন মল্লিক। ঘুম ভেঙে যায় নরেন মল্লিকের। অন্ধকার ঘরে সামান্য একটুখানি চাঁদের আলো খোলা জানালাপথে এসে কক্ষমধ্যে লুটিয়ে পড়েছে। সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে গিয়েছে। হাত বাড়িয়ে আলোটা জ্বালিয়ে দেয় নরেন মল্লিক বেড্ সুইচ্‌টা টিপে। শূন্য ঘর। বাকী রাতটুকু চোখের পাতায় আর ঘুম আসে না।

আবার একদিন রাত্রি প্রায় সাড়ে এগারটায় গাড়িতে করে বেড়িয়ে ফিরছে নরেন মল্লিক, গাড়ি গেটের মধ্য দিয়ে ঢুকছে, হঠাৎ নরেনের দৃষ্টি যেন স্থির হয়ে যায়। রাস্তার গ্যাসপোস্টের আলো গেটের ওধারে এসে পড়ছে—সেই অস্পষ্ট আলোয় দেখে দীর্ঘ এক ছায়ামূর্তি, পরিধানে কালো স্যুট, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ঠিক গেটেরই কাছে।

মূর্তিটা যেন একটু নত হয়ে কুর্নিশ জানাবার ভঙ্গী করে এবং পরক্ষণেই একপাশে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

প্রায়ই এর পর থেকে ছায়ামূর্তি চোখে পড়তে লাগল নরেন মল্লিকের। কখনো পাশ দিয়ে হেঁটে যায়, কখনো গাড়িতে করে পাশ কাটিয়ে চলে যায়। কখনো দূরে দাঁড়িয়ে থাকে। কখনো ছায়ার মত দীর্ঘ পা ফেলে ফেলে হেঁটে অথবা গাড়িতে চড়ে অনুসরণ করে।

একদিন গভীর রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে শয়নকক্ষের খোলা জানালার সামনে এসে দাঁড়াতেই

নজরে পড়লো—বাড়ির অল্পদূরে গ্যাসপোস্টটার নিচে দাঁড়িয়ে সেই দীর্ঘ ছায়ামূর্তি—মুখ তুলে অপলকে যেন তারই ঘরের দিকে তাকিয়ে আছে।

শুধু নরেন মল্লিকেরই না, ড্রাইভার নন্দুয়ার দৃষ্টিতেও পড়ে। সেও দেখে কালো রংয়ের একটা সেলুনগাড়ি যেন প্রায়ই নিঃশব্দে ওদের গাড়িকে অনুসরণ করছে। কখনো অনুসরণ করে একটা চকিত প্রহেলিকার মত, কখনো সোঁ করে পাশ কাটিয়ে চলে যায়। কখনো বা শোনা যায় একটা অস্পষ্ট শব্দ।

নন্দুয়া অবশেষে একদিন বলে, একটা কথা বলবো বাবু—

কি নন্দুয়া?

মাঝে মাঝে কিছুদিন থেকে মনে হচ্ছে যেন একটা কালো রংয়ের গাড়ি আমাদের গাড়ির পিছু আসছে—

হেসে ওঠে নরেন মল্লিক, যাঃ! কে আবার follow করবে? ও তোর দেখবার ভুল নন্দুয়া—

না বাবু—

যা যা—ওসব কিছু না!

উড়িয়ে দিতে চাইলেও একটা বোবা আশঙ্কা নরেনের মনকে যেন আচ্ছন্ন করে রাখে সর্বদা। ক্লেদাক্ত একটা অক্টোপাশের অষ্টবাহু যেন নরেনের সর্বাঙ্গ বেষ্টন করতে চাইছে। শয়নে, স্বপনে, জাগরণে একটা অনিশ্চিত আশঙ্কা, বিশ্রী একটা দুঃস্বপ্নের মতই ওকে যেন তাড়া করে ফেরে সর্বদা। অবাধ হাসি ও আনন্দের মধ্যে ঐ দুঃস্বপ্ন যেন নরেন মল্লিককে চঞ্চল, আনমনা করে তোলে। চোখেমুখে একটা দুশ্চিন্তার কালো রেখা যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বন্ধু সমীরের দৃষ্টিকেও এড়াতে পারে না নরেন মল্লিক। কথা বলতে বলতে হঠাৎ কেমন চম্‌কে চম্‌কে ওঠে। ভীত, শঙ্কিত দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকায়।

সমীর একদিন প্রশ্ন করে, ব্যাপার কি বল্ তো নরেন? আজকাল কিছুদিন হতে তোকে যেন কেমন চঞ্চল অন্যমনস্ক মনে হয়! হঠাৎ কেমন চম্‌কে চম্‌কে উঠিস, কি ব্যাপার বল্ তো?

না না—ও কিছু নয়।

উঁহু, আমার কাছে গোপন করছিস তুই! Keeping some secret—no no my dear friend—আমার চোখে তুই ধুলো দিতে পারবি না। Be frank!

এবারেও কিন্তু নরেন মল্লিক চুপ করেই থাকে।

আমার কাছেও গোপন করবি নরেন?

আজ নয় সমীর, অন্য এক সময় বলবো—অন্য এক সময় বলবো। বলতে বলতে হঠাৎ যেন নরেন মল্লিক কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

নরেন?

It's a long story সমীর! তারপর একটু চুপ করে থেকে হঠাৎ আবার মৃদু চাপাকণ্ঠে বলে, রাজার ঐশ্বর্য! বহু রাজার রত্নভাণ্ডারেও নেই! বলতে বলতে আবার চুপ করে গেল নরেন মল্লিক।

সমীর বুঝতে পারে। একটা রহস্য যা নরেন গোপন করতে চাইছে, কিন্তু কি এ রহস্য!

নরেন বলে, তোকে বলবো সমীর, হ্যাঁ, একদিন তোকে সব বলবো। সাজাহানের

ময়ূরসিংহাসন আলো করেছিল। এক হাত থেকে আর এক হাত—হস্তান্তর হতে হতে—বাকীটুকু আর শেষ করলে না নরেন মল্লিক। সমীরের বাড়িতেই রাত্রে তারই ওখানে আহারাদির পর দুটো সোফার ওপরে মুখোমুখি বসে গল্প করছিল দুই বন্ধুতে।

আচম্‌কা হঠাৎ একসময় সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল নরেন মল্লিক। ওয়ালক্লকটায় ঢং ঢং করে রাত্রি এগারটা ঘোষণা করলে।

উঃ, রাত অনেক হলো, চলি ভাই! Good Night।

এর দুদিন পর নরেন মল্লিকের বাড়িতে রাত্রে চোরের উপদ্রব হলো। আশ্চর্য, চোরের উপদ্রব হলো বটে কিন্তু কোন জিনিসই চুরি যায় নি শেষ পর্যন্ত দেখা গেল। নরেন ওই ডিস্ট্রিকটের পুলিস কমিশনার মিঃ চট্টরাজকে চোরের উপদ্রবের কথা সব বললে। চট্টরাজ নরেনের বন্ধু। দিবারাত্রির জন্য নরেনের গৃহে পুলিস প্রহরী মোতায়েন হলো। এবং আশ্চর্য, সঙ্গে সঙ্গে ছায়ামূর্তিও যেন মিলিয়ে গেল ছায়ার মতই।

তারপর দু'মাস নির্বিঘ্নে কেটে গেল। আর কোন উৎপাত নেই—নরেনও ভুলে গেল বোধ হয় সব কথা। পুলিস প্রহরী উঠিয়ে নেওয়া হলো।

ঐ সময় সমীর স্বাস্থ্য খারাপ হওয়ায় মাস তিনেকের জন্য কলকাতার বাইরে যায়। নরেনের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হবার সুযোগও হয় নি। যেদিন সমীর কলকাতায় ফিরে এলো তারই দিনতিনেক বাদে—নরেনের জন্মতিথি উৎসবে এলো সমীর নরেনের বাড়িতে। নরেনের আগের স্ফূর্তি যেন আবার ফিরে এসেছে, নরেন যেন অত্যন্ত খুশী!

সেই রাত্রেই অদৃশ্য আততায়ীর হাতে নৃশংসভাবে ছুরিকাঘাতে নিহত হলো নরেন মল্লিক।

চলন্ত গাড়ির মধ্যে রহমানের পার্শ্বে উপবিষ্ট কিরীটী মুখের পাইপটা হাতে নিয়ে এক-সময় প্রশ্ন করলে, নরেন মল্লিকের তাহলে একটা পূর্ব-ইতিহাস আছে বলুন—and quite interesting too! তারপর হঠাৎ আবার দ্বিতীয় প্রশ্ন করে, বাড়ির সমস্ত লোকেদের জবানবন্দীই তো নেওয়া হয়েছে, না মিঃ রহমান?

হ্যাঁ। এই যে দেখুন না, জবানবন্দীর ফাইলটা এই তো আমার সঙ্গেই আছে।

দেখি? হাত বাড়িয়ে কিরীটী রহমানের হাত থেকে জবানবন্দীর ফাইলটা নিল।

জবানবন্দী নেওয়া হচ্ছিল সেই দিন প্রাতে নরেন মল্লিকের শয়নকক্ষেই বসে। পার্ক সার্কাস থানা ইনচার্জ খোদাবক্স এক একজন করে ঘরের মধ্যে ডেকে এনে জবানবন্দী নিচ্ছেন। টেবিলের ওপরে ফাইলটা খোলা, হাতে পেনসিল, থানা ইনচার্জ খোদাবক্স জবানবন্দী লিখে নিচ্ছেন একের পর একের।

সামনে দাঁড়িয়ে নরেন মল্লিকের পুরাতন ভৃত্য মধু ঘোষ। মধুর জবানবন্দীই প্রথমে নেওয়া হয়, কারণ সে-ই ঘরের মধ্যে ঢুকে সর্বপ্রথম এ বাড়িতে মৃতদেহটা দেখতে পায়।

মধু ঘোষ ঃ বেঁটেখাটো লোকটি, দড়ির মত পাকানো দেহের পেশীগুলো অত্যন্ত সজাগ।

মাথার চুলে ইতিমধ্যেই পাক ধরেছে। পরিষ্কার একটা ধুতি ও হাতকাটা একটা পিরান গায়ে। চোখ দুটো ছোট ছোট বর্তুলাকার। এক জোড়া ভারী গোঁফ। সামনের দুটো দাঁত বেশ উঁচু—নিচে ঠোঁটের ওপরে চেপে বসেছে।

তোমার নাম মধু ঘোষ?

আজ্ঞে।

কোথায় বাড়ি?

কাটোয়াতে।

জাত?

গোয়ালা, বাবু!

কতদিন এ বাড়িতে আছো?

আজ্ঞে বাবুর কাছে আজ প্রায় আট বছর আমি কাজ করছি।

আট বছর! তাহলে তো খুব পুরাতন লোক হে তুমি!

আজ্ঞে—

তাহলে বাবুর সঙ্গে তুমি বর্মাতেও ছিলে?

হাঁ। আট বছর আগে বাবু একবার এক মাসের জন্যে কলকাতায় আসেন। বাবুর যে উকীল বন্ধু সমীরবাবু তাঁরই বাড়িতে আমার কাকা কাজ করতো। আমি তখন কাজের খোঁজে নতুন শহরে এসেছি, কাকার কাছেই আছি; বাবুর একজন দেশী লোকের প্রয়োজন হওয়ায়, উকিল বাবুই কাকাকে বলে আমাকে বাবুর কাজে বহাল করে দেন। আমার বয়স তখন বছর পঁচিশেক, সেই হতে এ পর্যন্ত বাবুর কাছেই আছি!

বেশ। আচ্ছা মধু, গতকাল রাত্রে বাবুর সঙ্গে শেষ তোমার কখন দেখা হয়েছিল?

আজ্ঞে রাত সাড়ে দশটায়। দশটা নাগাদ রাতে বাবু বেড়িয়ে ফিরে আসেন। এসে বললেন আমায় ডেকে, ক্ষিধে নেই, কিছুই খাবেন না রাত্রে, কেবল এক কাপ দুধ খাবেন। আমি বিনতা দিদিকে তাই আর তুললাম না ডেকে। দুপুর থেকেই তিনি জ্বর হয়েছিল বলে শুয়ে ছিলেন। আমাকে বলেছিলেন, বাবুর খাবার সময় হলে তাঁকে ডাকতে কিন্তু বাবু রাত্রে খাবেন না জেনে আর তাঁকে তুলি নি। অনেক দিন থেকেই রোজ রাত্রে ঘুমোবার আগে বাবুর এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খাওয়ার অভ্যাস ছিল। দুধ খাইয়ে রাত সাড়ে দশটায় ঘরে জলের গ্লাসটা রেখে যাই।

জলের গ্লাসটা রেখে যাবার সময় বাবু কি করছিলেন তোমার মনে আছে মধু?

হাঁ, ঐ ডেক-চেয়ারটার ওপরে বসে একটা বই পড়ছিলেন। আমায় বললেন, যাবার সময় দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যেতে। দরজা ভেজিয়ে দিয়ে আমি নিচে চলে এলাম।

তারপর?

তারপর বিকালের দিকে কাল বাবুর জন্মতিথি উৎসবের জন্য বিশেষ খাটাখাটনি হওয়ায় সোজা নিজের ঘরে এসে ঘুমিয়ে পড়ি। রোজ খুব ভোরে আবার বাবু এক গ্লাস গরম জল নুন দিয়ে খেতেন। গ্লাসে করে গরম নুনজল নিয়ে আজ সকালে ঘরে এসে ঢুকলাম, তখনও কিছুই জানি না—

একটা কথা মধু, তোমার বাবুর শোবার ঘরের দরজাটা কি বরাবর খোলাই থাকত?

আজ্ঞে হাঁ। খুব ভোরে গরম নুনজল গ্লাসে করে এনে আমিই তাঁর ঘুম ভাঙ্গাতাম। এটা বাবুর ২১।২২ বছরের অভ্যাস। চাকরিতে ঢোকার পর আমিই ঐ কাজটা করতাম।

হাঁ—বল তারপর?

ঘরে ঢুকে বিছানার দিকে এগিয়ে যেতেই দেখতে পেলাম বাবু ঐভাবে মেঝের ওপরে—

বলতে বলতে মধু থেমে গেল। সকলের দৃষ্টি মধুর কথা অনুসরণ করে যুগপৎ গিয়ে মেঝেতে কার্পেটের ওপরে যেখানে নরেন মল্লিকের অসাড় প্রাণহীন, ছোরাবিদ্ধ দেহটা পড়ে ছিল, সেই দিকে গিয়ে স্থিরনিবদ্ধ হলো।

দামী কার্পেটের ওপরে ঠিক ডেক-চেয়ারটার সামনেই চিৎ হয়ে পড়ে আছে নরেন মল্লিকের প্রাণহীন দেহটা তখনও।

বামদিককার বক্ষে প্রায় আমূল বিদ্ধ হয়ে আছে সুদৃশ্য কারুকার্যখচিত বাঁটওয়ালা একটা ছোরা। চোখ দুটো যেন ঠেলে বের হয়ে আসতে চায়। অসহায় একটা ভীতি যেন চোখের মণি দুটোয় তখনও স্পষ্ট হয়ে আছে।

ঐভাবে বাবু পড়ে আছেন—রুদ্ধ কান্নাঝরা সুরে কথা ক'টি যেন কোনমতে শেষ করার জন্যই উচ্চারণ করে মধু। প্রভুর আকস্মিক নিষ্ঠুর মৃত্যুতে মধু যে মনে বিশেষ আঘাত পেয়েছে বুঝতে কারও কষ্ট হয় না।

এতক্ষণে যেন সত্যসত্যই শোকের একটা বিষণ্ণতা নরেন মল্লিকের হত্যাকে কেন্দ্র করে কক্ষের মধ্যে নেমে এলো। থানা-ইনচার্জ খোদাবক্সও ক্ষণেকের জন্য তাঁর লেখা থামিয়ে মৃতের মুখের দিকে চেয়ে থাকেন।

প্রসারিত দেহটা। ডান ও বাম হাতের মুষ্টি দুটো বদ্ধ। মাথাটা এক পাশে ঈষৎ হেলে পড়েছে।

মধুর দু'চোখের কোল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে।

খোদাবক্স আবার তাঁর পেনসিলটা তুলে নিয়ে সম্মুখে টেবিলের ওপরে রক্ষিত খাতার উপরে খস্ খস্ করে লিখে চলেন ঃ—

মধু ভয়ে চিৎকার করতে করতে হাউমাউ করে নিচে এসে যদু ও হরিকে সব বলে। সুবিমল তখনও নাকি নিজের কক্ষে ঘুমাচ্ছিল, গিয়ে ডাকাডাকি করে তাকে তোলে। সুবিমলের চোখ থেকে তখনও ঘুমের ঘোর ভাল করে কাটে নি, হতভম্বের মত চেয়ে থাকে ওদের মুখের দিকে কিছুক্ষণ। শেষ পর্যন্ত সুবিমলই ফোন করে পার্ক সার্কাস থানায় সংবাদ পাঠায়।

রবিবার সন্ধ্যায় নরেন মল্লিকের বাড়িতে তাঁর জন্মতিথিকে কেন্দ্র করে যে উৎসবের আয়োজন হয়েছিল অনেকেই তাতে নাকি যোগ দিয়েছিল। উৎসব শুরু হয় বিকাল পাঁচটায় এবং শেষ হয় রাত্রি আটটায়। রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটার সময় নরেন মল্লিক গাড়ি নিয়ে বেড়াতে যান। এবং ফিরে আসেন রাত্রি প্রায় দশটায়। ক্ষিদে না থাকায় রাত্রে বিশেষ কিছু খাওয়াদাওয়া করেন নি, কেবল এক গ্লাস গরম দুধ পান করেছিলেন মাত্র।

পরের দিন প্রাতে তাঁকে বুকে ছোরাবিদ্ধ অবস্থায় মৃত দেখতে পাওয়া গেল শয়নকক্ষের মেঝের উপরে লম্বমান। এবং আশ্চর্য, ছোরাটা নাকি নরেন মল্লিকের নিজেরই ছোরা!

তাঁরই শয়নকক্ষে বুক-শেলফ্‌য়ের উপরে একটা সুদৃশ্য জয়পুরী পিতলের প্লেটে ছোরাটা থাকত এবং অনেকেই সে কথা জানত। ছোরাটা তাঁকে উপহার দিয়েছিল তাঁরই এক বন্ধু, মহীশূরে বেড়াতে গিয়ে কিনে এনে তাঁরই কোন এক জন্মতিথি উৎসব উপলক্ষে।

মধু ঘোষ, গোয়ালার ছেলে, বাড়ি কাটোয়ায়। বছর আষ্টেক হবে নরেন মল্লিকের সঙ্গে আছে। নরেনের বেশীর ভাগ কাজ ও-ই করত। নরেনের জামা কাপড় ইত্যাদির ভারও মধুর উপরেই ছিল। নরেন ওকে অত্যন্ত ভালবাসতেন ঃ লিখে চলেন খোদাবক্স।

মধু তার জবানবন্দীতে আরো বলে ঃ

ইদানীং একটি মেয়ে বাবুর সঙ্গে একটু যেন বেশী ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। বয়স তার বছর ২৪।২৫ হবে। দেখতে খুব সুন্দরী। না, তার বাড়ির ঠিকানা আমি জানি না, ড্রাইভার নন্দুয়া হয়ত জানে। দেখলে—হাঁ, তাকে দেখলে নিশ্চয়ই আমি চিনতে পারবো, অনেক দিন তো তাকে দেখেছি। আজ্ঞে মেয়েটি খুব ভাল বলেই তো মনে হয়। বাবুর ভাগ্নে ঐ সুবিমলবাবুকে বাবু খুব ভালবাসতেন। সুবিমলবাবুও তাঁর মামাবাবুকে খুব ভক্তিশ্রদ্ধা করতেন। না, মামা-ভাগ্নের মধ্যে কোন মন-কষাকষি বা রাগারাগিই ছিল না। কাল সুবিমলবাবু অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরেছেন, নিচের দালানের দরজা রাত্রে আমিই তাঁকে খুলে দিয়েছিলাম। না, বাবুর শত্রু থাকলেও সে খবর আমি রাখি না বাবু। অমন লোকের কোন শত্রু থাকতে পারে বিশ্বাস করি না। না, কাউকেই আমার সন্দেহ হয় না। না, কোন শব্দ বা চিৎকার আমি শুনি নি গতরাত্রে।

যদুনাথ পোল ঃ আজ্ঞে—জাতিতে আমি সদ্‌গোপ। বাড়ি পাবনা জেলায়। মাস ছয়েক হলো বাবুর এখানে কাজে বহাল হয়েছি। সেদিন উৎসব শেষে সকলে চলে গেলে কিছুক্ষণ পরেই জামা কাপড় বদলিয়ে বাবু গাড়ি নিয়ে বের হয়ে গেলেন। রাত্রি দশটায় আবার ফিরে আসেন। আজ্ঞে না, কোন শব্দই ঐ রাত্রে আমি শুনতে পাই নি। খাটাখাটনিতে বড্ড পরিশ্রান্ত ছিলাম, শুতে শুতেই ঘুমিয়ে পড়েছি। পরের দিন মধুদার ডাকেই ঘুম ভেঙ্গে সব শুনতে পাই।

হরি সাধু ঃ আমি বাবু জাতিতে তিলি, বাড়ি বগুড়া জেলায়। মাস তিনেক হলো বাবুর এখানে কাজ করছি। বাবু বেশ ঠাণ্ডামেজাজী লোক ছিলেন, কখনো কাউকেই গালমন্দ করতেন না। সন্ধ্যার ঝামেলা মিটে গেলে বাবুর কাছ থেকে ছুটি নিয়ে, আমার এক খুড়ো থাকে পার্ক সার্কাস বাজারের ওপরে, তার পানবিড়ির দোকান, তারই সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। ফিরে এসেছি রাত যখন সাড়ে বারোটা হবে, দারোয়ানের ঘরের ঘড়িতেই সময় দেখেছি। আমার স্পষ্ট মনে আছে বাবুর শোবার ঘরের আলো তখনও জ্বলছিল। আজ্ঞে না, কোন চিৎকার বা শব্দ কিছুই শুনতে পাই নি। সকালে মধুদার চেঁচামেচিতে ঘুম ভাঙ্গে, তার মুখেই প্রথমে শুনলাম বাবু খুন হয়েছেন।

রামখেল সিং ঃ বাড়ি ছাপড়া জিলায়, এ বাড়িতে শুরু থেকেই আমি দারোয়ানের কাজ করছি। আজ্ঞে হাঁ, রাত্রি সাড়ে দশটার পরই সাধারণত গেট বন্ধ করে দিই। রাত যখন সাড়ে এগারোটা, নন্দুয়া এসে বিড়ি চাওয়ায় তাকে বিড়ি দিই, ঐ সময়ই বাবুর ঘরের আলো নিবে যেতে দেখি। আজ্ঞে হাঁ, ঘরে আমার একটা ঘড়ি আছে, বাবুই কিনে দিয়েছিলেন। তারপর ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, রাত সাড়ে বারোটায় হরি ফিরে এলে আবার তাকে গেট খুলে দিই, আবার রাত সোয়া একটায় সুবিমলবাবুও ফিরে এলে গেট খুলে দিয়েছিলাম। না, শেষের দুবারের একবারও তখন বাবুর ঘরের আলো জ্বলছিল কিনা লক্ষ্য করি নি, তবে যতদূর মনে পড়ে জ্বলছিল না।

রামভজন সিং ঃ সন্ধ্যার পরই ছুটি নিয়ে টালায় তার এক দেশওয়ালী ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে যায়, ফিরেছে আজ সকাল বেলা সাড়ে নটায়। এখানে মাস পাঁচেক মাত্র চাকরি করছে।

ঠাকুর জগন্নাথ ঃ বাড়ি উড়িষ্যায়। রান্নাঘরের পাশেই ছোট একটা ঘরে আমি শুই। উৎসবের ঝামেলা মিটে গেলে এবং বাবু রাত্রে কিছু আর খাবেন না শুনে শুয়ে পড়ি, বড্ড

মাথা ধরেছিল বলে, কিছু জানি না, কোন চিৎকার বা শব্দও শুনি নি। পরদিন মধুদার ডাকে ঘুম ভাঙ্গে এবং তার মুখেই প্রথমে শুনি বাবু খুন হয়েছেন।

নন্দুয়া ঃ বাড়ি মজঃফরপুর। মাস আষ্টেক হবে বাবুর গাড়ির ড্রাইভারি করছি আমি। বাবু বেশীর ভাগই দেশপ্রিয় পার্কে বা লেকেই সন্ধ্যার দিকে বেড়াতে যেতেন। ইদানীং মাস কয়েক আমীর আলী য়্যাভিনুতে ছোট একটা পার্কেও মাঝে মাঝে সন্ধ্যার দিকে গিয়ে তিনি বসতেন। সেখানে একটি খুব সুন্দরী মেয়ে, বয়স ২৫।২৬ হবে, বাবুর সঙ্গে বসে গল্প করতো দেখেছি, মাঝে মাঝে সেই দিদিমণিকে নিয়ে বাবু লেকে, বোটানিক্যাল গার্ডেনে বা হগ মার্কেটে এবং মাঝে মাঝে রাত্রের শোতে সিনেমাতেও যেতেন। গতকাল রাত্রে দেশপ্রিয় পার্কে যান—ফিরে আসবার সময় সেই দিদিমণিকে পার্কের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে দেখেছি। বাবুকে তারপর সোজা একাই গাড়িতে করে বাড়ি নিয়ে আসি। না, দেখিনি দিদিমণি কোন্ দিকে গেলেন। হ্যাঁ, দিদিমণির বাড়ি চিনি। দু-একবার তাঁকে চিঠিও দিয়ে এসেছি। হাঁ, নিশ্চয়ই তাঁকে দেখলেই চিনতে পারবো। হাঁ, রাত সাড়ে এগারোটায় বিড়ি ফুরিয়ে যেতে দারোয়ানের কাছ থেকে বিড়ি চেয়ে এনেছিলাম। হাঁ, আমিও দেখেছি ঐসময় বাবুর ঘরের আলো নিবে যায়। না, রাত্রে কোন চিৎকার বা শব্দ শুনি নি। না, কোন রকম সন্দেহজনক কিছু দেখি নি, তবে আগে, মানে মাসখানেক আগে পর্যন্তও প্রায়ই দেখতাম একটা কালো রংয়ের সিডনবডি গাড়ি যেন আমাদের গাড়ির পিছু পিছু দূরে দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে গেটের সামনে এগিয়ে যেতে দেখেই গাড়িটা ছেড়ে চলে যায়। না, গাড়ির নম্বরটা কখনো দেখতে পাই নি। হাঁ, বাবুকে বলেছিলাম—বাবু বলেছিলেন, ও কিছু না। কে আবার আমাদের গাড়িকে follow করবে?

সুবিমল রানা ঃ গত রাত্রে প্রায় সোয়া একটার সময় বাড়ি ফিরেছি। দারোয়ান গেট খুলে দিয়েছিল, মধু ভিতরের দরজা খুলে দেয়। হ্যাঁ, লক্ষ্য করেছি মামাবাবুর ঘরের আলো তখনও জ্বলছিল, আমার বেশ স্পষ্টই মনে আছে। গতকাল সকাল নটায় অফিসের জরুরী কাজে ডায়মণ্ডহারবার যখন যাচ্ছি, মামার সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ হয়। না, মামার হাবভাবে বা কথাবার্তায় এমন কিছুই বুঝিনি যাতে করে কোন বিপদ আসছে বলে সন্দেহ মনে জাগতে পারে। না, তাঁর বন্ধু-বান্ধবীদের সম্পর্কে আমি কিছুই তেমন জানি না। মাস আষ্টেক হবে মামার একান্ত অনুরোধেই এখানে এসে আছি। আমার সংসারে আপনার বলতে একমাত্র বিধবা মা, এখনো তিনি বেঁচে আছেন, কুড়িগ্রামে দেশের বাড়িতেই আছেন। মা ও মামাবাবু বৈমাত্রেয় ভাই বোন। না, মামার কোন উইল আছে কিনা সে সম্পর্কে কিছুই আমি জানি না। না, আজ পর্যন্ত উইল সম্পর্কে কোন কৌতুহলও আমার মনে দেখা দেয়নি। 'ভারত বন্ধু' বীমা কোম্পানীতে বছর দুই হলো চাকরি করছি। ফিক্সড তিনশত টাকা মাইনেতে আমি সেখানে এজেন্সী করি। আজ্ঞে না, বিবাহ করিনি, কারণ তেমন যে বিশেষ কিছু আছে তা নয়। প্রথম কথা, যোগাযোগ তেমন কিছু ঘটেনি, আর আমার মতে আজকালকার দিনে ঐ সামান্য আয়ে বিবাহ করাটা খুব সুবিবেচকের কাজও নয়!

হঠাৎ ইন্‌স্‌পেক্টার প্রশ্ন করলেন, সুবিমলবাবু, একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো—ইদানীং শোনা যাচ্ছে আপনার মামা নরেন মল্লিক নাকি একটি সুন্দরী তরুণীর সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন, ও সম্পর্কে আপনি কিছু জানেন বা কোনরকম—

জানি বললে ভুল হবে। তবে হাঁ, দু-একবার একটি সুন্দরী তরুণীকে মামাবাবুর সঙ্গে দেখেছি। একবার ন'টার শোতে রক্সি সিনেমায় আর বার দুই হগ্ মার্কেটে—

তার নাম শুনেছেন কখনো?

না।

আচ্ছা আপনার মামা বিবাহ করবেন বা করবার কোন মনস্থ করেছেন এ সম্পর্কে কোন কিছু আপনি আপনার মামার মুখে শুনেছেন বা—

না, তেমন কোন আভাসই পাইনি। তাছাড়া মামার এখানে আমি একান্ত অনুরোধেই এসে থাকি বটে, তাঁর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ ক্বচিৎ কখনো হতো। আমি সর্বদাই আমার কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকি।

হুঁ। আচ্ছা যে সুন্দরী মেয়েটির কথা বললেন, তাকে কখনো রাত্রে এ বাড়িতে দেখেছেন?

না। কথাটা যেন একটু ইতস্তত করেই উচ্চারণ করে সুবিমল।

মেয়েটিকে দেখলে চিনতে পারবেন নিশ্চয়ই!

আশা তো করি।

বিনতা দেবী ঃ নরেন মল্লিক নতুন বাড়িতে আসবার মাসখানেক বাদেই বিনতা দেবী এখানে এসে চাকরিতে ঢোকেন। একজন স্ত্রীলোক না হলে সংসারের কাজ ভালভাবে চলে না বলে ভদ্রঘরের একজন দুঃস্থা মহিলার জন্য নরেন মল্লিক সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। সেই বিজ্ঞাপন অনুযায়ী বিনতা দরখাস্ত করায় বিনতাকে নরেন মল্লিক কাজে বহাল করেন। বিনতা বিধবা, বর্ষীয়সী, ভদ্রঘরের। বিনতা এসে কাজে ঢোকবার পর ধীরে ধীরে একটু একটু করে সংসারের আভ্যন্তরিক ব্যবস্থাটা তাঁরই হাতের মধ্যে চলে যায়। অত্যন্ত শান্ত ও মৃদুভাষী। কথা একটা প্রয়োজন ছাড়া কারো সঙ্গে তাঁকে বলতেই কখনো দেখা যায়নি। সংসারের আভ্যন্তরীণ খরচাদির টাকাকড়িও মাসের প্রথমেই মধুর হাত দিয়ে বরাবর নরেন মল্লিক বিনতার হাতেই পাঠিয়ে দিতেন। নিচের তলায় একটা ঘরে একাকিনী থাকতেন বিনতা, মাথার উপরে সর্বদা দীর্ঘ গুণ্ঠন থাকতো টানা। এ বাড়িতেও কেউ কখনো তাঁর মুখ দেখেছে বলে মনে পড়ে না। নরেন মল্লিকের সকল ব্যাপারে সর্বদা বিনতার দুটি চক্ষু সজাগ থাকলেও গত ৮।৯ মাসের মধ্যে কখনো তাঁকে কেউ নরেন মল্লিকের ঘরে বা তাঁর সঙ্গে কথা বলতে সামনাসামনি দেখেনি। উভয়ের যাবতীয় কথাবার্তা মধুর মারফতই হতো। সেই বিনতাকে যখন ডাকা হলো, তিনি বললেন, ঘটনার দিন দ্বিপ্রহর থেকেই মাথায় যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছিলেন বলে বিকাল থেকে তাঁর নিজের ঘরের মধ্যেই ছিলেন। রাত্রে নরেন মল্লিক গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর মাত্র দুই মিনিটের জন্য ঘর থেকে বের হয়ে মধুকে জিজ্ঞাসা করতে বলেছিলেন নরেন মল্লিক রাত্রে কি আহার করবেন সেটা জানার জন্য। এবং মধুর মুখে রাত্রে তিনি আহার করবেন না জেনে আবার ঘরে গিয়ে ঢোকেন। পরের দিন সকালে ভৃত্যদের গোলমালে ঘুম ভেঙ্গে বাইরে এসে মধুর মুখেই সব ব্যাপারটা শোনেন। নরেন মল্লিক সম্পর্কে কোন কথাই বলতে পারলেন না তিনি। যে সুন্দরী তরুণীটি ইদানীং কিছুদিন ধরে নরেন মল্লিকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল এবং মধ্যে মধ্যে এ বাড়িতে আসতো তার গলাই এক-আধবার বিনতা শুনেছেন কিন্তু কখনো তাকে চাক্ষুষ দেখেননি বা তাকে দেখলেও চিনতে পারবেন না।

সেই সুন্দরী মেয়েটি!

প্রায় প্রত্যেকেরই জবানবন্দী থেকে মৃত নরেন মল্লিকের সঙ্গে যে সুন্দরী তরুণীর ঘনিষ্ঠতা সম্পর্কে শোনা গেল, সেই মেয়েটিরই খোঁজে পরের দিন পার্ক সার্কাস থানার ইনচার্জ খোদাবক্স নরেনের ড্রাইভার নন্দুয়াকে সঙ্গে করে আমীর আলী য়্যাভিনুর ত্রিতল একটি ফ্ল্যাট বাড়ির তিনতলার ফ্ল্যাটে গিয়ে হাজির হলেন। দরজা ভিতর হতে বন্ধ। দরজার গায়ে কলিং বেলের ব্যবস্থা আছে দেখা গেল।

নন্দুয়া, তুমি একটু আড়ালে দাঁড়াও, মেয়েটিই যদি এসে দরজা খুলে দেয় তো আমাকে চোখ-ইশারায় কেবল তুমি জানিয়ে দেবে।

বুঝেছি। নন্দুয়া একটু দূরে সরে দাঁড়ায়।

কলিং বেল টিপতেই একটু পরে দরজা খুলে গেল।

খোলা দরজাপথে এসে দাঁড়াল একটি ২৩।২৪ বৎসরের তরুণী। তরুণীর রূপের সত্যিই যেন অবধি নেই। চাঁপা ফুলের মত উজ্জ্বল গায়ের বর্ণ। ক্ষীণাঙ্গী নয়, সুডৌল স্বাস্থ্যে দেহযমুনায় যেন বান ডেকেছে। অপরূপ মুখশ্রী। টানা টানা গভীর কৃষ্ণ দুটি আঁখি। ভারী আঁখিপল্লব। নাকের পাশ দিয়ে বামদিককার গালে একটি ছোট্ট কালো তিল। তিলটি সৌন্দর্যকে যেন তিলাঞ্জলি দিচ্ছে। দাঁড়াবার ভঙ্গীটিও অপূর্ব, পুরাকালে রাজসভায় করঙ্ক-বাহিনীর কথাই মনে করিয়ে দেয়। অপর্যাপ্ত কুঞ্চিত কেশরাশি পৃষ্ঠব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে। কবির ভাষায় বলতে সাধ যায়, বিকীর্ণ কুন্তলা।

চকিতে অদূরে দণ্ডায়মান নন্দুয়ার দিকে তাকাতেই, নিঃশব্দে ঘাড় হেলিয়ে সে জানাল, হাঁ ঐ মেয়েটিই।

ইশারা করলেন খোদাবক্স নন্দুয়াকে সরে যেতে। নন্দুয়া সরে গেল।

কাকে চান? তরুণীই কথা বললে প্রথমে খোদাবক্সকে সম্বোধন করে।

নমস্কার।

নমস্কার।—তরুণীও প্রতিনমস্কার দেয়।

আমি পার্ক সার্কাস থানার O. C., বিশেষ একটি জরুরী ব্যাপারে আপনাকে একটু বিরক্ত করতে হচ্ছে বলে বিশেষ দুঃখিত। ঘরে আসতে পারি কি?

তরুণী ভ্রূকুঞ্চিত করে মৃদু কণ্ঠে বলে, আসুন।

তরুণী রাস্তা ছেড়ে দাঁড়ায়, খোদাবক্স কক্ষে প্রবেশ করেন।

শৌখীন পরিচ্ছন্ন ভাবে সাজানো-গোছানো ছোট একখানি ঘর। আসবাবপত্র ও ব্যবস্থা দেখে মনে হয় ড্রয়িংরুম হিসাবেই ঘরটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে সাধারণত। গোটা দুই সোফা। ঘরের মেঝেতে কার্পেট বিস্তৃত, মাঝখানে একটি গোল পিতলের স্ট্যাণ্ডে একটি জয়পুরী কারুকার্যখচিত পাত্রে একগোছা প্রস্ফুটিত পদ্মফুল। ঘরের দেওয়ালে দু-তিনটি ফটোগ্রাফ, দুটি ল্যাণ্ডস্কেপ্, কোন একটি বিলাতী কোম্পানীর সুদৃশ্য একখানা দেয়ালপঞ্জী।

ঘরের তিনটি জানলার প্রত্যেকটিতেই সুদৃশ্য জাফ্‌রাণী রঙের পর্দা খাটানো। দ্বিতীয় দরজাটিতে একটা ভারী সবুজবর্ণের পর্দা ঝুলছে। সেই দরজারই ঠিক বিপরীত দেওয়ালে একটি প্রমাণ সাইজের দর্পণ প্রলম্বিত।

সোফাটা দেখিয়ে তরুণী বললে, বসুন।

হঠাৎ এমন সময় কানে ভেসে এলো অন্তরাল হতে অতি শুদ্ধ, সুস্পষ্ট সু-উচ্চারিত ইংরাজীতে আবৃত্তির সুর—

The mind is it's own place, and in itself
Can make a Heaven of Hell, a Hell of Heaven.

অন্তরাল হতে যেন সুললিত আবৃত্তির সেই সুর সহসা খোদাবক্সকে আকর্ষণ করে।

বাঃ চমৎকার!

আবার শোনা গেল ঃ এবারে ইংরাজী নয়, বাংলায় আবৃত্তি, কবিগুরুর বিখ্যাত কবিতার কয়েকটি পংক্তি—

তবু একদিন এই আশাহীন পন্থ রে
অতি দূরে দূরে ঘুরে ঘুরে শেষে ফুরাবে
দীর্ঘ ভ্রমণ একদিন হবে অন্ত রে
শান্তি সমীর শ্রান্ত শরীর জুড়াবে।

আবৃত্তি করছেন মনে হচ্ছে এই ফ্ল্যাটেরই যেন কেউ?

হ্যাঁ, আমার বাবা।

আপনার বাবার নামটা জানতে পারি কি?

শ্রীসঞ্জীব চৌধুরী। একটা পা ওঁর paralytic হয়ে যাওয়ায় ঘর থেকে বের হতে পারেন না, তাই সর্বদা লেখাপড়া ও আবৃত্তি নিয়েই থাকেন।

একেবারেই হাঁটা-চলা করতে পারেন না বুঝি?

সেই রকমই প্রায়, অতি কষ্টে ক্রাচে ভর দিয়ে সামান্য একটু-আধটু হাঁটা-চলা যা করেন। তরুণী বলে।

দেখেছেন মিস চৌধুরী, আমরা পুলিসের লোকেরা এত unsocial, এতক্ষণ আপনার নামটা পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করিনি!

আমার নাম কৃষ্ণা চৌধুরী।

সহসা এমন সময় খোদাবক্সের নজরে পড়ল, অদূরে সোফার উপরে ঐদিনকারই প্রাত্যহিক 'সুপ্রভাত'খানা। এবং মাঝের পৃষ্ঠা—যেটিতে মৃত নরেন মল্লিকের ছবি দিয়ে তাঁর হত্যা-সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, সেটিই খোলা। সংবাদপত্রটার প্রতি কৃষ্ণার দৃষ্টি আকর্ষণ করে খোদাবক্স বলে ওঠেন, পড়েছেন নরেন মল্লিকের হত্যার সংবাদ?

ঈষৎ বিরক্তিমিশ্রিত কণ্ঠে কৃষ্ণা যেন জবাব দেয়, অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত একটি শব্দে, হুঁ।

ওঁকে তো আপনি চিনতেন কৃষ্ণা দেবী, তাই না?

ভ্রূকুঞ্চিত করে তাকায় কৃষ্ণা খোদাবক্সের মুখের দিকে, কে বলেছে একথা?

বুঝতেই পারছেন জানতে পেরেছি, নইলে—মৃদু হাসি ওষ্ঠপ্রান্তে জেগে ওঠে খোদাবক্সের অতঃপর।

কৃষ্ণা চুপ করে থাকে, মনে হয় সে যেন একটু অন্যমনস্ক।

শুধু যে চিনতেনই আপনি নরেন মল্লিককে তা নয়, বিশেষ ভাবে জানা গিয়েছে আপনি ওঁর সঙ্গে নাকি বেশ ঘনিষ্ঠ ভাবেই পরিচিত ছিলেন—অবিশ্যি—খোদাবক্স কথাটা শেষ না করে কৃষ্ণার মুখের দিকে তাকালেন।

অস্বীকার করবো না যে তাঁর সঙ্গে সামান্য আলাপ ছিল, তবে আপনি যেরকম ঘনিষ্ঠতার কথা বলছেন—

দেখুন মিস চৌধুরী, পুলিসের লোক আমরা, ভাল ভাবে কোন সংবাদ না নিয়ে—

দারোগা সাহেব, ভদ্রতার সীমাটা কি লঙ্ঘন করে যাচ্ছেন না? এখন মনে হচ্ছে, বোধ হয় ঐ কারণেই এখানে আপনার পদার্পণ হয়েছে। সত্যিই যদি তাই হয়ে থাকে, I must say you would be rather disapointed.

খোদাবক্সের বুঝতে কষ্ট হয় না, শক্ত মাটিতে পা ফেলেছেন। তাই এবার নিজেকে বেশ প্রস্তুত করেই খোদাবক্স তাঁর বক্তব্য শুরু করেন, কথাটা—মানে আপনি যে বিশেষ ভাবেই মৃত নরেন মল্লিকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন, মিথ্যে বলেই কি একেবারে উড়িয়ে দিতে চান মিস্ চৌধুরী?

নিশ্চয়। কারণ যেটা সত্যিই মিথ্যা তাকে আইনের দোহাই পেড়ে বা গলাবাজীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত যে করা যায় না কোন দিনই, আপনার মত একজন আইনজ্ঞকে সেটা নিশ্চয়ই বুঝিয়ে বলতে হবে না আশা করি দারোগা সাহেব। তাছাড়া আপনার এ ধরনের প্রশ্ন—not only objectionable, damaging too.

শেষের দিকে কৃষ্ণার কণ্ঠস্বরে সুস্পষ্ট উষ্মার ভাব একটা যেন জেগে ওঠে।

কৃষ্ণা যে রীতিমত চঞ্চল ও উত্তেজিত হয়ে উঠেছে বুঝতে কষ্ট হয় না।

মুহূর্তে সমগ্র পরিস্থিতিটাই বুঝে নেন খোদাবক্স এবং এবারে কতকটা যেন কর্তৃত্বভরা কণ্ঠেই বলে ওঠেন, দেখুন মিস্ চৌধুরী, আমি পুলিসের লোক—

খোদাবক্সের কথাটা শেষ হলো না।

দিদি! হঠাৎ ঠিক অনুরূপ একটি মেয়েলী কণ্ঠস্বরে খোদাবক্স চমকে মুখ তুলে তাকাতেই সম্মুখে দেওয়ালে প্রলম্বিত দর্পণে দেখতে পেলেন, প্রতিবিম্বিত হয়েছে বর্তমানে তাঁর সম্মুখে উপবিষ্ট অনুরূপ একটি তরুণীরই যেন প্রতিচ্ছায়া।

খোদাবক্স যেন সহসা নিশ্চুপ হয়ে গিয়েছেন। আর্শির বক্ষে দৃষ্টি তখনও তাঁর স্থিরনিবন্ধ।

আশ্চর্য! আশ্চর্য! হুবহু এক! তিলমাত্র প্রভেদ বা পার্থক্যও যেন জীবিত ও আর্শিতে প্রতিফলিত ছায়াতরুণীর মধ্যে কোথাও নেই! অবিকল প্রতিচ্ছবি যেন একে অন্যের!

চক্ষু, নাসিকা, ভ্রূ, কপাল, চিবুক, ওষ্ঠ—এমন কি বাম গালের উপরে ছোট্ট কালো তিলটি পর্যন্ত। দাঁড়াবার বিশেষ ভঙ্গীটি যেন হুবহু এক দুজনারই। এবং সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর—কণ্ঠস্বরের মিলটুকুও উভয় তরুণীর একই যেন। কথা বলার ও উচ্চারণ ভঙ্গীটি পর্যন্ত এক।

কে উনি? বিস্মিত হতভম্ব খোদাবক্স এতক্ষণে সম্মুখে সোফার উপরে উপবিষ্ট কৃষ্ণাকে প্রশ্নটা করেন।

দর্পণে প্রতিবিম্বিতা নারী ধীরপদে ততক্ষণ কক্ষে প্রবেশ করে একই সোফার উপরে কৃষ্ণার পার্শ্বে এসে উপবেশন করল।

আমার বোন কাবেরী। কৃষ্ণা জবাব দেয়।

আপনার বোন! আপনারা—

আমরা যমজ বোন, মাত্র ঘণ্টা দুয়েকের ছোট বড়।

কৃষ্ণা ও কাবেরী যমজ বোন!

পাশাপাশি দুটি বোন কৃষ্ণা কাবেরী সোফার উপরে বসে। পরিধানে শাড়ির রঙ, পাড় এবং পরবার স্টাইলটির মধ্যেও যেন বিন্দুমাত্র পার্থক্য নেই। দুজনেরই মাথার চুল খোলা। সাধ্য নেই কারো একটি ভগ্নীকে অন্যের থেকে পৃথক করে বুঝবার।

ক্রমে বিস্ময়ের ধাক্কাটা কেটে গেলে ধীর সংযত কণ্ঠে খোদাবক্স এবারে কাবেরীর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, আপনার নাম কাবেরী চৌধুরী?

হ্যাঁ। কিন্তু আপনি—

আমি পার্ক সার্কাস থানা থেকে আসছি। আমার নাম খোদাবক্স। আচ্ছা কাবেরী দেবী, আজকের সংবাদপত্রে—বলতে বলতে সংবাদপত্রটি তুলে নরেন মল্লিকের মৃত্যুসংবাদটির প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ করে বললেন, এঁকে আপনি চিনতেন?

কথাটা কাবেরীকে জিজ্ঞাসা করা হলেও জবাবটা দিল কৃষ্ণা অনুচ্চ বিরক্তির সুরে, ওর বেলাতেও ঐ কথাই প্রযোজ্য মিঃ খোদাবক্স। বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ওরও তাঁর সঙ্গে ছিল না। আমারই মত সামান্য পরিচয় ছিল মাত্র।

দেখুন কৃষ্ণা দেবী, এবারে সুস্পষ্ট একটা আদেশের কাঠিন্য যেন প্রকাশ পায় খোদাবক্সের কণ্ঠস্বরে, কথাটা আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হয়নি, হয়েছে আপনার বোন কাবেরী দেবীকে। উনি শিশু নন—ওঁর যা বলবার ওঁর মুখে শুনতে পেলেই আমি খুশী হবো।

কাবেরী কৃষ্ণার মুখের দিকেই তাকিয়ে ছিল, এবার খোদাবক্সের মুখের দিকে তাকাল।

বলুন কাবেরী দেবী, আমার প্রশ্নের জবাব দিন।

সামান্য পরিচয় ছিল মিঃ মল্লিকের সঙ্গে। দু-একবার পার্টিতে, উৎসবে দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে মাত্র এই যা। জবাব দিল কাবেরী।

আপনি নরেন মল্লিকের ওখানে মাঝে মাঝে যেতেন?

না। কৃষ্ণার মুখের দিকেই তাকিয়ে কাবেরী এবারে জবাব দিল।

ব্যাপারটা খোদাবক্সের দৃষ্টিতে কিন্তু এড়ায় না।

আপনি, কৃষ্ণা দেবী?

কস্মিনকালেও যাইনি।

হুঁ। সত্যিই খোদাবক্স এবার নিজেকে যেন যথেষ্ট বিব্রত বোধ করেন।

বুঝতে তাঁর কষ্ট হয় না, যমজ দুটি বোন কৃষ্ণা ও কাবেরীর মধ্যে নিশ্চয়ই একজন মিথ্যা বলছে এবং দ্বিতীয়জন ইচ্ছা করেই অন্যজনের কথায় সায় দিচ্ছে। এবং এও ঠিক, অবিকল একই রকম দুজনে দেখতে, এদের মধ্যে কে যে মিথ্যা বলছে, নিজে হতে স্বেচ্ছায় এরা স্বীকৃতি না দিলে সেই আসল সত্যটুকু জানা কারো পক্ষে শুধু দুঃসাধ্যই নয়, অসম্ভবও। কিন্তু উপায়ই বা কি? যারা এদের মধ্যে একজনকে মৃত নরেন মল্লিকের সঙ্গে দেখেছে তারাও হয়ত এখন দুজনকে পাশাপাশি দেখলে আসলটিকে নির্দিষ্ট করতে পারবে না।

আচ্ছা কৃষ্ণা দেবী, গত রবিবার রাত্রে অর্থাৎ পরশু রাত্রে আপনি সন্ধ্যা হতে রাত্রিতে শয্যায় শয়ন করতে যাবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কোথায় ছিলেন বা কোথায় কোথায় গিয়েছেন, কার কার সঙ্গে দেখা হয়েছে, I mean all your movements and whereabouts in details, একটা বিবৃতি চাই।

এটা কি আপনার জুলুম নয় দারোগা সাহেব?

দেখুন কৃষ্ণা দেবী, আমি যদি তার উত্তরে বলি, নরেন মল্লিকের হত্যার ব্যাপারে আপনারা যমজ ভগ্নী দুজন যথেষ্ট সন্দেহের কারণ ঘটিয়েছেন, মানে—কথাটা খোদাবক্সের শেষ হলো না, যুগপৎ কৃষ্ণা ও কাবেরী অস্ফুটকণ্ঠে আর্তনাদ করে ওঠে।

অতএব বুঝতেই পারছেন—I want a detail report of the movements of both of you. আপনাদের দুই ভগ্নীরই একটা পূর্ণ জবানবন্দী আমার চাই। এটা আমি দাবী জানাচ্ছি আইনের দিক হতে—

এরপর উভয়েই কিছুক্ষণ ঝিম্ দিয়ে থাকে, তারপর কৃষ্ণাই প্রথমে কথা বলে, সেদিন আমাদের দু' বোনেরই off duty ছিল।

Off duty ছিল—আপনাদের? মানে, আপনারা কি—

আমরা দু' বোনেই টেলিফোন অফিসে চাকরি করি।

ওঃ! আচ্ছা বলুন।

কৃষ্ণা তখন বলতে শুরু করে, গত রবিবার—শরীর আমার বিশেষ রকম ক্লান্ত থাকায় সারাটা দিন ঘরেই বই পড়ে ও ঘুমিয়ে কাটিয়েছি। তারপর রাত্রি দশটায় খেয়েদেয়ে একেবারে শুয়ে পড়ি।

আপনি কাবেরী দেবী?

সারাটা দিন আমিও বাড়িতেই ছিলাম। রাত্রি সাড়ে সাতটায় একটু গঙ্গার ধারে বেড়াতে যাই।

কতক্ষণ পর্যন্ত সেখানে ছিলেন?

রাত্রি দশটা পর্যন্ত।

কি করে বুঝলেন ঠিক সময়টা?

হাতে ঘড়ি ছিল, ফিরবার মুখে দেখেছি রাত তখন দশটা ঠিক।

বাড়িতে ফিরে আসেন কখন?

এই সাড়ে দশটা নাগাদ হবে।

এসে দেখলেন আপনার দিদি তখন ঘুমিয়ে বোধ হয়?

হ্যাঁ।

আচ্ছা গঙ্গার ধারে যতক্ষণ ছিলেন, কারো সঙ্গে আপনার দেখা হয়নি?

হয়েছিল—দুজনের সঙ্গে।

তাদের নাম পরিচয়টা জানতে পারি কি?

একজনের পরিচয় দিতে পারবো না—অবশ্য আপনি আমার কথা বিশ্বাস করতে পারেন, তিনি আপনার নরেন মল্লিক নন—

হুঁ। আর দ্বিতীয় জন?

আমার এক পরিচিত অ্যাডভোকেট বন্ধু—রবীন সেন, তিনিও ঐ সময় গাড়িতে গঙ্গার ধারে বেড়াতে এসেছিলেন।

আপনাদের কোন previous engagement ছিল ঐ সময় meet করবার?

না। বলতে পারেন নেহাৎ আকস্মিক ভাবেই তাঁর সঙ্গে সেখানে দেখা হয়েছিল আমার।

তাঁর ঠিকানাটা?

৩।১ রিজেন্ট পার্ক—টালিগঞ্জ।

মিঃ সেন ওখানে কখন পৌঁছেছিলেন?

রাত্রি সাড়ে আটটা বোধ হয়।

একসঙ্গেই বোধ হয় আপনারা ফিরে আসেন?

হ্যাঁ। তিনিই তাঁর গাড়িতে করে আমাকে পার্ক সার্কাস মার্কেট পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে যান।

এরপর খোদাবক্স বিনীত ভাবে উভয়কেই সম্বোধন করে বলেন, আবার হয়ত দেখা হতে পারে। আচ্ছা আজ আসি, নমস্কার।

কৃষ্ণা কিন্তু চুপ করেই থাকে। চোখেমুখে বিরক্তির চিহ্নটা তখনও কৃষ্ণার নিঃশেষে মুছে যায়নি যেন।

গাড়ি চলেছে নরেন মল্লিকের গৃহের দিকে। ফাইলটা রহমানের হাতে ফিরিয়ে দিতে দিতে কিরীটী বলে, দুটি যমজ বোন সম্পর্কে আপনার মতামতটা কি রহমান সাহেব?

One of them must be telling deliberate lies—

আমারও তাই মনে হয়, রহমান সাহেব।

শুধু তাই নয়—আমার স্থির ধারণা মিঃ রায়, যমজ ওই দুই বোনের মধ্যেই একজন খুনী।

হতে পারে আবার নাও হতে পারে।

গাড়ি ইতিমধ্যে নরেন মল্লিকের বাড়ির সামনে এসে গিয়েছিল।

We have reached our destination মিঃ রায়।

গাড়ি গেটের মধ্যে প্রবেশ করল। গাড়ি হতে নামতে নামতে, কিরীটী তার অর্ধসমাপ্ত কথার জের টেনে বলে, একটা কথা কি জানেন রহমান সাহেব, স্রেফ্ probabilityর উপরেই basis করে এসব ক্ষেত্রে সবসময় conclusionয়ে পৌঁছানো যায় না, আর investigationয়ের ব্যাপারে সে proceedure-ও ভুল। হত্যা-রহস্যের মীমাংসার ব্যাপারে আরও ব্যাপক ও সূক্ষ্ম তদন্তের প্রয়োজন।

নরেন মল্লিক যে ঘরে নিহত হয়েছিল সে ঘরে তেমনি তালা দেওয়াই ছিল। রহমান সাহেব পকেট হতে চাবি বের করে তালাটা খুলে ফেললেন, দরজাটা নিঃশব্দে খুলে গেল।

ঘরটা অন্ধকার দিনের বেলাতেও। কারণ জানালা-দরজাগুলো সব বন্ধই ছিল। রহমান একে একে ঘরের জানালা-দরজাগুলো খুলে দিলেন। সকালের আলোয় ঘরটা ঝলমল করে ওঠে। ঘরের মেঝেতে সুদৃশ্য গালিচা বিস্তৃত, একটি সুদৃশ্য পালঙ্কে ধবধবে শয্যা বিছানো।

একটি আলমারি, গোটা দুই কাউচ্, একটি রকিং আর্ম-চেয়ার। দেওয়ালে সুদৃশ্য সব পেনটিং। হঠাৎ কিরীটীর অনুসন্ধানী দৃষ্টি দেওয়ালে টাঙ্গানো একটি প্রমাণ আয়নার উপরে গিয়ে স্থিরনিবদ্ধ হলো।

আয়নার কাঁচটা ভাঙ্গা, মনে হয় কোন ভারী বস্তুর আঘাতে ভেঙ্গে গিয়েছে চৌচির হয়ে যেন।

আশ্চর্য! অস্ফুট কণ্ঠে কতকটা স্বগতোক্তির মতই কথাটা উচ্চারণ করে কিরীটী।

কি? রহমান কিরীটীর কণ্ঠস্বরে ফিরে তাকালেন।

ওই বড় আয়নাটা—ওটা কি সেদিন ভাঙ্গাই দেখেছিলেন?

লক্ষ্য করিনি, কিন্তু কেন বলুন তো?

এই ঘরের অন্যান্য জিনিসপত্র সব লক্ষ্য করে দেখলেই বুঝবেন, এ ঘরে যে ব্যক্তি থাকতেন, তাঁর রুচিতে ঘরের মধ্যে এমন একটি ভাঙ্গা আয়না ঝুলিয়ে রাখা—উঁহু, সম্ভব নয়।

কিন্তু—

ডাকুন আপনার সেই মধু চাকরকে, সে-ই হয়ত প্রমাণ দিতে পারবে।

তক্ষুনি মধুকে ডাকা হলো এবং সবিস্ময়ে সে বললে, আয়নাটা আগে ভাঙ্গা ছিল না।

মধু চলে গেলে কিরীটী আবার ঘরের ভিতরটা ভাল করে চারিদিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগল।

আয়নাটা ঘরের মধ্যে এমনি ভাবে ঝুলানো, যাতে করে শয়নকক্ষ-সংলগ্ন স্নানঘর থেকে বের হলে প্রথমেই আয়নার উপরে ছায়া পড়ে। বাথরুমটা পরীক্ষা করে দেখা গেল, বাথরুমের বাইরে দিয়ে মেথর যাতায়াতের জন্য একটি ঘোরানো লোহার সিঁড়িও আছে। তবে বাথরুমের দরজাটি তখন বন্ধই ছিল।

রহমান সাহেবও বললেন, সেদিনও মানে তদন্তের দিনও নাকি দরজাটি বন্ধই ছিল তিনি দেখেছিলেন। এবং সেদিন খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছিল, দিনে একবার মাত্র দরজাটি নাকি খোলা হত এবং মেথরের কাজ শেষ হলেই আবার বন্ধ করে রাখা হত।

রবিবার মধুই মেথর কাজ সেরে চলে যাবার পর নিজহাতে দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিল।

কিরীটী একটা সিগারে অগ্নিসংযোগ করে ধূমোদ্‌গীরণ করতে করতে বলে, ভাঙ্গা আয়না অথচ কেউ সে-রাত্রে কোনরকম শব্দই শোনেনি!

কি বলছেন মিঃ রায়? মজিবুর রহমান প্রশ্ন করেন।

কিরীটী মজিবুরের প্রশ্নটা আপাতত এড়িয়ে গিয়ে প্রসঙ্গান্তরে চলে গিয়ে বলে, আচ্ছা মিঃ রহমান, এই নরেন মল্লিকের হত্যার ব্যাপারে আপাতত ছটা পয়েণ্ট অত্যন্ত এলোমেলো বা জট পাকানো বলে কি মনে হচ্ছে না আপনার?

বিস্মিত রহমান কিরীটীর মুখের দিকে তাকান, ব্যাপারটা তিনি যেন ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না। বুঝে উঠতে পারছেন না যেন কিরীটী ঠিক কি বলতে চায়!

কি কি পয়েণ্টস্ বলুন তো মিঃ রায়? তবু প্রশ্ন করেন।

প্রথমতঃ ধরুন, আপনার ঐ যমজ বোন কৃষ্ণা ও কাবেরী, circumstantial evidence থেকে মনে হয়, ওদের মধ্যে একজন বা দুজনই মৃত নরেন মল্লিকের সঙ্গে বিশেষ এবং ঘনিষ্ঠ ভাবেই পরিচিতা ছিল; অথচ মিঃ মল্লিকের জন্মতিথি বা জন্মদিন উৎসবে ওদের মধ্যে কেউই কেন নিমন্ত্রিতা হলো না—কেন? এবং ওরা দুই বোনই যে অস্বীকার করেছে তাদের নিজ নিজ জবানবন্দীতে যে, ওদের কেউই কখনো নরেন মল্লিকের গৃহে আসেনি সেও মিথ্যা। কারণ মল্লিক-বাড়ির অন্যান্য দু-একজনের জবানবন্দী থেকেই সেটা প্রমাণিত হয়, কিন্তু এখন কথা হচ্ছে কৃষ্ণা কাবেরী মিথ্যা কথা বললে কেন? মিথ্যা তারা বলেছে নিঃসন্দেহে এবং তারা যে বুদ্ধিমতী যথেষ্ট সে বিষয়েও সন্দেহের কোন অবকাশ মাত্র নেই। তারপর দ্বিতীয়তঃ, যে রাত্রে নরেন মল্লিক নিহত হন, সে রাত্রে এগারোটার পরে দারোয়ান দেখেছে তাঁর ঘরের আলো নিবে গিয়েছে, অথচ সুবিমলের জবানবন্দী থেকে আমরা জানতে পারছি যে, রাত্রি এগারটার পরে মিঃ মল্লিকের ঘরে আলো জ্বলছিল। এর দ্বারা এই প্রমাণ হয়, রাত্রি এগারোটায় আলো

নিবে গেলেও যে কোন কারণেই হোক, রাত্রি একটায় আবার ঘরের আলো জ্বলেছিল সুনিশ্চিত, কিন্তু কেন? তৃতীয়তঃ মিঃ মল্লিকের শয়নকক্ষের সংলগ্ন বাথরুমে মেথর যাতায়াতের দরজাটা পরের দিন সকালে ছিল ভিতর হতে বন্ধ—কেন? চতুর্থতঃ এবং বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হচ্ছে, ঘরের ঐ আয়নার কাঁচটা ভাঙ্গল অথচ সেরাত্রে এ বাড়ির কেউ কোন শব্দ পেল না, কেন? পঞ্চম, আয়নার কাঁচটা ভাঙ্গল অথচ মিঃ মল্লিক খুন হয়েছেন ছোরার আঘাতে—কেন? ষষ্ঠ ঃ নরেন মল্লিক যে ছোরাটার দ্বারা নিহত হয়েছেন সে ছোরাটা তাঁরই ঘরে ছিল এবং খুনী অন্য কোন ছোরা ব্যবহার না করে, বিশেষ করে ঐ ছোরাটাই বা ব্যবহার করতে গেল কেন?

মিঃ রহমান ভাবেন লোকটা পাগল নাকি, খুনের তদন্ত করতে এসে এসব কি অদ্ভুত আবোল-তাবোল প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন!

মধ্যে যাতায়াতের জন্য যাতায়াতের দরজাটা বন্ধ ছিল কেন, ঘরের আলো দুবার জ্বলেছে কেন, ঘরের আয়নাটার কাঁচ ভাঙ্গল কেন, শব্দ কেউ শুনতে পেল না কেন?

মনে মনে রহমান সাহেব একটু বিরক্তই হন। কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারেন না।

আমার কি মনে হয় জানেন মিঃ রহমান—কিরীটী আবার বলে।

কি?

ঐ আয়নার কাঁচটা ভাঙ্গার ব্যাপার ও শব্দটা যে কারো না কারো অন্ততঃ এ বাড়িতে শুনতে পাওয়া উচিত ছিল অথচ শোনা যায়নি—এ দুয়ের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে।

যে শব্দটা কারো না কারো অন্ততঃ শুনতে পাওয়া উচিত ছিল অথচ শোনা যায়নি!

হাঁ। যে শব্দটা হারিয়ে গিয়েছে মিস্টিরিয়াস্‌লি অথচ যার অতীত অস্তিত্ব সম্পর্কে মনে আমার বিন্দুমাত্রও দ্বিধা বা সন্দেহ নেই। তারপর ধরুন আপনার ওই যমজ বোন কৃষ্ণা ও কাবেরী, তা যাক গে সেকথা, পরেও ভাবা চলতে পারে তাদের কথা, আপাতত আপনার মধু ও সুবিমলবাবু যদি বাড়িতে থেকে থাকেন তাঁদের এবং বিনতা দেবী ও দারোয়ান রামখেল সিং এই চারজনকে গোটাকতক কথা আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই।

খোঁজ নিয়ে জানা গেল চারজনই তখন বাড়িতেই আছে।

প্রথমে ডাকা হলো দারোয়ানকে।

তোমারই নাম রামখেল? কিরীটীই প্রশ্ন করে।

জি।

আচ্ছা যে রাত্রে তোমার বাবু মারা যান সে রাত্রে তুমি দেখেছিলে সাড়ে এগারটায় বাবুর শোবার ঘরের আলো নিবে যায়, তাই না?

জি।

কেমন করে জানলে যে ঠিক তখন রাত সাড়ে এগারটা?

হরি ফিরে এলে আমাদের ঘরে একটা ঘড়ি আছে সেটায় ঢং ঢং করে এগারটা বাজল। তারপর আবার ঠিক ঢং করে সাড়ে এগারটার ঘণ্টা বাজতেই আমি শুতে যাবো বলে গেটের তালাটা আর একবার দেখতে যাই, ঠিক সেই সময় দেখলাম বাবুর ঘরের আলোটা নিবে গেল।

তারপর সুবিমলবাবু যখন ফিরে আসেন রাত্রে তুমি গেট খুলে দাও, কেমন তো?

হাঁ।

তখন বাবুর ঘরের আলো জ্বলছিল কিনা লক্ষ্য করেছিলে?

জি না। ঘুম-চোখে এসে গেট খুলেছি অতটা লক্ষ্য করিনি।

রাত্রি সাড়ে বারোটার মধ্যে কোন শব্দ শুনেছিলে? যেমন ধর কোন কাঁচটাচ ভাঙ্গার শব্দ?

না। ঘুমিয়েছিলাম।

সুবিমলবাবু ডাকতেই তোমার ঘুম ভেঙ্গে যায়, তাই না?

জি না, আমার ঘরে কলিং বেল আছে, সেই বেলের শব্দে ঘুম ভেঙ্গেছিল।

আচ্ছা তুমি যেতে পারো।

রামখেল অতঃপর চলে গেল।

এরপর এলো মধু।

কিরীটী এবার তাকে প্রশ্ন শুরু করে।

আচ্ছা মধু, তোমার বাবুর শোবার ঘরের দরজাটা সাধারণত রাত্রে খুলেই কি বাবু ঘুমোতেন?

হ্যাঁ। রাত্রে তিনি কখনো দরজা বন্ধ করতেন না। রোজ সকালে আমিই এসে তাঁর ঘুম ভাঙ্গিয়ে গরম নুন-জল দিতাম কিনা, তাই দরজা খোলাই থাকত।

আচ্ছা সে রাত্রে তুমি যখন গরম দুধ নিয়ে এলে, বাবু তখনি দুধটা খেয়েছিলেন কি?

হাঁ, দুধটা খাবার পর আমি যখন খালি গ্লাসটা নিয়ে যাচ্ছি, তিনি আমাকে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল ঘরে রেখে যেতে বললেন। শোবার আগে বাবু এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খেতেন।

তাহলে গ্লাস হাতে তুমি যখন ঘর হতে বের হয়ে যাও বাবু তখনও শোন নি, তাই না?

হাঁ।

কি করছিলেন তখন তিনি মনে আছে তোমার?

ঐ আরাম-চেয়ারটার ওপরে বসে একটা কি বই পড়ছিলেন যেন।

তোমার সঙ্গে আর কোন কথা হয়েছিল তোমার বাবুর সে রাত্রে?

হাঁ, বলেছিলেন দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যেতে।

আর একটা কথা মধু, সেদিন সকালে মেথর এসে বাথরুম পরিষ্কার করে যাবার পর তুমি দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিলে?

তা মনে আছে বৈকি।

আচ্ছা তুমি যেতে পার মধু।

মধু ঘর ছেড়ে প্রায় চলে যেতে উদ্যত হতেই হঠাৎ কিরীটী আবার তাকে ডাকে, মধু?

আজ্ঞে! ফিরে দাঁড়াল মধু যেতে যেতে।

আচ্ছা মধু, তোমার বাবুর সঙ্গে তো তুমি অনেক দিন যাবৎ ছিলে, একটা কথা বলতে পারো, সাধারণত তোমার বাবুর ঘুম কেমন ছিল, রাত্রে কখনো উঠতেন কিনা?

তা ঠিক বলতে পারি না বাবু—তবে একবার-আধবার উঠতেন বোধ হয় মাঝরাত্রে।

মধু, বলতে পারো তোমার বাবুর স্বভাবচরিত্র কেমন ছিল?

এবারে মধু মাথা নিচু করে।

বল, এতে লজ্জার কিছু নেই। শোন মধু, তোমার বাবুর হত্যার মীমাংসা করতে হলে তাঁর সব কথাই যে আমাদের জানা দরকার—

আজ্ঞে—মেয়েছেলে ইদানীং, বিশেষ করে সেই সুন্দর দিদিমণি এখানে যাতায়াত করতেন বটে, তবে কখনো কোন খারাপ কিছু বা নষ্টামি আমার চোখে পড়েনি।

আচ্ছা যাও।

এরপর এলো সুবিমল, নিহত নরেন মল্লিকের ভাগ্নে।

আপনার নাম সুবিমল রানা?

হাঁ।

বসুন, বসুন—দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? আমাদের কর্তব্যটাই বড় বিশ্রী।

সুবিমল নির্দিষ্ট চেয়ারটার উপরে উপবেশন করে।

তারপর হঠাৎ ইন্‌স্‌পেক্টারের দিকে চেয়ে সুবিমল বলে, ইন্‌স্‌পেক্টার, সেদিন আপনি মামার উইল সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমি কিছুই বলতে পারিনি তখন, কারণ সে সম্পর্কে তখনও আমি কিছুই জানতাম না। কাল সন্ধ্যার দিকে মামার সলিসিটার বোস এণ্ড চৌধুরীর মিঃ রাধেশ চৌধুরী এসেছিলেন। মামা উইল কিছুই যদিও লিখিতভাবে করে যাননি—তবে he had definite instructions—

বটে! কি instructions ছিল? রহমান প্রশ্ন করেন।

আমিই তাঁর অবর্তমানে সমস্ত সম্পত্তির মালিক হব।

হুঁ, Good news no doubt! রহমান সানন্দে বলেন।

হঠাৎ কিরীটী প্রশ্ন করে, মিঃ মল্লিকের সলিসিটারের কাছে তাঁর সম্পত্তির পরিমাণ সম্পর্কে কোন কিছু শোনেননি সুবিমলবাবু? মানে কোন definite idea?

চোখ তুলে তাকাল সুবিমল কিরীটীর দিকে, তারপর মৃদু কণ্ঠে বললে, হাঁ বলেছেন। ব্যাংকে তাঁর নগদ হাজার পঞ্চাশেক টাকা, কলকাতায় পার্ক সার্কাসের এই বাড়ি, যার valuation প্রায় সত্তর হাজার টাকা দাঁড়িয়েছে, তাছাড়া কিছু কোম্পানীর কাগজ।

A good fortune! স্মিতভাবে কিরীটী বলে।

Really lucky আপনি মিঃ রানা। রহমান বলেন।

কিন্তু একা মানুষ আমি, এক বুড়ী বিধবা মা মাত্র সংসারে, কি হবে আমার এই বিরাট সম্পত্তি দিয়ে ইন্‌স্‌পেক্টার! এর চাইতে তিনি—মামা যদি বেঁচে থাকতেন—বলতে বলতে সহসা সুবিমলের চোখের কোণ দুটো অশ্রুতে ঝাপসা হয়ে যায়। টপ্ টপ্ করে কয়েক ফোঁটা অশ্রুও গাল বেয়ে ঝরে পড়ে।

আর একটা কথা সুবিমলবাবু! কিরীটী আবার প্রশ্ন করে।

বলুন?

আপনি বলেছেন, সে রাত্রে আপনি প্রায় সোয়া একটার সময় বাড়ি ফিরেছিলেন, রানাঘাট না কোথায় যেন গিয়েছিলেন—

হাঁ, রানাঘাটেই insuranceয়ের একটা জরুরী কাজে যেতে হয়েছিল।

কোন্ ট্রেনে রানাঘাট হতে ফেরেন?

শেষ ট্রেনে, রাত সাড়ে এগারটায়।

সাড়ে এগারটায়?

হাঁ, ট্রেনটা একটু লেট ছিল।

ওঃ, সাড়ে এগারটায় শিয়ালদহে পৌঁছালেন তো বাড়িতে পৌঁছাতে এত দেরি হলো যে?

ট্রাম, বাস বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, একটা ট্যাক্সিও ছিল না। কোনমতে একটা রিক্সা করে এসেছিলাম।

এরপর ডাক পড়ল বিনতা দেবীর। সুবিমল ঘর থেকে চলে যাবার মিনিট দশেক বাদেই এলেন বিনতা দেবী। দীর্ঘ অবগুণ্ঠন টানা, সাদা থান পরিহিতা, নিরাভরণা, ধীর সংযত চলন।

কিরীটীই কথা বলে, বসুন বিনতা দেবী।

বিনতা দেবী বসলেনও না, কোন সাড়াও দিলেন না। যেমন দাঁড়িয়ে ছিলেন তেমনিই দাঁড়িয়ে রইলেন।

কিরীটী লক্ষ্য করছিল বিনতা দেবী শুধু যে মুখখানাই তাঁর অবগুণ্ঠনের আড়ালে সযতনে রেখেছিলেন তাই নয়, সর্ব অবয়বই যেন পরিধেয় বস্ত্র দ্বারা অন্যের দৃষ্টির সামনে থেকে আড়াল করবার একটা সুস্পষ্ট সযত্ন প্রয়াস প্রকাশ পাচ্ছিল।

কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করবার জন্য আপনাকে ডেকেছি বিনতা দেবী। কিরীটী বলে।

এবারও কোন জবাব পাওয়া গেল না।

আপনার বাড়ি কোথায়?

বর্ধমানে। মৃদুকণ্ঠে জবাব এল।

আপনার আত্মীয়স্বজন কেউ আছেন?

না।

কেউ নেই?

না।

আপনার স্বামী কতদিন আগে মারা গেছেন?

দশ-বারো বছরের বেশি হবে।

সুবিমলবাবু যদি আপনাকে চাকরিতে রাখেন তাহলে তো আপনি এখানেই থাকবেন?

না। আমি আর চাকরি করবো না, সুবিমলবাবুকে পরশুই বলে দিয়েছি।

চাকরি আর করবেন না?

না।

দেশে ফিরে যাবেন বুঝি?

বলতে পারি না।

আচ্ছা নরেন মল্লিকের সঙ্গে কি এখানে আপনার চাকরির এই কয় মাসে কখনো কথা বলেননি?

না।

নরেনবাবু লোক কেমন ছিলেন আপনার ধারণা?

ভালই।

কৃষ্ণা কাবেরীকে আপনি চেনেন?

বিনতা চুপ করে থাকেন শেষের প্রশ্নে।

কই, আমার প্রশ্নের জবাব দিলেন না?

কি জবাব দেবো?

কৃষ্ণা কাবেরীকে আপনি চেনেন?

না।

ঐ নাম দুটি কখনো শোনেননি?

না।

নরেনবাবুর সঙ্গে যে একটি সুন্দরী তরুণীর আলাপ ছিল, মধ্যে মধ্যে যিনি এ বাড়িতে আসতেন, তাঁকে কখনো দেখেন নি?

দেখেছি।

তাঁর নাম শোনেন নি কখনও?

না।

তার নাম হয় কৃষ্ণা না হয় কাবেরী!

হবে।

অতঃপর কিরীটী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, আচ্ছা আপনি যেতে পারেন।

বিনতা যেমন নিঃশব্দে ধীরে এসেছিলেন তেমনি নিঃশব্দেই চলে গেলেন।

কিরীটী রহমান সাহেবের দিকে তাকিয়ে বলল, এবারে চলুন ওঠা যাক রহমান সাহেব।

চলুন।

এরপর কিরীটী ও রহমান সুবিমল রানার কাছ হতে বিদায় নিয়ে চলে আসে।

সুবিমল নিজের ঘরে এসে একটা বই নিয়ে বসল। মনের মধ্যে অসংখ্য চিন্তা যেন জাল বুনে চলেছে একটা কালো মাকড়সার মত।

সন্ধ্যার অন্ধকার চারিদিকে নামছে ধূসর অঞ্চলখানি বিছিয়ে।

কিরীটী তার বসবার ঘরে একটা সোফার ওপরে অর্ধশায়িত অবস্থায় চক্ষু বুজে, একটা পা আর একটা পায়ের ওপর তুলে অভ্যাসমত মৃদু মৃদু নাচাচ্ছিল। নরেন মল্লিকের হত্যার রহস্যটা ঠিক যে কোথা হতে শুরু করা যেতে পারে, গতকাল ইন্‌স্‌পেক্টারের সঙ্গে অকুস্থান হতে ঘুরে আসা অবধি সেই চিন্তাটাই কিরীটীর মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল।

কতকগুলো বেখাপ্পা রকমের সূত্র বিশ্রী ভাবে জট পাকিয়েছে, সেগুলো সর্বাগ্রে খোলার প্রয়োজন কিন্তু তারও আগে প্রয়োজন যমজ বোন কৃষ্ণা ও কাবেরীর মধ্যে আসল কোন্ জন মৃত নরেন মল্লিকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিল সেইটাই জানা। ইন্‌স্‌পেক্টার মজিবুর রহমানের কথাই ঠিক, ওদের মধ্যে একজন স্পষ্টই মিথ্যা কথা বলছে।

কিন্তু কে বলছে মিথ্যা কথা?

এবং এও ঠিক, একজন মিথ্যা কথা বললেও দ্বিতীয়জন তাতে সায় দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কেন?

আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে দুজনেই মৃত নরেন মল্লিকের সঙ্গে বেশ ভালভাবেই পরিচিতা ছিল। আচ্ছা পরিচিতাই যদি ছিল দুটি বোনই তবে ওদের মধ্যে একজনও সেদিন নরেন মল্লিকের জন্মতিথি উৎসবে, নরেন মল্লিকের বাড়িতে গেল না কেন?

চিন্তাস্রোত পাক খেয়ে ফিরতে থাকে।

আচ্ছা ঐ ধরনের যমজ বোন, তাদের একজনকে অন্যজন থেকে কি ভাবে পৃথক করা যেতে পারে? এবং সত্যিই সেটা সম্ভব কিনা?

এমন কোন লোক যে ছোটবেলা হতে ওদের চেনে না বা জানে না এবং ওদের ঠিক পরস্পরের পরস্পর হতে পার্থক্য কোথায় জানে না, সে যদি ওদের দুজনের মধ্যে একজনকে পৃথক করে নিতে চায়, কি ভাবে করতে পারে? এবং প্রকৃতপক্ষে সেটা আদপেই সম্ভবপর কিনা?

জংলী এসে অন্ধকার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল, বাবু?

কিরে জংলী?

রহমান সাহেব এসেছেন—আপনাকে—

নিয়ে আয়, এই উপরের ঘরেই নিয়ে আয়। যা।

একটু পরে রহমান সাহেব কক্ষে এসে প্রবেশ করলেন, এ কি! ঘর অন্ধকার কেন হে সত্যাশ্রয়ী?

কিরীটী তাড়াতাড়ি উঠে আলোটা জ্বেলে দেয়, আসুন, আসুন—রহমান সাহেব। একটু পরেই আপনার কাছে যেতাম। আমার এক বন্ধু আছেন ডাঃ সুকুমার গুপ্ত, সাইকো অ্যানালিস্ট, চলুন তাঁর কাছে একবার যাবো, সে হয়ত কৃষ্ণা কাবেরীর ব্যাপারে আমাদের help করতে পারে—

থিয়েটার রোডে সুন্দর প্যাটার্নের একখানি দোতলা বাংলো বাড়ি। গেটের মাথায় নিওন সাইনে লেখা ঃ Dr. Gupta's Clinic; গেটের গায়ে নেমপ্লেটে লেখা ঃ

Dr. Sukumar Gupta, D. Sc, M. R. C. P. (Lond) Neurologist.

কিরীটীর গাড়িটা এসে নিঃশব্দে বাংলোবাড়ির গেটের মধ্যে ঢুকলো।

ডাঃ গুপ্তের কনসালটিং চেম্বার। ভিতরের কক্ষটি চমৎকারভাবে সাজানোগোছানো। একটি সেক্রেটারিয়েট টেবিলের সামনে ঘূর্ণায়মান একটি চেয়ারের উপরে বসে ডাঃ গুপ্ত।

বেশ লম্বা, বলিষ্ঠ চেহারা, গায়ের বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম। পরিধানে দামী গরম সুট, তার উপরে সাদা অ্যাপ্রন। চোখে রিমলেস্ চশমা। দাড়িগোঁফ নিখুঁতভাবে কামানো। চশমার কাঁচের অন্তরালে তীক্ষ্ণ একজোড়া চক্ষু। চোখে-মুখে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির একটি পরিচয় অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

এদিককার চেয়ারে একজন চ্যাঙ্গা, রোগা, বৃদ্ধ ডাঃ গুপ্তর সঙ্গে বসে কথা বলছেন। বৃদ্ধটির পরিধানে দামী শান্তিপুরী ধুতি, গায়ে সার্জের গলাবন্ধ গরম কোট, কাঁধে দামী শাল একখানা পাট করা সযতনে। একমুখ দাড়িগোঁফ।

বৃদ্ধ বলছিলেন, বুঝলেন ডাঃ গুপ্ত, লভ—আমার ছেলে ন্যাপলার মস্তিষ্কে একালের ঐ লভ ব্যাধি ঢুকেছে। বৌমাটি আমার সতীলক্ষ্মী। এগার বছর বয়সের সময় ঘরে নিয়ে আসি মা-জননীকে আমার। বুঝলেন কিনা—ন্যাপলা কুষ্মাণ্ডের বয়স তখন বাইশ। হারামজাদা ছয়-ছয়টি কন্যের পিতা, বড় নাতনীটির বয়সই এখন তেরো। তা হতভাগা—বুঝলেন কিনা—

ডাঃ গুপ্ত ঃ দেখুন মিঃ চ্যাটার্জী, direct patient-য়ের সঙ্গেই কথা বলা দরকার কারণ এও এক ধরনের যৌন মনোবিকার, sexual insanity!

বৃদ্ধ ঃ কি বললেন?

ডাঃ গুপ্ত ঃ sexual insanity মানে যৌন বিকৃতি, অর্থাৎ যৌন সংক্রান্ত মস্তিষ্ক-বিকৃতি, তা—

বৃদ্ধ ঃ তা বেশ। হতভাগা কুষ্মাণ্ডটাকে নিয়ে কবে আসতে হবে বলুন?

বেয়ারা এসে একখানা কার্ড দিল ডাঃ গুপ্তর হাতে।

কার্ডের দিকে তাকিয়েই ডাঃ গুপ্তর মুখটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, আসতে বল। আচ্ছা মিঃ চ্যাটার্জী—তাহলে ঐ কথাই রইলো, আপনার ছেলেকে সঙ্গে করে একদিন নিয়েই আসবেন, তারপর যা করবার—

বৃদ্ধ ঃ আপনার ফিস্‌টা—

ডাক্তার ঃ ষোল।

বৃদ্ধ ঃ দেখুন ডাক্তার সাহেব, টাকার জন্য আপনি ভাববেন না। বুঝলেন কিনা—আপনার ন্যায্য ফিস ছাড়াও হতভাগাটির যদি মতিগতি ফিরিয়ে দিতে পারেন, আপনাকে খুশী করে দেবো, বুঝলেন কিনা—

কিরীটী আর রহমান সাহেব চেম্বারের সুইংডোর ঠেলে কক্ষমধ্যে এসে প্রবেশ করল; সুকুমার মৃদু হেসে বৃদ্ধকে সম্বোধন করে বলে, হবে হবে, আপনি আপনার ছেলেকে একদিন নিয়ে আসুন তো! তারপর কিরীটীর দিকে তাকিয়ে আনন্দোৎফুল্ল কণ্ঠে আহ্বান জানায়, এসো এসো রহস্যভেদী, তারপর?

বৃদ্ধ কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন।

তারপর পথ ভুলে নাকি?

না হে না। কিরীটী জবাব দেয়।

বসুন—কিরীটী এবার রহমানের দিকে তাকিয়ে বলে। ওঁর নাম মজিবুর রহমান, লালবাজার ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের ইন্‌স্‌পেক্টার।

নমস্কার।

তারপর কি ব্যাপার বল তো ভাই, হঠাৎ এই অধীনের গৃহে—

তুই তো মানসিক চিকিৎসা করিস—সাইকোঅ্যানালিস্ট, একটা ডায়লেমার সলুশন করে দে তো ভাই—

কি ব্যাপার!

একটু সময় নেবো ভাই। তুই এখন ফ্রি তো?

হাঁ, দাঁড়া চা আনতে বলি, আপত্তি নেই তো?

না, মৃদু হাসি দেখা দেয় কিরীটীর ওষ্ঠপ্রান্তে, অমৃতে অরুচি কিরীটী রায়ের নেই।

সুকুমার টেবিলের উপরে রক্ষিত কলিং বেল বাজাতেই বেয়ারা এসে সেলাম জানাল। জগদেও—একটু চায়ের ব্যবস্থা কর। জগদেও সম্মতি জানিয়ে চলে গেল।

তারপর এখন বাসা নিলি কোথায়? সুকুমারকে প্রশ্ন করে কিরীটী।

কোথায় আবার, এইখানে! সমস্ত বাড়িটাই ভাড়া নিয়েছি, ভিতরের দিকে ব্যাচিলার্স ডেন, বাইরে চেম্বার।

সুকুমারের কথায় কিরীটী ও রহমান দুজনেই হেসে ওঠে।

পসার কেমন জমলো?

কিরীটীর কথায় আড়চোখে রহমান সাহেবের দিকে একবার তাকিয়ে মৃদু হাসির সঙ্গে বলে, Confidential; হাঁড়ির খবর আজকালকার দিনে কেউ কাউকে দেয় রে!

চেম্বার তো বেশ জাঁকিয়ে বসেছিস।

হাঁ, তা বসতে হবে বৈকি। এ দেশটাকে তো চিনলি না এখনও, আমাদের মত বাপের টাকা বা শ্বশুরের টাকার জোরে বিলেত-প্রত্যাগত আনকোরা বিশেষজ্ঞদের কেউ পোঁছে না ভাই, কেউ পোঁছে না। দাঁড়া, আগে না খেয়ে খেয়ে, দুশ্চিন্তায় দুশ্চিন্তায় প্যাণ্টে তালি পড়ুক, মাথার চুল সাদা হয়ে যাক, বাপের দেওয়া ব্যাংক ব্যালেন্সটা শেষ হয়ে আসুক, তবে তো।

কিন্তু এতগুলো institution, হাসপাতাল—visitingয়ের postও একটা জোটাতে পারলি না?

না ভাই। বাবা, মামা, শ্বশুর, মেসো কারোই তো জোর নেই, কোন হাসপাতালে অনাহারী বহির্বিভাগীয় পরিদর্শনকারী হওয়া কি এতই সহজ রে! তা আমিও বাবা শত হস্তেন দুর্জনদের পরিত্যাগ করেছি। My own Nursing Home & chamber, এতে করে কিন্তু মন্দ হয় নি, সুফলই পেয়েছি। একা মানুষ বেশ আনন্দেই আছি।

ট্রেতে করে ভৃত্য চা নিয়ে এলো। চা পান করতে করতেই কিরীটী সংক্ষেপে কৃষ্ণা ও কাবেরীর ব্যাপারটা বলে গেল।

এই হলো story, তুই তো একজন মনস্তাত্ত্বিক, এই ডায়লেমাটার সলুশন করে দে তো! ঐ দুই যমজ বোন কৃষ্ণা ও কাবেরী ওদের পরীক্ষান্তে দৈহিক কোন চিহ্ন, যেমন বার্থ মার্ক, স্কার মার্ক বা ডিফিসিয়েন্সি ইত্যাদি ছাড়া, ওদের মনের বা চরিত্রগত গঠন বা প্রবৃত্তিগত ভাবধারার অনুশীলন দ্বারা কি এক থেকে অন্যকে পৃথক করা যেতে পারে না?

How interesting ! It's marvellous idea ! ঐভাবে ঠিক ইতিপূর্বে কখনো আমি ভেবে দেখি নি। হাঁ, হয়ত কিছুদিন ধরে আলাদা আলাদা ভাবে ঐ যমজ বোনদুটিকে study করতে পারলে, হয়তো—হয়তো yes, একটা conclusion-এ পৌঁছানো যেতে পারে। কিন্তু—

কিন্তু কি?

ভাবছি তা সম্ভবই বা হতে পারে কি করে? ভদ্রঘরের অবিবাহিতা সুন্দরী তরুণী, বাপ বর্তমান, রাজীই বা হবেন কেন? না ভাই, এদেশে এখনও এ সব সম্ভব নয়—

শোন ডাক্তার, আমি ইতিমধ্যেই একটা মতলব ঠাউরেছি, how do you like the idea—কাগজে কাগজে তোর নাম দিয়ে সাইকোঅ্যানালিস্ট হিসাবে বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে।

বিজ্ঞাপন?

হাঁ, বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে ঃ যমজ ভাই বোন, যমজ ভাই বা যমজ বোন এদের মনোগত বা চরিত্রগত প্রবৃত্তি বা ভাবকে স্টাডি করে এদের মানসিক ও প্রবৃত্তিগত গঠন থেকে একজনকে অন্যজন হতে identify করা যায় কিনা, ঐ সম্পর্কে তুই গবেষণা করছিস এবং ঐ গবেষণার জন্য তুই যমজ ভাই, বোন ও ভাইবোনদের আহ্বান জানাচ্ছিস; নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তারা তোর চেম্বারে এসে sitting দেবে—

দূর পাগল! এদেশে ও ধরনের বিজ্ঞাপনে কেউ সাড়া দেবে না।

উঁহু, তুই আমার পরিকল্পনাটা ঠিক এখনও ধরতে পারিস নি। তাদের বেগার দিতে হবে না, রীতিমত প্রতি sittingয়ের জন্য তাদের pay করা হবে—হাঁ, handsomely pay করা হবে—বলতে থাকে কিরীটী, ধর্ এক বা দু' ঘণ্টার জন্য যেমন প্রয়োজন, প্রতি sittingয়ে ৫০্ হতে ৬০্, ৮০ টাকা পর্যন্ত দেওয়া হবে।

বলিস কি!

হাঁ, আর সে টাকা দেব আমি।

তুই দিবি?

হাঁ, আমি দেবো কারণ দায়টা এক্ষেত্রে আমারই—

কিন্তু—

না, আর কিন্তু নয় বন্ধু। শুভস্য শীঘ্রম্। কালই আমি কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দেবার সব ব্যবস্থা করছি।

বেশ। কিন্তু যাদের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছে, যদি শেষ পর্যন্ত তারাই না সাড়া দেয়?

সাড়া তাদের দিতেই হবে এবং যতদিন না সাড়া দেবে বিজ্ঞাপন চলবে কিন্তু অতটা বোধ হয় করতেই হবে না। কারণ খোঁজ নিয়ে ইতিমধ্যেই আমি জেনেছি, আর্থিক অবস্থা তাদের এমন বিশেষ কিছু একটা নয়। এ ফাঁদে তাদের ধরা দিতেই হবে। আর শেষ পর্যন্ত ধরা যদি নাই দেয়, তখন অন্য উপায় না হয় একটা কিছু ভেবে দেখা যাবে।

বেশ, দে বিজ্ঞাপন।

তবে আজকের মত উঠি?

আয়—

কৃষ্ণা ও কাবেরীর ফ্ল্যাটবাড়ি।

অন্তরাল হতে সঞ্জীবের আবৃত্তি শোনা যাচ্ছে ঃ

Our sincerest laughter
With some pain is fraught
Our sweetest songs are those
That tell of saddest thought.
ত্রিলোকের হৃদিরক্তে আঁকা তব চরণ শোণিমা,
স্বর্গ, মর্ত্য, আরাধ্যা, তুমি হে চিরবরেণ্যা।

কৃষ্ণা একটা সোফার উপরে বসে কাঁটা দিয়ে উলের একটা স্কার্ফ বুনছে। কাবেরী হাতে ঐদিনকার ইংরাজী একটা সংবাদপত্র নিয়ে কক্ষে এসে প্রবেশ করল, দিদি!

উঁ!

আজ কদিন থেকে খবরের কাগজে যে বিজ্ঞাপনটা বেরুচ্ছে—একজন সাইকোঅ্যানালিস্ট যমজ ভাই ও বোনদের study করে তাদের মানসিক ও চরিত্রগত প্রবৃত্তি থেকে তাদের এক হতে অন্যকে পৃথক করে নেওয়া যায় কিনা সে সম্পর্কে—

পড়েছি।

আয় না কেন, আমরা দুজনে দরখাস্ত করে দিই!

কৃষ্ণা কাবেরীর দিকে মুখ তুলে তাকাল, কুঞ্চিত ভ্রূযুগল।

বিনা পরিশ্রমে কেবল কথাবার্তা বলবার জন্য প্রত্যেক সিটিংয়ে টাকা দেবে—

না।

না কেন? এত সহজে অর্থোপার্জন! তাছাড়া টাকার তো আমাদের যথেষ্টই প্রয়োজন। এক্ষেত্রে—

তুই কি ক্ষেপে গেলি কাবি?

বাঃ রে! এতে ক্ষেপে যাবার মত কি দেখলি তুই?

তাছাড়া কি! সামান্য কয়েকটা টাকার জন্য ভদ্রঘরের মেয়ে হয়ে আমরা একজন পরপুরুষের সামনে বসে বসে তার খুশিমত যত সব আবোল-তাবোল প্রশ্নের জবাব দিয়ে যাবো! মান-সম্ভ্রম নেই আমাদের—

But really this is too much দিদি। তাছাড়া ভদ্র শিক্ষিত বিলাতফেরত ডাক্তার, তাঁর রুচি ও ব্যবহার সম্পর্কে নিশ্চয়ই আমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারি।

বাবা! বাবার কথা ভুলে যাস না কাবি। হাঁ, তুই তো জানিস কোন পুরুষের সংস্পর্শে আমরা আসি—এ তিনি একেবারে চান না। একটু থেমে আবার কৃষ্ণা বলে, তা ছাড়া বাবা মনে যাতে দুঃখ পান আমাদের তা করারই বা কি প্রয়োজন? কোন এক পরপুরুষ ডাক্তারের চেম্বারে একা একা তার সঙ্গে বসে বসে এভাবে sitting দেওয়ায় তিনি কিছুতেই মত দেবেন না।

নেপথ্য হতে ঠিক এমনি সময় ওদের পিতা সঞ্জীবের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, কৃষ্ণা কাবেরী!

কৃষ্ণা ঃ যাই বাবা। চল্, বাবা ডাকছেন।

দুই বোন ভিতরের ঘরের দিকে গেল।

ভিতরের একটি কক্ষ।

আসবাবপত্রের কোন বাহুল্যই নেই। একটি সিংগ্‌ল খাট একপাশে, উপরে তার শুভ্র শয্যা বিছানো। একপাশে নানাজাতীয় ইংরাজী বাংলা বইতে ঠাসা একটা আলমারী। ছোট একটি বেতের টেবিলের উপরে মদের গেলাস ও মদের বোতল। একটি হেলান দেওয়া বেতের চেয়ারের ওপরে বসে, কোলে একটি মোটা বই, পাঠনিরত সঞ্জীব চৌধুরী।

অদূরে দেওয়ালের গায়ে দাঁড় করানো আছে একজোড়া 'ক্রাচ' ও দেওয়ালে টাঙ্গানো একটি বেহালার বাক্স।

ক্রাচের সাহায্যেই সঞ্জীব চৌধুরী ঘরের মধ্যে সামান্য প্রয়োজনমত হাঁটা-চলা করেন।

সঞ্জীবের বয়স পঞ্চাশের ঊর্ধ্বে। সরু ছুঁচালো মুখ—মাথার চুল ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া। বহুকাল চিরুনির সংস্পর্শ নেই বলেই মনে হবে। কোটরপ্রবিষ্ট দুটি চক্ষু। দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, অন্তর্ভেদী। দাড়ি-গোঁফ নিখুঁতভাবে কামানো। পরিধানে পায়জামা ও গায়ে কিমোনো।

কৃষ্ণা ও কাবেরী এসে কক্ষে প্রবেশ করল।

বই হতে চোখ না তুলেই সঞ্জীব মৃদু কণ্ঠে বলেন, তোমাদের বোনদের কথা কিছু কিছু আমার কানে এসেছে। I agree with কাবেরী—

পিতার প্রকৃতিবিরুদ্ধ কথা শুনে দু বোনই যুগপৎ চম্‌কে যেন পিতার মুখের দিকে তাকায়।

কারো সঙ্গে মেলামেশা করা, বিশেষ করে কোন পরপুরুষের সঙ্গে, সঞ্জীব একেবারেই পছন্দ করেন না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাঁর সর্বদাই সজাগ ওদের প্রতি।

এমন কি এ কথাও তিনি বহুবার মেয়েদের বলেছেন, মেয়েদের স্বাধীনতার তিনি আদপেই পক্ষপাতী নন। মেয়েদের স্থান ঘরে—অন্দরের সীমানায়, আর লজ্জা ও সংযমের মধ্যে। শিক্ষার তাদের প্রয়োজন আছে, কিন্তু সে শিক্ষা স্কুল কলেজের ডিগ্রী শিক্ষা নয়। বাড়িতে বসেই তারা অধ্যয়ন করবে, শিক্ষালাভ করবে আত্মোন্নতির জন্য। বাইরের জগতের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক যতটা কম হয় ততই ভাল ও মঙ্গল। সেই জন্যই ম্যাট্রিক পাসের পর ঘরে বসেই আই-এর পাঠ পড়তে পড়তে তাদের পড়া বন্ধ হয়ে যায়। মোট কথা অতিমাত্রায় রক্ষণশীল পিতার প্রকৃতির সঙ্গে তাদের বেশ ভালভাবেই পরিচয় আছে।

সেই পিতার মুখে আজ এ কি কথা!

বিস্ময়ে দুই বোনই চেয়ে থাকে পিতার মুখের দিকে।

আবার সঞ্জীব বলে ওঠেন, বুঝতে পারছি তোমরা কি ভাবছো। মত আমার আজও বদলায় নি। তবু এ ব্যাপারে আমার মত আছে দুটি কারণে—

একটু থেমে আবার সঞ্জীব বলতে শুরু করেন, হাঁ, দুটি কারণে, ১নং আমাদের কিছু টাকার প্রয়োজন। এযাবৎকাল তোমাদের দুজনের মাইনে হতে যা আমি বাঁচিয়েছি, তার উপরে আরো কিছু টাকা হলে আমরা কলকাতা ছেড়ে কোন গ্রামে গিয়ে কিছু জমি-জায়গা করে সাধারণভাবে নিরুপদ্রবে ও শান্তিতে জীবন কাটাতে পারবো। তোমরা দু বোন প্রত্যেক sittingয়ের জন্য ১০০ টাকা করে চার্জ করবে, যদি এতে তারা রাজী হয় ভালো নচেৎ sitting দেবে না। আর ২নং কারণ—আমি দেখতে চাই এতদিন ধরে যে শিক্ষা তোমরা আমার কাছ হতে পেয়েছো, কতটুকু তার তোমরা গ্রহণ করেছো। সত্যিকারের মনের জোর যদি তোমাদের থাকে, তোমরা যে কোন situationয়েই উত্তীর্ণ হয়ে আসতে পারবে।

কাবেরী বেশী উৎসাহিত হয়ে ওঠে পিতার কথায়, বলে, তাহলে একটা দরখাস্ত করে দিই বাবা?

দাও—তবে হাঁ, ঐ একশ টাকা করে তোমরা প্রত্যেক sittingয়ের জন্য চাও, এ কথাটা mention করতে ভুল হয় না যেন।

কাবেরী বলে, কিন্তু বাবা, একশ টাকাটা খুব বেশী নয় কি?

সঞ্জীব জবাব দেন, না। যে লোক সামান্য একটা অদ্ভুত খেয়ালের জন্য টাকা খরচ করতে রাজী থাকে, তার কাছে অর্থের মূল্যটা খুব বেশী নয় কাবেরী। তাছাড়া দিয়েই দেখ না দরখাস্ত, রাজীও তো হতে পারে। তাছাড়া লোকটা রাজী হয়ে যায় ভালই নচেৎ আমাদের ক্ষতিই বা কি?

কিন্তু বাবা—এতক্ষণে কৃষ্ণা কথা বলে।

আর কথা নয় কৃষ্ণা। তোমরা এখন যেতে পারো—সঞ্জীব কতকটা যেন মেয়েকে বাধা দিয়েই প্রসঙ্গটা থামিয়ে দিলেন।

বাপের প্রকৃতির সঙ্গে কৃষ্ণা কাবেরী যথেষ্ট পরিচিত, আর দ্বিরুক্তি না করে দুজনে কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

* * *

মেয়েরা কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলে সঞ্জীব চেয়ার হতে উঠে ক্রাচে ভর দিয়ে দিয়ে কক্ষের আলমারীটার সামনে এসে দাঁড়ালেন।

একটা ড্রয়ার খুলে বের করলেন একটা ফাইল—সেই ফাইলটা খুলতেই বের হলো ৩০।৩২ বৎসরের অপরূপ রূপলাবণ্যময়ী এক নারীর ফটো। ফটোটা চোখের সামনে তুলে ধরে কিছুক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে সঞ্জীব চৌধুরী চাপা স্বরে বলতে থাকেন, করুণা করুণা করুণা! চোখের কোণে দু'ফোঁটা জল বুঝি এসে জমা হয় বৃদ্ধ সঞ্জীবের। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নেন সঞ্জীব চৌধুরী, তারপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ফটোটার দিকে তাকিয়ে চাপা কণ্ঠে বলে ওঠেন, You—You cruel heartless woman, you ruined my life! কিন্তু আজ? কেমন জব্দ, কেমন জব্দ করেছি তোমায়! আমার বুকভরা অফুরন্ত ভালবাসাকে একদিন দু'পায়ে তুমি থেঁতলে দিয়েছিলে। নিষ্ঠুর পাষাণ হৃদয়ে তোমার তিলমাত্রও সাড়া জাগাতে পারি নি। কিন্তু আজ! কেমন জব্দ, কেমন জব্দ?...World is too big, নয়?

হঠাৎ পাগলের মতই হাঃ হাঃ করে হেসে ওঠেন সঞ্জীব চৌধুরী।

দীর্ঘ সতের বছর আগে—স্মৃতির পর্দায় আলোকপাত হলো।

হাঃ হাঃ করে একটি সুবেশধারী যুবক হাসছে। সুসজ্জিত একটি ড্রইংরুম। যুবকটির নাম অরুণ মল্লিক। অদূরে সোফার উপরে বসে সুন্দরী, সুবেশা সঞ্জীব চৌধুরীর তরুণী স্ত্রী করুণা।

না—না—হাসি নয়, সত্যি বলছি অরুণ, সে ভীষণ রেগে গিয়েছে। লিখেছে, শীঘ্রই নাকি আমাদের সে চা-বাগানে নিয়ে যাবে—

After all the good old Sanjib is really a devoted husband. মিথ্যে তুমি ভয় পাচ্ছ রুণা। চা-বাগানে নিয়ে যাবে তোমার মত একজন সোসাইটি লেডিকে, চা-বাগানের সেই অন্ধকার জীবনে সে কখনই টেনে নিয়ে যেতে পারে না। সকলে মিলে আমরা তীব্র প্রতিবাদ করবো। Vehemently protest করবো।

কিন্তু এ কথাটা তোমরা ভোল কেন অরুণ, আমি তার বিবাহিতা স্ত্রী! তারই অধিকার সর্বাগ্রে—

বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা!

Don't be naughty অরু। সে আমার স্বামী।

অস্বীকার করি না, তাই বলে সীমা লঙ্ঘন করা কি উচিত?

এমন সময় ছয় বছরের শিশুকন্যা কৃষ্ণা ঘরে এসে প্রবেশ করল।

কৃষ্ণি! কাবি কোথায়?

কাবি ওঘরে খেলছে মা!

মা মেয়েকে কাছে টেনে এনে কুঞ্চিত কেশরাশিতে সস্নেহে হাত বুলাতে থাকেন।

অরুণ বলে, তাছাড়া তোমার এই যমজ মেয়ে কৃষ্ণা কাবেরী, ওদের কথা একবারও কি ভাবছো রুণা? চা-বাগানের বনজঙ্গলে গেলে ওদের লেখাপড়া, মানুষ করা সম্ভব হবে বলে মনে করো? তোমার স্বামী মিঃ চৌধুরী তাঁর নিজ সন্তানের ভবিষ্যৎকে নিশ্চয়ই অবহেলা করবেন না।

মুশকিল তো আমার মেয়ে দু'টিকে নিয়েই আরো হয়েছে অরুণ।

এমন সময় বাইরে কাবেরীর উল্লসিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, ওমা! দেখবে এসো বাবা এসেছে—

এ কি! উনি আজই এসে গেলেন নাকি! সবিস্ময়ে বলে ওঠে করুণা।

আমি তাহলে এখন চলি রুণা! আজকের পার্টির কথা ভোল নি তো?

না।

আসছো নিশ্চয়ই?

নিশ্চয়ই।

তা হলে চলি। পার্টিতে আবার দেখা হবে।

অরুণ যে দ্বারপথে ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল তার ঠিক বিপরীত দ্বারপথে কাবেরীকে কোলে নিয়ে করুণার স্বামী মিঃ সঞ্জীব চৌধুরী এসে কক্ষে প্রবেশ করলেন।

একটু বেশী বয়সেই সঞ্জীব সোসাইটির অন্যতম রত্ন তরুণী করুণাকে বিবাহ করেছিলেন। এবং করুণার অনুপাতে তার স্বামী সঞ্জীবকে বৃদ্ধ বলেই মনে হয়। অতিরিক্ত খাটুনি ও পরিশ্রমে শরীর ভেঙ্গে গিয়েছে, মুখটা লম্বাটে হয়ে গিয়েছে। রগের দু'পাশে চুলে পাক ধরেছে।

সঞ্জীব আসাম অঞ্চলের কোন এক চা-বাগানের ম্যানেজার। বেশ মোটা মাইনেই যে কেবল পান তা নয়, পিতৃসম্পত্তি এই বাড়িখানা ছাড়াও আরো খান-দুই বাড়ি কলকাতা শহরে ছিল। কিন্তু আজ আর একখানা বাড়িও তাঁর নিজস্ব বলতে নেই। যে বাড়িখানায় তাঁর স্ত্রী করুণা বর্তমানে আছে সেটাও দেনার দায়ে বিক্রি হয়ে গিয়েছে, এখন ক্রেতার কাছ হতেই মাসিক দু'শ টাকা ভাড়া দিয়ে ওরা আছে।

করুণা ও সঞ্জীবের পরিচয় হয় কোন এক পার্টিতে।

সঞ্জীব চমৎকার আবৃত্তি করতে পারতেন ও বেহালা বাজানোর হাত ছিল তাঁর সত্যিই মিষ্টি। কিন্তু অত্যন্ত চপল, বিলাসী ও অন্তঃসারশূন্য প্রকৃতির মেয়ে করুণা সঞ্জীবের গুণে নয়, তার মোটা মাইনের চাকরি, ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স ও কলকাতা শহরের উপরে তিনখানা বাড়ির লোভেই এবং একান্ত বুদ্ধিমতী, বিধবা, স্কুল-মিসট্রেস মায়ের সৎপরামর্শেই এ বিবাহে অগ্রসর হয়েছিল। সঞ্জীবের বয়স তখন চুয়াল্লিশ পার হয়ে গেছে, করুণা পঞ্চবিংশতিবর্ষীয়া মাত্র।

করুণার কৃপাদৃষ্টি লাভের জন্য অনেক বেকার বড়লোকের সন্তানও স্বল্প আয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠা খুঁজে বেড়াচ্ছে এমন তরুণের দল সর্বদা করুণার পিছনে পিছনে মধুলোভী ভ্রমরের মত গুনগুন রব তুলে ফিরছে তখন।

কিন্তু করুণার জননী মুখে কাউকে কিছু না বললেও মনে মনে কাউকেই ভবিষ্যৎ জামাতা হিসাবে পছন্দ করতেন না।

সঞ্জীব মাসখানেকের ছুটি নিয়ে সেবার কলকাতায় এসে নতুন একটা গাড়ি কিনে এক অবিবাহিত ব্যারিস্টার বন্ধুর পাল্লায় পড়ে ক্লাবে ও নানা পার্টিতে যাতায়াত করছে।

ঐরকম এক পার্টিতেই সঞ্জীব আবৃত্তি করলে ও বাজিয়ে শোনালে বেহালা। করুণা যেচে এসে সঞ্জীবের সঙ্গে আলাপ করলে।

ক্রমে আলাপ-পরিচয়টা আরো ঘনিষ্ঠ হলো, পরস্পর পরস্পরের বাড়িতে যাতায়াত শুরু

করলে। সঞ্জীব আরও এক মাসের ছুটি নিল। অবশেষে করুণার মা-ই একদিন সঞ্জীবের কাছে বিবাহের প্রস্তাব করলেন কন্যার হয়ে।

সঞ্জীব মনে মনে যে কামনাটা ইদানীং ভীরু সঙ্কোচের সঙ্গে লালন করছিল, করুণার মায়ের প্রস্তাব শুনে অন্তরের সেই ভীরু বাসনা মুক্তির আনন্দে যেন দু'কূল ছাপিয়ে গেল।

মৃদু সঙ্কোচের সঙ্গে সঞ্জীব বললে, কিন্তু মা, করুণা কি—

মৃদু হেসে করুণার মা বললেন, রুণার মন না জেনেই কি এ প্রস্তাব আমি তোমার কাছে করছি বাবা! তাছাড়া মেয়ে আমার এদিকে যতই সোসাইটির মধ্যে ঘুরে বেড়াক, ভীষণ লাজুক। আমি তো জানি রুণাকে।

* * *

যা হোক ঐ মাসেরই শেষে সঞ্জীব ও করুণার বিবাহ হয়ে গেল। এবং বিবাহের পরেই সঞ্জীব করুণাকে নিয়ে চা-বাগানে চলে গেল। দশ-পনের দিন যেতে-না-যেতেই কিন্তু করুণা বলতে শুরু করলে, এ কি ছাইয়ের জায়গা! মনের কথা বলবার একটা লোক নেই। না আছে ক্লাব, একটা হোটেল বা সিনেমা!

সঞ্জীব ভাবলেন, সত্যিই তো, অল্প বয়স করুণার, চিরদিন কলকাতার মত শহরে মানুষ। পাণ্ডব-বর্জিত এই বনজঙ্গলে তার মন টিকবেই বা কেন?

নিজে সঙ্গে করে সঞ্জীব রেখে এলেন করুণাকে কলকাতার বাড়িতে। ভৃত্য, চাকরানী, ড্রাইভার, বামুন নিযুক্ত হলো। করুণা মনের আনন্দে দিন কাটাতে লাগলো। হাতে অজস্র টাকা, বাড়ি, গাড়ি, সোসাইটিতে পজিশন—করুণা তার নিজের খেয়ালখুশিতে মশগুল হয়ে উঠলো।

সঞ্জীব মধ্যে মধ্যে আসেন, ছয় সাত দিন থেকে যান। স্ত্রীকে যখনই নিজের কর্মস্থলে যাওয়ার কথা বলেন, করুণা মুখখানি ভার করে। সঞ্জীবের কেমন মায়া হয়, কিছু বলতে পারেন না।

বৎসর দেড়েক বাদে কৃষ্ণা ও কাবেরী যমজ দুটি মেয়ে হলো করুণার।

এবারে আবার সঞ্জীব করুণাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইলেন নিজের কর্মস্থলে, কিন্তু করুণা রাজী হলো না।

স্ত্রীর ব্যবহারে সঞ্জীব মনে বিশেষ আঘাত পেলেন এবারে, মুখে কিছু বললেন না—কিন্তু মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন, জীবনে আর কখনো স্ত্রীকে নিজের কাছে যেতে বলবেন না। থাক সে এখানে, যদি কখনো সে স্বেচ্ছায় যেতে চায় তাঁর কাছে, তবেই নিয়ে যাবেন—নইলে নয়।

শাপে বর হল করুণার। আয়ার হাতে মেয়ে দুটির রক্ষণাবেক্ষণের ভার সঁপে দিয়ে করুণা তার পার্টি, ক্লাব নিয়েই হৈ হৈ করে সারাদিন বেড়াতে লাগল।

ব্যাঙ্কের জমানো টাকার সংবাদ বিবাহের পর থেকেই সঞ্জীব আর রাখতেন না, স্ত্রীর নামে ব্যাঙ্ক হতে টাকা তুলবার ক্ষমতা দিয়ে দিয়েছিলেন। বিবাহের বছর চারেক বাদে হঠাৎ একদিন সঞ্জীব আবিষ্কার করলেন ব্যাঙ্ক প্রায় শূন্য।

তাড়াতাড়ি ছুটে এলেন সঞ্জীব কলকাতায়। শুধু যে ব্যাঙ্ক শূন্য তা নয়, বহু জায়গায় ধারও হয়েছে করুণার প্রচুর। সেই ঠেলা সামলাতে গিয়ে একখানা বাড়ি বিক্রয় হয়ে গেল। তথাপি সঞ্জীব করুণাকে কিছু বললেন না।

দুটো বছরও তারপর গেল না—বাকী দুখানা বাড়িও দেনার দায়ে বিক্রি হয়ে গেল, সময় থাকতে করুণাকে কিছু না বলবার জন্যই। কিন্তু এবারে আর সঞ্জীব চুপ করে থাকতে পারলেন না।

একদিন স্ত্রীকে বললেন, করুণা, এতদিন তোমায় আমি কোন কথা বলি নি, কিন্তু আর না বলে পারছি না, এবার থেকে যদি তুমি সাবধানে না চল, ভবিষ্যতে তোমায়ই অসুবিধায় পড়তে হবে।

করুণা স্বামীর দিকে বিলোল কটাক্ষ হেনে বললে, সোনার হরিণের দাম কি কখনো কমে?

তারপর স্বামীর দেহের উপরে এলিয়ে পড়ে হাসতে হাসতে বললে, তাই বলে কঞ্জুস নাম কিনতে পারবো না। তোমার স্ত্রীর societyতে একটা position আছে তো!

সমস্ত আঘাতই সঞ্জীব সহ্য করেছিলেন করুণার দিক থেকে কিন্তু শেষ ও চরম আঘাত এলো যখন তিনি একটা উড়ো চিঠি থেকে জানতে পারলেন, করুণা অরুণ নামে কোন এক তরুণ ব্যারিস্টারের সঙ্গে কুৎসিত জীবনযাপন করছে, তাঁরই স্বোপার্জিত অর্থে।

গোপনে সংবাদ নিয়ে সঞ্জীব জানলেন চিঠির একটি বর্ণও মিথ্যা নয়। তথাপি করুণার প্রতি তাঁর হৃদয়ভরা ভালবাসা তাঁকে রূঢ় হতে দিল না।

কেবল একখানা চিঠি লিখলেন, তিনি আসছেন—করুণা যেন প্রস্তুত থাকে, এবারে তাকে তিনি সঙ্গে নিয়েই আসবেন।

করুণা স্বামীর চিঠি পেয়েও এতটুকু বিচলিত হলো না, কারণ স্বামীর তার প্রতি যে কি প্রগাঢ় ভালবাসা সেটা তার অবিদিত ছিল না।

সেদিন সঞ্জীব আসবার একটু আগে সেই সম্পর্কেই করুণা ও অরুণের মধ্যে কথাবার্তা চলছিল।

কাবেরীকে কোলে নিয়ে স্বামীকে হঠাৎ কক্ষে প্রবেশ করতে দেখে করুণা চিৎকার করে আয়াকে ডাকল, আয়া—আয়া—

আয়া ঘরে এসে ঢুকলো হন্তদন্ত হয়ে, জি মেম্‌সাব—

বেবীকো লে যাও। দেখতা নেই—সাব্ আভি আয়া, কেতনা পরেশান হুয়া—

সঞ্জীব বাধা দিলেন, না না, থাক।

No No, you look so tired darling ! কাবি—যাও খেল গে যাও—

মাকে মেয়েরা যমের মতই ভয় করে, কাবেরী তাড়াতাড়ি বাপের কোল থেকে নেমে চলে গেল।

তারপর কেমন আছো?—করুণা প্রশ্ন করে।

ভাল—সব ready করে রেখেছো তো? পরশুই রওনা হবো আমরা।

এত তাড়া কেন? রহস্যপ্রিয় কণ্ঠে করুণা বলে।

কেন—তুমি আমার চিঠি পাওনি?

পেয়েছি গো পেয়েছি—

ঐদিন সন্ধ্যার মুখে সঞ্জীব তাঁর কক্ষমধ্যে বসে কি একটা ইংরাজী বই পড়ছেন।

অপরূপ সাজসজ্জায় করুণা এসে স্বামীর সামনে দাঁড়াল।

ব্যাপার কি, হঠাৎ এত সেজেছো যে?

একটা পার্টি আছে মিঃ চাকলাদারের ওখানে—

পার্টি?

হাঁ—ফিরতে একটু রাত হবে।

আজ পার্টিতে না গেলেই নয় করুণা?

ওঃ ডিয়ার! কি বলছো তুমি? আমার জন্য সবাই হা-পিত্যেশ করে বসে থাকবে—

সত্যিই I am serious, রুণা। আজ পার্টিতে তোমার যাওয়া হবে না। ফোন করে দাও—

Don't be so jealous। আচ্ছা চলি—

রঙীন প্রজাপতির মতই যেন রূপের একটা ঢেউ তুলে করুণা স্বামীকে আর দ্বিতীয় বাক্য পর্যন্ত উচ্চারণ করার অবকাশ মাত্র না দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

একটু পরেই গাড়ির শব্দে জানা গেল করুণা চলে গেল।

স্তম্ভিত হয়ে সঞ্জীব ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইলেন।

অনেক রাত্রি। কৃষ্ণা কাবেরী ঘুমিয়েছে।

শয়নকক্ষে একাকী বসে বসে সঞ্জীব বহুদিন বাদে বেহালাটা বাজাচ্ছিলেন। অনেকক্ষণ ধীরে ধীরে বেহালা বাজিয়ে থামবার পর হঠাৎ ঘড়ির ঘণ্টাধ্বনিতে তাঁর চমক ভাঙল।

রাত্রি একটা। আশ্চর্য, এখনো করুণা ফিরল না! মুখে বিরক্তির ছায়া নেমে এলো সঞ্জীবের।

ঘরের মধ্যে পায়চারি সুরু করলেন সঞ্জীব আর বেহালাটা একপাশে রেখে ঘন ঘন দেওয়াল-ঘড়ির দিকে তাকাতে লাগলেন। এমন সময় নিচে গাড়ির শব্দ শোনা গেল। এগিয়ে এলেন সঞ্জীব জানালাটার ধারে।

নিচের গেটের সামনে একটা গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে, আর তাঁর স্ত্রী করুণা ও অরুণ পরস্পর পরস্পরের কাছ থেকে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে বিদায় সম্ভাষণ জানাচ্ছে।

মুহূর্তে দাবাগ্নির মতই সমস্ত অন্তর জ্বলে ওঠে সঞ্জীবের।

অপেক্ষা করতে লাগলেন ঘরের মধ্যেই দাঁড়িয়ে।

একটু পরেই সিঁড়িতে চঞ্চল পদশব্দ ও সেই সঙ্গে জড়িত কণ্ঠে গানের একটি কলি শোনা গেল,—

কাছে যবে ছিল তারে হলো না চাওয়া—

করুণা কক্ষমধ্যে এসে প্রবেশ করল। এবং সঙ্গে সঙ্গেই বজ্রকঠিন কণ্ঠ সঞ্জীবের শোনা গেল, করুণা!

করুণার তখন দাঁড়াবার মতও অবস্থা নয়, রীতিমত টলছে, চোখ দুটো নেশার ঘোরে বুজে আসছে, ঢুলু ঢুলু।

করুণা!

Oh dear ! Please—not now ! I'm feeling so sleepy !

জড়িত, ক্লান্ত কণ্ঠে কথা কয়টি বলে করুণা যেমন শয়নকক্ষের দিকে পা বাড়াতে যাবে, তীক্ষ্ণ কণ্ঠ আবার শোনা গেল সঞ্জীবের, শোনা করুণা, দাঁড়াও। তোমার সঙ্গে আমার কয়েকটা কথা আছে—

করুণা আবার যাবার জন্য পা বাড়িয়ে জড়িত কণ্ঠে বলে ওঠে, Oh sweety, don't be so cruel ! কাল—কাল সকালে সব—সব শুনবো—

করুণা!

করুণা এবারে একটা চেয়ারে বসে পড়ে।

ছিঃ! এত দূর তোমার অধঃপতন হয়েছে! পরপুরুষকে নিয়ে শুধু যে ঢলাঢলি করছো তা নয়, ইতর মেয়েমানুষের মত মদও খেতে শুরু করেছ!

মদ! No No—শ্যাম্পেন—শেরী—that is not liquor !

Shut up ! বাঘের মতই গর্জন করে ওঠেন সঞ্জীব, স্বৈরিণী!

হঠাৎ যেন করুণার নেশাটা টুটে গেল, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠলো সে, সঞ্জীব, how dare you insult me !

Insult ! অপমানের কোন জ্ঞান আজ আর তোমার আছে? ভদ্রঘরের বৌ, ভদ্রলোকের স্ত্রী—সন্তানের জননী হয়ে যে জঘন্য কুৎসিত জীবন তুমি যাপন করছো—তোমার লজ্জা নেই কিন্তু আমার গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে হচ্ছে।

সঞ্জীব! ভুলে যেও না আমি তোমার বিবাহিত স্ত্রী হলেও নিজস্ব আমার একটা মতামত, একটা স্বাধীনতা আছে—

এর নাম স্বাধীনতা! You shameless filthy woman !

সঞ্জীব!

তুমি না শিক্ষিতা? স্বামী বর্তমানে যে জঘন্য রুচির পরিচয় তুমি আজ দীর্ঘ সাত বছর ধরে দিয়েছো—কি বলবো, তুমি আমার সন্তানের জননী, নইলে—

নইলে কি করতে? বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে?

তাড়িয়ে দিতাম? না। অত বড় বোকা সঞ্জীব চৌধুরী নয়। তোমাকে আজ বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবো আর তুমি আমার পরিচয়ের শেষ চিহ্নটুকু বহন করে নিয়ে সর্বত্র কাদা ঘেঁটে বেড়াবে, নিজের সর্বাঙ্গে কালি মাখবে—সেই সঙ্গে আমার সর্বাঙ্গে কালি ছিটাবে!

একটু থেমে সঞ্জীব আবার বলেন, না করুণা, সে সুযোগ এ জীবনে আর তোমায় আমি দেবো না। আমার অফুরন্ত বুকভরা ভালবাসা, বিশ্বাস ও ধৈর্যের শেষ পাওনাগণ্ডাটুকুও পর্যন্ত তুমি মিটিয়ে দিয়েছো। অনেক দিয়েছো তুমি আমায় এই জীবনের সুদীর্ঘ সাত বছর ধরে—হাঁ অনেক দিয়েছো।

করুণা এবারে বাধা দিয়ে উঠলো, থাক। তোমার লেকচার শোনবার মত আমার এখন ধৈর্য নেই, তুমি মনে করো না, তোমার এই ঘর ছাড়া এত বড় দুনিয়ায় আর জায়গা নেই—World is too big ! এরপর আমারও এখানে থাকা সম্ভব নয়। এখুনি আমি চলে যাচ্ছি—

করুণা পাশের কক্ষে, যেখানে ছোট মেয়ে দুটি কৃষ্ণা কাবেরী ঘুমাচ্ছে সেই ঘরের দরজার দিকে অগ্রসর হতেই গম্ভীর বজ্রকঠিন কণ্ঠে সঞ্জীব বলে ওঠেন, ওদিকে কোথায় যাচ্ছ? দাঁড়াও!

স্তম্ভিত, হতচকিত হয়ে করুণা তার চলমান পা দুটো সহসা যেন থামিয়ে, ভ্রূকুঞ্চিত করে তাকায় সঞ্জীবের মুখের দিকে, I want to give a parting kiss to my kiddies।

না। ও ঘরের দরজা তোমার কাছে চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তোমার ও অপবিত্র

দেহের স্পর্শও আমার সন্তানদের গায়ে তোমায় আজ আর আমি লাগাতে দেবো না—

ওঃ এতদূর! কিন্তু ভুলে যাচ্ছো ওরা আমারও সন্তান। I have got legal rights !

Legal rights ! তোমার সন্তান সেটাই আজ ওদের জীবনের সবচাইতে বড় অভিশাপ, সবচাইতে বড় কলঙ্ক; সন্তানই বটে—যে মা সন্তানের জন্ম মাত্র দিয়ে পশারিণীর বৃত্তি নিয়ে—

সঞ্জীব! বাঘিনীর মত গর্জন করে ওঠে করুণা, এবং মুহূর্তে করুণার সর্বাঙ্গ যেন জ্বলে ওঠে, ও পরক্ষণেই হাতের কাছে স্ট্যাণ্ডের ওপরে রক্ষিত ফুলসমেত পিতলের ফুলদানীটা চোখের নিমেষে তুলে নিয়ে সজোরে নিক্ষেপ করে সঞ্জীবকে লক্ষ্য করে। ঠং করে সঞ্জীবের কপালের উপরে গিয়ে ফুলদানীটা আঘাত করে, ঝরঝর করে রক্ত পড়ে কপালটা কেটে গিয়ে ; একটা আর্তনাদ করে সঞ্জীব বসে পড়েন। কয়েকটি মুহূর্ত, তারপর উঠে কোনমতে এগিয়ে গিয়ে ড্রয়ার থেকে লোডেড রিভলভারটা হাতে নিয়ে করুণার দিকে এগিয়ে এল সঞ্জীব। রাগের মাথায় অকস্মাৎ ফুলদানী স্বামীর কপালে ছুঁড়ে মেরেই কতকটা যেন বোকা বনে গিয়ে স্থাণুর মত দাঁড়িয়েছিল, এখন রিভলভার হাতে স্বামীকে এগিয়ে আসতে দেখে ভয়ে, আতঙ্কে আর্ত চিৎকার করে ওঠে, না, না—খুন করো না, আমায় খুন করো না। আমি, আমি—

মরতে এত ভয়! বলেই সঞ্জীব পাগলের মত অট্টহাসি হেসে ওঠে, তারপর বলে, ভেবেছিলাম তোমায় খুনই করবো, কিন্তু না, খুন তোমায় আমি করবো না করুণা। তোমার মত একটা নরকের কীটকে খুন করে হাত আমার কলঙ্কিত করবো না। এখুনি এক বস্ত্রে, রিক্ত দেহে, এ গৃহ এই মুহূর্তে তোমায় ত্যাগ করে যেতে হবে। বলতে বলতে গিয়ে আলনা হতে সাধারণ একটা শাড়ি টেনে করুণার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে কঠোর কণ্ঠে সঞ্জীব বললে, আমারই অর্থে ক্রয় করা তোমার ঐ মূল্যবান জড়োয়ার চোখ-ঝলসান গহনাগুলো তোমায় ত্যাগ করতে হবে, এমন কি পরিধানের ঐ শাড়িটি পর্যন্ত। ঐ সাধারণ শাড়িখানা পরে একবস্ত্রে একেবারে রিক্ত হয়ে এই মুহূর্তে এ গৃহ তোমাকে ত্যাগ করতে হবে। যাও—তাড়াতাড়ি করো, যত তাড়াতাড়ি এ গৃহ ছেড়ে তুমি যাও ততই মঙ্গল। তোমার পাপে এ গৃহের বাতাস পর্যন্ত বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। যাও—

বেশ।

একে একে গহনাগুলো গা হতে করুণা খুলে দিল, তারপর স্বামীর দেওয়া শাড়িখানা পরে নিল।

দাঁড়াও—এখনও একটা জিনিস বাকী আছে, তোমার সিঁথির ঐ সিঁদুর, আমার সামনে ওটা মুছে ফেলতে হবে। নিশ্চিহ্ন করে ঘষে মুছে ফেলতে হবে।

করুণা বোবা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

মোছ! মোছ সিঁথির সিঁদুর! বলতে বলতে সঞ্জীব নিজেই এগিয়ে এসে পাগলের মত মুছে দেয় ঘষে করুণার মাথার সিঁদুর।

হাঁ, এবারে যাও। পৃথিবী অনেক বড়, কিন্তু একটা কথা, আমার শেষ কথা, তোমার সিঁথির সিঁদুর মুছে দিলেও সমাজের চোখের দৃষ্টি তো মুছে দিতে পারবো না, তারা আঙুল তুলে টিটকারী দেবে। কিন্তু সেদিন আর আমাকে তারা খুঁজে পাবে না—সে টিটকারী তোমার গায়েই ফিরে আসবে। যাও—

হঠাৎ এমন সময় চমকে উঠলেন সঞ্জীব, ইতিমধ্যে একসময় কৃষ্ণা ঘুম ভেঙে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে।

কৃষ্ণা ডেকে ওঠে, মা!

হঠাৎ যেন সঞ্জীব পাগলের মত ছুটে গিয়ে করুণাকে প্রাণপণে ধাক্কা দিতে দিতে ঘর হতে ঠেলে বের করে দেন, যাও—যাও!

কৃষ্ণা কেঁদে ওঠে চিৎকার করে, মা—মা!

ঠেলতে ঠেলতে করুণাকে ঘর হতে বের করে দিতে গিয়ে চৌকাঠে পা বেধে সঞ্জীব হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন।

করুণা ছুটতে ছুটতে নিচে চলে গিয়ে অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

তারপর আর কেউ করুণার সংবাদ কোন দিনও পায় নি।

* * *

সেই রাত্রেই কৃষ্ণা কাবেরীকে নিয়ে সঞ্জীব বাড়িতে তালা দিয়ে বের হয়ে পড়লেন। চাকুরিস্থলে আর ফিরে গেলেন না, দেশ হতে দেশান্তরে কৃষ্ণা কাবেরীকে নিয়ে ঘুরতে লাগলেন।

এদিকে সেরাত্রে চৌকাঠে পা বেধে পড়ে গিয়ে পায়ের হাড়ে প্রচণ্ড আঘাত লাগে সঞ্জীবের। ক্রমে সেই পা নিয়ে সঞ্জীবকে অনেক ভুগতে হলো এবং শেষটায় পা-টা অকর্মণ্য হয়ে গেল।

ঘুরতে ঘুরতে আবার সুদীর্ঘ দশ বছর পরে সঞ্জীব কলকাতায় ফিরে এলেন এবং ফ্ল্যাটটা ভাড়া নিয়ে বসবাস শুরু করলেন অতীতকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে।

ইতিমধ্যে কৃষ্ণা কাবেরী প্রাইভেটে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাস করেছিল। প্রাইভেটে তারা আই. এ'ও পাস করল। কিন্তু এদিকে সঞ্জীবের সমস্ত সঞ্চিত অর্থ গেল ফুরিয়ে।

নিজে অথর্ব হয়ে পড়েছেন, অগত্যা মেয়েদের টেলিফোনে চাকরি নিতে দেওয়া ছাড়া আর উপায়ান্তর রইলো না।

মেয়েদের চাকরি করতে দিলেও সঞ্জীব মেয়েদের প্রতি সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। এবং ছোটবেলা হতেই এমন কঠোর শাসনের মধ্যে মেয়েদের গড়ে তুলেছিলেন যে, মেয়েরা বাপকে বাঘের মতই ভয় করতো। বাপের অমতে এক পাও এগুবার সাহস ছিল না।

আসলে সঞ্জীব করুণার ব্যাপারে সমস্ত নারীজাতির উপরেই বিতৃষ্ণ ও সন্দিহান হয়ে উঠেছিলেন। এবং তাদের তিলমাত্র স্বাধীনতা দেবারও ইচ্ছা তাঁর হত না। সর্বদা ভয় ছিল, কখন মেয়েরা তাঁর অধিকারের বাইরে চলে যায়—দশ চক্ষু মেলে তাই যেন তিনি সর্বদা মেয়েদের পাহারা দিতেন। এমন কি যতদিন বেঁচে থাকবেন, মেয়েদের বিবাহ পর্যন্ত দেবেন না, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে রেখেছিলেন।

ডাঃ সুকুমার গুপ্তের চেম্বার।

সকালের ডাকে আজ অনেকগুলো চিঠি এসেছে। ডাক্তার চিঠিগুলো একটার পর একটা খুলে পড়ছে। হঠাৎ একখানা চিঠি পড়তে পড়তে ডাক্তারের মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

ডাক্তার তাড়াতাড়ি পাশ থেকে ফোনটা তুলে নেয়, Please put me to south....

একটু পরে ওপাশ হতে কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, হ্যালো!

কে, কিরীটী নাকি?

কে, ডাক্তার? কি খবর ভাই?

সুখবর। তোর কৃষ্ণা কাবেরী দরখাস্ত করেছে—

সুখবর। দিয়ে দাও—জবাব দিয়ে দাও এখুনি। শুভস্য শীঘ্রম্।

কিন্তু—

কিন্তু আবার কি? না না—appointment দিয়ে দাও।

দুই

কাজ হয়ে গেল। সুকুমারও মনে মনে যেন একটা নতুন উৎসাহ অনুভব করে। ব্যাপারটার মধ্যে সত্যিই একটা নতুনত্ব আছে। আছে একটা বৈচিত্র্য ও উত্তেজনা।

পৃথক পৃথক ভাবে sitting শুরু হলো। এক-একটা sittingয়ের জন্য ১০০ টাকা করে পারিশ্রমিকই দেওয়া হতে লাগল, যেমন কৃষ্ণা কাবেরী চেয়েছিল।

ডাঃ সুকুমার গুপ্তের চেম্বার।

রাত্রি আটটা হবে। প্রশস্ত একটি হলঘরের মধ্যে নানাজাতীয় বিচিত্র আসবাবপত্রে সুসজ্জিত। ঘরের মধ্যে জ্বলছে একটি ডোমে-ঢাকা নীলাভ আলো। কৃষ্ণার sitting।

একটি আরাম-কেদারার উপরে কৃষ্ণা অর্ধশায়িতভাবে বসে, পাশেই একটি স্ট্যাণ্ডের উপরে ভাসে রক্ষিত এক থোকা রক্তগোলাপ। ঘরের মধ্যে বায়ুস্তরে গোলাপের উগ্র একটি মিষ্টি গন্ধ ভেসে বেড়ায়। জানালার উপরে লাল রক্তবর্ণের সব ভারী পর্দা টাঙানো, বাইরের জনতার গোলমাল বা শব্দ ঘরে প্রবেশ করে না।

সুকুমার বলছিল—

আচ্ছা কৃষ্ণা দেবী, মনে করুন আপনাকে একটা particular situation বলবো এবং আপনাকে যদি সেই বিশেষ situationটিতে পড়তে হয় আপনি কি করতেন? চট্‌পট জবাব দেবেন না—ভেবে বলুন। মনে করুন আপনি যেন কোন একটা অচেনা পথ ধরে এগিয়ে চলেছেন দিক ভুল করে। রাত্রির অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে, আশেপাশে সব নির্জন, জনপ্রাণীর চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

সুকুমার গল্প বলে যায় কিন্তু তার স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে সামনের বড় আর্শিটার উপরে—যার উপরে উপবিষ্ট কৃষ্ণার সম্পূর্ণ ছায়াটা প্রতিফলিত হয়েছে। কৃষ্ণার অজান্তে তার মুখের সমস্ত ভাব-বৈলক্ষণ্যই সুকুমারের দৃষ্টিতে ধরা দিচ্ছে।

সুকুমার বলতে থাকে—

আপনি চলেছেন—চলেছেন। হঠাৎ দেখলেন পথের মধ্যে একটা বিষধর সাপ ফণা তুলে দুলছে। এবং পথও সেখানে সংকীর্ণ। সাপটাকে এড়িয়ে পথ অতিক্রম করা দুঃসাধ্য। পিছনপানে ফিরে তাকালেন। একটি ছোট্ট শিশু টলতে টলতে এগিয়ে আসছে। এ অবস্থায় পড়লে আপনি কি করতেন?

কি আর করব—ছুটে পালাব! জবাব দেয় কৃষ্ণা।

আর সেই ছোট্ট শিশুটি! অসহায়—তাকে—

আপনি বাঁচলে বাপের নাম, আপনি কি করতেন? প্রাণ নিয়ে পালাতেন না?

কি জানি, হয়ত—হয়ত পালাতামই।

* * *

একই প্রশ্নের জবাবে দিন দুই পরে কাবেরী কিন্তু সাপের কথা শুনেই চিৎকার করে ওঠে অর্ধস্ফুটভাবে।

তারপর শিশুটির কথায় বলে, কি বিশ্রী নিষ্ঠুর গল্প আপনার ডাঃ গুপ্ত!

ডাঃ গুপ্ত হেসে ফেলে।

হাসলেন যে ডাঃ গুপ্ত? আমি কি মিথ্যা বলেছি?

ডাঃ গুপ্ত জবাব দেয় না।

আবার আর একদিন, ডাঃ গুপ্ত কৃষ্ণাকে প্রশ্ন করে, আচ্ছা কৃষ্ণা দেবী, প্রত্যেকেরই জীবন সম্পর্কে আমরা একটা কল্পনা বা আশা পোষণ করি মনে মনে, কেমন না?

কৃষ্ণা মৃদু কণ্ঠে জবাব দেয়, তা করি।

ডাঃ গুপ্ত বলে, বেশ। বলুন তো আপনি—ভবিষ্যতের জীবন সম্পর্কে আপনি মনে মনে কি আশা পোষণ করেন? লজ্জা করবেন না কিন্তু, be frank & straightforward !

অনেক টাকাকড়ি থাকবে ব্যাঙ্কে, সচ্ছল জীবন, গাড়ি, বাড়ি, শিক্ষিত, রূপবান, স্বাস্থ্যবান স্বামী—

বলতে বলতে হঠাৎ মৃদু হেসে বলে, societyতে position না চায় কে বলুন ডাঃ গুপ্ত? স্বপ্ন আমরা সকলেই তো দেখি এবং শতকরা ৯৯টি ক্ষেত্রেই তা বাস্তবে পরিণত হয় না এই যা দুঃখ!

একটা নোটবুকে কৃষ্ণার মন্তব্যগুলো টুকে নিতে নিতে স্মিতভাবে সুকুমার বলে, অত pessimistic হচ্ছেন কেন? হয়ও তো!

কৃষ্ণা মৃদু হাসে।

পরের দিন ডাক্তারের একই প্রশ্নের জবাবে কাবেরী বলে, আকাঙ্ক্ষা বা কল্পনা বলতে আপনি কি ঠিক mean করছেন বলতে পারি না ডাঃ গুপ্ত। তবে এভাবে চাকরি করে জীবিকা উপার্জন করতে সত্যিই ভাল লাগে না। এর চাইতে—

বলুন—বলুন, don't be shy !

ছোটখাটো শান্ত সচ্ছল একটি পরিবার, সুখে দুঃখে দিন চলে যাবে, অশান্তি বা মনের গরমিল থাকবে না—তাছাড়া অভাব-অভিযোগ তো মানুষের কতকটা নিজেরই মনে সৃষ্টি করা ডাঃ গুপ্ত। শান্তি অর্থে ক্রয় করা যায় না, সেও মানুষের মনে।

ডাক্তার কাবেরীর মন্তব্যটা কৃষ্ণার মন্তব্যের পাশেই ঠিক টুকে নিতে নিতে বলে, যা বলেছেন। তবে মনকে সব সময় ঠিকভাবে যাচাই করতে গেলে দুঃখটা আমাদের বেশীর ভাগ মানসিকই বইকি।

* * *

দিনের পর দিন এই ধরনের আলাপ আলোচনা, দুটি সুন্দরী তরুণীর নিকটত্ব, একক সাহচর্য, তরুণ ডাক্তারের মনে রঙের ছোঁয়া লাগে বোধ হয়, অদৃশ্য মীনকেতুর ফুলশ্বর কখন

বুঝি মনের একটি কোমল তারে মৃদু আঘাতে সুর জাগিয়ে যায়।

মনের আকাশে পঞ্চশরের ফুলবাণে কিসের স্পর্শ লাগে—ফুটে ওঠে কুসুমের কলি। মনের ঘরে অকারণে ভ্রমর যায় গুনগুনিয়ে। ভাল লাগে সুন্দর মুখখানি, ভাল লাগে কোন একটি কণ্ঠস্বর, চোখের চাউনি, একটি তনুর ভঙ্গিমা। মন পড়ে থাকে পায়ের সাড়ার সঙ্গীতে।

কিন্তু কে? কৃষ্ণা না কাবেরী?

কিরীটী হঠাৎ একদিন রাতে এলো।—তারপর মনস্তাত্ত্বিক, সংবাদ কি তোমার clientদের?

এগুচ্ছে। ডাঃ গুপ্ত বলে।

হঠাৎ কিরীটীর টেবিলের উপরে নজর পড়ে। একটা ব্লটারের উপরে কত ভাবেই যে লেখা, কৃষ্ণা কাবেরী—কাবেরী কৃষ্ণা দুটি নাম।

মৃদু হাসি দেখা দেয় কিরীটীর ওষ্ঠপ্রান্তে, হুঁ! একটা কবিতা মনে পড়ে গেল ডাক্তার।

কবিতা? বিস্মিত সুকুমার বন্ধুর মুখের দিকে তাকায়।

হাঁ। একটু হেসে সুর করে কিরীটী বলে ঃ

ভাল লাগে মোর দুটি নাম!
ভাল লাগে কানে কানে বলা—
আর মনে মনে জানা,
তটিনীর কলতান
ভাল লাগে খালি দু'টি নাম।

লজ্জায় ডাক্তারের চোখে মুখে যেন রক্ত আবির ছড়িয়ে দেয়, যাঃ, কি যে বল!

কিরীটী বলে, বলি ভালই বন্ধু। তবে সত্য এই যা, সুন্দরী তরুণী, নির্জন একক সাহচর্য, দিনের পর দিন experiment বা studyটা তো মনের কথারও হতে পারে—কি বল?

আঃ, কি আরম্ভ করলি বল্ তো! কাবেরী দেবীর আসবার সময় হয়েছে, এখুনি হয়ত এসে পড়বেন, যদি শুনতে পান—

আনন্দই পাবেন, তাছাড়া এসে পড়বেন নয়—পড়েছেন। ঐ শোন তাঁর লঘু পদধ্বনি পাষাণ সোপানবক্ষে। শোন—কান পেতে শোন—নহে, নহে মিথ্যা বা মনের কল্পনা।

সত্যি সিঁড়িতে লঘু পদশব্দ শোনা গেল। কেউ উপরে উঠে আসছে।

চলি বন্ধু—দেখা হবে পুনঃ—মৃদু হেসে কিরীটী ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যায়।

কাবেরীর কণ্ঠস্বর সুইং-ডোরের ওপাশ হতে ভেসে এলো, ভিতরে আসতে পারি কি?

আসুন, আসুন কাবেরী দেবী।

সানন্দ আহ্বান শোনা গেল ডাক্তারের কণ্ঠে।

টেলিফোন অফিসের অপারেটিং রুম। কানে হেড্‌পিস লাগিয়ে দু'বোন কাজ করছে পাশাপাশি। মধ্যে মধ্যে একথা সেকথা আলোচনা হচ্ছে। দুই বোনের মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছিল, বাইরে সন্ধ্যার তরল অন্ধকার ডানা মেলেছে।

কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করে হঠাৎ একসময় আলোচনার মধ্যে, ডাক্তার গুপ্তকে তোর কি রকম মনে হয় কাবি?

কাবেরী ঃ তা মন্দ কি! বেশ ভাল লোক বলেই তো মনে হয়। একটু যা মিস্টিরিয়াস—সব সময় যেন ঠিক বোঝা যায় না।

কৃষ্ণা ঃ একদিন আমাদের বাড়িতে চায়ের নিমন্ত্রণ করলে মন্দ হতো না—

কাবেরী ঃ বাবাকে কি ভুলে গেলি দিদি!

হঠাৎ কৃষ্ণা হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে, মিস রেহানা এখনো তো এলো না। সোয়া সাতটা বেজে গেল।

কাবেরী বলে, আমারও তো রিলিফ মিস্ বোস এখনো এলো না।

এমন সময় দেখা গেল মিস্ রেহানা ও মিস্ বোস দু'জনেই প্রায় আগে পিছে ঘরে এসে ঢুকছে।

কৃষ্ণা কাবেরী তাদের পরস্পরের ডিউটি মিস্ রেহানা ও মিস্ বোসের হাতে তুলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

বাইরে সন্ধ্যার কলকাতা শহর আলোকসজ্জায় হাস্য ও লাস্যময়ী হয়ে উঠেছে তখন।

টেলিফোন অফিসের ঠিক গেটের সামনেই লাইট্‌পোস্টের নিচে স্যুট পরিহিত একটি ভদ্রলোক, মাথায় ফেল্ট ক্যাপ বাঁ দিককার মুখের উপরে একটু টেনে গেটের দিকে দৃষ্টি দিয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ধূমপান করছিল। ওদের দু'বোনকে অফিস থেকে বের হতে দেখে যেন লোকটা সজাগ হয়ে ওঠে। কাবেরীর দৃষ্টি হঠাৎ স্যুট-পরিহিত লোকটার উপরে গিয়ে পড়ে। সে অলক্ষ্যে কৃষ্ণার গায়ে হাত দিয়ে চাপা কণ্ঠে ডাকে, দিদি—

কি হলো আবার, থামলি কেন?

ওই যে লাইটপোস্টের নিচে দাঁড়িয়ে স্যুটপরা লোকটা, কিছুদিন ধরে লক্ষ্য করছি ও আমাদের প্রায়ই follow করে—

কি যে বলিস?

স্যুটপরিহিত লোকটি ততক্ষণে এক পা এক পা করে হাঁটতে সুরু করেছে।

হাঁ—I am sure about it. সেদিন রাত্রে ডিউটি সেরে ফিরছি—লোকটা ঠিক ঐ জায়গায় দাঁড়িয়েছিল। প্রথমটা তত মন দিই নি, পরে ট্রাম থেকে বাড়ির কাছে গিয়ে নেমেছি, রাত্রি তখন প্রায় এগারোটা। রাস্তা ও তার আশপাশ বেশ নির্জন। মনে হলো হঠাৎ, তখনও যেন লোকটা আমার পিছু পিছু আসছে। পিছন ফিরে থমকে দাঁড়ালাম। তাকিয়ে দেখতে পেলাম, কেবল ঐ লোকটা দূরে দাঁড়িয়ে। গা'টার মধ্যে কেমন ছম্‌ছম্ করে উঠলো।

নে নে চল্, যত সব আজগুবী চিন্তা! আমার আবার ডাক্তার গুপ্তের ওখানে রাত আটটায় sitting আছে—তুই বাড়ি যা, আমি একেবারে sitting শেষ করে যাবো—

আজই রাত আটটায় sitting ?

হাঁ, রাত আটটায়।

আমারও তো sitting আছে আজ রাত নটায়—কাবেরী বলে।

ঢং ঢং করে ডাঃ গুপ্তর চেম্বারের সুদৃশ্য ওয়ালক্লকটায় রাত্রি ঠিক আটটা ঘোষণা করলো। ডাঃ গুপ্ত একাকী চেম্বারের মধ্যে নিঃশব্দে কার্পেট-মোড়া মেঝের ওপরে পায়চারি করছে। এক-একবার ঘড়ির দিকে তাকায়।

তারপর এগিয়ে গিয়ে অদূরে স্ট্যাণ্ডের উপরে রক্ষিত রেডিও সেট্‌টা চালিয়ে দিল। গান শোনা যায় কলকাতা কেন্দ্রের।

আটটা বেজে ঠিক পাঁচ মিনিট। সুইং-ডোরের ওপাশ হতে নারীকণ্ঠ ভেসে এলো, আসতে পারি?

চট্ করে রেডিওটা বন্ধ করে দাঁড়ায় ডাক্তার, আসুন আসুন, কৃষ্ণা দেবী।

কৃষ্ণা কক্ষে এসে প্রবেশ করলো। বড় সুন্দর আজ মানিয়েছে সাধারণ একটি কালো রঙের শাড়ি ও টক্‌টকে লাল রঙের একটা ব্লাউজ গায়ে কৃষ্ণাকে।

রেডিও বন্ধ করলেন কেন? বেশ সুন্দর গানটা হচ্ছিল—

Duty first—স্মিতভাবে ডাঃ সুকুমার জবাব দেয়।

তারপর তখনও কৃষ্ণাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলে ওঠে, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন।

আমি আপনার কথা কিন্তু ঠিক মেনে নিতে পারলাম না ডাঃ গুপ্ত—হঠাৎ কৃষ্ণা বলে ওঠে।

বুঝতে পারলাম না আপনার কথা কৃষ্ণা দেবী।

ঐ যে একটু আগে বললেন—duty first ! জীবনে সর্বক্ষণ যদি কেবল dutyকেই first preference দিতে হয়, আপনি কি মনে করেন না তাতে অনেক ক্ষেত্রেই জীবনের অনেক বড় আনন্দকে বাদ দিতে হয়?

কেন? তা হবে কেন?

তা ছাড়া কি? মানুষের জীবনটা কি কেবল bundle of duties-ই? কেবল কর্তব্য আর কাজ করেই যাবো?

তা তো ঠিক আমি বলি নি মিস্ চৌধুরী। বলেছি আগে কর্তব্য। তার মানে এ নয়, জীবনের আনন্দটুকু বাদ দিয়ে কেবল কর্তব্যই করে যাবো—কেবল কাজই করে যাবো।

তাহলে অমন সুন্দর গানটা শোনা যাচ্ছিল, আপনি বন্ধ করে দিলেন কেন? কতক্ষণই বা সময় লাগত গানটা শেষ হতে!

তা নয় মিস্ চৌধুরী, আপনাকে আমি একটা কাজের জন্য আসতে বলেছি, আপনার সময়ের দাম আছে, তাই—

কৃষ্ণা হাসতে থাকে।

হাসছেন যে? সুকুমার প্রশ্ন করে।

আপনি ঠিক আমার বাবার মত। Duty সম্পর্কে he is so sincere—একটি মুহূর্তও তিনি কখনো অলসভাবে কাটান না।

আপনার বাবার সঙ্গে একদিন পরিচয় করবো।

না না—না—কতকটা যেন নিজের অজ্ঞাতেই আর্তস্বরে বলে ওঠে কৃষ্ণা। ডাক্তার একটু বিস্মিত হয়।

তিনি—

না, তিনি বাইরের কারোর সঙ্গে কখনো কথাবার্তা তো দূরে থাক, দেখাশুনা পর্যন্ত করেন না। এমনকি আমাদের দু বোনের সঙ্গেও দিনান্তে একটি দুটির বেশী কথা বলেন না।

কেন? বিস্মিত ডাক্তার প্রশ্ন করে।

কৃষ্ণা প্রসঙ্গটা তাড়াতাড়ি চাপা দিয়ে বলে ওঠে, সে কথা থাক। আজ কি করতে হবে বলুন।

ডাক্তার বুঝতে পারে, যে কোন কারণেই হোক কৃষ্ণা তার পিতার সম্পর্কে কোন আলোচনাই করতে ইচ্ছুক নয়।

অগত্যা ডাক্তার এগিয়ে গিয়ে অদূরে দেওয়াল-আলমারিটার ড্রয়ার খুলে, একটা খামের মধ্যে ভরা খানকয়েক হাতে আঁকা বিচিত্র ছবি বের করে আনে।

কৃষ্ণা প্রশ্ন করে, কি ওগুলো?

ডাক্তার বলে, ছবি। এবারে আপনি ঐ চেয়ারটার উপরে উঠে গিয়ে বসুন। এবার কাজ শুরু করা যাক।

ডাক্তারের হাতে খানকয়েক হাতে আঁকা ব্ল্যাক এণ্ড হোয়াইটের ছবি।

কৃষ্ণার চোখে-মুখে একটা কৌতুক ও আগ্রহ যেন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ছবিগুলো হাতের মধ্যে ধরে সুকুমার বলে, আজকের আমাদের sittingয়ের বিষয়বস্তু হচ্ছে এই ছবিগুলো। এই ছবিগুলো এক এক করে আপনাকে দেখতে বলবো এবং ছবিগুলো দেখে ছবিগুলোর বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রথম দৃষ্টিপাতেই যেমন যেমন আপনার মনে হবে বলে যাবেন—আমার বক্তব্যটা বুঝতে পারছেন তো?

কৃষ্ণা মৃদু হেসে ঘাড় নেড়ে জানায়, হাঁ।

কৃষ্ণা যে চেয়ারটার উপরে উপবেশন করেছে ঠিক তার সামনে, প্রলম্বিত একখানা প্রমাণ দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়েছে তার সর্বাঙ্গীণ ছায়া।

কৃষ্ণা সুন্দরী নয় শুধু, রূপে তিলোত্তমা যেন।

কৃষ্ণার অল্প দূরে টেবিলটার উপরে ছবিগুলো রেখে, একখানা ছবি হাতে নিয়ে টেবিলটার উপরে অর্ধদণ্ডায়মান ও অর্ধউপবিষ্ট ভাবে ডাক্তার ছবিখানা এগিয়ে ধরলো কৃষ্ণার দিকে, বলুন এই ছবিটা দেখে, কি দেখছেন এই ছবিতে?

কৃষ্ণা ছবিখানা দেখতে দেখতে বললে, এ আবার একটা ছবি নাকি? থুড়থুড়ে বুড়ো মানুষের মত যেন মনে হচ্ছে কি দুটো বসে!

বলুন তারপর? বলতে বলতে ডাক্তার একটা নোটখাতায় কি সব লিখে যায় পেন্‌সিল দিয়ে।

হাড়পাঁজরাগুলো জিরজির করছে, হাত-পাগুলো সরু সরু প্যাঁকাটির মত, বড় বড় চোখ, হাতের নখগুলো বাঁকানো বড় বিশ্রী—

আর কিছু?

আবার কি! বুড়োমানুষ না বলে ও দুটোকে—দুটো বাঁদরও তো বলতে পারেন। দুটো সাপও বলতে পারেন—গোলকধাঁধাও একটা বলতে পারেন।

ছবিখানা কৃষ্ণার হাত হতে নিয়ে দ্বিতীয় ছবিটা কৃষ্ণার দিকে এগিয়ে দিতে দিতে সুকুমার বললে, বেশ, এই নিন দ্বিতীয় ছবিখানা, বলুন এ ছবিটায় কি দেখছেন?

ছবিখানা দেখতে দেখতে কৃষ্ণা বলে, চমৎকার! এগুলো আবার কি? একটা বাদুড় না চাম্‌চিকে—মুখে একটা পোকা ধরেছে বোধ হয়, নিচে ঘাস, বুনো আগাছা না কতকগুলো কেঁচো কিলবিল করছে!

খাতায় নোট করতে করতে সুকুমার বলে, আর কিছু?

সত্যি বলুন না—চামচিকে না বাদুর ওটা?

ডাক্তার মৃদু হেসে কৃষ্ণার হস্তধৃত ছবিখানা নিয়ে টেবিলের উপর রেখে তৃতীয় ছবিখানা এগিয়ে দিয়ে বললে, বেশ, এখন বলুন তো কি দেখছেন?

তৃতীয় ছবিখানা হাতে নিয়ে কৃষ্ণা ছবিটা দেখতে দেখতে বললে, Rare collections তো আপনার ছবিগুলো ডাঃ গুপ্ত!

কি দেখছেন বলুন?

একটা ঘাসের চাবড়া—না একটা মাটির ঢেলা—হাঁ, তাই বলেই মনে হয়। উপরে কি একটা যেন বসে, একটা বোলতা না গুবরে পোকা! নিচে ওগুলো কি—আগাছা জন্মেছে অনেকগুলো, না?

বেশ। এই ছবিটায় কি দেখছেন এবারে বলুন? তৃতীয় ছবিখানা কৃষ্ণার হাত হতে নিয়ে চতুর্থ ছবিখানা এবারে ডাক্তার কৃষ্ণার হাতে তুলে দেয়।

কতকগুলো গোল সার্কেল (circle)—সার্কেলগুলোকে pierce করেছে একটা ধারালো ছোরা—

O. K.—আজ এই পর্যন্ত।

ছবিগুলো গোছাতে গোছাতে সুকুমার বলে, সোজা টেলিফোন অফিস থেকেই তো আসছেন, না?

হাঁ।

এক কাপ চায়ে আশা করি আপত্তি হবে না, কি বলেন মিস্ চৌধুরী?

না—না। এখন আবার চা—কৃষ্ণা আপত্তি জানায়।

টেবিলের উপরে রক্ষিত কলিং বেলটা বাজিয়ে ডাক্তার বলে, আমাদের হিন্দুশাস্ত্রে বলে দশ পা একত্র গেলেই নাকি বন্ধুত্ব হয়। দশ পা একত্রে আমরা না গেলেও অনেকদিন একত্রে বসে অনেক আলাপ আলোচনাই তো আমাদের পরস্পরের হয়েছে মিস্ চৌধুরী!

ভৃত্য জগদেও এসে কক্ষে প্রবেশ করল।

দু'কাপ চা, জলদি।

ভৃত্য জগদেও আদেশ পালনের সম্মতি জানিয়ে চলে গেল।

অবশ্য কাজের জন্যই আপনারা এখানে আসেন, কিন্তু কাজের মধ্য দিয়ে যে আলাপ-পরিচয়টা আমাদের মধ্যে গড়ে উঠেছে, তাকেও তো আপনি অস্বীকার করতে পারেন না। পারেন কি, বলুন?

না। মৃদু হাস্যে কৃষ্ণা জবাব দেয়।

তাহলেই দেখ, সামাজিক জীবনটাকে অস্বীকার করতে আমরা কেউই পারি না। তার অবশ্য আরো একটা কারণ আছে, আমাদের প্রত্যেকেরই জীবনের অনেকখানি জ্ঞাতেই হোক বা অজ্ঞাতেই হোক, ঐ সহজ সামাজিকতাটাই জুড়ে আছে।

হয়ত আপনার কথাই ঠিক ডাঃ গুপ্ত।

হয়ত কেন বলছো কৃষ্ণা, তোমার টেলিফোন অফিস ও সেখানকার ডিউটি দেওয়া ছাড়া তোমার কি একটা বাইরের সামাজিক জীবন নেই? কোথাও বেড়াতে যাও না, বন্ধু বান্ধবীদের বাড়ি, আত্মীয়স্বজনের বাড়ি, পার্টি, উৎসব বা সিনেমা থিয়েটার!

একমাত্র অফিসের কাজ ছাড়া বাইরে বড় একটা আমরা বেরই হই না। ক্বচিৎ কখনও ন-মাসে ছ-মাসে হয়ত এক-আধদিন সিনেমায় যাই—আর বন্ধু বা বান্ধবী নেই বললেই চলে।

বল কি! কখনো কি ইচ্ছা হয় না কারও সঙ্গে দুদণ্ড বসে আলাপ করতে, লেক বা গঙ্গার ধারে বা অন্য কোথাও বেড়াতে যেতে?

হয়, নির্জন গঙ্গার উপকূলে অথবা কোন নিরালা জায়গায় চুপটি করে একা একা এক এক সময় বসে থাকতে ইচ্ছা করে।

আচ্ছা কোন বন্ধু বা বান্ধবীই কি তোমার নেই?

বন্ধু বা বান্ধবীর কথা বলতে যেমন বইয়ে পড়ে থাকি বা শুনে থাকি তেমন কারও সঙ্গেই ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ পরিচয় তো আমার নেই—

বর্তমানে নেই, না পূর্বেও কোনদিন ছিল না?

এখনও নেই—আগেও ছিল না।

সে রকম ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব না হয় কোনদিন কারও সঙ্গে ছিল না, কিন্তু পরিচয়?

একটু যেন ইতস্তত করে কৃষ্ণা এবারে জবাব দেয়, না।

জগদেও ট্রেতে করে চা নিয়ে এল।

চায়ের একটা কাপ নিজে তুলে নিয়ে অন্যটা কৃষ্ণার দিকে এগিয়ে দিতে দিতে সুকুমার বলে, চা নাও—

তারপর হঠাৎ মৃদু হেসে সুকুমার বলে ওঠে, দেখেছ ইতিমধ্যে কখন এক সময় আপনাকে 'তুমি' বলতে শুরু করেছি—

তাতে কি হয়েছে, বয়সে তো আপনার থেকে কত ছোট, এবার থেকে আপনি আমাকে তুমিই বলবেন—

এ অধিকারটুকু যখন দিলে, আর একটা ছোট্ট অনুরোধ জানাই—

অনুরোধ বলছেন কেন, বলুন না কি বলবেন!

পরশু শনিবার প্রাচীতে খুব ভাল একটা বই আছে, যাবে?

একটু ইতস্তত করে কৃষ্ণা।

অবশ্য আপত্তি যদি থাকে—

না—না। পরশু তো আমার off-dutyই আছে, বেলা ৫টার পর থেকে অসুবিধা হবে না।

বেশ, তবে সেই কথাই রইলো, তুমি এখানেই এসো—ছ'টায় শো। চন্দ্রিমা কাফেতে we will have our tea—তারপর সেখান হতে যাব সিনেমায়।

সুইংডোরের ওপাশ হতে কাবেরীর কণ্ঠস্বর সহসা ভেসে এলো, আসতে পারি কি?

যুগপৎ দুজনই চমকে ওঠে।

ঠিক এমনি সময় চেম্বারের দেওয়াল-ঘড়িতে ঢং ঢং করে রাত্রি নয়টা ঘোষণা করলে।

কৃষ্ণা তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায়, উঃ! রাত ন'টা বাজে, আমি যাই।

আসুন, আসুন কাবেরী দেবী।

ডাঃ সুকুমার সাদর আহ্বান জানায়।

কৃষ্ণা সুইংডোর ঠেলে বের হয়ে যায়, কাবেরী এক পাশে সরে দাঁড়ায়, ক্ষণেকের জন্য উভয়েরই চোখাচোখি হয়।

কাবেরী দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়।

কৃষ্ণা হন্ হন্ করে বের হয়ে যায়।

কাবেরী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করলো।

কাবেরীর পরিধানে আজ অতি সাধারণ সাজসজ্জা। গেরুয়া রংয়ের খদ্দরের শাড়ি, লাল শাড়ির পাড়, গায়ে লাল রক্তবর্ণ ভয়েলের জামা। মাথার চুল বর্মিজ প্যাটার্নে বাঁধা। হাতে একগাছি করে সরু সোনার চুড়ি। দুই ভ্রূর মাঝখানে বড় একটি কাজলের টিপ ও চোখের কোণে সূক্ষ্ম সুর্মার টান।

বসুন কাবেরী দেবী—

বসতে বসতে কাবেরী বলে, আজ প্রথমেই একটা প্রতিবাদ জানাবো ডাঃ গুপ্ত—

প্রতিবাদ? স্মিতহাস্যে তাকায় সুকুমার কাবেরীর হাস্যোচ্ছল মুখের দিকে।

হাঁ প্রতিবাদ। আপনার চাইতে বয়সে আমি অনেক ছোট, আপনি আমাকে এবার থেকে তুমি বলবেন, আপনি বলে আর কথা বলতে পারবেন না।

বেশ তো। কিন্তু আধুনিক সমাজে আজ ঐটাই প্রচলিত যে—

তা হোক। তাছাড়া আমাদের পরস্পরের এতদিনকার পরিচয়েও কি অপরিচিতের দূরত্ব বা সঙ্কোচটা কেটে যায় নি?

অন্তত আমি তো কেটে গিয়েছে বলে মনে করি।

একটু পরে সুকুমার আবার বলে, কৃষ্ণা দেবীও আজ আমাকে সেই অনুরোধই জানিয়েছেন।

তাই নাকি!

হাঁ।

তাহ'লেই দেখুন আমরা দুজনেই কেউ আপনার ঐ আপনি সম্বোধনটা সহজভাবে নিতে পারছিলাম না। Businessয়ের ব্যাপারে টাকাটা না নিলে চলবে না যখন নিতেই হবে, কিন্তু এটা নিশ্চয়ই businessয়ের বাইরে পড়বে, কি বলেন? আমাদের সামাজিক সম্পর্কটা—

বেশ তাই হবে।

আজ আমার sittingয়ের বিষয়বস্তু কি বলুন?

বিশেষ কিছু না, কয়েকটা ছবি সম্পর্কে আপনার মতামত জানতে চাই আজ, it won't take much time!

ছবি! কিসের?

ঐ চেয়ারটার উপরে বসুন আগে—

কাবেরী উঠে গিয়ে নির্দিষ্ট চেয়ারটায় উপবেশন করে।

আচ্ছা এবারে আপনাকে আমি পর পর চারখানা ছবি দেখতে দেবো। ছবিগুলো দেখে প্রথম দৃষ্টিতেই আপনার যেমন মনে হবে বলে যাবেন, কেমন?

বেশ।

দেখুন এই ছবিটা—কি দেখছেন?

ছবিটা হাতে নিয়ে দেখতে দেখতে কাবেরী বলে, দুটি বৃদ্ধ—একেবারে থুড়থুড়ে বুড়ো, পরস্পরের পিঠের সঙ্গে পিঠ লাগিয়ে বসে আছে। কি রোগা বুড়ো দুজন! মনে হয় যেন দুর্ভিক্ষের দেশ থেকে উঠে এসেছে। ভাসা ভাসা উদাস চোখের দৃষ্টি।

বেশ। ধরুন এই ছবিটা—what do you find in this picture?

বাঃ, কি সুন্দর একটা পাখী! ডানা দুটি মেলে নীল আকাশে উড়ে চলেছে, ঠোঁটের মধ্যে রেখেছে বোধ হয় নীড় বাঁধবার জন্য একটি খড় বা কাঠি। নীড়ের মায়ায় পৃথিবীর যাবতীয় পশু, পাখী, প্রাণীই বোধ হয় এমনি ঘুরে মরছে!

আর কিছু দেখছেন ছবিটায়?

হুঁ। নীচে বোধ হয় ওগুলো ঘাস জন্মেছে, ঘাসের বুকে ছড়িয়ে আছে কতকগুলো শুকনো ঝরা পাতা।

নোটবইয়ে কাবেরীর কথাগুলো টুকতে টুকতে আর একখানা ছবি কাবেরীর দিকে এগিয়ে দিয়ে ডাক্তার বলে, দিন ও ছবিখানা, এইখানা দেখুন এবারে। বলুন এ ছবিটায় কি আছে?

চমৎকার একটি ফুল, দলগুলো মেলে ফুটে উঠেছে। ফোটা ফুলটির উপরে বসে আছে মধুলোভী একটি কৃষ্ণ ভ্রমর, নিচে ছড়িয়ে আছে দেখছি একরাশ ঝরা ফুলের পাপড়ি। তাই না ডাঃ গুপ্ত?

Good! দিন ছবিটা—now have this one! বলুন কি দেখছেন এইটায়?

চতুর্থ চিত্রখানা হাতে নিয়ে দেখতে দেখতে কাবেরী বলে, এটা কি! দাঁড়ান। হুঁ, মনে হচ্ছে কতকগুলো বৃত্ত। বৃত্তগুলোকে চিহ্নিত করছে আড়াআড়ি ভাবে একটি রেখা—সরল রেখা। কোন জিওমেট্রিক figure নিশ্চয়ই! জিওমেট্রি আমার ছিল বটে তবে ভাল বুঝতে পারতাম না কোন দিন। বরাবর তাই এড়িয়ে এসেছি ওটাকে—

ছবিখানা কাবেরীর হাত হতে ফেরত নিয়ে একটা খামের মধ্যে ছবিগুলো ভরে ফেলে সুকুমার।

আজকের sitting এইখানেই শেষ কাবেরী দেবী। হ্যাঁ, কৃষ্ণা দেবী চলে যাবার সময় তাড়াতাড়িতে তাঁর আজকের sittingয়ের পারিশ্রমিকটা নিয়ে যেতে ভুলে গেলেন—। বলতে বলতে ডাক্তার ড্রয়ার খুলে ১০ টাকার কুড়িখানা নোট বের করে কাবেরীর হাতে দিতে দিতে বলে, একশ টাকা কৃষ্ণা দেবীর, বাকী একশ টাকা আপনার।

কাবেরী বিনম্র কুণ্ঠার সঙ্গে ডাক্তারের হাত থেকে নোটগুলো নিতে নিতে সলজ্জ কণ্ঠে বলে, সত্যি এভাবে আপনার কাছ হতে টাকা নিতে কেমন যেন সঙ্কোচ অনুভব করি ডাঃ গুপ্ত—

সঙ্কোচ! কেন? পারিশ্রমিকের মূল্য হিসাবে টাকা নিচ্ছেন, দান-খয়রাৎ তো আর নয়—

তবু, সামান্য কথাবার্তা, আলোচনার জন্য এভাবে টাকা নেওয়া, সত্যি মনকে বড় পীড়া দেয়।

না, না—ও কথা ভাবেন কেন মিস্ চৌধুরী! সময়েরও মূল্য আছে একটা। বিশেষ করে আপনাদের ও আমাদের মত যাদের মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রম দিয়ে জীবিকা উপার্জন করতে হয়। এতে সঙ্কোচ লজ্জা বা দ্বিধার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না—শুধু তো আপনারাই নন, আরো দুজনে sitting দিচ্ছেন।

টাকা নেবো বলেই যখন আপনার কাছে sitting দিতে এসেছি, তখন ও সম্পর্কে মনে আজ দ্বিধা বা সঙ্কোচ জাগলেও অন্তত আমাদের মুখ দিয়ে সেটা প্রকাশ করা নিশ্চয় শোভা পায় না।

আলাপ-আলোচনার মধ্যে হঠাৎ একসময় কাবেরীই প্রশ্ন করে বসে, আচ্ছা ডাক্তার, যখনই আমি এখানে এসেছি তখন দেখি আপনি চেম্বারে বসে বই-ই পড়েন, দিনরাত খালি বুঝি লেখাপড়া নিয়েই থাকেন? কখনো কোথাও বেড়াতে বা সিনেমা দেখতে যান না?

সিনেমায় মাঝে মাঝে যাই ভাল বই থাকলে। আপনি বুঝি বেড়াতে, সিনেমা দেখতে খুব ভালবাসেন?

বেড়াতে, সিনেমা দেখতে খুবই ভাল লাগে তবে কোনটাই হয়ে ওঠে না তেমন এই যা দুঃখ।

কেন?

বাবা! তিনি পছন্দ করেন না। কারো সঙ্গে মেলামেশা করা, থিয়েটার, সিনেমা বা ক্লাবে যাওয়া এসব তিনি আদপেই পছন্দ করেন না। তবু মাঝে মাঝে লুকিয়ে-চুরিয়ে যে যাই না তা নয়, তবে—

কেন? আপনার বাবা—

বাবা একজন অদ্ভুত typeয়ের লোক। এত স্নেহ করেন, এত ভালবাসেন আমাদের—তবু in some respects he is so queer! নিজে তো কখনো কোথাও বেরই হন না, আমরা যে কোথাও বের হবো, তাও পছন্দ করেন না একেবারে।

কেন বলুন তো?

তা ঠিক জানি না—বলতে বলতে কাবেরী যেন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যায়, তারপর হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস যেন কাবেরীর বুকখানা কাঁপিয়ে বের হয়ে যায়।

থাক ওসব কথা ডাঃ গুপ্ত। এক এক সময় এ জীবন এমন ক্লান্ত ও দুর্বিষহ হয়ে ওঠে যে ইচ্ছা করে সব ভেঙেচুরে যেদিকে দু'চোখ যায় চলে যাই, কিন্তু বাবা—he is so affectionate, so tender—তাছাড়া বাবা কোন কারণে দুঃখ পাবেন, ভাবতেও পারি না—

কথার মোড়টা ফিরিয়ে দেবার জন্যে হঠাৎ সুকুমার প্রশ্ন করে, আচ্ছা মিস চৌধুরী, কি ধরনের ছবি দেখতে আপনার ঠিক ভাল লাগে বলুন তো?

আবার আপনি! জবাব দেবো না আপনার কথার—

Sorry! অনেক দিনের অভ্যাস কিনা—

Love picture আমার খুব ভাল লাগে—

রোমিও জুলিয়েট ছবিটা দেখেছেন?

দেখেছি, কিন্তু বড্ড বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়—

কিন্তু রোমিও জুলিয়েটের কাহিনী তো বিশ্বসাহিত্যের একটি প্রধান প্রেমের উপাখ্যান।

তা হোক। Effeminate love! তার চাইতে সিজার অ্যাণ্ড ক্লিওপেট্রা ঢের ভাল লেগেছে।

ঢং ঢং করে রাত্রি দশটা ঘোষণা করলে দেওয়াল-ঘড়িতে।

উঃ—রাত দশটা! তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায় কাবেরী।

চল তোমাকে খানিকটা এগিয়ে দিয়ে আসি—

না না—তার প্রয়োজন নেই, আমি একাই যেতে পারবো—কাবেরী কতকটা যেন ত্রস্ত পদেই ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল, শেষ বিদায়সম্ভাষণটুকুও জানাতে বোধ হয় ভুলে যায়।

কাবেরী ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যেতেই সুকুমার ঘরের রাস্তার দিকের জানালাটা খুলে দিয়ে সামনে দাঁড়াল।

খোলা জানালাপথে তাকিয়ে সুকুমার দেখলে, হন হন করে কাবেরী নির্জন রাস্তা ধরে হেঁটে চলেছে একাকী।

কাবেরী হন হন করে রাস্তা ধরে হেঁটে চলেছে। পিছনদিকে ফিরে তাকাবারও যেন কাবেরীর সময় নেই। কেবল মধ্যে মধ্যে রেডিয়াম দেওয়া ঘড়িটার উজ্জ্বল লেখাগুলোর দিকে তাকায়। কাবেরী পিছনপানে তাকালে দেখতে পেত বেশ কিছুটা দূরত্ব রেখে একটা কালো রংয়ের গাড়ি নিঃশব্দে শ্লথগতিতে ওকে পিছু পিছু অনুসরণ করে চলেছে।

থিয়েটার রোড পার হয়ে সার্কুলার রোড ও পার্ক স্ট্রীট যেখানে এসে মিশেছে সেখানে চৌমাথার সামনে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকাতেই একটা সবুজ রংয়ের ফ্লুইড্ ড্রাইভ্ ফোর্ডগাড়ি কাবেরীর পাশটিতে এসে দাঁড়াল, গাড়ির চালক সুবিমল।

মৃদুকণ্ঠে সুবিমল আহ্বান জানায়, এসো।

দরজাটা খুলে যায় গাড়ির, কাবেরী গাড়ির মধ্যে উঠে বসে।

গাড়ি আবার চলতে শুরু করে।

পশ্চাতের গাড়িটা এতক্ষণ কিছুটা দূরত্ব বাঁচিয়ে দাঁড়িয়েছিল, সেটাও এবারে চলতে শুরু করে ওদের গাড়িটাকে অনুসরণ করে।

এত দেরি হল যে? ভাবছিলাম ভুলে গেলে বুঝি!

মৃদু হাসি জেগে ওঠে কাবেরীর ওষ্ঠপ্রান্তে, ভুলিনি, ডাক্তারের সঙ্গে কথায় কথায় দেরি হয়ে গেল।

ডাক্তার যে বড্ড ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছে বলে মনে হচ্ছে!

ছিঃ, কি যে বল! লোকটা সত্যিই ভাল, I like him.

দেখো, বেশী ভাল লাগলে দেখা যায় ভালবাসায় পরিণত হয় কিন্তু—

তোমরা পুরুষরা ভারী jealous!

আর তোমরা মেয়েরা ভারী উদার, নয়?

আকাশে ইতিমধ্যে কখন কালো কালো মেঘ ঘন হয়ে উঠেছে। একটা ঠাণ্ডা বাতাস বইতে শুরু করেছে। কালো মেঘের বুকে বিদ্যুতের চকিত আলোর ঝলকানিও লক্‌লকিয়ে গেল দু'চারবার।

বৃষ্টি আসবে নাকি?

ক্ষতি কি আসুক না—সুবিমল জবাব দেয়।

কোথায় চলেছো?

যেদিকে দু'চক্ষু যায়। সত্যি আর ভাল লাগে না, এই লুকোচুরি আর অন্তহীন এই প্রতীক্ষা। চল সোজা গাড়ি চালিয়ে চলে যাই পৃথিবীর কোন এক নির্জন প্রান্তে বা—

তারপর?

তারপর বেঁধে নেবো ছোট একখানি ঘর, নিরজনে তোমাতে আমাতে বাঁধিব বাসা—

বৃষ্টি শুরু হয়, উইণ্ড-স্ক্রীনের উপরে বৃষ্টির ছাঁট এসে পড়ছে।

হঠাৎ সুবিমল ডাকে, প্রিয়া?

ও কি!

বাধা দিও না প্রিয়া, বাধা দিও না, ডাকার নেশায় পেয়েছে আজ আমায়—

রাত অনেক হলো, এবারে ফিরে চল—

হোক, শেষ হয়ে যাবে আজকের এই রাত্রি, আবার আসবে রাত্রি, রাত্রির পর রাত্রি। এমনি কত রাত্রি পার হয়ে যাবে আর আমরা চলবো এগিয়ে বন্ধনহীন যাত্রী। সেই কবিতাটি জান—

পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি,
আমরা দুজন চলতি হাওয়ার পন্থী
* * *
নাই আমাদের সঞ্চিত ধনরত্ন
নাইরে ঘরের লালন-ললিত যত্ন।
পথপাশে পাখি পুচ্ছ নাচায়,
বন্ধন তারে করি না খাঁচায়,
ডানা-মেলে-দেওয়া মুক্তি প্রিয়ের
কূজনে দুজনে তৃপ্ত
আমরা চকিত অভাবনীয়ের
ক্বচিৎ কিরণে দীপ্ত।

হঠাৎ সোঁ সোঁ শব্দে হাওয়া বইল, ঝম্‌ঝম্ বৃষ্টি হলো শুরু।

গাড়ির কাঁচটা তুলে দিতে দিতে কাবেরী বলে, জোরে বৃষ্টি নামল যে—

নামুক। নামুক — আকাশ ভেঙে নামুক—

বাইরে ঝম্‌ঝম্ করে বৃষ্টি পড়ছে, সোঁ সোঁ করে বইছে ক্ষ্যাপা হাওয়া। নিজের ঘরের খোলা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে সঞ্জীব চৌধুরী ক্রাচে ভর দিয়ে কবিতা আওড়াচ্ছেন। ঝোড়ো হাওয়ায় রুক্ষ এলোমেলো বড় বড় চুলগুলো উড়ছে। ঘরের কাগজপত্র, পর্দা উড়ে উড়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। সঞ্জীব চৌধুরী আবৃত্তি করছেন নিম্নস্বরে—

A dungeon horrible, on all sides round,
As one great furnace flamed ; yet from those flames
No light, but rather darkness visible.
Served only to discover sights of woe,
Regions of sorrow, doleful shades, where peace
And rest can never dwell, hope never comes
That comes to all ; but torture without end—

ঘুমাতে যায় নি অত রাত্রেও কৃষ্ণা, বাইরের ঘরে একাকী চুপটি করে বসে, একটা বাংলা উপন্যাস পড়ছিল কাবেরীর প্রতীক্ষায়।

এত রাত হয়ে গেল, এখনো কাবেরী ফিরে এলো না!

বইটা সোফার উপরে রেখে দিয়ে জানালাপথে গিয়ে দেখে এলো একবার, কাবেরী আসছে কিনা। সঞ্জীবের আবৃত্তি থেমে গিয়েছে, শোনা যাচ্ছে বেহালার সুর। সঞ্জীব বেহালা বাজাচ্ছেন।

দরজায় মৃদু করাঘাত শোনা গেল।

কে?

দিদি আমি কাবি, দরজাটা খোল।

কৃষ্ণা এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলে দিতেই কাবেরী এসে কক্ষে প্রবেশ করল।

কাবেরীর সর্বাঙ্গ ভিজা।

এত রাত করলি কেন?

হঠাৎ বৃষ্টি নামল দেখে ডাক্তার গুপ্ত আসতে দিলেন না। বলতে বলতে কাবেরী এগিয়ে যায় শয়নকক্ষের দিকে।

কাবি?

কি? কাবেরী ফিরে দাঁড়ায় কৃষ্ণার ডাকে।

কটা রাত হয়েছে খেয়াল আছে কি?

হাতে যখন ঘড়ি আছে এবং চোখের দৃষ্টিও যখন নষ্ট হয়ে যায় নি এখনো—

কাবেরী! কৃষ্ণা তীক্ষ্ণ চাপা কণ্ঠে ডেকে ওঠে।

দেখো দিদি—ফিরে দাঁড়ায় কাবেরী, আমার ব্যাপার নিয়ে তুমি একটু কম মাথা ঘামালেই সুখী হবো, mind your own business! বলে দৃঢ় পদবিক্ষেপে কাবেরী কক্ষান্তরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে কাবেরীর গমনপথের দিকে কৃষ্ণা।

পাশের ঘরে সঞ্জীবের বেহালা সুরের ঝঞ্ঝা তুলেছে তখন। কড়-কড়াৎ শব্দে মেঘের হুঙ্কার চারিদিক সচকিত করে গেল।

* * *

তাজ হোটেলে সেই রাত্রে।

দামী স্যুট পরিধানে এক দীর্ঘকায় পাঠান অধীর আগ্রহে একটি চেয়ারের উপরে বসে ঘন ঘন বন্ধ দরজাটির দিকে তাকাচ্ছে আর মণিবন্ধের ঘড়ি দেখছে।

এমন সময় পূর্ব-পরিচিত সেই পাঠানটি কক্ষে প্রবেশ করে উপবিষ্ট পাঠানকে দেখে সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে পড়ে, আপ—

হাঁ, কুছ পাত্তা মিলা ফৈয়াজ?

আভিতক ঠিক ঠিক পাত্তা নেহি মিলা জনাব। কৌসিস্ ত ম্যায় কর্ রাহা হুঁ।—

কর্ রাহা হুঁ—কর্ রাহা হুঁ! ও বাত ত বহুৎ দফে শুন্ চুকা। ফিরভি শুননা নেহি চাতা! জলদি হামে ও মিলনা চাহি, সমঝা—

লেকেন—

দেখো আউর দশ রোজ তুমহে time দিয়া যায় গা। দশ দিনকা অন্দর-অন্দর নেহি ও সামানকো ফায়সলা কর্ সেকে ত, হামেভি দোসরা কই নওজোয়ান কো এ কামকে লিয়ে ভেজনা পড়ে গা, সমঝা?

জি—

আচ্ছা ত ম্যায় চলতা হুঁ। রূপেয়াকা কোই জরুরৎ হো ত—

নেহি—

পাঠান ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

ফৈয়াজ ঘরের মধ্যে পায়চারি শুরু করে। নিম্নস্বরে আত্মগতভাবে বলে, ওহি—জরুর

ওহি হোগি। খপসুরৎ লেড়কী—

* * *

ডাঃ গুপ্তর চেম্বার।

ডাক্তারের চেম্বারে আজ বিশেষ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। সমগ্র কক্ষটি, দেওয়াল হতে শুরু করে মেঝে আসবাবপত্র সব কিছু কালো কাপড়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। ডাক্তারের টেবিলটির ওপরেও কালো টেবিলক্লথ বিস্তৃত এবং সেই টেবিলের উপরে সাদা হাড়ের তৈরী একটি অপূর্ব প্রতিমূর্তি ঃ একটি পুরুষ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, পশ্চাৎ হতে একটি নারীমূর্তি পুরুষটির পৃষ্ঠদেশ লক্ষ্য করে একটা তীক্ষ্ণ ছোরা তুলেছে।

ঘরের এক কোণায় জ্বলছে কেবল একটি লাল আলো স্বল্পশক্তির। রক্তাভ সেই আলোর দ্যুতি সমগ্র কক্ষখানিকে যেন ভৌতিক এক বিভীষিকায় থমথমে করে তুলেছে। টেবিলের একধারে লাউডস্পীকার-সংযুক্ত একটা গ্রামোফোনে একটি রেকর্ড প্লেটের ওপরে বসানো। সাউণ্ড বক্সটাও রেডি করা আছে, মুহূর্তে ইচ্ছামত রেকর্ডটি বাজানো চলতে পারে।

ডাক্তার মধ্যে মধ্যে হাতঘড়িটা দেখছে।

ঢং ঢং করে রাত্রি নয়টা বাজল। সুইংডোরে মৃদু করাঘাত শোনা গেল, আসতে পারি?

আসুন।

কক্ষে এসে প্রবেশ করল কাবেরী।

সাদা জরির পাড় দেওয়া কালো সিল্কের একখানি শাড়ি পরিধানে, গায়ে কালো রংয়ের সাদা জরির বর্ডার দেওয়া টাইট-হাতা ব্লাউজ। মাথার চুল বেণীবদ্ধ, বক্ষের দু'পাশে লম্বমান।

এ কি, ঘরে এমন আলো কেন?

বোস কাবেরী। ঐ চেয়ারটার ওপরে আরাম করে বোস।

কাবেরী নির্দিষ্ট চেয়ারটায় উপবেশন করে।

আবছা আলো-আঁধারিতে অস্পষ্ট ছায়ার মত ডাঃ সুকুমারকে দেখা যায়, গায়ে বোধ হয় একটা কালো অ্যাপ্রন। অ্যাপ্রনটার বুকের কাছে সোনালী জরি দিয়ে বীভৎস একটা ড্রাগনের মূর্তি তোলা।

ডাঃ গুপ্ত! ভীত একটা শঙ্কিত সুর যেন কাবেরীর কণ্ঠ হতে বের হয়।

Feeling nervous?

নার্ভাস্! না—মানে—

We won't take much time কাবেরী। আজ কয়েকটা প্রশ্ন পর পর তোমাকে করে যাবো, তুমি প্রশ্নের পিঠে পিঠে যেমন মনে হবে জবাব দিয়ে যাবে, বুঝতে পেরেছো?

ক্ষীণকণ্ঠে জবাব দেয় কাবেরী, হুঁ।

বেশ। Ready?

Ready।

ফুল?

গন্ধ।

কীট?

পতঙ্গ।

নর?

নারী।

চাঁদ?

জ্যোৎস্না।

রাত্রি?

দিন।

পতঙ্গ?

পাখী।

দর্পণ?

প্রতিচ্ছায়া।

ড্যাগার?

সোর্ড।

প্রশ্নোত্তরের পর কাবেরীর সর্বশরীরকে যেন অসহ্য একটা ঘুমের ক্লান্তি ও শৈথিল্য আচ্ছন্ন করে ফেলে। যে চেয়ারটার ওপরে কাবেরী এতক্ষণ বসেছিল, সেই চেয়ারটারই গায়ে অবশভাবে শরীরটা এলিয়ে দেয় ধীরে ধীরে।

ডাঃ সুকুমার চেয়ারের ওপরে এলায়িত কাবেরীর সামনে আরো একটু এগিয়ে এসে দাঁড়ায়।

কাবেরীর চোখের পাতা দুটো নিমীলিত।

সুকুমার কিছুক্ষণ চেয়ারের ওপরে এলায়িত, মুদ্রিত চক্ষু কাবেরীর প্রতি চেয়ে থেকে ধীরে মৃদুকণ্ঠে ডাকে, মিস্ চৌধুরী! কাবেরী দেবী!

উঁ! ক্ষীণকণ্ঠে সাড়া দেয় কাবেরী।

খুব ক্লান্তি বোধ করছো, না?

হাঁ, ঘুম আসছে—

ঘুমাও, ঘুমাবার চেষ্টা কর। হাঁ ঘুমাও—

একাগ্র তীক্ষ্ণদৃষ্টি ডাঃ সুকুমারের চোখে। অন্ধকারে জন্তুর চোখের মত জ্বল জ্বল করে ডাক্তারের চোখের মণি দুটো জ্বলছে যেন। গভীর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, কিন্তু পাথরের মতো স্থির, অচঞ্চল।

Sleep—sleep Kaberi!

কাবেরীর মাথাটা আরো একটু ঝুলে পড়ে।

ডাক্তারের কণ্ঠস্বর আবার শোনা যায়, কাবেরী?

উঁ! বহুদূর হতে ক্ষীণ কণ্ঠস্বর ভেসে এলো আবার।

এই পৃথিবীতেই এমন একটা জায়গা আছে যেখানে ছয় মাস থাকে দিনের আলো আর ছয় মাস থাকে রাত্রির জমাট কালো অন্ধকার। চারিদিকে শুধু জমাটবাঁধা ঠাণ্ডা বরফ। হু-হু করে বইছে যেখানে অবিশ্রাম হিমতীক্ষ্ণ ক্ষ্যাপা এলোমেলো হাওয়া। কোথাও সেখানে ফুলের কোন সমারোহ নেই—বর্ণের সাত রঙের খেলা প্রজাপতির মন ভোলানো অস্তিত্ব নেই। নেই মধুপের মধুগুঞ্জন। শীল মাছ, শ্বেত ভল্লুক আর বড় বড় শিংওয়ালা হরিণ। জনহীন জমাটবাঁধা

বরফের সেই নিঃশব্দ নির্জনতায় মাঝে মাঝে শোনা যায় শ্বেত ভল্লুকের ক্ষুধার্ত চিৎকার—

কথা বলতে বলতে ইতিমধ্যে একসময় ডাক্তার পার্শ্বেই রক্ষিত অ্যাম্প্লিফায়ার সংযুক্ত গ্রামোফোনে, ইংরেজী শব্দময় বাজনার একটা রেকর্ড যেটা আগে বসানো ছিল, সেটা চালিয়ে দিয়ে আবার বলতে থাকে ঃ আহারের কোন সংস্থান নেই—নেই কোন খাদ্যবস্তু, একমাত্র ঐ শীল মাছ ছাড়া। তাই ওদেশের লোকেরা তীক্ষ্ণ ধারালো ছোরা চালিয়ে শীল শিকার করে, হরিণ শিকার করে—ছুরি দিয়ে ফালি ফালি করে রক্তাভ হাতে—

সহসা রেকর্ড বেজে উঠলো মুহূর্তে যেন। ঝম্ ঝম্ করে তীব্র বাজনার শব্দ ঝঙ্কৃত, শব্দায়িত করে তোলে সমগ্র কক্ষখানিকে মুহূর্তে।

সহসা একটা আর্ত চিৎকার করে উঠে দাঁড়ায় কাবেরী, না! না! না!

কি হলো? কি হলো কাবেরী? ব্যস্ত হয়ে বলে ওঠে ডাঃ সুকুমার।

কাবেরী ততক্ষণে নিজের বিহ্বল, ভয়ার্ত ভাবটা সামলে উঠেছে। বড় রকমের একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বিষণ্ণ কণ্ঠে বলে, কিছু না। আমি বড্ড ক্লান্ত—feeling extremely tired! আমি এবারে যেতে চাই ডাঃ গুপ্ত।

চল, আমার ড্রাইভার তোমায় বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসবে—

না, না—তার কোন প্রয়োজন নেই, হঠাৎ কেমন মাথাটা ঘুরে উঠেছিল। আমি, আমি—আমি একাই বাড়ি ফিরে যেতে পারবো।

না, তোমাকে সত্যিই অত্যন্ত পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছে—তা ছাড়া ডাক্তার হিসাবে আমার একটা কর্তব্যও তো আছে—চল।

কাবেরী ডাক্তারের কথায় আর আপত্তি করে না।

আর আপত্তি করার মত শক্তিও তার ছিল না তখন।

নিচে এসে ড্রাইভারকে ডেকে ডাক্তার কাবেরীকে গাড়িতে তুলে দিল এবং ড্রাইভারকে ঠিকানা বলে দিল, মেম্সাবকো সিধা কোঠি পৌঁছা দেনা লছমন্।

জি সাব্।

আপনার ফিস্টা মিস্ চৌধুরী—

ডাক্তার পকেট হতে দশ টাকার দশখানা নোট গাড়ির জানালাপথে এগিয়ে দিল কাবেরীর দিকে।

কাবেরী কুণ্ঠার সঙ্গে নোটগুলো হাতে নেয়।

আচ্ছা Good Night!

Good Night। মৃদুকণ্ঠে কাবেরী জবাব দিলে।

গাড়ি চলে গেল।

কাবেরীকে বিদায় দিয়ে সুকুমার চেম্বারে আবার যখন ফিরে এলো, দেখলে কিরীটী একটা সোফার ওপরে বসে পায়ের ওপরে পা তুলে দিয়ে চোখ বুজে একটা বর্মা সিগার নিঃশব্দে টানছে। সিগারের তীব্র কটু গন্ধ কক্ষের বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। সুকুমারের পদশব্দে চোখ না খুলেই এবং দাঁত দিয়ে সিগারটা চেপে ধরে কিরীটী বললে, কাবেরী দেবী চলে গেলেন?

সুকুমার সিগারেট কেসটা পকেট হতে বের করে, একটা সিগারেট নিয়ে ওষ্ঠের ফাঁকে চেপে ধরে অগ্নিসংযোগ করতে করতে বললে, হুঁ। কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক কি হলো বুঝতে

পারলাম না। হঠাৎ কাবেরী অমন হিস্টিরিক ব্যবহার করলে কেন?

মনস্তাত্ত্বিক তুমি ডাক্তার, বোঝা উচিত ছিল। রোমাণ্টিক মাইণ্ড!

রোমাণ্টিক মাইণ্ড সে তো নিশ্চয়ই, কিন্তু—

আবার তবে কিন্তু কেন? ভাবুক মনের কল্পনাবিলাস বা স্বপ্ন—

কিন্তু একটা কথা—

কি?

So far তোমার কাজ excellent! চমৎকার। কিন্তু এবারে তোমাকে একটু ঘনিষ্ঠ হতে হবে।

মানে?

মানে—প্রেমের ব্যাপারে দুটির সঙ্গেই তোমার আরো একটু ঘনিষ্ঠ হতে হবে। যদিচ সেটা বিশেষ তোমার মত তরুণের পক্ষে জানি নিদারুণ risky খেলা—

কি বলছিস কি?

আহা অবোধ শিশুটি রে! কিছু যেন বুঝতে পারছেন না! শোন হে মনস্তাত্ত্বিক, অবশ্য মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি একটি ভগিনীর প্রেমে আপাততঃ তুমি যদিচ হাবুডুবু নদের নিমাই—দ্বিতীয়টির সঙ্গেও নদের নিমাইদের অভিনয় করতে হবে।

আঃ, কি হচ্ছে সব!

মধুর! মধুর! কিন্তু সত্য কথা বলতে ভাই, কে? কৃষ্ণা না কাবেরী? সুকুমার কিরীটীর প্রশ্নের জবাব দেবে কি, নিজেই এখনো মনের মধ্যে স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারে নি, সত্যি কোন্ জন ওর হৃদয়কে আকর্ষণ করেছে!

কৃষ্ণা, না কাবেরী?

হৃদয় যেন দুলছে একবার এদিক, একবার ওদিক। এক বৃন্তে দুটি ফুল যেন দুটি বোন। মনকে কখনো আকর্ষণ করে কাবেরী, কখনো কৃষ্ণা। দ্বিধা-সংশয়ে দোলে মন।

কি? জবাব দিচ্ছিস না যে? নির্বাক—হতবাক যে!

কি বলবো তাই ভাবছি—

হুঁ। তা বন্ধু, বলি সাবধান! পূর্বকালে শাস্ত্রে বিষকন্যা বলে এক ধরনের কন্যার কথা শোনা যায়। পাতঞ্জলির শাস্ত্রে খুঁজলেই পাবে। এবং শোনা যায় ঐ অপূর্ব, মনোমোহিনী কন্যাদের স্পর্শেই নাকি মৃত্যু ঘটতো। কন্যার দেহ হতে বিষ সংক্রামিত হতো হতভাগ্য রূপমুগ্ধ প্রেমিকের দেহে। কৃষ্ণা ও কাবেরী তোমার ওই দুটি মানসপ্রিয়ার একটি কিন্তু কলির বিষকন্যা। অতএব সাবধান বন্ধু — সাবধান—

কি আবোল-তাবোল সব বকছিস? এখুনি হয়ত কৃষ্ণা আসবে—তারও আজ রাত্রেই sitting দেবার কথা—

অর্থাৎ বলতে চাও, তুমি যাও! কিন্তু বন্ধু, দ্বিতীয় সিটিংয়েও যে আমাকে উপস্থিত থাকতে হবে!

সত্যি এমন সময় সিঁড়িতে পদশব্দ শোনা গেল।

ঐ বোধ হয় আসছেন কৃষ্ণা দেবী—অতএব কিরীটী এবারে তুমি অন্তরালে আত্মগোপন করো—বলতে বলতে মৃদু হেসে কিরীটী উঠে পর্দার আড়ালে আত্মগোপন করে।

কৃষ্ণা এসে কক্ষে প্রবেশ করল।

কৃষ্ণার দেহসজ্জায়ও আজ নতুনত্ব পরিলক্ষিত হয়—তবে সহজ ও সরল। কৃষ্ণারও আজ সাধারণ গেরুয়া রংয়ের শাড়ি ও ব্লাউজ পরিধানে—মাথার পর্যাপ্ত চুল বেণীর আকারে পীনোন্নত বক্ষের দুটি পাশে লম্বমান।

এসো—এসো কৃষ্ণা! সাদর আহ্বান জানায় ডাক্তার।

আজকের sittingয়ের সময়টা এত রাত্রে করলেন কেন ডাঃ গুপ্ত?

উপায় ছিল না।

একই পরিবেশের মধ্যে একই প্রশ্ন করা হয় কৃষ্ণাকেও।

বোস—দাঁড়িয়ে কেন কৃষ্ণা!

কৃষ্ণা উপবেশন করে কক্ষের চতুর্দিকে একবার তাকায়।

কি দেখছো?

কিছু না।

Ready?

Yes!

ফুল?

কীট।

নর?

বানর।

চাঁদ?

সূর্য।

রাত্রি?

অন্ধকার।

পতঙ্গ?

আরশুলা।

দর্পণ?

ছায়া।

ড্যাগার?

ডেথ।

পূর্বের মতই দপ করে উজ্জ্বল আলো জ্বলে উঠলো ঘরে ও বাজনা বেজে ওঠে। ক্ষণপূর্বের আলোছায়ার রহস্য দূরীভূত হলো।

কৃষ্ণা শুনতে থাকে বাজনাটা, কি অদ্ভুত সব আবোল-তাবোল প্রশ্ন আজ আপনি করছিলেন বলুন তো ডাক্তার? জোরালো গলায় কৃষ্ণা প্রশ্ন করে।

সুকুমার মৃদু মৃদু হাসতে থাকে, কৃষ্ণার প্রশ্নের কোন জবাব দেয় না।

আবার একসময় কৃষ্ণা প্রশ্ন করে, আমাদের নিয়ে যে গবেষণা আপনার চলছে, কতদূর successful হলো বলুন তো? এও কি কখনও সম্ভব নাকি, মানুষের মনের গতি বা সুপ্ত ও জাগ্রত প্রবৃত্তিকে অনুশীলন করে, এই প্রকারের বিভিন্ন দুজন মানুষ নর বা নারী একজন

হতে অন্যজনের identityতে আসতে পারবেন?

কেন সম্ভব নয় বল? ডাক্তার মৃদু হেসে কৃষ্ণার মুখের দিকে তাকায়।

ধরুন আমি একবার যদি কৃষ্ণা, আবার একবার কাবেরী বলে নিজের পরিচয় দিই এবং আমরা দুটি বোন পরস্পর পরস্পরকে যতটা closely study করবার সুযোগ বা সুবিধা পেয়েছি সেই হতে আমরা পরস্পর পরস্পরকে যতটা ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ ভাবে চিনি ও জানি সেদিক থেকে আমরা একে অন্যের কথাবার্তা, হাবভাব, চালচলন একই ভাবে প্রকাশ করলে, সাধ্য কি কেউ তা জানতে পারে?

তোমার কথা যে কতকটা সত্য অস্বীকার করি না কৃষ্ণা, কিন্তু এও ঠিক, প্রত্যেক মানুষের অবচেতন মনে যে প্রবৃত্তিগুলো জন্মগতভাবে সুপ্ত থাকে, অনেক সময় নিজের অজ্ঞাতে চিন্তায় ভাবে ও প্রবৃত্তিতে প্রকাশ হতে দেখা যায়। মানুষ তার পরিবেষ্টনী ও অবচেতন চিন্তার দ্বারা নিজের অজ্ঞাতেই অনেক ক্ষেত্রে চালিত হয়ে থাকে এ কথা কি অস্বীকার কর কৃষ্ণা! ডাক্তার তার বক্তব্য শেষ করে।

না।

তবে?

হঠাৎ ঢং ঢং করে রাত্রি বারোটা ঘোষণা করল দেওয়াল-ঘড়িতে।

কৃষ্ণা চম্‌কে উঠে দাঁড়ায়, উঃ অনেক রাত হয়ে গেল!

আমার গাড়ি তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে কৃষ্ণা।

না না, প্রয়োজন নেই, রাস্তা থেকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে নেবো'খন।

না। এত রাত্রে একাকী তোমার ট্যাক্সি করে যাওয়া উচিত হবে না, তা ছাড়া তোমার বাবা শুনলেও হয়ত অসন্তুষ্ট হবেন।

বাবা! হাঁ, তা হবেন—কথাটা যেন অন্যমনস্কের মতই বলে কৃষ্ণা কতকটা আত্মগতভাবেই।

তারপর একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস যেন কৃষ্ণার বুকখানা কাঁপিয়ে বের হয়ে আসে।

একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো কৃষ্ণা, অবশ্য যদি মনে কিছু না করো—

কি?

তোমার বাবার সম্পর্কে যখনই কোন কথা উঠেছে তুমি যেন—

না, না—ওকথা থাক ডাঃ গুপ্ত, আমি এবারে যাবো—

বলতে বলতে সহসা যেন উঠে দাঁড়ায় কৃষ্ণা।

হাঁ, চল—

কৃষ্ণাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে সুকুমার ড্রাইভারকে বলে, ওহি কোঠি পরই মেম্‌সাবকো ভি পৌঁছা দেনা লছমন্।

জি।

গাড়ি চলে গেল। অন্ধকারে ক্রমবিলীয়মান গাড়ির লাল টেইল লাইটটার দিকে তাকিয়ে করিডোরেই দাঁড়িয়ে থাকে সুকুমার।

সহসা কিরীটীর ডাকে ও চমকে ওঠে, এবারে আমিও গুড্‌নাইট জানাবো ডাক্তার।

যাবি?

হাঁ, ধ্যানের সময় আর যাই হোক দ্বিতীয় ব্যক্তির উপস্থিতিও ভাল লাগবে না।

একটা কথা কিরীটী—

বল্।

আচ্ছা কৃষ্ণা কাবেরী বোন দুটি সম্পর্কে তোমার ধারণা মানে মতামত কি?

দেখ্, তোর প্রতিদিনকার সিটিংয়ের রিপোর্ট পড়ে এবং ওদের সম্পর্কে তোর মতামত শুনে ও আজকের ব্যাপার দেখে আমরা একটা যাহোক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি।

কি?

কৃষ্ণা ও কাবেরী যমজ বোন দুটির মনোগত চিন্তা বা প্রবৃত্তির মধ্যে সুস্পষ্ট একটা পার্থক্য আছে স্বীকার করিস, না করিস না?

সে তো নিশ্চয়ই—কিন্তু—

হাঁ, পরস্পরের মধ্যে তাদের যতই similarity থাকুক না কেন, চিন্তাধারা ও প্রবৃত্তির দিক হতে কতকগুলো জায়গায় they distinctly differ from each other—অর্থাৎ একে অন্য হতে বিশেষ ভাবেই পৃথক। কিন্তু সে কথার আগে একটা প্রশ্ন, এদের এতদিন ধরে study করে নিজস্ব নিশ্চয়ই তোর একটা মতামত গড়ে উঠেছে—সেটা কি বল্ তো?

একটু যেন চিন্তা করে সুকুমার বলে, আমার মনে হয় কৃষ্ণা ও কাবেরী দুটি বোনের মধ্যে একজন অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, তীক্ষ্ণ ও চতুর—অথবা একেবারে নিরেট, আর তা না হলে একজন চতুর ও বুদ্ধিমতী হয়েও বোকার অভিনয় করে চলেছে এবং অন্যজন সত্যই হয়ত খুব নিরীহ, সরল, শান্তশিষ্ট ও একটু ভীতু প্রকৃতির।

তোমার কথা যে একেবারে মিথ্যা জোর গলায় বলতে পারি না ডাক্তার। অবশ্য আমার মনে হয় যাকে তুই অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও চতুরা বলছিস—তাকে আমি বুদ্ধিমতী ও চতুরা তো বলবোই সেই সঙ্গে অতিরিক্ত রোমাণ্টিক মনোভাবাপন্নও বলবো এবং মনের তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও রোমান্স দুটোতে মিলে কিছুটা মানসিক insanity develop করেছে বলবো।

Insanity—মানসিক বৈকল্য বা বিকৃতি?

হাঁ, এখানে insanity বলতে ঠিক আমি যা বলতে চাই তা হচ্ছে, মন অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও রোমাণ্টিক হওয়ার জন্য যে এক ধরনের মানসিক পরিবর্তন ঘটে তাই and nothing more। কিন্তু সে কথা যাক, definite প্রমাণ বা প্রুফ্ ছাড়া তো আজকের দিনে কাউকেই দোষী সাব্যস্ত করে কাঠগড়ায় এনে দাঁড় করানো যেতে পারে না। আমরা দুটি বোনের মানসিক ও প্রকৃতির পরিচয় কিছুটা পেয়েছি মাত্র—কিন্তু আসলে ঐ যমজ দুটি ভগ্নীর মধ্যে কোন্ জন সত্যি করে নিহত নরেন মল্লিকের সঙ্গে বিশেষভাবে ঘনিষ্ঠ ছিল সে সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত আমাদের বর্তমান সমস্যা এক পা-ও এগুচ্ছে না। যে জট ওদের দুটি বোনকে কেন্দ্র করে বর্তমান সমস্যাকে ঘোরালো করে রেখেছে সে জট এতটুকুও খুলছে না।

কোন উপায়ই কি খুঁজে পাচ্ছিস না?

পেতে হবেই কিন্তু তার আগে আরো একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় কাজের ভার তোর ওপরে আমি দিয়ে যেতে চাই।

আবার কি কাজ?

That mysterious father of কৃষ্ণা কাবেরী—হাঁ, কৃষ্ণা কাবেরীর বাপ ভদ্রলোকটি

যেন নিজেকে একটা কুহেলীর আবরণে সযত্নে ঢেকে রেখেছেন; যতটুকু আজ পর্যন্ত ভদ্রলোকটি সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে জেনেছি, লোকটা ঘরের মধ্যে দিবারাত্র নিজেকে বন্দী করে রাখে, কারো সঙ্গে দেখা করে না, কথা বলে না, মেয়ে দুটির উপরে অসাধারণ একটা আধিপত্য ভদ্রলোকের, যার মধ্যে হয়তো আছে একটু হিংসা, একটু ভয়, একটু সন্দেহ ও একটু আশঙ্কা এবং সব কিছু মিলে রহস্যঘেরা বিকৃত ও অস্বাভাবিক একটা সংশয়।

এত সংবাদ তুই পেলি কোথা হতে?

পাওয়াটাই যে আমার কাজ—হাঁ বলছিলাম, শুধু তাই নয়, ভদ্রলোকের একটা পা paralytic, ক্রাচে ভর দিয়ে চলাফেরা করেন, রবীন্দ্রনাথ, মধুসূদন, সেক্সপীয়ার, মিল্টন, কীটস নিয়ে ও মদ্যপান করে সময় কাটান। সব কিছুতে মিলে একটা মিস্ট্রি, একটা কিউরিও। একটু থেমে আবার বলে, হয়ত ঐ পিতার রহস্যের সঙ্গেই কন্যা দুটিরও অনেক রহস্যের সন্ধান পাওয়া যাবে—অতএব তোকে ঐ বোন দুটির কাছ হতে যেমন করে হোক পিতা ও মেয়ে দুটির মধ্যে আসল ও সত্যিকারের সম্পর্কটুকু খুঁজে বের করে আনতে হবে, পারবি না?

আমি তো বুঝতে পারছি না—কি করে তা সম্ভব হবে?

কেন? প্রেম দিয়ে বন্ধু — চিনিয়া লইও তোমার বঁধুর সে হৃদয়খানি।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল-এর বাগানে নিরিবিলি একটা বৃক্ষতল। অদূরে গাছের নীচে দাঁড় করানো আছে ডাঃ সুকুমার গুপ্তর গাড়ি। পাশাপাশি বসে সুকুমার ও কৃষ্ণা।

একটা ঘাসের শীষ দাঁত দিয়ে কাটছে আনমনে কৃষ্ণা। সাধারণ পিঁয়াজী রংয়ের ব্লাউজ ও শাড়ি পরিধানে কৃষ্ণার, মাথার চুল এলো খোঁপার আকারে বাঁ কাঁধের উপর লুটিয়ে পড়েছে।

কি ভাবছেন ডাঃ গুপ্ত? কৃষ্ণা প্রশ্ন করে।

তোমার কথার কোন জবাবই আমি দেব না, যতক্ষণ না তুমি আমায় 'তুমি' বলে সম্বোধন করছো।

বেশ, তুমি বললে যদি আপনি সুখী হন তুমিই বলবো।

কথাটা বলতে বলতে কৃষ্ণা কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে যায়।

কি ভাবছো? ডাক্তার প্রশ্ন করে।

ভাবছি এর চাইতে তোমার আমার পরিচয় না হলেই ভাল ছিল—

এ কথা কেন বলছো? এক-এক সময় তোমার হাবভাব দেখে মনে হয়, কি একটা গভীর সংশয় যেন দিবারাত্র তোমায় পীড়া দিচ্ছে। আমাকে সব কথা খুলে বল, এমনও তো হতে পারে তোমায় আমি সাহায্য করতে পারি।

না, না—তুমি জান না, তুমি তো জান না, কত বড় একটা দুঃস্বপ্ন দিবারাত্র ছায়ার মতোই আমাকে অনুসরণ করে ফেরে।

কৃষ্ণা আবার যেন অন্যমনস্ক, চিন্তিত হয়ে যায়।

শোন। সেদিনও তোমাকে বলেছি, আজও আবার বলছি—আমি তোমার বাবার সঙ্গে একবার—

না, না—কতকটা আর্ত আকুল কণ্ঠেই যেন বলে ওঠে কৃষ্ণা, ও কাজও তুমি করো না, বাবাকে তুমি চেন না। মত তো তিনি দেবেনই না, আর এ জীবনে আমাদের পরস্পরের এই

দেখাসাক্ষাৎ, এও তিনি চিরজীবনের মত বন্ধ করে দেবেন হয়ত।

কিন্তু চিরদিনই কি তাহলে আমাদের এমনি করেই লুকিয়ে-চুরিয়ে বেড়াতে হবে? প্রকাশ্যে তোমাকে কোনদিনই দাবী করতে পারবো না?

কলকাতা শহরের চৌরঙ্গী অঞ্চলে সুবিখ্যাত একটি ইংলিশ হোটেলের মধ্যে। আলোকিত হোটেলটি। বহু নরনারী একত্র বা জোড়া টেবিলে বসে পান ও আহার করছে। হোটেলের এক পাশে ইংরাজী বাজনা বাজছে নানা বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে।

একটি কর্ণার সীটে মুখোমুখি বসে কাবেরী ও সুবিমল, সামনের টেবিলের উপরে রক্ষিত কেক চা ইত্যাদি। সুবিমলের পরিধানে সাহেবী পোশাক।

চা পান করতে করতে সুবিমল বলছিল, সত্যি বলতে পারো, এমনি করে কতকাল আর আমাদের লুকিয়ে-চুরিয়ে বেড়াতে হবে?

কি করব বল! তবু দেখাশুনাটাও তো হচ্ছে—কাবেরী জবাব দেয়।

কিন্তু মেয়ে হয়ে যখন জন্মেছো, বিবাহ তো একদিন মেয়ের দিতেই হবে—তবে তোমার বাবার তোমাদের বিবাহে এত আপত্তিই বা কিসের?

বুঝতে পারি না, কেন বাবা কোন পুরুষের সঙ্গেই আমাদের মিশতে দেন না। এমন কি সেদিন রাত্রের sittingয়ের পর বাড়িতে ফিরে গেলে ডাক্তারের চেম্বারে যেতেও সেদিন হতে নিষেধ করে দিয়েছেন। তোমার সঙ্গে মিশি একথা ঘুণাক্ষরে জানতে পারলেও আর রক্ষা রাখবেন না।

কিন্তু এ অত্যাচার! সত্যি, ক্রমেই যেন এ আমার অসহ্য ঠেকছে। চলো—তার চাইতে না হয় আমরা বিবাহ করে তারপর তোমার বাবার কাছে—

না না, এত তাড়াতাড়ি বিবাহ আমাদের হতেই পারে না। বাবা—আমাদের বাবাকে তুমি জান না, তিনি আমাকে কিছুতেই তা হলে ক্ষমা করবেন না। আর তাঁর ক্রোধ! না না, সে আমি ভাবতেও পারি না। তুমি—তুমি আমাকে ক্ষমা করো।

এমন সময় দীর্ঘকায় ফৈয়াজ, পরিধানে সাহেবী পোশাক আর চোখে কালো কাচের চশমা, এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে হোটেলে এসে প্রবেশ করল। এবং সহসা কাবেরী ও সুবিমলের উপর নজর পড়তেই ওদের অল্প দূরে একটা চেয়ারে এসে উপবেশন করে ভারী গলায় ডাকল, বোয়!

বেয়ারা এসে সেলাম দিয়ে পাশে দাঁড়াল, টি অ্যাণ্ড স্যাণ্ডউইচ।

বেয়ারা সেলাম দিয়ে চলে গেল।

ফৈয়াজ একটা পাইপ ধরিয়ে ধূমোদ্গীরণ করতে থাকে।

তোমাদের দুই বোনেরই তোমাদের বাবা সম্পর্কে এমন একটা আতঙ্ক কেন বল তো? হাজার হলেও তিনি তো তোমাদেরই বাপ—তোমরা তাঁর সন্তান—আবার এক সময় সুবিমল বলে।

হাঁ, কিন্তু না—বাবার অমতে কোন কিছু করা অসম্ভব, তাছাড়া—বাকী কথাগুলো আর কাবেরী শেষ করে না, সহসা অদূরে পাঠানটির সঙ্গে চোখাচোখি হতেই কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করে কাবেরী।

অধীর কণ্ঠে বলে ওঠে, চল—আমরা যাই।

এখনি উঠবে? আর একটু বসবে না?

না চল। ওঠ। কাবেরী উঠে দাঁড়ায়।

বয়—বিল লাও। সুবিমল বেয়ারাকে ডাকে।

পরের দিন প্রত্যুষে। কৃষ্ণা কাবেরীদের ফ্ল্যাট্‌বাড়ির বাইরের কক্ষ।

কৃষ্ণা বসে বসে ঐদিনকার সংবাদপত্রটা পড়ছে, কাবেরী এসে কক্ষে প্রবেশ করল, চোখে মুখে বেশভূষায় সদ্য নিদ্রাভঙ্গের সুস্পষ্ট চিহ্ন। আজকাল কিছুদিন থেকে দুই বোনের নিবিড় একাত্মবোধ ও অন্তরঙ্গতার মধ্যে যেন একটা চিড় খেয়েছে। স্পষ্টভাবেই আজকাল যেন পরস্পর পরস্পরকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলে।

কাল অত রাত করে ফিরলি যে কাবি! অফিস থেকে বের হয়ে কোথায় গিয়েছিলি?

একটা হাই তুলে সোফাটার উপর বসতে বসতে কাবেরী বলে, গিয়েছিলাম—

গিয়েছিলি তা তো জানিই, কিন্তু কোথায় অত রাত পর্যন্ত ছিলি তাই তো জিজ্ঞাসা করছি।

ডাঃ গুপ্তর ওখানে।

সংবাদপত্র হতে মুখ তুলে বিস্মিত দৃষ্টিতে কৃষ্ণা কাবেরীর মুখের দিকে তাকাল।

Sitting ছিল বুঝি?

না।

তবে?

তবে আবার কি? পরিচিত লোকদের সঙ্গে একমাত্র কাজ না থাকলে কি আর দেখাসাক্ষাৎ করা যেতে পারে না? এমনি একটা social call!

বাবা না নিষেধ করে দিয়েছিলেন সেখানে যেতে! আশা করি ভুলে যাস নি এত তাড়াতাড়ি—

না, ভুলবো কেন? স্মৃতিশক্তি আমার এখনো এত ক্ষীণ হয় নি যে—

সহসা এমন সময় কক্ষের আর্শিতে সঞ্জীবের ছায়াপাত হলো।

ক্রাচে ভর দিয়ে ইতিমধ্যে কখন একসময় নিঃশব্দে ওদের অলক্ষ্যে সঞ্জীব দরজার গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছেন ওরা দুজনার একজনও টের পায় নি।

স্মৃতিশক্তি তোমার অবশ্য তা হলে প্রশংসনীয়ই বলতে হবে কাবেরী—

যুগপৎ দুই বোনই চম্‌কে ফিরে তাকালো এবং সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল।

অস্ফুট শব্দ দুজনারই কণ্ঠ হতে নির্গত হলো, বাবা!

সঞ্জীব ক্রাচে ভর দিতে দিতে কক্ষে প্রবেশ করলেন।

তাহলে আবার তুমি ডাক্তারের ওখানে গিয়েছিলে কাবি! আশ্চর্য, আমার আদেশ অমান্য করতে সাহস করো! সঞ্জীবের চোখের মণি দুটোতে অদ্ভুত একটা আলো দেখা দেয়, হিংস্র কুটিল।

সভয়ে কৃষ্ণা বলে ওঠে, বাবা!

কি? জবাব দিচ্ছ না যে? আবার সঞ্জীবের কণ্ঠ শোনা গেল। কঠিন নির্মম।

আমি—

সহসা বোমার মতই ফেটে পড়েন সঞ্জীব—আমি! আমি কি? কেন—কেন আমার নিষেধ সত্ত্বেও ফের আবার ডাঃ সুকুমার গুপ্তের চেম্বারে গিয়েছিলে? বল—জবাব দাও!

কাবেরী চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, কোন জবাব দিতেই বোধ হয় সাহস পায় না। সঞ্জীবের

দু'চক্ষুর তীক্ষ্ণ, অন্তর্ভেদী দৃষ্টি যেন কাবেরীর সর্বাঙ্গে দ্রুত পরিক্রম করছে। স্তব্ধতা। নীরেট পাষাণের স্তব্ধতা সমগ্র কক্ষখানি জুড়ে।

সহসা আবার সঞ্জীবের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, বেশ, আজই ডাক্তারের কাছে কালকের দরুন ১০০ টাকার একটা বিল দেবে—

বাবা! আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে কাবেরী।

হাঁ, আমার মেয়েরা বেকার নয় লোফার নয়, তাদের প্রতিটি মুহূর্তের দাম আছে।

বাবা—, আবার কাবেরী কি যেন বলবার চেষ্টা করে।

না, কোন কথাই আমি শুনতে চাই না। বিল তুমি দেবেই, হাঁ, এই আমার আদেশ—আমার আদেশ। বাধা দিয়ে সঞ্জীব বলে ওঠেন।

না না, আমি পারবো না—, আমি তা পারবো না! রুদ্ধ কণ্ঠে প্রতিবাদ জানায় কাবেরী।

পাষাণের মত দাঁড়িয়ে থাকে এক পাশে কৃষ্ণা।

পারবে না? গর্জন করে ওঠেন সঞ্জীব।

না, না—পারবো না। আমি পারবো না। বলতে বলতে স্খলিত পদে কাবেরী ঘর থেকে চলে যায়।

পারবে না? কাবেরী? কাবেরী? কাবেরী? বলতে বলতে সঞ্জীব মেয়েকে অনুসরণ করতে যেতেই এতক্ষণে কৃষ্ণা এসে বাপকে দু'হাতে আগলে দাঁড়ায়।

বাবা! বাবা—

কৃষ্ণা! থমকে দাঁড়ান সঞ্জীব।

বাবা—কাবি ছেলেমানুষ, ওকে ক্ষমা করুন। ও—

ক্ষমা! হাঃ হাঃ—পাগলের মতই উচ্চৈঃস্বরে হেসে ওঠেন সঞ্জীব।

ক্ষমা—সঞ্জীব চৌধুরী ক্ষমা কাউকে করে না। কিন্তু আমি জানতাম, এ আমি জানতাম। রক্তের ঋণ তোমাদের শোধ করতেই যে হবে—করুণার দেহরক্তের বিষ। জানতাম, আমি জানতাম—বিষ একদিন ফেনিল হয়ে উঠবেই, তাকে কেউ রোধ করতে পারবে না। কেউ রোধ করতে পারবে না।

বাবা—তুমি হাঁপাচ্ছ। বসো, এই চেয়ারটার ওপরে বসো।

কৃষ্ণা সঞ্জীবকে টেনে এনে চেয়ারটার উপর বসিয়ে দেয়।

কৃষ্ণা, শোন। এ বাড়ি ছেড়ে এ শহর ছেড়ে—যত শীঘ্র সম্ভব আমাদের চলে যেতে হবে।

চলে যাবে? কোথায়?

জানি না। শুধু এইটুকু জানি দূরে—দূরে—বহুদূরে।

কিন্তু—

শোন, তোমাদের আমি এতদিন বলি নি—তোমাদের অনুপস্থিতিতে দু'তিনদিন রাত্রে এ বাড়িতে নিশ্চয়ই চোর এসেছে—

চোর!

হাঁ, খস খস শব্দ শুনে আমি পাশের ঘরে গিয়েছি—ঘর অন্ধকার। আলো জ্বেলে কাউকে দেখতে পাই নি। কিন্তু আমি নিশ্চিত, কোন অজানা লোক আমাদের ছায়ার মতই অলক্ষ্যে অনুসরণ করে বেড়াচ্ছে। তার পদশব্দ আমি শুনতে পেয়েছি।

কিন্তু বাবা, তেতলার ফ্ল্যাটে যে আমরা—

বিশ্বাস কর কৃষ্ণা, এসেছে, নিশ্চয়ই কেউ এসেছে—তার স্পষ্ট পদশব্দ আমি শুনেছি। বেশী দিন নয়, নরেন মল্লিকের মৃত্যুর কিছুদিন আগে থেকেই এ ব্যাপারটা চলেছে—

নরেন মল্লিকের মৃত্যুর কিছুদিন আগে থেকেই! আর্তকণ্ঠে যেন চিৎকার করে বলে ওঠে কৃষ্ণা।

হাঁ।

ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে বোবাদৃষ্টিতে কৃষ্ণা তার বাবার মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

হাঁ বাবু—কর্তাবাবু মারা যাবার পর থেকে প্রায়ই রাত্রে উপরের তলায় বাবুর ঘরটার মধ্যে কি সব শব্দ শোনা যায়। কখনো মনে হয় কে যেন হেঁটে বেড়াচ্ছে, কখনো মনে হয় কেউ বা কারা যেন ঘরের সব জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করছে। শুধু আমিই নয় দাদাবাবু, হরি আর যদুও শুনেছে—

নরেন মল্লিকের বাড়িতে সকালবেলা সুবিমলের কক্ষে সুবিমল চেয়ারে বসে চা-পান করছে, সামনে দাঁড়িয়ে মধু।

মধুই কথাগুলো বলছিল।

কিন্তু এ কথা তো কই এতদিন তুমি আমাকে বল নি মধুদা!

এতদিন বলি নি দাদাবাবু, কিন্তু আর না বলে পারলাম না। হরি, যদু, ঠাকুর ওরা তো বেশ ভয় পেয়েই গেছে।

ভয় পেয়েছে?

হাঁ, ওরা বলাবলি করছিল কর্তাবাবুর অপঘাতে মৃত্যু হয়েছে—তাঁর প্রেতাত্মা—

Nonsense! সে যাক্, এক কাজ করো, আজ থেকে ওঘরে তালা দিয়ে রেখো।

বেশ।

কিরীটীর বাড়িতে। কিরীটী ও তালুকদারের মধ্যে কথোপকথন হচ্ছিল। সামনে ক্রিপয়ের ওপরে কাপে চা। মধ্যে মধ্যে ওরা চা-পান করছে।

সেই লোকটার উপরে বেশ ভাল করে নজর রাখা হয়েছে তো তালুকদার?

হাঁ, ভূপেন রথীন আর যতীন তিনজনকে নিযুক্ত করা হয়েছে। প্রায়ই লোকটাকে নরেন মল্লিকের বাড়ির আশেপাশে ও কাবেরীদের বাড়ির কাছে ঘোরাফেরা করতে দেখা যাচ্ছে।

ও লোকটার রহস্য সব জানতেই হবে। লোকটার বাড়ি, জাতি, পেশা—সব।

কিছু কিছু জেনেছি—লোকটা জাতিতে পাঠান, পেশা দালালী, ব্রোকার। থাকে Taj Hotelয়ে, একটা কালো রংয়ের সিডনবডি গাড়ি আছে। গাড়ির নং BLA 6786.

আর একটা কথা, সঞ্জীব চৌধুরীর অতীত ইতিহাসটা জানা গেল?

সামান্য—লোকটা এককালে আসামের এক চা-বাগানে ম্যানেজার ছিল এবং প্রচুর নগদ পয়সা ও স্থাবর সম্পত্তি—কলকাতার ওপরে তিনখানা বাড়ি ছিল। এককালের নামকরা আধুনিক সমাজের মেয়ে করুণা সেনকে বিবাহ করেছিল। বিবাহের পর স্ত্রী এখানেই থাকত। লোকটার মাঝখানের দীর্ঘ ১৫ বছরের ইতিহাসটা শুধু এখনো জানা যায় নি।

বেশ। আর সুবিমল? তার ওপরেও নজর রেখেছ তো?

হাঁ, এইটুকু বোঝা গিয়েছে, দুটি বোনের একটির সঙ্গে তার যথেষ্ট হৃদ্যতা আছে। কিন্তু দুটি বোনকেই হুবহু একই রকম দেখতে হওয়ায় আমার লোকেরা এখনো স্থির করতে পারে নি কোন্ বোনটি আসলে সুবিমলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠা। ভাল কথা, তোমাদের ডাক্তার গুপ্ত কি বলেন?

আপাততঃ সে বেচারীও হর্নস অব এ ডায়লেমাতে পড়েছে—হাসতে হাসতে জবাব দেয় কিরীটী।

কি রকম?

হাঁ, বেচারী এখনও ঠিক করেই উঠতে পারে নি কার প্রেমে সত্যি সত্যি পড়লো!

ইনটারেস্টিং তো!

তা একটু বৈকি, কিন্তু সে যাক্—একটা কথা—

কি?

নিহত নরেন মল্লিকের শয়নকক্ষটা আরো একবার ভালো করে তন্ন তন্ন করে আমাদের সার্চ করতে হবে অর্থাৎ সেই ঘরের আলমারি, ডেস্ক, ড্রয়ার ইত্যাদিগুলো।

হঠাৎ ডেস্ক, ড্রয়ার ইত্যাদি—কোন কিছু পাওয়া যাবে আশা করো নাকি?

একেবারে করি না বললে সত্যের অপলাপই করা হবে বৈকি।

যদি কিছু না মনে কর তো আরো একটু যদি বিশদভাবে খুলে বল।

কত কি-ই তো পাওয়া যেতে পারে, যেমন ধরো চিঠিপত্র কিংবা কোন মূল্যবান কাগজপত্র বা অন্য ধরনের কিছু—

হুঁ, বুঝেছি।

তিন

নিহত নরেন মল্লিকের গৃহ থেকে ফিরবার পর থেকেই কয়েক দিন ধরে কিরীটীর সমস্ত ঘটনার মধ্যে এবং মল্লিক-গৃহে যে যে মুখগুলি কিরীটী দেখেছিল তাদের মধ্যে বিশেষ একটি মুখ—যেটা তার দেখবার সৌভাগ্য হলো না, দীর্ঘ অবগুণ্ঠনের আড়ালে ঢাকাই ছিল, সেই অদেখা মুখখানির কথাই বার বার তার মনে পড়ছিল। মুখখানি কেমন কে জানে! তবে দেহের রং ও হাতের পায়ের ও দেহের গঠন দেখে মনে হয় মুখখানি নিশ্চয় ছিল সুন্দর।

কিন্তু সুন্দরই যদি মুখখানি হবে তবে তাকে সর্বদা সযতনে অবগুণ্ঠনে ঢেকে রাখবার উদ্দেশ্য কি? মল্লিক-গৃহে দীর্ঘ অবস্থানের মধ্যে একমাত্র মধু ব্যতীত কারো সঙ্গে তাঁকে কথা বলতে কেউ তো দেখে নি বা শোনেই নি, এমন কি কেউ তাঁর অবগুণ্ঠন উন্মোচিত মুখখানিও নাকি দেখে নি।

কেন? কি কারণে তাঁর নিজেকে ঐভাবে সযতনে আড়াল করে রাখবার প্রয়াস? বাড়ি বললেন বর্ধমানে এবং স্বামী তো নেই—এমন কি কোন আত্মীয়স্বজনও নাকি নেই তাঁর। এবং পেটের দায়েই যখন তিনি মল্লিক-গৃহে এসে চাকরি নিয়েছিলেন তখন, আর চাকরিই বা এখন করবেন না কেন? সুবিমলবাবুকে ইতিমধ্যে চাকরি ছাড়বার নোটিশ পর্যন্ত দিয়ে দিয়েছিলেন। চাকরি করবেন না আবার দেশেও ফিরে যাবেন কিনা বলতে পারলেন না।

কারো সঙ্গে মল্লিক-গৃহে কথা বলতেন না, অবগুণ্ঠনের অন্তরালে সর্বদা নিজেকে গোপন করে রাখতেন অথচ সর্ব ব্যাপারেই নজর ছিল তাঁর। এমন কি ঐ গৃহে কৃষ্ণা বা কাবেরীর যাতায়াতের ব্যাপারটাও তাঁর অজ্ঞাত ছিল না। আত্মগোপনেচ্ছু অথচ সজাগ।

কয়েক দিন ধরে অনবরত চিন্তার পর কিরীটী তার পকেট-ডাইরীটা খুলে সেদিন সন্ধ্যার দিকে সোফার ওপরে বসে নিজের ঘরে পাতা উল্টোতে লাগল।

এক জায়গায় এসে তার চোখের দৃষ্টি স্থির হলো।

সেই পাতার মধ্যস্থলে কালিতে একটি বৃত্ত আঁকা। বৃত্তের মধ্যস্থলে লেখা নিহত নরেন মল্লিক। এবং বৃত্তের গা থেকে তিনটি এ্যারো (তীরচিহ্ন) টানা। একটির মাথায় লেখা কৃষ্ণা, একটির মাথায় কাবেরী ও একটির মাথায় লেখা সঞ্জীব চৌধুরী। কিরীটী পকেট থেকে কলমটা বের করে বৃত্তটির গায়ে আর একটি নতুন তীরচিহ্ন আঁকলো এবং তার শেষপ্রান্তে লিখল বিনতা দেবী—রহস্যময়ী। সঙ্কেতময়ী।

সিঁড়িতে এমন সময় পদশব্দ পাওয়া গেল। ভারী জুতা পায়ে দিয়ে কে যেন দ্রুত উপরে উঠে আসছে।

পদশব্দ কিরীটীর পরিচিত এবং তাই বুঝতে কষ্ট হয় না আগন্তুক স্বয়ং রহমান সাহেব। রহমান সাহেব বেশ দ্রুতই এসে ঘরে প্রবেশ করলেন। চোখের দৃষ্টিতে স্পষ্ট একটা উত্তেজনার আভাস যেন চিক চিক করছে।

মিঃ রায়!

বসুন—বসুন রহমান সাহেব। কি ব্যাপার, কি এমন নতুন ব্যাপার হঠাৎ আবিষ্কার করলেন?

সত্যি নতুন আবিষ্কারই বটে। তবে বুঝলেন কি করে? বসতে বসতে রহমান সাহেব বললেন।

আপনার চোখ-মুখই যে তারস্বরে বলছে রহমান সাহেব।

কিন্তু আবিষ্কারটা কি বলুন তো?

এ কেসের ব্যাপারে একটা দামী ডকুমেণ্ট। বলতে পারেন হয়ত সূত্রও।

সূত্র!

হাঁ—একটা ডাইরী।

কার? মৃত নরেন মল্লিকের বোধ হয়?

আশ্চর্য! তাই। এই দেখুন—বলতে বলতে পকেট থেকে রহমান সাহেব একটা কালো মরোক্কোয় বাঁধা ছোট ডাইরী বের করে এগিয়ে দিলেন কিরীটীর দিকে।

আগ্রহে ও কৌতূহলে ডাইরীটা রহমান সাহেবের হাত থেকে নিয়ে কিরীটী ডাইরীটার পাতা উল্টাতে শুরু করলো। হাতের লেখাটি বিশেষ সুবিধার নয়। তবে নেহাত পড়তে কষ্ট হয় না। ইংরাজীতে লেখা ডাইরী। নিয়মিত সন তারিখ দিয়ে সুসংবদ্ধ ডাইরী নয়।

এলোমেলো খণ্ড খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত সব ঘটনা বা সংবাদ নোট করা হয়েছে ইংরাজীতে।

একের চার অংশ ডাইরীর পাতাগুলো পড়ে পড়ে চোখ বুলিয়ে উল্টিয়েও বিশেষ তেমন কোন আগ্রহের সৃষ্টি করে না বা মনের কোথাও কৌতূহল জাগায় না, তবু কিরীটী পাতাগুলো উল্টে যেতে থাকে।

হঠাৎ মাঝামাঝি জায়গায় একটা পাতায় এসে তার নজর পড়ল, লেখা আছে—কলকাতায় বাড়ি কিনলাম। সমীর এই বাড়ি কেনার ব্যাপারে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। বাড়িটা আমার পছন্দসই হয়েছে।

ব্যাস্ ঐ পর্যন্তই।

তারপর কয়েকটা পাতায় হিসাবের অঙ্ক। আবার কিরীটী উল্টে চলে পৃষ্ঠা। এবং সাত আট পৃষ্ঠা বাদে আবার এক জায়গায় এসে তার দৃষ্টি সজাগ হয়ে ওঠে। লেখা আছে—কি আশ্চর্য! হঠাৎ যেন চমকে উঠেছিলাম ওর কণ্ঠস্বরে। কত দিন হয়ে গেছে, তবু যেন ভুলতে পারি নি আদৌ সে কণ্ঠস্বর। অদ্ভুত আশ্চর্য মেয়ে! শোনা মাত্রই মনে হলো যেন এ সেই তারই কণ্ঠস্বর। দূর, এসব কি ভাবছি! কোথাকার কে তার ঠিক নেই। তাছাড়া কত সময় একের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে অন্যের কণ্ঠস্বরের তো কত আশ্চর্য মিলই না থাকে। এও হয়ত তাই।

এ আমার মনের ভুল নিশ্চয়ই।

আবার কয়েক পৃষ্ঠা পরে একটা পৃষ্ঠা। —আশ্চর্য! ওর কণ্ঠস্বর শুনলে এবং ওর চলা দেখলে তার কথাই আমার মনে পড়ে কেন? সে তো কবে মরে ভূত হয়ে গিয়েছে রেল গাড়িতে কাটা পড়ে। না না, এ আমার মনের ভ্রম ছাড়া আর কিছুই নয়। মিথ্যে কল্পনা।

কয়েক পৃষ্ঠা পরেই আবার এক পৃষ্ঠায়।

আশ্চর্য! ক'দিন থেকে কেবলই মনে হচ্ছে, কে যেন অনুক্ষণ আমাকে ছায়ার মত অনুসরণ করছে। বাড়িতে যতক্ষণ থাকি মনে হয় যেন ছায়ামূর্তি আমার পিছনে পিছনে ফিরছে। ডাক্তারের পরামর্শ নিয়েছিলাম। তিনি বললেন, নিউরোসিস। স্নায়ুর দুর্বলতা শেষ পর্যন্ত কিনা আমার মধ্যে দেখা দিল!

সত্যিই কি আমি দুর্বল হয়ে পড়েছি? না এটা বয়সের দোষ?

অন্য আর একটি পৃষ্ঠায়।

সত্যি, আশ্চর্য মুখের সৌসাদৃশ্য তো! যেন একেবারে তারই প্রতিচ্ছবি। কতকাল আগেকার কথা—স্মৃতির পৃষ্ঠা ঝাপসা হয়ে এসেছে, তবু সেই ঝাপসা পটে আজও যে দু'চারটে রেখা মনে আছে তার সঙ্গে যেন কোন পার্থক্য নেই।

নতুন আর একটি পৃষ্ঠা।

মাঝে মাঝে লোভ হচ্ছে বটে 'ক'কে নিয়ে ঘর বাঁধি। কিন্তু সাহস হয় না। এই জ্বলন্ত অগ্নিশিখাকে ঘরের মধ্যে হয়ত ধরে রাখতে পারব না। হয়ত বৃথাই পুড়ে ঝলসে যাবো। তার চাইতে এই ভালো। থাক সে অবন্ধনা। চট করে ছেড়ে আমাকে যাবে না। কারণ অর্থের খাকতি আছে। ও অবিশ্যি ভাবে যে আমি সেটা বুঝি বুঝতে পারছি না, কিন্তু জানে না তো ওদের মত মেয়েদের অন্তত আমার আর চিনতে বাকী নেই।

আমি ওদের ভাল করেই চিনি।

তারপর ডাইরীর আরো কয়েকটা পৃষ্ঠা কিরীটী উল্টে যায়, কিন্তু বিশেষ তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য চোখে পড়ে না। ডাইরীটা অতঃপর ধীরে ধীরে মুড়ে তাকালো রহমান সাহেবের মুখের দিকে।

এতক্ষণ রহমান সাহেব নিঃশব্দেই কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে বসে ছিলেন। কিরীটী ওঁর মুখের দিকে তাকাতেই বললেন, পড়লেন?

হাঁ। কোথায় পেলেন এ ডাইরীটা?

নরেন মল্লিকের বেড্‌রুমে বিছানার নিচে ছিল। ডাইরীটা মধুই গতকাল বিছানাপত্র রোদে দিতে গিয়ে পায়। তারপর আজ বিকেলে থানায় এসে দিয়ে গেল আমাকে।

মধু এসেছিল আজ থানায়?

হাঁ, বললাম তো সে দিয়ে গেল।

মল্লিক-গৃহের আর কোন নতুন খবর পেলেন?

নতুন খবর আর কি পাবো! পাবার মত আর আমাদের আছেই বা কি? বিনতা দেবীর কোন সংবাদ জানেন?

বিনতা দেবী!

হাঁ, উনি তো সেদিন বলছিলেন সুবিমলবাবুকে চাকরি ছাড়বার নোটিশ দিয়ে দিয়েছেন। তা তিনি চলে গিয়েছেন, না আছেন এখনো জানেন কিছু?

হাঁ, মধুই নিজে থেকে বলল বিনতা দেবী দিন পাঁচেক হলো চলে গিয়েছেন। তারপর একটু থেমে রহমান সাহেব প্রশ্ন করলেন, ডাইরীটা পড়ে কিছু বুঝতে পারলেন মিঃ রায়?

বিশেষ তেমন কিছুই আপাততঃ বুঝতে পারছি না। তবে একটা কথা আমার কি মনে হচ্ছে জানেন?

কি? রহমান সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন কিরীটীর মুখের দিকে।

নিহত নরেন মল্লিক সম্পর্কে আমরা আজ পর্যন্ত যেটুকু তার অতীতের জীবন থেকে জেনেছি সেটা সামান্যই।

কি রকম?

তাই। আমার মনে হচ্ছে নিহত নরেন মল্লিকের অতীত জীবনের পৃষ্ঠাগুলোতে এমন কিছু আছে যেখানে হয়ত তার এই আকস্মিক হত্যা রহস্যের কোন বড় রকমের একটি জটিল সূত্র রয়ে গিয়েছে।

অর্থাৎ?

অর্থাৎ আমি বলতে চাই নরেন মল্লিকের হত্যার ব্যাপারটা আকস্মিক নয় বা আচমকাও নয়। তার হত্যার বীজ রোপিত হয়েছিল অনেক অনেক দিন আগে। হত্যালিপ্সা মনের মধ্যে পোষণ করে হত্যাকারী সুযোগ ও সময়ের অপেক্ষায় ছিল মাত্র এবং তারই যোগাযোগ হচ্ছে হত্যার ব্যাপারটা। অবিশ্যি যোগাযোগটা পরে ঘটনাচক্রে বা আকস্মিকও হতে পারে। হত্যাকারীকে আমাদের খুঁজে বের করতে হলে যে উপায়েই হোক আমাদের ফিরে যেতে হবে নরেন মল্লিকের অতীত জীবনে। যেখানে ঘটনাচক্রে রোপিত হয়েছিল সেদিন হত্যার বীজ। তাই তো বলছিলাম, শুধু নরেন মল্লিকের গৃহই আর একবার ভাল করে খুঁজে দেখা নয়, কলকাতায় আসবার আগে যেখানে সে ছিল সেখানকার ইতিহাসও তো কম দিনের নয় নেহাৎ। সেটাও যথাসম্ভব অনুসন্ধান করে দেখতে হবে এবং কলকাতা ছেড়ে বর্মায় গিয়ে ব্যবসা ফাঁদবার আগেকার দিনের ইতিহাসটাও আমাদের সাধ্যমত সংগ্রহ করতে হবে। এমনি সে কলকাতা ছেড়ে ভাগ্যান্বেষণে বর্মায় গিয়েছিল, না অন্য কোনভাবে নিরুপায় হয়ে সে স্থানত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল!

সে সংবাদটা সংগ্রহ করা হয়ত বিশেষ কষ্টসাধ্য হবে না। রহমান সাহেব বলেন।

দুজনের মধ্যে যখন কথা হচ্ছে তালুকদার এসে ঘরে প্রবেশ করল।

এসো তালুকদার, কি খবর? কিরীটী আহ্বান জানাল।

নরেন মল্লিকের হত্যারহস্যের কোন কিনারা করতে পারলে রায়?

এতক্ষণ ধরে রহমান সাহেবের সঙ্গে সেই আলোচনাই করছিলাম।

কিন্তু ক'দিন তোমার কোন পাত্তাই ছিল না, ব্যাপার কি?

আর ভাই বল কেন? একটা রেলওয়ে ডাকাতির ব্যাপারে তদন্তে এলাহাবাদ পর্যন্ত ছুটতে হয়েছিল। আজ সকালেই ফিরেছি। অফিসে এসে ভাবলাম যাই তোমার সঙ্গে একবার দেখা করে আসি। যদি কোন নতুন ডেভেলপমেণ্ট হয়ে থাকে।

অন্ধকারে ক্ষীণ একটা আলোর শিখা ধরতে পেরেছি। মনে হচ্ছে এবারে হয়ত কিছুটা আরো এগুনো যাবে।

কথাটা শুনে তালুকদার সাহেব উৎসাহিত হয়ে ওঠে, বলে, বটে!

হাঁ, মধুর কাছ থেকে মৃত নরেন মল্লিকের একটা ডাইরী পাওয়া গিয়েছে।

সংক্ষেপে কিরীটী অতঃপর তালুকদারকে ডাইরীর ব্যাপারটা বলে যায়। এবং এও বলে ঐ সঙ্গে, তাই বলছিলাম রহমান সাহেবকে নরেন মল্লিকের অতীত জীবনের ইতিহাসটা যতটা সম্ভব খুঁজে বের করবার জন্য।

সমীরবাবুর কাছে ছাড়াও নরেন মল্লিকের কলকাতা ত্যাগ করে বর্মা যাবার পূর্বের ইতিহাস কিছু কিছু আমি সংগ্রহ করেছিলাম।

করেছিলে নাকি! কই এ কথা তো আমাকে জানাও নি!

হঠাৎ এলাহাবাদ চলে যেতে হলো তাই জানাতে পারি নি, তালুকদার বললে।

কেমন করে কার কাছ থেকে শুনলে?

সেও এক আশ্চর্য ব্যাপার।

কি রকম?

আমার বন্ধু ব্যারিস্টার অমল ঘোষকে তো তুমি চেন?

না চিনি না, তবে নাম শুনেছি তাঁর—ভাল প্র্যাকটিস।

এলাহাবাদ যাবার আগের দিন তার বাড়িতে একটা কাজে যেতে হয়েছিল আমাকে। সেখানেই সে কথায় কথায় আমাকে বলে নরেন মল্লিককে নাকি সে চিনত, একই সঙ্গে বিলেত থেকে তারা একই বছরে ব্যারিস্টার হয়।

সত্যি?

হাঁ।

তারপর?

কলকাতায় ফিরে এসে অমলের সঙ্গেই প্র্যাকটিস শুরু করে। তবে বাপের কিছু পয়সা থাকায় প্র্যাক্‌টিস্ জমানোর চাইতে স্ফূর্তির দিকেই তার নজর ছিল। একদল সোসাইটি মেয়ে পুরুষের সঙ্গে আজ পার্টি, কাল পিকনিক, পরশু চ্যারিটি শো এই সব নিয়েই থাকত। এমন সময় তার বাপ হঠাৎ মারা গেলেন সন্ন্যাস রোগে এবং তাঁর মৃত্যুর পর দেখা গেল মৃত বাপ বাজারে প্রচুর দেনা করে গিয়েছেন, যার ফলে মল্লিকের টানাটানি হওয়াই উচিত ছিল, কিন্তু তা তো হলোই না বরং পূর্বের মতই সে হৈ হৈ করে বেড়াতে লাগলো।

তারপর?

তারপর হঠাৎ বছর দুয়েক বাদে সে যে কোথায় উধাও হয়ে গেল বাজারে প্রচুর দেনা

করে কেউ জানতে পারল না। অনেকদিন পরে অবিশ্যি জানা যায় যে সে গিয়েছিল মগের মুলুকেই।

কিরীটী তালুকদারের কথা উদ্‌গ্রীব হয়ে শুনছিল। এবার মৃদু কণ্ঠে বললে, তা হলে নরেন মল্লিকের বর্মা যাবার পশ্চাতে একটা উদ্দেশ্য পাওয়া গেল। পাওনাদারদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া!

তা ছিল বৈকি। তাই তো অমল বলছিল, মল্লিক লোকটা যাদু জানে নচেৎ বর্মা থেকে পনের বছর পরে যখন ফিরে এলো, ব্যাগ ভর্তি করে সৌভাগ্য নিয়ে এলো কি করে? পনের বছরে কি করে সে ভাগ্যটাই ফিরিয়ে নিল?

তোমার ব্যারিস্টার ঘোষের সঙ্গে আমার একটু আলাপ করিয়ে দিতে পারো তালুকদার?

পারবো না কেন! কবে যেতে চাও বল!

যত শীঘ্র সম্ভব।

কাল চলো সন্ধ্যার পর।

বেশ তাই যাবো, তাহলে এবারে উঠি।

এসো। আর একটা কথা তালুকদার!

কি বল তো?

বলছিলাম শুধু নরেন মল্লিকের বাড়িটাই আর একবার ভাল করে সার্চ করা নয়, ঐ সঙ্গে কৃষ্ণা কাবেরীদের ফ্ল্যাট্‌টাও আর একবার ভাল করে সার্চ করা প্রয়োজন।

তার মানে সেই খোঁড়া সঞ্জীব চৌধুরীর ফ্ল্যাট্! না বাবা, সেখানে আমি যেতে পারবো না। ভদ্রলোক যেন খোঁচা খাওয়া বাঘের মত সর্বদা থাবা বাড়িয়েই আছে। যেতে হয় তুমি যাও।

বেশ, আমিই না হয় যাবো। হাসতে হাসতে কিরীটী বলে, তাহলে তুমি যাও মল্লিক ভবনে।

তা যাবো।

বিদায়ের আগে রহমান সাহেব বললেন, ডাইরীটা কি তাহলে আপনার কাছেই—

হাঁ রহমান সাহেব। ডাইরীটা আমার কাছেই থাক।

রহমান ও তালুকদার বিদায় নিল। কিরীটী কিন্তু উঠলো না। সে যেমন সোফার উপরে বসেছিল তেমনই বসে রইলো।

ডাইরীটা পড়বার পর থেকে এবং তালুকদারের মুখে নরেন মল্লিক সম্পর্কে আরো কিছুটা নতুন তত্ত্ব শুনে তার মনের চিন্তাধারাটা যেন সম্পূর্ণ একটি ভিন্ন পথে বইতে শুরু করেছে। এবং এতক্ষণে যেন সমস্ত ঘটনাগুলোকে নতুন করে পর পর সাজিয়ে নির্দিষ্ট একটি আকারে পৌঁছবার সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছে। কৃষ্ণা ও কাবেরীর ফ্ল্যাট্‌টা সার্চ করবার চাইতেও খোঁড়া সঞ্জীব চৌধুরীর সঙ্গে আলাপ করবার ইচ্ছাটাই কিরীটীর প্রাণে প্রবল হয়ে উঠছিল। খোঁড়া অর্থাৎ বিকলাঙ্গ হয়েও মেয়েদের প্রতি তার অদ্ভুত একটা আধিপত্য, বিশেষ করে তারা অপরূপ সুন্দরী, শিক্ষিতা ও উপার্জনশীল হওয়া সত্ত্বেও, যা এ যুগের মেয়েদের মধ্যে বড় একটা দেখাই যায় না এবং শুধু আধিপত্যই নয়, বাপের অমতে চলবার কৃষ্ণা বা কাবেরীর কারোই সাহস নেই। বাঘিনী যেমন বাচ্ছাদের আগলে রাখে সর্বদা তেমনি করেই খোঁড়া সঞ্জীব চৌধুরী তার মেয়ে কৃষ্ণা ও কাবেরীকে আগলে রেখেছে।

কিন্তু কেন এ সতর্কতা!

এর মূলে কোন সন্দেহ বা কোন রকম কম্‌প্লেকস্ সঞ্জীবেরই। আর মেয়েরাই বা বাপকে

অত ভয় করে চলে কেন? কলকাতা ছেড়ে হঠাৎ মেয়েদের নিয়ে চলে যাবার পর দীর্ঘ পনের বছরের সঞ্জীব চৌধুরীর ইতিহাসটা আজো জানা যায় নি। দীর্ঘ পনের বছর এক আধ দিনও নয়। একটা যুগ। দীর্ঘ পনের বছর। হঠাৎ যেন বিদ্যুৎচমকের মতই একটা সম্ভাবনা কিরীটীর মনের মধ্যে উঁকি দেয়।

কি আশ্চর্য! আশ্চর্য, সেও ঠিক পনের বছর! সঙ্গে সঙ্গে কিরীটীর কপালের কুঞ্চিত রেখাগুলো সরল হয়ে আসে। আনন্দে চোখের তারা দুটো চক্ চক্ করে ওঠে। আর দেরি নয়, কালই যেতে হবে তাকে সঞ্জীব চৌধুরীর ওখানে। কিরীটী উঠে গিয়ে ফোনের রিসিভারটা তুলে নিল। ডাক্তারই তাকে ঠিক সংবাদ দিতে পারবে। এবং যেতে হবে তাকে কৃষ্ণা ও কাবেরীর অনুপস্থিতিতে।

বেলা তখন ঠিক দ্বিপ্রহর। কিরীটী আগে হতেই সংবাদ নিয়ে জেনেছিল ঐদিন দ্বিপ্রহরে দুটি বোনেরই অফিসে ডিউটি আছে, দুজনের একজনও দ্বিপ্রহরে বাড়ি থাকবে না। আসবার পথে কিরীটী পার্ক সার্কাস থানা ইনচার্জ খোদাবক্সের কাছ থেকে দুজন লাল পাগড়ী সঙ্গে করে নিয়ে এল।

সোজা উপরে উঠে এসে কিরীটী দরজার কলিং বেল টিপতেই একটু বাদে একটি বৃদ্ধা গোছের ঝি এসে দরজা খুলে দিল।

কাকে চান বাবু?

মিঃ চৌধুরী, মানে বুড়ো বাবু বাড়িতে আছেন?

আছেন, কিন্তু তিনি কারো সঙ্গেই দেখা করেন না বাবু।

তুমি বুঝি এ বাড়িতে চাকরি করো, কি নাম তোমার?

আজ্ঞে সরলা।

দিনরাতের?

আজ্ঞে বাবু না, ঠিকে কাজ করি।

আমার বড্ড জরুরী দরকার, একটিবার বাবুর সঙ্গে দেখা না করলে চলবেই না। তুমি গিয়ে বাবুকে বরং একবার—

ঝি ভীত, শঙ্কিত ভাবে বলে ওঠে, ওরে বাবা! তাঁর কাছে কে যাবে বাবু? কদিন থেকে কর্তাবাবুর যা মেজাজ হয়ে আছে, আর তা ছাড়া বাবুর ঘরে ঢুকবারও আমার হুকুম নেই—

এমন সময় হঠাৎ ভিতর থেকে গম্ভীর গলায় কে যেন প্রশ্ন করল, কে? একটা খট্ খট্ শব্দও শোনা গেল ঐ সঙ্গে।

খট্ খট্ খট্! ...শব্দটা ক্রমেই এগিয়ে আসছে।

একটু পরেই ভিতর ও বাইরের মধ্যবর্তী দরজার উপরে দেখা গেল সঞ্জীব চৌধুরী ক্রাচে ভর দিয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন।

তীক্ষ্ণ, অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে সঞ্জীব প্রশ্ন করলেন, কে আপনি, এখানে কি চান?

কিরীটী বিনম্র কণ্ঠে বললে, এখানকার ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের এইচ. কিউ. থেকে আসছি, আমার নাম ধূর্জটি রায়।

ওঃ। তা এখানে আপনার কি প্রয়োজন?

আপনিই কি মিঃ সঞ্জীব চৌধুরী?

হাঁ।

তা দেখুন, প্রয়োজন বিশেষ একটা আছে বৈকি। কিন্তু সেটা তো এভাবে এইখানে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে বলা চলে না।

ওঃ। আসুন তাহলে ভিতরে।

কিরীটী কক্ষমধ্যে এসে প্রবেশ করল।—বসতে পারি?

বসুন।

কিরীটী একটা সোফার উপরে উপবেশন করল।

বলুন কি চান আপনি?

আপনার বাড়িটা একবার সার্চ করতে চাই—

সার্চ করতে চান, মানে?

হাঁ, বিশ্বস্ত সূত্রে আমাদের অফিস অবগত হয়েছে, আপনার বাড়িতে নাকি কতকগুলো জরুরী পলিটিক্যাল ডকুমেন্টস্ লুকানো আছে—

ভ্রূ কুঞ্চিত করে তীক্ষ্ণ, অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে সঞ্জীব চৌধুরী কিরীটীর দিকে বারকয়েক তাকালেন, কি বললেন পলিটিক্যাল ডকুমেন্টস্?

আজ্ঞে।

কিছুক্ষণ ক্রাচে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে সঞ্জীব যেন কি ভাবলেন, পরে গম্ভীর নিরুৎসুক কণ্ঠে বললেন, বেশ, আসুন। দেখুন খুঁজে।

কিরীটী প্রথমেই কৃষ্ণা কাবেরীর ঘরটা তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করা শুরু করলে।

কিরীটীকে এই ঘরে পৌঁছে দিয়ে সঞ্জীব তাঁর নিজের কক্ষে গিয়ে চেয়ারটার উপরে একটা বই খুলে নিয়ে বসলেন। কিরীটী কিন্তু কিছু তেমন খুঁজে পেল না কৃষ্ণা কাবেরীর ঘরে।

এ ঘরের যা কিছু দেখবার দেখে কিরীটী সঞ্জীবের কক্ষে এসে প্রবেশ করলো।

সঞ্জীব বই হতে মুখ না তুলেই প্রশ্ন করলেন, কি চাই?

আপনার ঘরটাও একবার দেখতে চাই, যদি কিছু মনে না করেন!

দেখুন—স্বচ্ছন্দে।

কথাটা বলে সঞ্জীব যেমন বই পড়ছিলেন তেমনি বই পড়তে লাগলেন।

কিরীটী বিনা বাক্যব্যয়ে তার অনুসন্ধান শুরু করে দিল।

প্রথমেই বইয়ের আলমারি ও অন্যান্য ড্রয়ার ও ডেস্কগুলো তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করেও কিরীটী তার অভীপ্সিত বস্তু খুঁজে পেল না।

কি হলো, কিছু পেলেন?

অ্যাঁ! কি বললেন?

বলছিলাম, পেলেন খুঁজে সেই পরশ পাথরটি—that valuable document of your most Honourable the ইংরাজ সরকার বাহাদুরের?

সঞ্জীবের কথায় চকিতে ফিরে দাঁড়াল কিরীটী। সঞ্জীবের চোখের দৃষ্টিও কিরীটীর উপরে

নিবদ্ধ, পাথরের মত স্থির দৃষ্টি, সমস্ত মুখের রেখায় যেন একটা সুকঠিন তাচ্ছিল্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

শুনুন মিঃ সি. আই. ডি. যে মুহূর্তে আপনি ঘরে এসে ঢুকেছেন আপনার আসল ইচ্ছাটা আমার কাছে আর অস্পষ্ট থাকে নি। আমি জানি কি জন্য আপনি এ সময় আমার বাড়িতে হানা দিয়েছেন। আপনি কেন, এ দুনিয়ায় কারো সাধ্য নেই একবার সঞ্জীব চৌধুরীর হাতে মুঠোর মধ্যে যা আসে তাকে ছিনিয়ে নিতে পারে। যাক সে কথা, আশা করি আপনার যা জানবার ছিল আপনি জেনেছেন!

কিরীটীর চোখে মুখে অদ্ভুত একটা হাসি ফুটে ওঠে, বুঝলাম, কিন্তু যাবার আগে আমি একটা জিনিস মাত্র আপনার এখান হতে নিয়ে যাবো—

কি? বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে তাকান সঞ্জীব কিরীটীর মুখের দিকে।

বিশেষ তেমন অবিশ্যি কিছুই নয়—আপনার হাতের ঐ বইটি—

এই বইটা! ফ্যালফ্যাল করে তাকান সঞ্জীব কিরীটীর মুখের দিকে।

হাঁ। বলেই মুহূর্তে যেন ছোঁ মেরে কিরীটী সঞ্জীবের কোলের উপর রক্ষিত বইটা তুলে নেয় এবং তাকে দ্বিতীয় বাক্যব্যয়ের অবকাশমাত্র না দিয়ে বলে ওঠে, যা আমি এখানে খুঁজতে এসেছিলাম পেয়েছি মিঃ চৌধুরী। ধন্যবাদ। আচ্ছা good bye!

কিরীটী তড়িৎ-পদে কক্ষ ত্যাগ করে চলে গেল।

সঞ্জীব চৌধুরী কতকটা যেন বোকা বনে গিয়েছেন এমনি ভাবে কিরীটীর গমনপথের দিকে তাকিয়ে থাকেন কিছুক্ষণ।

কিরীটীর বসবার কক্ষ। একা একা তালুকদার বসে বসে খানকয়েক চিঠি একটার পর একটা পড়ে যাচ্ছিল। কিরীটী এসে কক্ষে প্রবেশ করল।

আরে তালুকদার যে, কতক্ষণ?

তা আধ ঘণ্টাটাক তো হবেই—এই যে এই চিঠিগুলো নরেন মল্লিকের শয়নকক্ষের একটা আলমারির গুপ্ত ড্রয়ার থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।

কিরীটী সঞ্জীব চৌধুরীর ঘর হতে আনীত মোটা বইখানা পাশের টেবিলের উপরে রেখে একটা সোফার উপরে গা এলিয়ে দিতে দিতে বললে, প্রেমপত্র নিশ্চয়?

হুঁ।

প্রেমিকাটি কে?

সেটাই তো বুঝে উঠতে পারছি না।

কি রকম?

এই দেখো না—এগিয়ে দিল তালুকদার চিঠিগুলো ও খামগুলো কিরীটীর দিকে।

চিঠি ও খামগুলো উল্টে-পাল্টে দেখে কিরীটী মৃদু কণ্ঠে বললে, হুঁ, এখানেও অগাধ জল। প্রত্যেকটা চিঠির মধ্যেই দেখছি সম্বোধন করা হয়েছে প্রিয়া আমার প্রিয়তম বলে আর চিঠির নিচে নাম স্বাক্ষর করা হয়েছে ইতি তোমার 'ক' বলে। 'ক' অর্থাৎ কৃষ্ণাও হতে পারে। কাবেরীও হতে পারে। এদিকে আমি যে চিঠিগুলো উদ্ধার করে এইমাত্র আনলাম তাতেও দেখলাম লেখা আছে, 'প্রিয়তম আমার' সম্বোধনে, আর ইতি করা হয়েছে তোমার প্রিয় 'ন'

বলে। Again that blessed কৃষ্ণা কাবেরীর puzzle!

যা বলেছো, যে দিকে যাই ঐ কৃষ্ণা কাবেরী যেন পথরোধ করে দণ্ডায়মান—

কিন্তু যেমন করে হোক কৃষ্ণা কাবেরী রহস্য আমাদের সমাধান করতেই হবে। শেষের দিকে কিরীটীর কণ্ঠে যেন একটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সুর ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে।

রায়, এবারে দেখছি সত্যিই তোমায় হার মানতে হলো!

হার মানতে হলো! সিংহের মত গ্রীবা বেঁকিয়ে, কেশর ফুলিয়ে কিরীটী যেন সহসা সোজা হয়ে বসে, আমিও কিরীটী রায়, তালুকদার!

কিরীটীর চোখে, মুখে, সর্বদেহে এবং কণ্ঠস্বরে পর্যন্ত একটা ঋজু কাঠিন্য যেন ইস্পাতের মতই ঝিকিয়ে ওঠে।

হঠাৎ কিরীটী সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়।—এবার জাল গুটাবো। এগিয়ে গিয়ে কিরীটী ফোনের মাউথ-পিস্‌টা তুলে নেয়। হ্যালো! Put me to P. K. ...Please!

কে, ডাক্তার? আমি কিরীটী।

হাঁ। কি সংবাদ?

শোন—

মধুর কাছে অনুসন্ধান করতেই কিরীটী বিনতা দেবীর একটা সন্ধান পেয়ে গেল। কলকাতা ছেড়ে বিনতা দেবী আপাততঃ যান নি। পার্ক সার্কাসের কাছে একটা অখ্যাতনামা গলির মধ্যে একটা ঘর নিয়ে আছেন। মধু সেখানে মধ্যে মধ্যে যায়। বেচারী মধু তাকে সত্যিই ভালবেসেছিল। তাই আজও তার মায়াটা কাটিয়ে উঠতে পারে নি। মধ্যে মধ্যে সেখানে গিয়ে তার বাজারটা-আসটা করে দিয়ে আসে। মধু গলির নাম বা বাড়ির নম্বরটা বলতে পারল না, কিন্তু দূর থেকে কিরীটীকে দেখিয়ে দিল।

হঠাৎ মধু একটা প্রশ্ন করে কিরীটীকে, বিনতা মাকে আপনার কি দরকার বাবু? তাঁর এত খবর নিচ্ছেন কেন এত করে?

তোমার বাবুর চাকরি তো ছেড়ে দিলেন, তাই ভাবছিলাম যদি ওঁর অন্য কোথাও একটা ভাল ব্যবস্থা করে দিতে পারি!

আহা, তা যদি পারেন তো তাঁর বড্ড উপকার হয়। মা আমার বড় ভাল।

তা সুবিমলবাবু তো শুনলাম ওঁকে চাকরি থেকে ছাড়াতে চান নি, তবে উনি চাকরি ছেড়ে দিলেন কেন মধু?

কি জানি বাবু, সেটাই তো বুঝতে পারলাম না। তবে আমার মনে হয় ভয়ে।

ভয়ে! কিসের ভয়ে?

মধু এবার যেন একটু ইতস্ততঃ করতে থাকে।

কিরীটী আবার প্রশ্ন করে, কি ব্যাপার বল তো?

বাড়িটার মধ্যে বাবু মারা যাবার পর থেকেই কেমন যেন সব শব্দ শোনা যায়—

বল কি!

হাঁ বাবু, আর আর যারা সব আছে তারাও ইতিমধ্যে পালাই পালাই শুরু করেছে।

শব্দ! কি রকম শব্দ বল তো?

সে বাবু নানা রকমের শব্দ!

কিরীটীর ইচ্ছা ছিল কথাপ্রসঙ্গে মধুর ক্ষণপূর্বের বিনতা সম্পর্কে কৌতূহলের চিন্তাধারাটা একটু ঘুরিয়ে দেবে। কথাপ্রসঙ্গে সেটা আপনা থেকেই হয়ে যেতে কিরীটী যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

মধুর সঙ্গে আরো কিছুক্ষণ আলাপ করে তাকে বিদায় দিয়ে কিরীটী অন্য পথ ধরলো। পার্ক সার্কাস অর্থাৎ এ অঞ্চলেই কৃষ্ণা ও কাবেরীদের ওপর সর্বদা নজর রাখবার জন্য সে নিজের যে লোকটিকে নিযুক্ত করেছিল, ভাবল তার সঙ্গে একবার দেখা করে যাবে যখন এ অঞ্চলেই এসেছে। কৃষ্ণা কাবেরীদের ফ্ল্যাটটা সেখান থেকে বেশী দূরেও নয়।

বড় রাস্তাটার একদিকে ফ্ল্যাট বাড়িটা এবং ঠিক তার উল্টোদিকে ডিলুক্স রেস্তোঁরা। সন্ধ্যা সবে তখন উত্তীর্ণ হয়েছে। শীতের সন্ধ্যা। রেস্টুরেণ্ট ইতিমধ্যেই চা-পিয়াসীদের ভিড়ে সরগরম হয়ে উঠেছে।

রেস্টুরেণ্ট থেকে অল্প দূরে গাড়িটা পার্ক করে মন্থর পদে এগিয়ে চলল কিরীটী রেস্টুরেণ্টের দিকে। মাঝারি গোছের একটি ঘরের মধ্যে রেস্টুরেণ্ট। ভিতরের খরিদ্দারের ভিড় দেখে বোঝা যায় বিক্রিপত্র ভালই। ঘরের মাঝখানে গোটাচারেক টেবিল পেতে খদ্দেরদের বসাবার জন্য স্টীলের চেয়ার পাতা আর দেওয়ালের ধার ঘেঁষেও ব্যবস্থা আছে। দেওয়ালের চারদিকে চারটে ফ্লোরেসেণ্ট্ টিউব জ্বলছে। কাউণ্টারের একপাশে রেডিও সেটে শোনা যাচ্ছে পল্লীমঙ্গল আসর জমে উঠেছে। ঘরের বাতাসে পিঁয়াজ রসুন ও মাংস ভাজার একটা লোভনীয় মিশ্র গন্ধ।

ভিতরে প্রবেশ করে কিরীটী একবার চারদিকে তাকাতেই দৃষ্টিটা তার উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। দক্ষিণ কোণে মুসলমান বেশভূষায় মাথায় একটা শালের টুপী ২৫/২৬ বছরের একটি যুবক একাকী বসে চা-পান করছিল। কিন্তু চা-পানের চাইতেও তার মনোযোগ ছিল বেশী রাস্তার ঠিক অপর পারে কৃষ্ণাদের ফ্ল্যাটের মেইন দরজাটার দিকে। কারণ সেখান থেকে স্পষ্ট সব কিছু দেখা যায়।

কিরীটী এগিয়ে গিয়ে তার টেবিলেই একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল।

রেস্টুরেণ্টের একটি ছোকরা এগিয়ে এলো, কি দোব?

এক কাপ স্ট্রং করে চা দাও। ছোকরাটি চলে যেতেই চাপা গলায় কিরীটী তার সামনে উপবিষ্ট মুসলমান-বেশ-পরিহিত লোকটিকে সম্বোধন করে বলল, চন্দ্রনাথ খবর কি?

খবর আছে, স্যার। চা-টা খেয়ে সামনের পার্কে আসুন। আমি সেখানেই অপেক্ষা করছি। চন্দ্রনাথের চা-পান হয়ে গিয়েছিল। উঠে গিয়ে কাউণ্টারের দাম মিটিয়ে দিয়ে বের হয়ে গেল।

মিনিট পাঁচেক বাদে কিরীটীও রেস্টুরেণ্ট থেকে বের হলো। বড় রাস্তাটা ধরে একটু এগুলেই বাঁ-হাতে একটা ছোট ত্রিকোণা পার্ক। একটা সিগারে অগ্নিসংযোগ করে ধূমপান করতে করতে কিরীটী সেই পার্কের মধ্যে প্রবেশ করল।

কিরীটী এদিক ওদিক তাকাতে লাগলো চন্দ্রনাথের সন্ধানে।

হঠাৎ তার নজর পড়ল চন্দ্রনাথ তারই দিকে এগিয়ে আসছে।

আরো কাছে এসে চন্দ্রনাথ বললে, চলুন স্যার, ঐ বেঞ্চটায় গিয়ে বসা যাক।

বেঞ্চে তখন আর কোন তৃতীয় ব্যক্তি ছিল না। দুজনে পাশাপাশি বসল।

আপনার কাছে কালই আমি যেতাম আপনি না এলে। গত চার-পাঁচদিন ধরেই লক্ষ্য

করছিলাম রাত এগারটার পর একটি রিকশা ঠুং ঠুং করে ঐ ফ্ল্যাট বাড়ির গেটের সামনে এসে দাঁড়ায়। তারপর সর্বাঙ্গ চাদরে মোড়া ঘোমটা টানা একটি ভদ্রমহিলা রিকশা থেকে নেমে ঐ ফ্ল্যাট বাড়িটার মধ্যে প্রবেশ করেন এবং কিছুক্ষণ বাদে আবার বের হয়ে যান। কিন্তু কাল রাত্রে—

কি?

ভদ্রমহিলাকে গতকাল রাত্রে আমি ফলো করেছিলাম।

করেছিলে?

হাঁ। ফ্ল্যাটের মধ্যে ঢোকবার পর আমিও কিছুক্ষণ পরে ফ্ল্যাটটার মধ্যে গিয়ে ঢুকলাম।

তারপর?

দেখলাম সোজা তিনি কৃষ্ণা দেবীদের ফ্ল্যাটের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বদ্ধ দরজার গায়ে আঙুল দিয়ে আস্তে আস্তে তিনটি টোকা দিতেই একটু পরে কৃষ্ণা বা কাবেরী দুজনার মধ্যে একজন এসে দরজা খুলে দিলেন। তিনি ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই ভিতর থেকে দরজাটা আবার বন্ধ হয়ে গেল।

তার পর কি হলো?

তা ঠিক বলতে পারবো না, কারণ রাত দুটো পর্যন্ত অপেক্ষা করেও যখন দেখলাম ভদ্রমহিলা আর ফ্ল্যাট থেকে বের হয়ে এলেন না, আমি ফিরে গেলাম।

হুঁ! কিরীটীর ভ্রূদুটো কুঞ্চিত হয়ে ওঠে।

তাই আজ ভাবছিলাম, আজও যদি তিনি আসেন তো আবার তাঁকে ফলো করবো ও শেষ পর্যন্ত তাঁর জন্য অপেক্ষা করবো।

কিন্তু হয়তো আর তিনি ও-বাড়ি থেকে না-ও বের হতে পারেন।

আপনি বলছেন গত রাত্রে সেই যে তিনি ঢুকেছেন আর বের হন নি!

হাঁ।

হতে পারে। তবু দেখবো।

বেশ। তুমি অপেক্ষা করো। আমিও রাত্রে একবার আসবো।

আসবেন?

হাঁ।

নির্দিষ্ট সময়ের কিছু পূর্বেই কিরীটী এসে হাজির হলো এবং বাড়িটা থেকে কিছু দূরে একটা গাছের নীচে অন্ধকারে গাড়িটা পার্ক করে সব আলো নিবিয়ে অপেক্ষায় রইলো। চন্দ্রনাথ পিছনের সীটে বসে রইলো। কিন্তু রাত তিনটে পর্যন্ত অপেক্ষা করেও কোন রিকশা বা অবগুণ্ঠনবতী মহিলার দেখা পাওয়া গেল না। এবং রাত বারোটা নাগাদ ফ্ল্যাটের মেইন দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

কিন্তু কিরীটী এক রাত্রের বিফলতাতেই হতাশ হলো না। পরের রাত্রেও তেমনি অপেক্ষা করল। এবং সে-রাত্রিও নিষ্ফলেই গেল।

দেখা মিলল তৃতীয় রাত্রে।

রাত বারোটায় ঠিক গেট বন্ধ হয়ে গেল। এবং রাত যখন একটা হবে, কিরীটীর একটু

ঝিম মত এসেছে, পিছন থেকে পৃষ্ঠদেশে একটা মৃদু ধাক্কা খেয়ে সে সচকিত হয়ে উঠল।

এসেছে, স্যার!

অদূরে গীর্জার ঘড়িতে ঢং করে রাত্রি একটা ঘোষিত হলো।

কিরীটী তাকিয়ে দেখলো সর্বাঙ্গে একটা সাদা চাদর আবৃত একটি ভদ্রমহিলা নিঃশব্দ পদসঞ্চারে এগিয়ে আসছেন। মেইন গেটটার সামনে এসে দাঁড়াবার কিছুক্ষণ পরেই হঠাৎ গেটটা খুলে গেল। খোলা গেটের উপরে রাস্তায় লাইটপোস্টের আলোটার খানিকটা অংশ গিয়ে পড়েছে। এবং সেই আলোতেই দেখা গেল, খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণা কাবেরীর এক বোন।

আগন্তুক ভদ্রমহিলা ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে গেটের কপাট দুটো বন্ধ হয়ে গেল।

অপেক্ষমাণ এক-একটা প্রহর যেন এক এক যুগ বলে মনে হয়। তবু অপেক্ষা করেই থাকে কিরীটী—শেষ পর্যন্ত সে অপেক্ষা করবেই! এবং শেষ পর্যন্ত দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান হলো। রাত যখন ঠিক চারটে বেজে দশ, গেট খুলে গেল এবং একাকিনী সেই চাদরে আবৃত মহিলা বের হয়ে এলেন।

কিরীটীও সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থেকে নেমে তাঁকে অনুসরণ করল। পায়ে ছিল তার পুরু রবার সোলের দামী জুতো। নিঃশব্দে অগ্রগামী মহিলাকে অনুসরণ করে সে চলল।

নির্জন রাস্তা। একেবারে খাঁ খাঁ করছে। সম্মুখে পশ্চাতে ডাইনে বাঁয়ে জনমানবের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। শুধু রাত্রিশেষের অন্ধকারে এসেছে একটা দিকে অস্বচ্ছ আভাস। কিন্তু আর ওকে অগ্রসর হতে দেওয়া উচিত হবে না। এবারে একেবারে গলির মুখোমুখি এসে পড়েছে।

কিরীটী আচমকা তার চলার গতি অত্যন্ত দ্রুত করে অগ্রগামী মহিলাকে একেবারে ধরে ফেললে এবং ডাকলে, বিনতা দেবী দাঁড়ান!

চকিতে ভদ্রমহিলা কিরীটীর সেই ডাক শুনে ঘুরে দাঁড়ালেন।

বিনতা দেবী!

সুস্পষ্ট নারীকণ্ঠে এবারে জবাব এলো, আপনি কি আমাকে কিছু বলছেন?

হাঁ।

আপনি বোধ হয় ভুল করেছেন।

ভুল করেছি!

হাঁ। আমার নাম বিনতা নয়। সুস্পষ্ট প্রত্যুত্তর, কোন সংশয় বা জড়তা মাত্রও নেই কণ্ঠস্বরে।

না, আমি ভুল করি নি। তবে বিনতা দেবী ছাড়াও আপনার অন্য কোন যদি নাম থাকে তো বলতে পারি না। কিন্তু সে কথা থাক। আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা ছিল যে—

আমার সঙ্গে! কিন্তু আপনাকে চেনা তো দূরে থাক, কখনো দেখেছি বলেও তো মনে পড়ছে না আমার। বলতে বলতে হঠাৎই যেন মহিলা তাঁর মুখের উপরের অনতিদীর্ঘ অবগুণ্ঠনটা বাঁ হাত দিয়ে টেনে একেবারে কপালের উপরে তুলে দিলেন।

গলির ঠিক মুখেই একটা গ্যাসপোস্ট ছিল, অবগুণ্ঠন উন্মোচিত মুখখানির ওপর চকিতে সেই আলো এসে পড়ল। এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা চাপা আর্ত শব্দ কিরীটীর অজ্ঞাতসারেই তার

কণ্ঠ দিয়ে বের হয়ে আসে। কোন জীবিত মানুষের মুখ যে এত ভয়াবহ, এত কুৎসিত হতে পারে এ যেন কিরীটীর চিন্তারও অতীত ছিল।

শুধু ভয়াবহ ও কুৎসিত বললেই হয়ত সবটুকু তার বলা হয় না, বিকৃত একটা দুঃস্বপ্ন যেন! আগুন বা তীব্র অ্যাসিড জাতীয় কিছুতে পুড়ে গেলে বিশ্রীভাবে যা দাঁড়ায় ঠিক তাই।

মুখের রেখা বা গঠনটাই আছে শুধু। নাক চোখ মুখ ওষ্ঠ ভ্রূর কোনটারই চিহ্নমাত্রও নেই বললেও অত্যুক্তি হয় না। একটা চোখ আছে, দ্বিতীয়টা নেই।

যার হাঁটা, দেহের গঠন, হাত এবং পায়ের রং দেখে একদা কিরীটীর মনে হয়েছিল কতই না সুন্দরী মহিলা, তার অবগুণ্ঠনের তলায় যে এত বড় একটা ভয়াবহ বিভীষিকা ঢাকা থাকতে পারে বুঝি সে কল্পনাও করে নি।

বিস্ময়ের ঘোরটা কেটে যাবার পর কিরীটীর স্বাভাবিক অবস্থাটা যখন ফিরে এলো দেখলো অবগুণ্ঠিতা মহিলা ধীরে ধীরে সামনের গলির মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছেন।

নির্বাক কিরীটী দাঁড়িয়ে রইলো। একটি শব্দও আর তার ওষ্ঠপ্রান্তে জাগল না। ফিরে এলো যখন কিরীটী, গাড়ির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে চন্দ্রনাথ।

কি হলো স্যার?

বিশেষ তেমন কোন সুবিধা করতে পারলাম না চন্দ্রনাথ। গাড়িতে উঠে বসে স্টার্ট দিতে দিতে কথাটা মৃদু কণ্ঠে বললে কিরীটী।

আমি কি এখনো যেভাবে ফ্ল্যাটটার দিকে নজর রাখছিলাম রাখব?

হাঁ।

ঐদিন সন্ধ্যার ঠিক মুখে। টেলিফোন অফিস। অপারেটিং রুমে অপারেটাররা যে যার মাথায় হেডপিস লাগিয়ে কাজে ব্যস্ত।

হঠাৎ এক সময় কৃষ্ণা উঠে দাঁড়ায়, তার রিলিফ এসে গিয়েছে—সুধীরা নাগ।

রিলিফের হাতে কার্যভার তুলে দিয়ে কৃষ্ণা কাবেরীর দিকে ফিরে তাকিয়ে বললে, আমার duty off হলো, আমি চললাম কাবি, তোর তো দশটা পর্যন্ত ডিউটি আছে, না?

হাঁ। কৃষ্ণা অপারেটিং রুম থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

অপারেটিং রুমে কাজ চলেছে, মধ্যে মধ্যে অপারেটাররা নানা আলাপ-আলোচনা, হাসি-তামাশাও করছে।

নবনিযুক্ত দুটি মেয়ে ইতিমধ্যে পরস্পরের মধ্যে নিজেদের ব্যক্তিগত আলোচনা নিয়ে মেতে উঠেছে।

একজনের নাম মিস লীলা ঘোষ, অন্যটির নাম মিস সবিতা চ্যাটার্জী। আরো দু'চারজনও সেখানে এসে আড্ডায় যোগ দিয়েছে।

লীলা—জানিস ভাই সাবি, হিমাংশুটা একটা আসল ন্যাকা, কেবল শুনতে চাইবে তাকে আমি ভালবাসি কিনা?

সবিতা—বললেই পারিস, বাসি না।

লীলা—ওরে বাবা! তাহলে রক্ষে আছে? বলবে পটাসিয়াম সায়ানাইড্ খাবো।

মিস ঘোষ স্থূলকায়া, বয়সও প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি, এগিয়ে এসে বলে, অমন ঢের

বীরই সায়ানাইড্ খেয়ে থাকে, এই তো সবে শুরু, বলে কত দেখলাম!

নীরা মল্লিক বলে ওঠে, বলুন না মিস ঘোষ, আপনার সেই fifty second লাভারের কথাটা!

ওদিকে বোর্ডে তখন ঘন ঘন কল্ আসছে, শ্রীমতীদের সেদিকে কারো কিন্তু এতটুকু খেয়াল নেই।

মিস ঘোষ কানেকশনটা দিয়ে বলে, Number please?

ওধার থেকে জবাব আসে, কতক্ষণ ধরে তো বলছি, B. B. 4542—শুনতে পান না নাকি?

মিস ঘোষ কানেকশনটা কেটে আবার আলাপে রত হয়, সে এক মজার ব্যাপার! সে ছেলেটি এক ইন্‌সিওরেন্স্ অফিসে ১০০্ টাকা না কত মাইনের যেন কাজ করতো—

বোর্ডে আবার আলো জ্বলে ওঠে, কল্ এসেছে।

পাশের থেকে একজন অপারেটার বলে ওঠে, আঃ জ্বালাতন! বলুন না মিস ঘোষ এন্‌গেজড!

মিস ঘোষ আবার কনেকশনটা দিয়ে বলে, Number please!

Please put me B. B....

নম্বর বলা শেষ হবার আগেই মিস ঘোষ জবাব দেয়, Engaged! বলেই কনেকশনটা কেটে দেয়।

আর একজনও নম্বর চাওয়ায় বলে দিল, West line engaged!

আর একজনকে বললে, No reply!

আলাপ-আলোচনায় সব মশগুল।

যাকে No reply জবাব দেওয়া হয়েছিল, সে আবার কল্ করলে, শুনছেন? Clerk-in-chargeকে কনেকশন দিন তো?

সবিতা জিজ্ঞাসা করে, কি বলছে রে মলি?

মলি হাসতে হাসতে জবাব দেয়, ক্লার্ক ইন্‌চার্জকে কানেকশনটা দিতে বলছে।

চুপ করে থাক। সাড়া দিস না। কতক্ষণ ট্যাপ করবে করুক না।

এবার সুধীরা নাগের আলোটা জ্বলে উঠলো।

Number please!

দেখুন আপনাদের অপারেটর মিস চৌধুরী আছেন?

কি নাম বললেন? কৃষ্ণা চৌধুরী? সুধীরা কৌতূহলী হয়ে ওঠে।

হাঁ, কৃষ্ণা চৌধুরী। বলুন থিয়েটার রোড থেকে ডাঃ সুকুমার গুপ্ত কথা বলতে চাইছেন, অনুগ্রহ করে একটু ডেকে দিন না—

কথাটা কাবেরীর কানে গিয়েছিল, মিস নাগ জবাব দেওয়ার আগেই সে কানেকশনটা নিয়ে প্রশ্ন করলে, হ্যালো কে? ডাক্তার গুপ্ত?

হাঁ। মানে—আপনি, মানে—

হাঁ, কৃষ্ণা কথা বলছি, ব্যাপার কি?

কৃষ্ণা, আজ তোমার off কখন?

কেন বল তো?

বল না আগে, তারপর বলছি—

রাত দশটায়।

আজ ডিউটির পর আসবে এখানে?

যেতে পারি, কিন্তু আগে বল তো কেন?

বলতেই হবে!

নিশ্চয়ই।

আজ ভাবছি দুজনে গিয়ে কাফে-ডি-মুনে ডিনার খাবো, ইনডিয়ান ডিশ।

তারপর?

তারপর a long pleasure drive—

Oh how lovely ! কোথায়—কতদূর?

So long as the petrol tank is not empty ! রাত দশটায় ঠিক হাজির থাকবো গেটের সামনে—with my car—

O. K. !

ডাঃ সুকুমার গুপ্তের চেম্বার।

ডাঃ সুকুমার একটা সোফার উপরে আরাম করে গা এলিয়ে দিয়ে কৃষ্ণাকে ফোন করছিল, ফোন শেষ হতেই ফোনটা যেমন নামিয়ে রাখতে যাবে, সুইং ডোর ঠেলে কৃষ্ণা এসে প্রবেশ করল কক্ষে। পদশব্দে মুখ তুলে দরজার দিকে তাকাতেই সুকুমার চম্‌কে ওঠে, কতকটা আত্মগতভাবেই যেন উচ্চারণ করে, এ কি! তু-তুমি?

খুব আশ্চর্য হয়েছো তো! Surprise একটা রীতিমত দিয়েছি তো?

পরক্ষণেই ডাক্তারের মুখের দিকে তাকিয়ে কৃষ্ণাও যেন কতকটা বিস্মিত হয়ে বলে, ব্যাপার কি বল তো? এসে কি অন্যায় করলাম নাকি হঠাৎ এ সময়? ফিরে যাবো?

কৃষ্ণা সত্যি সত্যিই চলে যেতে উদ্যত হয়ে ঘুরে দাঁড়ায়।

আরে না না—চলে যাচ্ছো কেন—সুকুমার ততক্ষণে অভাবনীয় পরিস্থিতিটা সামলে উঠেছে, মৃদু হেসে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলে, চলে যাবে মানে? জান এই মুহূর্তে আমি তোমার কথাই ভাবছিলাম!

কৃষ্ণা মৃদু হেসে ফেলে, কিন্তু ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তোমার মুখের চেহারা যা হয়েছিল তাতে করে মনে হয়েছিল—

কি মনে হয়েছিল বল তো?

কি আবার! মনে হয়েছিল—মনে হয়েছিল আর যাকেই হোক ঠিক ঐ মুহূর্তটিতে আমাকে অন্তত যেন তুমি expect করো নি।

হা ভগবান! দিবানিশি যার ধ্যানে আছি নিমগন, সেও কিনা হেন বাক্য করে উচ্চারণ! কিন্তু দাঁড়িয়ে কেন কৃষ্ণা, বোস! চা আনতে বলি, কৃষ্ণা জবাব দেবার আগেই বেল্ বাজিয়ে জগদেওকে ডাকে সুকুমার।

জগদেও এসে কক্ষে প্রবেশ করে। সুকুমার বলে, জগদেও, জলদি চা!

সোফা হতে উঠে সুকুমার বলে, এক মিনিট—একটু বোস, আমি চট্ করে dressটা একটু বদলে আসি।

হঠাৎ? ড্রেস চেঞ্জের কি এমন দরকার পড়লো এ সময় শুনি?

হঠাৎ নয় দেবী, পূর্বপরিকল্পিত—এবং ইতিমধ্যে তুমি না এসে পৌঁছে গেলে হয়ত তোমাকে ফোন করতাম।

কিন্তু পেতে না, কারণ আজ সন্ধ্যা ঠিক ছটায় আমার duty off তুমি জানতে না—

দ্বিতীয়টা স্বীকার করি, কিন্তু প্রথমটা স্বীকার করতে রাজী নই।

মানে?

মানে যাকে মনেপ্রাণে ডাকা যায়, ফোনে তার সাড়া না পেলেও সশরীরে এসে সে হাজিরা দেয়—ইহাই বেদবাক্য কহে সুধীজন। সুকুমার কথাটা শেষ করে হাসতে থাকে।

তা বইকি! কক্ষনো না। রাস্তায় বের হয়েই হঠাৎ তোমার কথা মনে হলো, তাই চলে এলাম তোমার এখানে সোজা।

আসতেই হবে, জান তো আমি একজন সাইকোঅ্যানালিস্ট—একেই বলে টেলিপ্যাথি, এর আকর্ষণ মাধ্যাকর্ষণের চাইতেও বেশী। বেচারী নিউটন ভূমি আকর্ষণ নিয়েই মেতে ছিল—মনের আকর্ষণ যে ভূমির আকর্ষণের চাইতে শত-সহস্র গুণে বেশী টের যদি পেত তাহলে হয়ত—

থাক, আর আকর্ষণের কাজ নেই—যাও পোশাক বদলাতে যাচ্ছিলে তাই বদলে এসো।

হাঁ যাই—তুমিও ইতিমধ্যে বাথরুমে গিয়ে হাত-মুখটা ধুয়ে এসো না।

মন্দ বল নি। কৃষ্ণা উঠে বাথরুমের দিকে চলে গেল।

কৃষ্ণা ঘর হতে বের হয়ে যেতেই চট্ করে সুকুমার ফোনটা তুলে নিল ঃ হ্যালো, please put me to south...

ওপাশ হতে কিরীটীর কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, Kirity Roy speaking !

কে, কিরীটী? আমি সুকুমার।

কি ব্যাপার? হঠাৎ ফোন?

আজকেই—সব ready রাখবি, সুযোগ হঠাৎ মিলে গিয়েছে অভাবনীয়, এখন আর নয়, আবার মিলনী সঙ্ঘ থেকে তোকে ring করবো।

সুকুমার ফোনটা নামিয়ে রেখে বেশ পরিবর্তনের জন্য পাশের কক্ষে চলে গেল। কৃষ্ণা তখনও বাথরুম থেকে বের হয় নি।

একটু পরে জগদেও ট্রেতে করে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে কক্ষে প্রবেশ করল। ত্রিপয়ের ওপরে ট্রে-টা নামিয়ে রেখে চলে যেতেই কৃষ্ণা প্রসাধনান্তে কক্ষে এসে প্রবেশ করল গুনগুন করে গানের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে। কাপ সাজিয়ে দুধ চিনি দিয়ে সব প্রস্তুত করে রেখে কৃষ্ণা সুকুমারের অপেক্ষা করতে থাকে। এবং একটু পরেই সুকুমারও এসে কক্ষে প্রবেশ করল, পরিধানে তার ধুতি-পাঞ্জাবি।

এ কি, বসে আছো কেন? শুরু করলেই পারতে। সুকুমার কৃষ্ণার দিকে তাকিয়ে বলে।

এসো, আজ কি তোমার চেম্বার বন্ধ?

আজ যে রবিবার।

সত্যিই তো, মনে ছিল না।

চা-পান চলতে থাকে। হঠাৎ কৃষ্ণা প্রশ্ন করে, আচ্ছা অফিসে আমাকে ফোন করবে বলেছিলে কেন?

আজ তোমাকে এক জায়গায় নিয়ে যাবো।

কোথায়?

মিলনী সঙ্ঘে!

মিলনী সঙ্ঘ?

হাঁ, দক্ষিণ কলকাতার অভিজাত মহলের নর-নারীদের একটা ক্লাব বা মিলন কেন্দ্র। আজ সেখানে একটা বিশেষ অনুষ্ঠান আছে—বিখ্যাত আধুনিক গাইয়ে শ্রীমন্ত মুখার্জী সন্ধ্যায় গান গাইবেন। শুনেছো শ্রীমন্ত মুখার্জীর গান?

না।

সত্যিই শোনবার মত। যেমন মিষ্টি তেমনি সুরেলা কণ্ঠ।

কিন্তু—

ভয় নেই, রাত দশটার আগেই তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবো।...আর দেরি করলে হয়ত ওদিকে গানের পালা শেষ হয়ে যাবে, চল ওঠো।

কৃষ্ণা উঠে দাঁড়ায়। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে হঠাৎ কৃষ্ণা প্রশ্ন করে, আচ্ছা কিরীটী রায়কে তুমি চেনো সুকুমার?

চলতে চলতে হঠাৎ থম্‌কে দাঁড়ায় সুকুমার, কিরীটী রায়!

হাঁ, চেনো নাকি তাই বল না?

চিনি। কিন্তু কেন বল তো? তুমিও তাকে চেনো নাকি?

হাঁ, গতকাল পরিচয় হলো।

ও। তারপর হঠাৎ কি ভেবে প্রশ্ন করে, কেমন লাগল ভদ্রলোকটিকে?

আজ নয়, এ প্রশ্নের জবাব তোমাকে অন্য একসময় দেবো।

কিরীটীর বাড়ি। তালুকদার ও রহমানের সঙ্গে কিরীটী কথা বলছিল।

বেশ, রহমান জবাব দেয়, তাহলে আমি উঠি।

হাঁ, আসুন।

রহমান চলে যেতে উদ্যত হতেই কিরীটী সহসা রহমানকে বাধা দিয়ে বলে ওঠে, হাঁ ভাল কথা রহমান সাহেব, গতরাত্রি থেকেই নরেন মল্লিকের মার্ডার সম্পর্কে একটা কথা ভাবছিলাম আপনাকে জিজ্ঞাসা করবো, তা—

কি বলুন তো?

আচ্ছা নরেন মল্লিকের বাড়িটা ভাল করে সার্ভে করা হয়েছিল নিশ্চয়?

হাঁ, কেন বলুন তো?

আচ্ছা, মল্লিকের বাড়িতে মেইন গেট ছাড়া আর কোন প্রবেশ পথ আছে কিনা জানেন?

হাঁ, বাড়িটার পিছন দিকে ছোট একটা বাগান আছে, বাগানের প্রাচীরের ওপাশে সরু একটা blind lane আছে, সেই blind lane দিয়েই একটা দরজা আছে বাড়িতে প্রবেশ করবার দেখেছি।

আছে? যাক বাঁচা গেল। শেষ পর্যন্ত এসে ঐ puzzleটাই আমাকে বিব্রত করে তুলেছিল গত দুদিন ধরে, যদিচ ঐরকম একটা কিছুর সম্ভাবনা সম্পর্কে না জানা থাকলেও কতকটা sureই ছিলাম—It was so important—কিরীটীর কণ্ঠস্বরে উল্লাস যেন উপচে পড়ে।

আমি আপনাকে ঠিক follow করতে পারলাম না তো! মিঃ রহমান বলে ওঠেন।

বলেন কি রহমান সাহেব! খুনোখুনির ব্যাপারে একটা দরজা থাকার importance কি কম?

কিন্তু দরজাটায় তো সর্বদা তালা লাগানো থাকত—সেদিনও তালা লাগানোই ছিল, যতদূর মনে আছে আমার।

কোন্ দিক থেকে তালা লাগানো থাকতো, ভিতরের দিক থেকে না বাইরের দিক থেকে?

বাইরের দিক থেকেই—অবশ্য তালাটা কখনো সেইজন্য খোলাই হতো না।

ঠিক উল্টো। সেই কারণেই প্রায়ই তালা খোলা হতো এবং ঐ দ্বারপথেই নরেন মল্লিকের শয়নকক্ষে ঘোরানো সিঁড়ি অতিক্রম করে, পরে সেরাত্রে বাথরুমের দরজা দিয়ে খুনী প্রবেশ করেছিল।

কি বলছেন? আমরা তো পরের দিন সকালে গিয়ে বাথরুমের সে দরজাটা বন্ধ দেখেছিলাম! খুনী যদি ঐ রাস্তা দিয়ে প্রবেশ করে থাকবে তবে—

তবে সে কোন্ পথে পলায়মান হলো, এই তো আপনার প্রশ্ন?

হাঁ, মানে—

পালিয়েছে সে সদর দ্বার দিয়ে।

য়্যাঁ! তালুকদার এবার বলে ওঠে।

হাঁ, easiest and shortest route! খুনীর গৃহে প্রবেশ, হত্যা ও পলায়ন পর্যন্ত solved! বাকী এখন আয়নাটার ভাঙা কাঁচ and why at all that particular knife was used and not a bullet! এটার জবাব অবশ্য আশা করি কৃষ্ণা ও কাবেরীর কাছ থেকেই পাবো।

একটু পরে কিরীটী আবার রহমানকে লক্ষ্য করে বলে, আচ্ছা রহমান সাহেব আপনি তাহলে আসুন।

রহমানের প্রস্থানের পর কিরীটী তালুকদারকে বললে, চলো একবার মিলনী সঙ্ঘের আশপাশ চক্কর দিয়ে আসা যাক্।

সেখানে আবার কেন?

চলই না।

মিলনী সঙ্ঘ। দক্ষিণ কলকাতার অতি আধুনিক ও আধুনিকাদের মিলন কেন্দ্র ঐ সঙ্ঘ। সুকুমারের গাড়ি যখন মিলনী সঙ্ঘের বাড়ির পোর্টিকোর নিচে এসে দাঁড়াল রাত্রি তখন সোয়া সাতটার বেশী নয়। সামনেই আলোকোজ্জ্বল হলঘরটি বহু নর-নারীর কণ্ঠস্বরে গুঞ্জনমুখরিত তখন। হাসির হল্লা উঠছে।

গাড়িটা একপাশে পার্ক করে সুকুমার কৃষ্ণাকে নিয়ে হলঘরে প্রবেশ করতেই যুগপৎ সকলেরই মুগ্ধ ও বিস্মিত দৃষ্টি প্রথমে কৃষ্ণাকে পরিক্রম করে পরে সুকুমারের ওপরে নিবদ্ধ

হলো। সকলেই সুকুমারের পরিচিত। অথচ কৃষ্ণাকে ইতিপূর্বে কেউ দেখে নি এবং চেনেও না। দু'চারজন তরুণ সাদর আহ্বান জানায়, সুস্বাগতম্—সুস্বাগতম্ ডাঃ গুপ্ত!

একটি হালফ্যাসনদুরস্ত, এনামেলিং করা শ্যামবর্ণা তরুণী এগিয়ে এসে আধো আধো ন্যাকামিভরা কণ্ঠে বলে ওঠে, হ্যালো সুকুমার, naughty boy, where been so long!

ব্রিফলেস ব্যারিস্টার মিঃ নির্মল মিটার দুর্দান্ত সাহেব, ওষ্ঠাধরে ধৃত সরু পাইপে সিগারেট। একটু কাছ ঘেঁষে এসে মৃদু চাপা কণ্ঠে বলে, who is this dream, my dear Gupta?

আঃ, কি হচ্ছে মিত্র! চাপা তর্জন করে ওঠে সুকুমার।

সুকুমার এরপর কৃষ্ণাকে সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়, আমার বান্ধবী কৃষ্ণা চৌধুরী।

হঠাৎ একসময় সেই এনামেলিং-করা তরুণীটি সুকুমারের সামনে এগিয়ে এসে চাপা কণ্ঠে বলে, আমাদের লতা সেনকে তা হলে—

সুকুমার ভ্রূ-কুঞ্চিত করে একবার সেই তরুণীটির দিকে তাকিয়ে হলের অন্যদিকে কৃষ্ণাকে নিয়ে সরে যায়।

একটু পরেই শ্রীমন্ত মুখার্জীর গান শুরু হলো। আধুনিক এক গীতিকারের একটি আধুনিক গান প্রথমে গাইতে আরম্ভ করেন শ্রীমন্ত মুখার্জী। একটি বিরহের সঙ্গীত।

গানের সুরে সবাই মশগুল, কৃষ্ণাও মুগ্ধ হয়ে যায় শ্রীমন্ত মুখার্জীর গান শুনে, মুগ্ধবিস্ময়ে সে একপাশে বসে গান শুনতে থাকে। ঐ অবসরে নিঃশব্দে অন্যের অলক্ষ্যে সেই ঘর থেকে বের হয়ে পাশের ঘরে গিয়ে ছোট একটা টেবিলের উপরে রক্ষিত ফোনটার রিসিভারটা তুলে নেয় ঃ Please put me to south...

* * *

ফোন সেরে হলঘরে ফিরে এসে দেখে কৃষ্ণা সেখানে নেই। সুকুমার হলঘরের সামনের টানা বারান্দায় বের হয়ে আসে। লম্বা টানা বারান্দা মৃদু আলোয় ছায়াচ্ছন্ন, রেলিংয়ের ধার দিয়ে সব টবে পামট্রি বসানো, ঝুড়িতে নানাজাতীয় সব অর্কিড্। একপাশে অন্ধকারে রেলিংয়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিল কৃষ্ণা নিঃশব্দে যেন ছায়ার মত।

সুকুমার এগিয়ে এসে ডাকে, কৃষ্ণা!

কে? চম্‌কে ফিরে তাকায় কৃষ্ণা, বলে, ওঃ তুমি! হঠাৎ আমাকে একা ওখানে ফেলে কোথায় গিয়েছিলে?

কিন্তু তুমি এখানে যে—গান ভাল লাগল না?

মাথাটা হঠাৎ বড্ড ধরেছে—তাই এখানে খোলা জায়গায় একটু—

চল গঙ্গার ধারে খানিকটা না হয় ঘুরে আসি, মাথাটা ছেড়ে যাবে'খন।

না। আমাকে বাড়ি পৌঁছে দাও সুকুমার।

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে সুকুমার বললে, রাত মাত্র তো সবে সাড়ে আটটা, এখুনি বাড়ি যাবে?

হাঁ, চল—

কি ভেবে সুকুমার বলে, বেশ চলো।

* * *

বাড়ির কাছে এসে সুকুমার কৃষ্ণাকে নামিয়ে দেয়।

Good night—সুকুমার বলে।

Good night !

সুকুমারের গাড়ি চলে গেল।

কৃষ্ণা কিন্তু বাড়ির মধ্যে ঢুকল না, সামনের পার্কের দিকে এগিয়ে গেল। পার্কটি তখন প্রায় নির্জন হয়ে এসেছে, কেবল দু'চারজন ইতস্তত পরিক্রমণ করছে। কৃষ্ণা একটা বেঞ্চের উপরে গিয়ে বসল।

টেলিফোন অফিস।

কাবেরীর ডিউটিও শেষ হয়ে গিয়েছিল রাত্রি সাড়ে আটটায়। তাড়াতাড়ি বাড়িতে ফিরে বেশভূষা করে আবার কাবেরী অফিসেই ফিরে এল।

সুকুমারকে বলেছে সে, রাত দশটায় duty off হবে—সে আসবে এখানে। অপেক্ষা করতে থাকে কাবেরী সুকুমারের জন্য অপারেটারদের বিশ্রামকক্ষে বসে। হাতঘড়িতে ঠিক দশটা বাজতেই কাবেরী বেশভূষাটা ঠিক করে উঠে দাঁড়াল।

বাড়ি থেকে বেরুবার আগেই কাবেরী বেশভূষার মধ্যে সামান্য অদলবদল করে নিয়েছিল, এবং নিজের নাম লেখা ভ্যানিটি ব্যাগটা আনবে না ভেবেও দৈবক্রমে কৃষ্ণার নাম লেখা ব্যাগটা আনতে গিয়ে নিজেরটাই নিয়ে এসেছিল অজ্ঞাতে। আর 'কৃষ্ণা' লেখা ব্রোচ্‌টা শাড়ির ওপরে কাঁধে এঁটে এসেছে। গেটের কাছে আসতেই দেখলে সুকুমারের গাড়ি আসছে।

সুকুমার গাড়িটা গেটের কাছে এনে দাঁড় করিয়ে গাড়ির সামনের দরজাটা খুলে দিয়ে কাবেরীকে আহ্বান জানাল, এসো কৃষ্ণা।

কাবেরী মৃদু হেসে গাড়িতে উঠে সুকুমারের পাশের সীটে এসে বসল, খুব punctual তো?

হাঁ, বিশেষ করে মহিলাদের সঙ্গে appointment ঠিকমত রক্ষা করতে না পারলে আজকালকার দিনে কি চলে!

তাই নাকি?

নিশ্চয়ই।

পাতলা একটা স্নিগ্ধ সুবাস কাবেরীর বেশভূষা থেকে ছড়িয়ে যাচ্ছে।

যদি কিছু মনে না কর কৃষ্ণা, বাড়িটা একবার ঘুরে যেতে চাই—

বাঃ, কি আবার মনে করবো, চল!

কাবেরী লক্ষ্য করে নি, অদূরে সুবিমলও ঠিক ঐ সময়টিতে তার ফ্লুইড্ ড্রাইভ ডজ গাড়িতে বসে ওদের দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখেছিল। ডাক্তার ও কাবেরীর সম্পর্ক কিছুদিন হতেই তার মনের মধ্যে একটা সন্দেহের ছায়াপাত করেছিল।

তাই কিছুদিন হতে কাবেরীকে সে অলক্ষ্যে অনুসরণ করছিল। কাবেরীকে ডাক্তারের গাড়িতে উঠতে দেখে ব্যাপারটা ঠিক সে বুঝে উঠতে পারল না, তা ছাড়া 'কৃষ্ণা' বলে ডাক্তারের ডাকটাও তাকে কতকটা বিভ্রান্ত করেছিল। ডাক্তারের গাড়ি চলে যেতে সুবিমলও গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে অন্যদিকে চলে গেল।

সুকুমারের গাড়ি তার বাড়ির কম্পাউণ্ডে এসে প্রবেশ করলো।

এসো কৃষ্ণা—সুকুমার আহ্বান জানায় কাবেরীকে দরজা খুলে। দুজনে এসে সুকুমারের চেম্বারে প্রবেশ করল।—বোস।

সুকুমারের নির্দেশে কাবেরী একটা সোফার উপরে উপবেশন করে।

হঠাৎ তোমার আজকে বেড়াবার ও হোটেলে ডিনার খাবার শখ হলো যে সুকুমার? কাবেরী প্রশ্ন করে।

কাবেরীর 'সুকুমার' সম্বোধনে সুকুমার প্রথমটায় চম্‌কে ওঠে, কিন্তু মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, কি ভোলা মন তোমার কৃষ্ণা, এর মধ্যেই পরশু রাতের কথা ভুলে গেলে? কি কথা হয়েছিল আমাদের লেকের ধারে বসে?

এবারে কাবেরীর চমকাবার পালা, কিন্তু কাবেরীর হাবভাবে এতটুকু সেটা প্রকাশ পেল না, বরং মৃদু হেসে বললে, সত্যিই তো! দেখেছো কি ভোলা মন আমার, একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম।

তারপর সহসা একসময় সুকুমার কাবেরীর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, একটা কথার সত্য জবাব দেবে কৃষ্ণা?

বল, কি কথার জবাব চাও?

সত্যি কি তুমি কিছু বুঝতে পারো না—না বুঝেও বুঝতে চাও না?

বুঝতে যে পারি না তা নয়—তাছাড়া সত্যিই এই দূরে দূরে থাকতে ভালও লাগে না, কিন্তু—

কিন্তু কি কৃষ্ণা?

ভাবছি বাবার কথা। তিনি যদি রাজী না হন?

নাই-বা হলেন রাজী, তাই বলে চিরকালটা এমনি করেই জীবন কাটাতে হবে নাকি? এমনি করেই তোমাদের দু'টি বোনের জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে নাকি?

কাবেরী সুকুমারের কথার কোন জবাব দেয় না, নিঃশব্দে বসে বসে শাড়ির আঁচলের পাড়টা টানতে থাকে।

কিন্তু তোমরা ওভাবে ব্যাপারটার অতটা importance দিলেও আমি কিন্তু ততটা চিন্তিত নই। একটা লোকের অদ্ভুত একটা খেয়াল নিয়ে আর দশজনের জীবন নিয়ন্ত্রিত হবে কেন? কিন্তু তা ছাড়াও যে জিনিসটা আমাকে মধ্যে মধ্যে চিন্তিত করে তোলে সেটা—

কি?

মনে পড়ে পার্ক সার্কাসে নরেন মল্লিকের হত্যার ব্যাপারে পুলিসের কর্তৃপক্ষ তোমাদের দু'বোনকে suspect—

সুকুমারের কথাটা শেষ হল না, কাবেরী তীব্র কণ্ঠে বলে ওঠে, nonsense ! কোথায় কি? কারো সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু পুলিসের সন্দেহের কথা ছেড়েই দাও, তুমি—তুমিও কি—

আমি? আমার কথা না হয় ছেড়েই দাও, কিন্তু একটা সন্দেহের দুঃস্বপ্ন অবিরত আমাদের পিছনে পিছনে তাড়া করে ফিরবে এও তো—

কিন্তু আমি তোমার কথাই জানতে চাই।

অন্য কথা না হয় ছেড়েই দিচ্ছি কিন্তু এটা তো ঠিকই, তোমাদের দু'বোনের মধ্যে একজন নরেন মল্লিককে চিনতে—

সুকুমার!

হাঁ, এটা শুধু মুখের কথা নয়, সাক্ষীপ্রমাণও যে তার আছে। সত্য যা একদিন না একদিন তা দিনের আলোর মত আত্মপ্রকাশ করবেই, সেদিন—একটু থেমে হঠাৎ সুকুমার আবার বলে, অন্তত আমার কাছে তুমি সব কথা খুলে বল কৃষ্ণা, সত্যিই যদি তুমি আমাকে ভালবাস, এ যন্ত্রণা থেকে আমাকে নিষ্কৃতি দাও। আমাদের পরস্পরের প্রেমের মধ্যে এই যে সন্দেহের একটা কালো রাহু এ থেকে আমাকে মুক্তি দাও।

কাবেরী যেন পাষাণের মতই স্থির, অনড়। চোখের দৃষ্টি অকম্পিত।

কৃষ্ণা!

বল।

বল, বল কৃষ্ণা, সত্যিটুকু আমাকে খুলে বল! সহসা এগিয়ে এসে দু'হাতে কাবেরীর একখানা হাত তুলে ধরে আবেগকম্পিত কণ্ঠে কথা ক'টি বলে সুকুমার।

সহসা কাবেরী সুকুমারের মুষ্টি হতে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দু'হাতের মধ্যে মুখ গুঁজে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলে ওঠে, না না, আমি কিছু জানি না—আমি কিছু জানি না—

কৃষ্ণা!

সস্নেহে কাবেরীর অবনত পৃষ্ঠে একখানা হাত রেখে সুকুমার বলে, আমায় তুমি বিশ্বাস করো কৃষ্ণা, সব কথা আমায় খুলে বল।

না, না—আমায়—আমায় তুমি ক্ষমা করো সুকুমার। আমি কিছু জানি না—জানি না। কাবেরী উঠে দাঁড়ায়, তার কোলের ওপর থেকে ভ্যানিটি ব্যাগটা মাটিতে পড়ে যায়।

নিচু হয়ে ব্যাগটা তুলতে গিয়ে সুকুমারের নজর পড়ল, ব্যাগটার গায়ে বড় বড় অক্ষরে লেখা ঃ কাবেরী।

ঠিক এমনি সময় টেলিফোন বেজে ওঠে ঃ ক্রিং! ক্রিং! ক্রিং!

সুকুমার তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে ফোনটা তুলে নেয়, হ্যালো—য়্যাঁ, হাঁ—Dr. Gupta speaking. কি—কি বললেন, য়্যাঁ, accident ! Motor accidentয়ে মারা গেছেন? হাঁ হাঁ আসছি, এখুনি আসছি—

কি — কি ব্যাপার সুকুমার? প্রশ্ন করে কাবেরী।

বড় sad news কৃষ্ণা! তোমার বোন কাবেরী, মানে—

কি — কি হয়েছে কাবির? বল—বল সুকুমার, চুপ করে রইলে কেন, বল?

সে, মানে, কাবেরীর মোটর অ্যাক্সিডেন্ট —। মুহূর্তে কাবেরীর সমগ্র মুখখানা যেন রক্তহীন, ফ্যাকাশে হয়ে যায়। একটা আর্ত অস্ফুট চিৎকার কাবেরীর কণ্ঠ হতে নির্গত হয়। কাবেরী মুহ্যমানের মত সোফাটার ওপরেই ধপ করে বসে পড়ে।

সুকুমার কাবেরীর পাশে এসে দাঁড়ায়, সস্নেহে ধীর কণ্ঠে বলে, এ সময় নার্ভ হারালে তো চলবে না কৃষ্ণা—চল বরং তোমাকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে আমিই হাসপাতালে যাই।

না, না—আমি—আমিও তোমার সঙ্গে যাবো সুকুমার—

তুমি যাবে?

হাঁ। আমায়—আমায় তুমি নিয়ে চল।

বেশ চল।

দুজনে উঠে দাঁড়ায়। গাড়িতে উঠে সুকুমার গাড়িতে স্টার্ট দিল। গাড়ি ছুটে চলল হাসপাতালের দিকে।

সার্কুলার নার্সিং হোম। সুকুমারের গাড়ি কাবেরীকে সঙ্গে নিয়ে এসে নার্সিং হোমের কম্পাউণ্ডে প্রবেশ করল। নার্সিং হোমের কক্ষে কক্ষে খোলা জানালাপথে নজরে পড়ে ডোমে-ঢাকা স্বল্প পাওয়ারের মৃদু আলোর আভাস। বাইরের মৃদু আলোকিত বারান্দায় একটি যুবক বোধ হয় ওদেরই অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিল, বললে, ডাক্তার গুপ্ত?

হাঁ।

এইদিকে আসুন।

যুবকের সঙ্গে সঙ্গে তাকে অনুসরণ করে সুকুমার আর কাবেরী আলোকিত নাতিপ্রশস্ত একটি কক্ষমধ্যে এসে প্রবেশ করে। অল্পবয়েসী একজন নার্স বিমর্ষ মুখে দাঁড়িয়ে আর ঘরের মধ্যে অস্থির অশান্ত পদে কিরীটী পায়চারি করছে। স্বল্পবয়েসী একজন ডাক্তার অ্যাপ্রন গায়ে একপাশে দাঁড়িয়ে।

ওদের কক্ষমধ্যে প্রবেশ করতে দেখেই কিরীটী ডাক্তারকে আহ্বান জানায়, এই যে ডাক্তার, আসুন!

ব্যাপার কি বলুন তো মিঃ রায়? কি করে দুর্ঘটনা ঘটল?

সত্যিই বড় দুঃখের ব্যাপার। আমারই গাড়ির নীচে হঠাৎ—মানে আমি আমীর আলি অ্যাভিনু দিয়ে ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে গাড়িতে করে আসছিলাম, রাস্তা অনেকটা খালি থাকায় বেশ জোরেই গাড়ি চালিয়ে আসছিলাম, হঠাৎ আচমকা মেয়েটি ছুটে রাস্তা cross করতে গিয়ে আমার সামনে এসে পড়ে, আমি থামাতে পারলাম না, ফলে—

আঘাত, মানে—

মাথাটা একেবারে চাকার তলে পড়ে সঙ্গে সঙ্গেই অজ্ঞান হয়ে যান, একটু আগে কয়েক সেকেণ্ডের জন্য মাত্র জ্ঞান হয়েছিল, কি সব নরেন মল্লিকের হত্যার ব্যাপার, আপনার নাম, কৃষ্ণা না কাবেরী—কি সব যেন বললেন। আপনার নামটা আমার জানা ছিল, ফোন গাইড থেকে আপনার নাম খুঁজে বের করে তাই আপনাকেই ফোন করেছি। আর একটু আগেও যদি আসতেন ডাঃ গুপ্ত, হয়ত শেষ দেখাটা হতো—

আমি—আমি তার dead bodyটা একবার দেখতে পারি না! অ্যাপ্রন পরা ডাক্তারটি বললে, আসুন—পাশের ঘরেই আছে।

সুকুমার ডাক্তার ও নার্সের সঙ্গে পাশের ঘরে গিয়ে প্রবেশ করে পর্দার ওপাশে।

একটা চেয়ারের উপরে মুহ্যমানের মত বসেছিল কাবেরী। মনের মধ্যে যে তার প্রচণ্ড একটা ঝড় বয়ে যাচ্ছে, তার চোখ-মুখ দেখে তা বুঝতে কষ্ট হয় না।

একসময় পায়ে পায়ে কিরীটী কৃষ্ণার ছদ্মবেশে কাবেরীর ঠিক সামনে এগিয়ে এসে মৃদু কণ্ঠে বলে, মাপ করবেন, যিনি মোটর অ্যাক্সিডেন্টে একটু আগে মারা গেছেন, আপনার চেহারার সঙ্গে তাঁর চেহারার অদ্ভুত একটা সৌসাদৃশ্য আছে বলে মনে হচ্ছে, আপনারা—

হাঁ, সে আমারই যমজ বোন কাবেরী।

ঘুমিয়ে—তার ডিউটির সময় হয়েছে, তবু তাকে না জাগিয়ে আমি একাই ডিউটিতে চলে যাই।

* * *

ঠিক এমনি সময়ে বাইরে একটা মোটর গাড়ি এসে থামবার শব্দ শোনা গেল। কাবেরী একটু থেমে আবার বলতে শুরু করে, অফিসে সে সেদিন একটু লেটেই এলো। পাশাপাশি বসে দুজনে কাজ করছি, তবু কেউ কারও সঙ্গে কথা বলছি না।

বাইরের বারান্দায় একটা শব্দ শোনা যায়—খট্ খট্ খট্। খট্ খট্ শব্দটা ক্রমে যেন ঐ ঘরের দিকেই এগিয়ে আসছে।

খট্ খট্ শব্দে সকলেরই দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষিত হয়। ক্রাচে ভর দিয়ে দরজার উপরে এসে দাঁড়ালেন সঞ্জীব চৌধুরী। চোখে মুখে তাঁর উদ্বেগের সুস্পষ্ট চিহ্ন।

সঞ্জীবকে দরজার গোড়ায় দেখেই হঠাৎ কাবেরী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় এবং তার বিস্মিত কণ্ঠ হতে অর্ধস্ফুট একটা আর্ত শব্দ নির্গত হয়, বাবা!

কাবেরী কোথায়? সত্যিই কি সে মোটর-অ্যাকসিডেন্টে মারা গিয়েছে? বলতে বলতে সঞ্জীব চৌধুরী কক্ষমধ্যে এসে প্রবেশ করেন এবং পরক্ষণেই কাবেরীকে অদূরে দণ্ডায়মান দেখে বলে ওঠেন, কিন্তু এই তো—এই তো! তবে—তবে যে কে এক ডাক্তার ফোনে বললে, তুমি—তুমি নাকি মোট অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছো!

সঞ্জীবের কথায় কাবেরীর মুখখানা যেন সহসা ছাইয়ের মত রক্তশূন্য ফ্যাকাশে হয়ে যায়। বিহ্বল বোবাদৃষ্টিতে সে তাকায় বাপের মুখের দিকে।

কিরীটীর কণ্ঠস্বর হঠাৎ শোনা গেল, তাহলে আপনি—আপনিই কাবেরী চৌধুরী! এতক্ষণ তাহলে কৃষ্ণা চৌধুরীর পরিচয়ে ধোঁকা দিচ্ছিলেন! মারা গেছেন তাহলে আসলে কৃষ্ণা দেবীই—কাবেরী চৌধুরী নন?

আমি—আমি—, কি যেন কাবেরী বলবার চেষ্টা করে।

কিরীটী ঘুরে সঞ্জীব চৌধুরীকে সম্বোধন করে প্রশ্ন করে, মিঃ চৌধুরী, তাহলে ইনিই কাবেরী দেবী?

নিশ্চয়ই। আমার মেয়েকে আমি চিনি না! ঐ তো আমার ছোট মেয়ে কাবেরী—কিন্তু—

হঠাৎ কাবেরী যেন পাগলের মত চিৎকার করে ওঠে, না না, আমি কাবেরী নয়—আমি কৃষ্ণা। বাবা, তুমি কি আমায় চিনতে পারছো না? চেয়ে দেখো ভাল করে—চেয়ে দেখো বাবা, আমি—আমি কাবেরী নই, আমি—আমি তোমার কৃষ্ণা।

কৃষ্ণা! হঠাৎ হাঃ হাঃ হাঃ করে পাগলের মত হেসে ওঠেন সঞ্জীব চৌধুরী, তুই কৃষ্ণা, য়্যাঁ! তুই কৃষ্ণা! হাঃ—হাঃ—হাঃ! পাগলের মতই হাসতে থাকেন সঞ্জীব চৌধুরী।

কাবেরী ছুটে এসে তার বাপ সঞ্জীব চৌধুরীকে দু'হাতে আঁকড়ে ধরে আর্ত ব্যাকুল কণ্ঠে বলে ওঠে, বাবা—বাবা! আমি—আমি সত্যিই তোমার কৃষ্ণা! দেখো, আমি সত্যিই তোমার বড় মেয়ে কৃষ্ণা—

য়াঁ! হঠাৎ হাসি থামিয়ে বোবাদৃষ্টিতে তাকান সঞ্জীব মেয়ের মুখের দিকে। তারপর অর্ধস্ফুট স্বরে বলেন, তুমি—তুমি তাহলে কাবেরী নও? তুমি কৃষ্ণা? তাহলে—তাহলে কৃষ্ণা মরে

নি—মরেছে কাবেরী? না না, তা কি করে হবে? কাবেরী—কাবেরী! কৃষ্ণা—কৃষ্ণা! না না, আমি যাই—আমি যাই—

ক্রাচে ভর দিয়ে অস্থিরভাবে খট্ খট্ শব্দ তুলে সঞ্জীব ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন।

আর কাবেরী হঠাৎ চেয়ারটার উপরে বসে দু'হাতে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে। ঘরের মধ্যে উপস্থিত সকলেই ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে রোরুদ্যমানা কাবেরীর দিকে।

হঠাৎ কাবেরী উঠে পড়ে। তারপর বলতে বলতে বের হয়ে যায় ঘর হতে, বাবা—বাবা, শোন—শোন, দাঁড়াও!

অবিনাশ ও রহমান দুজনেই কাবেরীকে অনুসরণ করতে যাচ্ছিল, কিরীটী ওদের বাধা দিয়ে বলে, না, ওঁকে যেতে দিন রহমান সাহেব।

কক্ষের মধ্যে যেন নাটকের একটা দৃশ্য অভিনীত হয়ে গেল।

কাবেরী ও তার পিতা সঞ্জীব চৌধুরীর পরস্পরের মধ্যে কাথাবার্তাগুলো নরেন মল্লিকের হত্যাকে কেন্দ্র করে গত ২৭শে পৌষ যে রহস্যজাল বিস্তৃত করেছিল এ যেন তারই সমাপ্তির রূঢ় ইঙ্গিত। সকলেই চুপচাপ দাঁড়িয়ে, কারো মুখে কথাটি পর্যন্ত নেই।

সর্বপ্রথম কথা বললে কিরীটী, এতটা আমি ভাবি নি। অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত তীর অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ করেছে।

রহমান বললেন, কাবেরীকে ওভাবে না যেতে দিলেই কি ভালো হতো না মিঃ রায়!

কিরীটী মৃদু হেসে বললে, ভয় নেই রহমান সাহেব, এ অজগরের গ্রাস, একবার যখন দাঁত বসিয়েছে, পূর্ণগ্রাসের থেকে আর ও নিস্তার পাবে না।

ইতিমধ্যে একসময় ডাঃ সুকুমারও কক্ষে এসে প্রবেশ করে একপাশে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার দিকে তাকিয়ে কিরীটী বললে, ডক্, this is the world! কিন্তু আমি বলছি তুমি ঠকো নি!

ঠিক এমনি সময়ে একটা গাড়ি এসে থামবার শব্দ পাওয়া গেল।

কে এলো?

দেখুন তো রহমান সাহেব কে এলেন!

রহমানকে আর বাইরে বের হয়ে দেখতে হলো না, তালুকদার কক্ষে প্রবেশ করলে, চোখেমুখে তার সুস্পষ্ট একটা উত্তেজনার ভাব।

ব্যাপার কি তালুকদার সাহেব?

জব্বর সংবাদ! উত্তেজিত ভাবে তালুকদার বলে।

হেঁয়ালি ছেড়ে বল, বর্মা থেকে কোন সংবাদ পেয়েছ বোধ হয়!

আশ্চর্য! How could you guess?

Simple rule of three! বর্তমানে যে কেস নিয়ে আমরা ব্যস্ত তার মধ্যেই তো একটা অপ্রাপ্ত সূত্র ঐ বর্মা-সংবাদ। এবং এত রাত্রে হন্তদন্ত হয়ে যখন এসেছো, বুঝতে কষ্ট হওয়া তো উচিত নয়—কি হতে পারে তোমার অত্যাশ্চর্য সংবাদ। Now—now tell me, নরেন মল্লিকের অতীত বর্মা-বাস সম্পর্কে কি এমন সংবাদ গ্রহণ করলে!

তুমি জান, আমাদের হেড কোয়ার্টার থেকে বর্মার স্পেশাল পুলিশে নরেন মল্লিকের details চেয়ে পাঠানো হয়েছিল তোমারই পরামর্শমত!

হাঁ, তা তো জানি।

এই কিছুক্ষণ আগে এখানকার হেড কোয়ার্টারে সিগন্যাল মেসেজ এসেছে। নরেন মল্লিকের যৌথ কারবার ছিল বার্মা-টিকের ইসমাইল খাঁ নামে এক পাঠানের সঙ্গে। ইসমাইলের বাপ ছিল পাঠান ও মা বর্মী এবং ব্যবসাসূত্রেই নরেনের ইসমাইল-গৃহে যাতায়াত ও ঘনিষ্ঠতা খুবই ছিল।

অর্থাৎ মল্লিক মশাই ইসমাইল খাঁর ঘরে ঘন ঘন যাতায়াত শুরু করে! বল, তারপর?

ইসমাইল খাঁর এক পরমা সুন্দরী শিক্ষিতা কন্যা পীরবানু নরেনের সঙ্গে বিশেষ একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

কলির 'ডন যুয়ান' একেবারে, তারপর?

কিন্তু ইমসাইল খাঁ কন্যার পরদেশীর সঙ্গে অত ঘনিষ্ঠতাটা ঠিক বরদাস্ত করে উঠতে পারে নি।

ফলে পিতা ও কন্যার মধ্যে মতান্তর!

Exactly—

হতেই হবে, শিক্ষিতা কন্যা যখন! Yes, go on—তারপর?

এমন সময় সহসা এক রাত্রে নরেন পীরবানুকে নিয়ে—

পলায়মান! চমৎকার! তারপর?

ইসমাইল খাঁ ক্ষেপে গেল সংবাদ পেয়ে এবং ছুটলো ওদের পিছু পিছু। শেষ পর্যন্ত ধরে ফেললে বর্মা সীমান্তে। বাপ-মেয়েতে কথা-কাটাকাটি হলো এবং শেষ পর্যন্ত বাপ মেয়েকে জোর করে নিয়ে গেল—নরেন সোজা ফিরে এল কলকাতায়।

উঁহু, শুধু ঐ নয়—আরো story আছে!

আছে, তবে সেটা সঠিক জানা যায় নি, কেবল জানা গেছে ইসমাইলের রত্ন-ভাণ্ডারে—

তালুকদার এই পর্যন্ত বলেছে, সহসা কিরীটী লাফিয়ে ওঠে, Hurry up—চল, এখুনি চল—

বিস্মিত তালুকদার শুধায়, কোথায়?

কিরীটী বলে, আমীর আলি অ্যাভিনুতে কৃষ্ণা কাবেরীর ফ্ল্যাটে—quick!

* * *

ঘণ্টা দুই পরে।

কৃষ্ণাদের ফ্ল্যাট-বাড়ির বাইরের ঘর। সোফার উপরে বসে দু'হাতের মধ্যে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদছে কাবেরী। দরজাটা হা-হা করছে খোলা। নিঃশব্দে কিরীটী এসে কক্ষে প্রবেশ করে—কাবেরী দেবী!

চমকে মুখ তুলে তাকায় কাবেরী—কে?

পুলিশ এসেছে, আপনাকে নরেন মল্লিকের হত্যাপরাধে গ্রেপ্তার করতে। কিরীটী বলে।

পুলিশ! আর্ত চিৎকার একটা বের হয়ে আসে কাবেরীর কণ্ঠ হতে।

হাঁ, ঐ দেখুন।

সত্যিই দরজার গোড়ায় দুজন লাল পাগড়ী নিঃশব্দে দণ্ডায়মান।

ত্রস্ত ব্যাকুল হয়ে উঠে দাঁড়ায় কাবেরী, কিন্তু আমি—আমি তো হত্যা করি নি নরেনকে! আমি—

বৃথা লুকোবার আর চেষ্টা করে কোন ফল হবে না কাবেরী দেবী। আপনি—আপনি নরেন মল্লিককে হত্যা করেছেন। মৃত্যুর পূর্বে কৃষ্ণা দেবী পুলিসের কাছে statement দিয়ে গিয়েছেন—

কিরীটীর কথা শেষ হলো না, কাবেরী পাগলের মতই যেন চিৎকার করে উঠল, মিথ্যা—মিথ্যা! কৃষ্ণা—কৃষ্ণা মিথ্যা কথা বলেছে!

না। সে মিথ্যা কথা বলে নি। কঠিন কণ্ঠে কিরীটী প্রতিবাদ জানায়।

হাঁ, হাঁ, হাঁ—সে মিথ্যা বলেছে—, বলতে বলতে সহসা উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ায় কাবেরী এবং উঠে দাঁড়াতেই তার পূর্ণ প্রতিকৃতি সম্মুখে দেওয়ালের গায়ে প্রলম্বিত দর্পণে প্রতিফলিত হলো। সেই প্রতিবিম্বিত নিজের ছায়ার দিকে তাকিয়েই অকস্মাৎ যেন ক্ষেপে ওঠে কাবেরী এবং মুহূর্তে নিজের কোমর থেকে তীক্ষ্ণ ধারালো একখানা ছোরা বের করে, কতকটা উন্মাদিনীর মতই যেন ছুটে গিয়ে দর্পণের কাচের উপরে ছোরা দিয়ে সজোরে আঘাত করে চিৎকার করে ওঠে, কৃষ্ণা—

ঝন্ ঝন্ করে ছোড়ার আঘাতে দর্পণের কাঁচটা ভেঙে ছড়িয়ে পড়ে ঘরময়। তাতেও যেন কাবেরীর রোষ প্রশমিত হয় না, আবার আঘাত হানবার জন্যে হাত তুলতেই চোখের পলকে কিরীটী এগিয়ে এসে সজোরে কাবেরীর উত্তোলিত হাতটা চেপে ধরে কঠিন কঠোর কণ্ঠে বলে ওঠে, আবার—আবার আপনি কাবেরী দেবী সেরাত্রের মতই ভুল করেছেন! She is not কৃষ্ণা—but reflection—your own reflection on the mirror ! কৃষ্ণা নয়, দর্পণে আপনারই ছায়া ওটা। ভাল করে চেয়ে দেখুন—আপনারই ছায়া, আপনি—কৃষ্ণা নয়!

আর্ত চিৎকার করে ওঠে কাবেরী, ছায়া! কৃষ্ণা নয়—ছায়া!

হাঁ, ছায়া—আপনারই ছায়া। যমজ বোনের একজন—আপনারই ছায়া, কাবেরী দেবী।

কৃষ্ণা নয়? ছায়া—ছায়া!

হাঁ, ছায়া। এখন বসুন—স্থির হয়ে বসুন।

মুহ্যমান কাবেরীকে একপ্রকার যেন জোর করেই কিরীটী সোফার উপরে বসিয়ে দেয়। —এখন বোধ হয় বুঝতে পেরেছেন, হিংসায় অন্ধ হয়ে রাগে উত্তেজনায় সে-রাত্রে নরেন মল্লিকের শয়নঘরের আয়নাটার উপরে আঘাত হেনে আপনি সেটা ভেঙে দিয়েছিলেন—নিজের ছায়াই আয়নাতে দেখে কৃষ্ণা ভেবে কৃষ্ণাকে ছোরা দিয়ে খুন করতে গিয়ে!

দু'হাতের মধ্যে মুখ গুঁজে কাবেরী বলে ওঠে, সত্যিই বলছেন কৃষ্ণাকে আমি দেখি নি —কৃষ্ণাকে আমি দেখি নি—

না, দেখেন নি। That was your own reflection ! নরেন মল্লিকের ঘরের আয়নার ভাঙা কাচই সে কথা সেদিন আমায় বলেছিল। এবং তাই প্রথমে আমার সব কেমন গোলমাল ঠেকেছিল, ছোরাটা মৃতের বক্ষে বিদ্ধ রইলো, কোন গুলি ছোঁড়ার শব্দ শোনা গেল না, অথচ আয়নার কাচটা ছিল ভাঙা!

এমন সময় রহমান, ডাক্তার সুকুমার ও কৃষ্ণা এসে কক্ষে প্রবেশ করল।

আসুন কৃষ্ণা দেবী! কিরীটীই আহ্বান জানাল।

কাবি? কৃষ্ণা বলে ওঠে।

অকস্মাৎ কৃষ্ণার কণ্ঠস্বর শুনে কাবেরী যেন বিদ্যুৎগতিতে উঠে দাঁড়ায় এবং উন্মাদিনীর মতই কৃষ্ণার দিকে চিৎকার করে ছুটে যায়, খুন করবো তোকে সর্বনাশী! তুই—তুই—তুই-ই আমার জীবনের সব চাইতে বড় শত্রু!

মুহূর্তে কিরীটী এগিয়ে এসে কাবেরীকে প্রতিরোধ করে, কাবেরী দেবী!

না—না, আমায় ছেড়ে দিন—আমায় ছেড়ে দিন। ওকে—ওকে আমি খুন করবোই। কিরীটীর বজ্রমুষ্টি হতে নিজেকে ঝাঁকি দিয়ে মুক্ত করবার চেষ্টা করতে করতে চিৎকার করে কাবেরী বলতে থাকে।

কাবেরী দেবী! দু'হাতে কাবেরীর স্কন্ধের দু'পাশ দৃঢ় মুষ্টিতে চেপে প্রচন্ড এক ঝাঁকুনি দিয়ে কঠোর কণ্ঠে বলে ওঠে কিরীটী, চুপ করে বসুন—না হলে বাধ্য হবো আমি আপনার হাতে হাতকড়া লাগাতে!

কাবেরী সোফাটার উপরে বসে পড়ে সোফার মধ্যেই মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে। মিনিট পাঁচ-সাত কিরীটী কাবেরীকে কাঁদতে দেয়। কিছুক্ষণ কেঁদে কাবেরী একটু সুস্থ হলে কিরীটী ডাকে, কাবেরী দেবী, এখন নরেন মল্লিককে কেন খুন করতে—

খুন—হাঁ, খুন নরেনকে আমি করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু পারি নি—শুধু নরেনকে কেন, একই সঙ্গে দিদি কৃষ্ণাকেও!

কিন্তু কেন—কেন ওদের খুন করতে চেয়েছিলেন? কথাটা বলে ওঠেন রহমান সাহেব।

কেন খুন করতে চেয়েছিলাম! জঘন্য, হীন প্রতারক—রাগে উত্তেজনায় কাবেরীর সমগ্র মুখখানি যেন রক্তচাপে লাল হয়ে ওঠে, কেন খুন করতে চেয়েছিলাম জিজ্ঞাসা করছেন? ভাবতে পারেন, যাকে সমস্ত প্রাণ দিয়ে আমি ভালবেসেছিলাম—যাকে ভালবেসে জীবনের নীতিকে বর্জন করেছি, পিতার স্নেহ-ভালবাসাকে উপেক্ষা করেছি, পিতাকে প্রতারণা করেছি, সেই শঠ প্রতারক নরেন—যখন জানতে পারলাম আসলে সে কৃষ্ণাকেই ভালবাসে, আমাকে নয়, আমার প্রতি ভালবাসা তার অভিনয় মাত্র, দিনের পর দিন আমার বুকভরা ভালবাসাকে নিয়ে সে ছিনিমিনি খেলেছে, পদদলিত করেছে—ভাবতে পারেন নারী হয়ে সে কি মর্মান্তিক লজ্জা, কি দুঃসহ বেদনা! শঠ, নীচ, প্রতারক!

কিরীটী বাধা দিয়ে বলে, কিন্তু তাই যদি হয় সে তো ওর দোষ নয়!

আবার ক্ষেপে ওঠে কাবেরী এবং কৃষ্ণার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলে, দোষ নয়? ওরই দোষ—ঐ—ঐ শয়তানীকে সে ভালবাসতো অথচ পরিচয় আগে তার আমার সঙ্গেই। আমিই কৃষ্ণার সঙ্গে পরে তার পরিচয় ঘটিয়ে দিয়েছিলাম। দিনের পর দিন প্রলোভনের জাল বিস্তার করে, প্রেমের ভালবাসার অভিনয় করে আমাকে আকর্ষণ করেছে, এমন কি চোরের মত লুকিয়ে ওর বাড়ির পশ্চাতের দ্বার দিয়ে রাত্রে সেই শঠ প্রতারকের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হয়েছি। কিন্তু যেদিন বুঝলাম আসলে সে আমাকে চায় না, চায় কৃষ্ণাকেই—স্থির করলাম তাকে খুন করবো—শুধু তাকেই নয়, কৃষ্ণাকেও!

বুঝতে পারছি এখন আপনার তখনকার মনের অবস্থা কাবেরী দেবী—সহানুভূতির সঙ্গে কিরীটী বলে।

কতটুকু বুঝতে পেরেছেন সে জ্বালা, সে দাহ! না না, কেউ বুঝতে পারে না—আমার মত

যে না জ্বলেছে সে ছাড়া কেউ বুঝতে পারে না, পারবে না। হাঁ, তারপর থেকেই সুযোগ খুঁজতে লাগলাম। প্রতিশোধ! প্রতিশোধ! সুযোগ এলো। জন্মতিথি উৎসবে নরেন আমায় নিমন্ত্রণ করলে না, করলে কৃষ্ণাকে—রাত্রে তার ওখানে যাওয়ার জন্য। চিঠি নন্দুয়ার হাতে পাঠিয়েছিল, আমার হাতে এসে পড়লো। এই সুযোগ। লুকিয়ে ফেললাম চিঠিটা। অফিস হতে ঐদিনই কৃষ্ণার পরিচয়ে নরেনের সঙ্গে appointment করলাম রাত্রি সাড়ে আটটায় দেশপ্রিয় পার্কে দেখা করবার জন্য।

তারপর? রুদ্ধ নিঃশ্বাসে কিরীটী প্রশ্ন করে।

কৃষ্ণার পরিচয়েই দেশপ্রিয় পার্কে কৃষ্ণার মত সাজসজ্জা করে ঠিকসময় নরেনের সঙ্গে দেখা করলাম—বললাম, চিঠি পেয়েছি। রাত বারোটায় তার শয়নকক্ষে গিয়ে দেখা করবো, সে যেন বাথরুমের দরজাটা খুলে রাখে। আমার কথা শুনে আনন্দে সে উল্লসিত হয়ে উঠলো। এতদিন সে আমার সঙ্গে অভিনয় করে এসেছে, কিন্তু এমন নিখুঁত অভিনয় সেরাত্রে আমি তার সঙ্গে করলাম ধরতে পারলে না সে!

একটু থেমে কাবেরী আবার বলতে লাগল, আগেই একটা ছোরা কিনে রেখেছিলাম—বাড়িতে ফিরে দেখি কৃষ্ণাও ইতিমধ্যে ঘরে ফিরে এসেছে। বুকের মধ্যে প্রতিশোধের আগুন নিয়ে, কোনমতে মুখে চারটি গুঁজে তাড়াতাড়ি শয্যায় গিয়ে কৃষ্ণার সঙ্গে শুয়ে পড়লাম যে যার পৃথক শয্যায়। ঠিক রাত যখন সাড়ে এগারটা, নিঃশব্দে শয্যার ওপরে উঠে বসলাম।

ঘর অন্ধকার। অন্ধকারেই চেয়ে দেখলাম, কৃষ্ণা তার শয্যায় শুয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। সন্ধ্যা থেকে বাবার শরীর খারাপ বলে বাবা নাকি কৃষ্ণা যখন সন্ধ্যার সময় বের হয় তাকে বলেছিলেন বিরক্ত না করতে। ঘরের আলো নিভিয়ে তিনি শুয়ে পড়েছিলেন আমাদের আগেই।

বাবার ঘরের দিকে তাকালাম, কোন সাড়াশব্দই নেই। পা টিপে টিপে শয্যা হতে উঠে, প্রথমেই কোমরে ছোরাটা গুঁজে নিয়ে নিঃশব্দে পাশের কক্ষে চলে এলাম। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বেশ ভাল করে সাজলাম। অভিনয় করতে চলেছি। অভিনয়—অভিনয়ের শেষরাত্রি! লাল রক্তবর্ণ শাড়ি পরলাম। মাথার চুল এলোখোঁপা করে বেঁধে, ঠিক কৃষ্ণার মত করে তার ব্রোচটা শাড়িতে এঁটে, তার ভেইলটা মাথার ওপরে দিয়ে রাস্তায় এসে নামলাম। হনহন করে হেঁটে চললাম নরেনের বাড়ির দিকে। নির্জন রাস্তা, একটুকু ভয় করে নি আমার।

নরেনের বাড়িতে অনেক রাত্রেই তো অমনি করে অভিনয় করে গিয়েছি এসে বাড়ির পশ্চাতের গলিপথের দরজাটা দিয়ে ঢুকে। তাই বাইরে থেকেই সেটায় ইদানীং তালা লাগানো থাকতো। চাবি আমার কাছেই থাকতো। চাবি দিয়ে তালা খুলে বাগানে প্রবেশ করলাম। ঘোরানো সিঁড়িপথে নরেনের শয়নকক্ষ-সংলগ্ন বাথরুমের মধ্যে গিয়ে ঢুকলাম। বাথরুমের দরজাটাও খোলাই ছিল কিন্তু নরেনের শয়নকক্ষে প্রবেশ করে দেখি ঘর অন্ধকার—দেওয়ালের গায়েই সুইচ, হাত বাড়িয়ে আলোটা জ্বালতেই—

হাঁ, মুহূর্তে যেন মাথার মধ্যে আগুন জ্বলে উঠলো—মনে হলো যেন কৃষ্ণাই ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে, দ্বিধামাত্র না করে কোমর থেকে ছোরাটা টেনে ছুটে গিয়ে কৃষ্ণা ভেবে দর্পণের ওপরেই হাতের ছোরাটা দিয়ে আঘাত হানলাম। ঝনঝন করে দর্পণের কাঁচটা ভেঙে যেতেই সেই শব্দে আমার জ্ঞান যেন ফিরে এলো এবং ঠিক সেই মুহূর্তেই সামনের দিকে নজর পড়তে

আতঙ্কে দু'পা পিছিয়ে গেলাম! নরেনের মৃতদেহটা মেঝের কার্পেটের ওপরে পড়ে আছে। আর তার বুকে বিঁধে আছে সমূলে একখানা ছোরা। ভয়ে আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যেই দাঁড়িয়ে ছিলাম। হঠাৎ এমন সময়—ফিরে চেয়ে দেখি পিছনের বাথরুমের দরজার ওপরে দাঁড়িয়ে বাবা আর তারই পিছনে কৃষ্ণা!

আমি—আমি এবারে বলবো ইন্‌স্‌পেক্টার, আমায় বলতে দিন—আচম্‌কা কাবেরীর উক্তিতে বাধা পড়ায় এবং অন্য একটি কণ্ঠস্বরে একসঙ্গে ফিরে তাকাল কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করে।

ঠিক দুই ঘরের মধ্যবর্তী দরজার উপরে ইতিমধ্যে কখন যে একসময় নিঃশব্দে সকলের অলক্ষ্যে ক্রাচে ভর দিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিলেন সঞ্জীব চৌধুরী কেউ তা লক্ষ্য করে নি। কিন্তু সঞ্জীব চৌধুরীকে কথা বলতে শুনে সেই দিকে ফিরে তাকিয়ে কাবেরী যেন পাষাণে পরিণত হয়ে গেল।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে কৃষ্ণাও চিৎকার করে উঠলো, বাবা! বাবা! না না—তুমি না—তুমি না!

ছুটে এসে কৃষ্ণা সঞ্জীবকে যেন দু'হাতে আগলে ধরতে চেষ্টা করে।

সঞ্জীব বাধা দিয়ে মেয়েকে সরিয়ে দেন, বলতে দে মা আমায় বলতে দে! পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমায় করতে দে!

বাবা! বাবা! কৃষ্ণা আবার পিতাকে বাধা দেবার চেষ্টা করে।

আঃ সরে যা! শুনুন ইনস্‌পেক্টর—নরেন মল্লিককে আমিই খুন করেছি—কাবেরী খুন করে নি—খুন করেছি আমি, আমার মেয়েকে সে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবে আমি সহ্য করতে পারি নি। আমার স্ত্রী করুণার ব্যবহারে আমি মেয়েজাতটার ওপরেই অবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলাম। তাই নিজের ঔরসজাত মেয়েদেরও আমি বিশ্বাস করি নি—কারো সঙ্গে মিশতে দিই নি। সর্বদা চোখে চোখে রেখেছি। কিন্তু যেদিন জানতে পারলাম কাবেরী তার মায়ের রক্তের ঋণই শোধ করতে চলেছে, আমাকে প্রতারণা করে নরেনের সঙ্গে মিশতে শুরু করেছে, কাবেরীর ওপর নজর রাখলাম। ওর ঘর থেকেই চিঠি চুরি করে সব জানতে পারলাম। তারপর যখন জানতে পারলাম—শুধু আলাপই নয়, কাবেরী অনেক রাত্রে নরেনের গৃহে যায়—রাগে তখন আমার মাথায় খুন চেপে যায়। সুযোগ খুঁজতে লাগলাম। এলো সুযোগ—নরেন যে চিঠিতে তার জন্মতিথির দিন রাত্রে কৃষ্ণাকে ওর বাড়িতে যাবার জন্য আমন্ত্রণ করে, সে চিঠিখানা কাবেরী তখন তার ভ্যানিটি ব্যাগে রেখে স্নানঘরে গিয়েছে, সেই ফাঁকে লুকিয়ে পড়ি, এবং বুঝি ঐ চিঠি হতে, কৃষ্ণা ও কাবেরীর মধ্যে নরেনের ব্যাপারে একটা গোলযোগ আছে। যা হোক, ঠিক করলাম ঐ রাত্রেই দুজনকে একসঙ্গে হত্যা করবো। লোডেড রিভলভারটা নিয়ে—ওরা দু'বোন বাড়ি থেকে বের হয়ে যেতেই—সিঁড়ির নিচে গিয়ে আত্মগোপন করে রইলাম কাবেরীর অপেক্ষায়। ঠিক রাত সাড়ে এগারোটার কিছু পরে সিঁড়িতে পদশব্দ পেলাম, বুঝলাম কাবেরী আসছে। সত্যিই কাবেরী! কাবেরীকে অনুসরণ করলাম নিঃশব্দে। কাবেরী তালাচাবি খুলে নরেনের বাড়ির পশ্চাতের দ্বারপথে প্রবেশ করল—গলির মধ্যে অন্ধকারে কিছুদূরে আত্মগোপন করে রইলাম।

রহমান এমন সময় প্রতিবাদ জানিয়ে ওঠেন, তা হলে মিঃ চৌধুরী, আপনি যদি কাবেরী দেবীকে ফলো করে থাকেন, তবে কেমন করে—

হাঁ হাঁ, আমি—আমিই খুন করেছি! মিঃ চৌধুরী চিৎকার করে ওঠেন।

না, আপনি খুন করেন নি। নিজের মেয়েকে বাঁচাতে গিয়ে আপনি মিথ্যা কথা বলছেন—খুন করেছেন তাকে আপনার বড় মেয়ে কৃষ্ণা!

এতক্ষণ কিরীটী নীরবে সঞ্জীব চৌধুরীর কথা শুনতে শুনতে ভ্রূ কুঞ্চিত করে কি যেন ভাবছিল, হঠাৎ সে বলে ওঠে কৃষ্ণার দিকে তাকিয়ে, Now কৃষ্ণা দেবী, বলুন আপনি কি জানেন!

সকলের দৃষ্টি কিরীটীর কণ্ঠস্বরে যুগপৎ গিয়ে অদূরে দণ্ডায়মান কৃষ্ণার উপরে পড়লো। সকলের চোখে অদ্ভুত এক দৃষ্টি। একসঙ্গে পাঁচজোড়া চোখের অনুসন্ধানী, সন্দিগ্ধ দৃষ্টি যেন কৃষ্ণাকে গ্রাস করছে। কিরীটীর অদ্ভুত ঋজু কঠিন কণ্ঠস্বর এবারে যেন সকলকেই সচকিত করে তোলে। সে বললে, বলুন কৃষ্ণা দেবী আপনার যা বক্তব্য বলুন!

আবার প্রতিবাদে চিৎকার করে উঠলেন সঞ্জীব চৌধুরী, আমি তো বলছি, ও কিছু জানে না মিঃ রায়! কেন—কেন মিথ্যে মিথ্যে ওকে আপনারা পীড়ন করবেন?

এবারে কিরীটী সঞ্জীব চৌধুরীর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে, মিঃ চৌধুরী, আপনি যদি এভাবে আমাদের কাজে বাধা দেন তো বাধ্য হবো আপনাকে পুলিসের হেফাজতে পাশের ঘরে পাঠিয়ে দিতে!

কিন্তু যা ও জানে না তার জন্য ওকে আপনারা পীড়ন করবেন? বিশ্বাস করুন আমার কথা মিঃ রায়, ও কোন কথাই গোপন করে নি—কৃষ্ণা সম্পূর্ণ নিরপরাধ। করুণ মিনতিতে যেন সঞ্জীব চৌধুরীর কণ্ঠস্বর ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল।

কিন্তু আমি বলছি, উনি—আপনার বড় মেয়ে কৃষ্ণা দেবী অনেক কিছুই গোপন করে রেখেছেন। কৃষ্ণা দেবী, আমার দিকে ফিরে তাকান, এখনো বলুন সব কথা!

কৃষ্ণা যেন পাথর। কেবল দেহই নয়, যেন তার অনুভূতিও পাথর হয়ে গিয়েছে। নিষ্কম্প ভাবলেশহীন দৃষ্টি।

কৃষ্ণা দেবী, আর চুপ করে থেকে লাভ হবে না! বলুন, কি আপনার বলবার আছে?

আমি—আমি কিছুই জানি না। এতক্ষণে ক্ষীণকণ্ঠে প্রত্যুত্তর শোনা গেল কৃষ্ণার।

আপনি কিছুই জানেন না?

না।

বেশ। তবে সে রাত্রে অর্থাৎ ২৭শে পৌষ রবিবার, যে-রাত্রে নরেন মল্লিক নিহত হয়, সে-রাত্রে কেন গিয়েছিলেন মল্লিক ভবনের পিছনদিককার বাগানে?

বাগানে আমি যাই নি।

আমি জানি আপনি গিয়েছিলেন এবং তার প্রমাণও আমার হাতে আছে। কঠোর প্রতিবাদ জানায় কিরীটী।

প্রমাণ!

হাঁ। দেখুন তো এটা চিনতে পারেন কিনা? বলতে বলতে পকেট থেকে একটা গগলস্ বের করে হাতটা সামনের দিকে তুলে ধরল কিরীটী, চিনতে নিশ্চয়ই কষ্ট হচ্ছে না আপনার যে এটার মালিক আপনিই! দেখুন, ভাল করে চেয়ে দেখুন—চশমাটার ডাঁটে দেখুন লেখা আছে 'কৃষ্ণা' ইংরাজীতে। নিশ্চয়ই কোন একসময় নিজের নামটা ডাঁটের গায়ে কুঁদে

নিয়েছিলেন, পাছে আপনার বোন কাবেরী দেবীর চশমার সঙ্গে গোলমাল হয়ে যায় বলে, তাই নয় কি? এটা আমি কুড়িয়ে পেয়েছি বাগানে ডালিয়ার ঝাড়ের কাছে।

কৃষ্ণা একেবারে নির্বাক নিষ্কম্প।

চুপ করে আছেন যে! এ চশমাটা কি আপনার নয়?

হাঁ আমারই।

তাহলে এবার বলুন কেন সেরাত্রে বাগানে গিয়েছিলেন? কারো সঙ্গে দেখা করতে কি?

হাঁ।

কার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন? বিনতা দেবী, না মিঃ মল্লিকের সঙ্গে?

কিরীটীর কথায় যেন ভূত দেখার মতই চমকে মুখ তুলে তাকাল কৃষ্ণা ওর মুখের দিকে।

চম্‌কে উঠবেন না। কিন্তু বুঝতেই পারছেন যে, আমি জানি যে বিনতা দেবীর সঙ্গে আপনার আলাপ ছিল!

সঞ্জীব চৌধুরী চিৎকার করে ওঠেন এমন সময় সহসা, কৃষ্ণা!

কিন্তু কিরীটী সে চিৎকারে যেন ভ্রূক্ষেপও করল না। কৃষ্ণার মুখের দিকে তাকিয়েই আবার প্রশ্ন করল, কি করে আপনার বিনতা দেবীর সঙ্গে আলাপ হলো, বলবেন কি?

তিনিই আমাকে চিঠি দিয়ে ডেকে নিয়ে গিয়ে আলাপ করেছিলেন। মৃদু ক্ষীণ কণ্ঠে কৃষ্ণা প্রত্যুত্তর দেয়।

হাঁ। তাহলে সেই আলাপের সূত্র ধরেই তিনি এখানেও ইদানীং মধ্যে মধ্যে রাত্রে এসে আপনার সঙ্গে দেখা করতেন তাই বোধ হয়, না?

হাঁ।

কিন্তু জানেন কি তাঁর সত্যিকারের পরিচয়টা?

না।

জানেন না?

না।

সত্যি বলছেন, জানেন না? তিনিও কখনও তাঁর পরিচয় দেন নি?

না।

সেরাত্রে তাহলে আপনি বাগানে তাঁরই সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন?

হাঁ।

কেন?

তিনি ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

কেন?

তাঁর কিছু কথা আমাকে বলবার ছিল তাই।

কি কথা জানতে পারি কি?

ক্ষমা করবেন। বলতে পারবো না।

ঠিক ঐ সময় চন্দ্রনাথ এসে ঘরে প্রবেশ করল। কিরীটী চন্দ্রনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করল, কি খবর চন্দ্রনাথ? তুমি একা?

তাঁকে পাওয়া গেল না সে-বাড়িতে।

পেলে না?

না। আজ সকালেই তিনি সে-বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছেন।

কোথায় কিছু জানতে পারলে?

না। কেউই তা বলতে পারল না। তবে—

কি?

বাড়িওয়ালার হাতে তিনি আপনার নামে একখানা চিঠি দিয়ে গিয়েছেন যাবার আগে।

চিঠি!

হাঁ, এই যে, চন্দ্রনাথ জামার পকেট থেকে একটা মুখ-আঁটা পুরু সাদা খাম নিঃশব্দে এগিয়ে দিল কিরীটীর দিকে।

মুখ-আঁটা খামটার উপরে পরিষ্কার অক্ষরে বাংলায় লেখা—শ্রীযুক্ত কিরীটী রায় সমীপেষু। ঘরের মধ্যে উপস্থিত অন্যান্য সকলেই তখন স্তব্ধ বিস্ময়ে কিরীটী ও চন্দ্রনাথের পরস্পরের কথোপকথন শুনছিল। কিরীটী খামটা ছিঁড়ে ফেলল। ভিতর থেকে বের হলো একখানা চিঠি। দীর্ঘ তিনপৃষ্ঠা ব্যাপী। কিরীটী চিঠিটা পড়তে লাগল ঃ

কিরীটীবাবু,

আপনি সেরাত্রে ঠিকই আমাকে চিনেছিলেন, ভুল আপনার হয় নি। ভেবেছিলাম কাউকে কিছু না জানিয়েই নিঃশব্দে চিরদিনের মত সরে যাবো। কিন্তু পরে ভেবে দেখলাম নরেন মল্লিকের হত্যার ব্যাপারে আমার নিজস্ব বক্তব্যটুকু অন্তত যদি না জানিয়ে যাই শেষ বিদায়ের আগে, কোন তৃতীয় নিরপরাধ ব্যক্তি হয়তো শেষ পর্যন্ত নরেন মল্লিকের হত্যাপরাধের সন্দেহে অযথা পীড়িত হবে। সেও একটি কথা এবং নরেনের হত্যা-ব্যাপারটার সঙ্গে এমন দু'জন জড়িত আছে যাদের চাইতে প্রিয় এ জগতে আমার আর কিছুই নেই—এবং বিশেষ করে শেষোক্ত কারণেই এই চিঠিখানা যাবার আগে আপনাকে লিখে গেলাম।

সেদিন রাস্তার মাঝখানে গ্যাসের আলোয় আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আপনার চোখে যে বিস্ময় ফুটে উঠেছিল তা আমার নজর এড়ায় নি। কিন্তু সে বিস্ময়কে জানতে হলে আমার অতীত কাহিনী আপনার জানা প্রয়োজন। শুধু তাই নয়, আমার কথা বুঝতে হলেও আমার অতীত না জানলে সবটা ঠিক বুঝে উঠতে পারবেন না।

আজ থেকে প্রায় কুড়ি বছর আগেকার কথা। কাহিনী হচ্ছে একটি তথাকথিত আলট্রা-মডার্ন বা আলোকপ্রাপ্তা(?) শিক্ষিতা(?) তরুণীর কাহিনী। ভগবান রূপ দিয়েছিলেন তার দেহে অকৃপণভাবে ঢেলে। কিন্তু জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অর্থাৎ তার দেহে যখন কৈশোর এলো তখন থেকেই তার মা তাকে তার রূপ সম্পর্কে এমন আত্মসচেতন করে তুলেছিল যে যৌবন তার দেহে আসবার আগেই রূপের দেমাকে হয়ে উঠেছিল সে আত্মহারা, তার সঙ্গে মায়ের শিক্ষায় হয়ে উঠেছিল সে উচ্ছৃঙ্খল বেপরোয়া। মা'র কাছ থেকে সে শিক্ষা পেয়েছিল, নারীর রূপ হচ্ছে পুরুষ-পতঙ্গকে পোড়াবার জ্বলন্ত অগ্নিশিখা এবং যে মেয়ে সে নীতিকে জীবনে না অনুসরণ করে, তার দুঃখের আর সীমা থাকে না। বোকা মেয়ে তাকেই জীবনের পরম সত্য বলে মেনে নিয়ে এগিয়ে চলল।

উচ্ছৃঙ্খল জীবনে তার হৃদয় বলে কোন পদার্থই ছিল না। অর্থাৎ দেহের অভ্যন্তরে যে একটা মন থাকতে পারে তার সন্ধান সে কোন দিনই পায় নি। রূপমুগ্ধ পুরুষদের নিয়ে খেলা

করাই ছিল তার একমাত্র কাজ। এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে শোষণ। এমনি করে যখন জীবনের একুশটা বছর কেটে গিয়েছে, এমন সময় দেখা হলো তার একটি পুরুষের সঙ্গে কোন একটি পার্টিতে, যে পুরুষটির তথাকথিত ঐসব মেয়েদের সম্পর্কে কোন জ্ঞানই ছিল না। পুরুষটির তখন বয়স চল্লিশের কোঠা ছাড়িয়ে চলেছে।

ধীর, সৌম্য, শান্ত, রূপবান এবং অবস্থা খুব ভাল। কলকাতায় তিন-চারখানা বাড়ি, মোটা ব্যাংক-ব্যালেন্স। পুরুষটিও পার্টিতে প্রথম দিন সেই মেয়েটিকে দেখেই মুগ্ধ হলো। মেয়েটিরও যে পুরুষটির উপরে কিছুটা দুর্বলতা জেগেছিল সেদিন অস্বীকার করা যায় না। যাহোক সেই পার্টির পর থেকেই দু'জনার মধ্যে আলাপ জমে উঠলো। মেয়েটির মা একদিন বললে, যদি বিয়ে করতে হয় তো একেই কর্। গোবেচারী ধরনের লোক। টাকাকড়ি যথেষ্ট আছে। বয়সও হয়েছে। একে তুই অনায়াসেই মুঠোর মধ্যে রেখে নিজের খুশিমত জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারবি। তাছাড়া আজ রূপ-যৌবন আছে, কিন্তু একদিন যখন ওসব কিছুই থাকবে না তখন একটা শক্ত আশ্রয় না পেলে বাঁচতে পারবি না। মেয়েটিও ভেবে দেখলো, কথাটা নেহাৎ মিথ্যা নয়। যার ফলে মেয়েটির সঙ্গে পুরুষটির বিবাহ হয়ে গেল।

কিন্তু কয়েক মাস না যেতেই দুটি সত্য মেয়েটির চোখের সামনে অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠলো। তার একটি হচ্ছে, নির্বিবাদী শান্ত ও সংযমী পুরুষ হলেও তার স্বামীর মনের মধ্যে একটা লৌহ কঠিন পৌরুষ আছে যা সহজে বিদ্রোহ ঘোষণা করে না বটে কিন্তু একবার বিদ্রোহী হলে তাকে শান্ত করা স্বয়ং বিধাতারও দুঃসাধ্য। দ্বিতীয়, লোকটির অসম্ভব এবং অত্যুগ্র একটা আভিজাত্য ও রুচিবোধ আছে। যার ফলে কারোই সহজ চলার পথে সে অনিচ্ছা থাকলেও বাধা দেয় না। এবং ঠিক দুটি কারণেই মেয়েটি বিবাহের পরও যখন তার স্বামীকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করেই নিজের গতানুগতিক উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে গা ভাসিয়ে চলতে লাগল, স্বামীর গৃহ থেকে বহুদিন পর্যন্ত কোন বাধাই পায় নি—আর ঐটাই হলো তার জীবনের সব চাইতে বড় ভুল। যে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত তাকে সর্বস্ব দিয়ে করতে হলো। বেঁচে থেকেও তিলে তিলে প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করতে কাউকে দেখেছেন কি মিঃ রায়! ধারণা করতে পারবেন না—সে কি যন্ত্রণা সে কি দাহ!

যাক্ যা বলছিলাম—বুঝতে পারছেন বোধ হয় সেই মেয়েটিই আমি!

বিবাহের দুই বৎসরের মধ্যেই আমি মা হলাম। কিন্তু তবু হতভাগিনী আমার চোখ খুলল না। যে মাতৃত্ব নারীকে দেয় নতুন জীবন, যে মাতৃত্ব নারীর জীবনে আনে অমৃতের স্বাদ, সে মাতৃত্ব পেয়েও আমি সুধা ফেলে গরলের পিছনেই ছুটতে লাগলাম! আকণ্ঠ গরল পান করেই নেশায় বুঁদ হয়ে রইলাম। সেই গরলই হচ্ছে আপনাদের ঐ নরেন মল্লিক। নরেনের দুটো নাম ছিল—একটা পোশাকী, একটা সর্বত্র চলতি। চলতি নামটা আর করবো না, নরেন নামটাই বলি।

জানি না সদ্য বিলাত-প্রত্যাগত ঐ নরেন কি কুক্ষণেই আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল! ঐ নরেনই শেষ পর্যন্ত আমার এত দুঃখের কারণ, নরেনই দিল আমাকে যত উৎসাহ, যত বুদ্ধি—বুদ্ধি নয় বলবো দুর্বুদ্ধি!

স্বামী আমার কোন কাজেই বাধা দেন না। মুক্ত স্বাধীন আমি। যথেচ্ছাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে দিন কাটছে। আর বিশ্বাস করে স্বামী তাঁর যে অর্থ ও সম্পত্তি আমার হাতে তুলে দিয়ে

নিশ্চিন্ত ছিলেন—সেই অর্থ ক্রমে ক্রমে নিঃশেষ হয়ে আসছে। কিন্তু জেনেও বুঝতে পারি নি, চোখ আমার খোলে নি যে প্রায়শ্চিত্তের দিন আমার এগিয়ে এসেছে!

হঠাৎ তারপর একদিন এলো আমার স্বামীর চিঠি, কলকাতার বাস উঠিয়ে এবার তাঁর কাছে যেতে হবে। তখনও ভেবেছি ও কিছু না। কেবল একটা নিছক হুমকিই বুঝি। আর নরেনও তাই আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করল। কিন্তু অকস্মাৎ যেদিন স্বামী এসে হাজির হলেন, তাঁর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করেই বুঝলাম, কোথায় যেন সত্যিকারের গণ্ডগোল ঘটেছে। আমার ভাগ্যাকাশে কত বড় দুর্যোগের মেঘ ঘনিয়ে এসেছে। চারিদিকে ঘনিয়ে এসেছে ঝড়ের কালো মেঘ! সুখের স্বপ্ন আমার ভাঙার মুখে। কিন্তু মানুষের দুর্ভাগ্য, রাহু যখন একবার তাকে গ্রাস করে মুক্তি যে তার সহজে মেলে না তা তো বুঝি নি! তাই সেদিন রাত্রেই গৃহে ফিরে স্বামীর কণ্ঠস্বরে সেই মেঘই যখন গর্জে উঠলো, তখনই স্পষ্ট বুঝলাম আগুন জ্বলছে এবং ভয়াবহ সে আগুন মেলেছে শত শত লোল বাহু। রক্ষে নেই আর। মুহূর্তে সে আগুন আমার সর্বাঙ্গে বেষ্টন করে ধরল। পদাঘাতে বিতাড়িত হলাম আমি সেই রাত্রেই স্বামীগৃহ থেকে। ধাক্কা খেয়ে সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে গড়াতে নীচে এসে পড়লাম কিন্তু তবু মৃত্যু আমাকে আশ্রয় দিল না। দেবেই বা কেন? পাপের প্রায়শ্চিত্ত যে তখনও আমার পূর্ণ হয় নি। রক্তাক্ত মুখে ছুটে গেলাম সেই রাত্রেই নরেনের গৃহে। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখি—নরেন তখন আর এক নারীর আলিঙ্গনে বদ্ধ। একে অপমানের জ্বালায় পুড়ছিলাম, তার উপরে নরেনের সেই মিথ্যাচার প্রতারণা আমাকে যেন একেবারে হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য করে তুলল। নরেনকে আঘাত দেবো বলে পাগলিনীর মতো যেমন তার দিকে এগিয়ে গিয়েছি সে আমাকে দিল একটা প্রচণ্ড ধাক্কা। সামলাতে না পেরে গিয়ে পড়লাম টেবল-ল্যাম্পটার ওপরে। বিস্ফোরণের শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারালাম। তিন দিন পরে জ্ঞান ফিরে এলো হাসপাতালে। সমস্ত মুখে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। টেবল-ল্যাম্পটা ফেটে সমস্ত মুখটা ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিল, পরে জানতে পারি। এবং হাসপাতাল থেকে তারপর বের হয়ে এলাম একদিন মুখের উপরে অবগুণ্ঠন টেনে। সেই হলো নবজন্ম। নাম নিলাম বিনতা।

এবারে শুনুন বিনতার ইতিহাস ঃ

মাসচারেক বিনতা বাংলাদেশের একেবারে বহুদূরে এক তীর্থক্ষেত্রে আত্মগোপন করে রইলো। এবং ঐ চার মাস সময়ের মধ্যে প্রচণ্ড এক অগ্নিদাহ চলেছিল বিনতার নিভৃত মনে। এবং সেই অজ্ঞাতবাসের সময়েই বিনতা জানতে পারল যে তার নারীমনের মধ্যে সহজাত যে মাতৃত্ব, যাকে সে এতকাল কণ্ঠরোধ করে অবহেলা ও অবজ্ঞায় অস্বীকার করার চেষ্টা করে এসেছে—কোন নারীই যাকে আজ পর্যন্ত অস্বীকার করতে পারে নি, তাই মনের এক কোণে জ্বলছে যখন প্রতিহিংসার ভয়াবহ অগ্নিস্রোত, অন্য কোণে চলেছে বয়ে নিঃশব্দে অতৃপ্ত মাতৃত্বের স্নিগ্ধ এক ক্ষীণ ধারা এবং একদিন সেই ধারাই তাকে অজ্ঞাতবাস থেকে টেনে নিয়ে এলো কলকাতা শহরে তার ছেড়ে যাওয়া সন্তানদের সন্ধানে। এসে শুনল স্বামী তার সন্তানদের নিয়ে সেই রাত্রেই কোথায় যেন নিখোঁজ হয়েছেন। আরো শুনলো নরেন মল্লিকও বর্মায় গিয়ে আত্মগোপন করেছে। কিন্তু অতৃপ্ত মাতৃত্ব তাকে যেন স্থির থাকতে দিচ্ছিল না। সে বের হলো তার সন্তানদের সন্ধানে এবং শুনে হয়ত আশ্চর্য হবেন, শেষ পর্যন্ত ঘুরতে ঘুরতে সে পেল তার সন্তানদের সন্ধান। দূর থেকে আজ সে শুধু দেখেই তার বুকজোড়া নিধিদের কিন্তু অধিকার

নেই তার তাদের স্পর্শ করবার। দূরত্ব রেখেই সে তার সন্তানদের পিছনে পিছনে সর্বত্র ছায়ার মতই ঘুরতে লাগল। ভাবতে পারবেন না মিঃ রায়, এক অভাগিনী জননীর দিনের পর দিন তার বুকভরা স্নেহের সঙ্গে সে কি যুদ্ধ! কত সময় মনে হয়েছে ছুটে গিয়ে তাদের বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরি কিন্তু স্বামীর ভয়ে ও নিজের কলঙ্কিত পরিচয় পাছে তার সন্তানদের শুভ্রতায় কালি ছিটায়, পারেনি সে অভাগিনী নারী কোনদিনই তাদের সামনে দাঁড়াতে। বুকভরা তৃষ্ণার হাহাকার নিয়ে সে দূরে সরে রয়েছে। তারপর দীর্ঘকাল পরে আবার তার স্বামী কলকাতায় এলে তাঁর সন্তানদের নিয়ে। এবং তারই বছর দেড়েক বাদে বর্মা প্রত্যাগত নরেন মল্লিক এসে কলকাতায় জাঁকিয়ে বসল। আপনি বোধহয় বুঝতে পারছেন কৃষ্ণা কাবেরীর অভাগিনী জননীই আমি। নরেন যে কলকাতায় ফিরে এসে জাঁকিয়ে বসেছে আগে কিন্তু তা টের পাই নি। হঠাৎ একদিন রাত্রে নরেনকে পার্ক সার্কাসের একটা স্টেশনারী দোকানে দেখে চমকে উঠলাম। তার পাশে ছিল কাবেরী। দোকানের উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোয় এতকাল পরে নরেনকে দেখেও আমার চিনতে কষ্ট হয় নি। কিন্তু নরেনকে দেখে যতখানি না চমকে ছিলাম, তার চাইতেও বেশি চমক লেগেছিল আমার সেরাত্রে নরেনের পাশে আমার মেয়ে কাবেরীকে দেখে। আমার কাজকর্ম করবার জন্য ও আমাকে সদাসর্বদা দেখাশোনা করবার জন্য একটি পাহাড়ী ভৃত্য ছিল বীরবাহাদুর। তাকে নিযুক্ত করলাম নরেনের সমস্ত সন্ধান নেবার জন্য। সে-ই আমাকে নরেনের সব সংবাদ এনে দিল। তার মুখেই শুনলাম নরেনের গৃহে কৃষ্ণা কাবেরী দুজনারই যাতায়াত আছে। শয়তান নরেন মল্লিককে আমি চিনি। সে একদিন আমার জীবনে রাহুর মত উদয় হয়ে আমার সর্বস্ব গ্রাস করেছিল, আজ আবার সে আমার আত্মজাদের জীবনে রাহুর মত উদয় হয়েছে। বহুদিনের পুরাতন ক্ষতে আবার নতুন করে রক্ত ঝরতে লাগল। নরেনের হাত থেকে যেমন করেই হোক আমার কৃষ্ণা ও কাবেরীকে বাঁচাতে হবে প্রতিজ্ঞা করলাম। কিন্তু কেমন করে? এমন সময় ভগবানই যেন হাতে আমার সুযোগ এনে দিলেন। নরেন একজন হাউস-মেইডের জন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল। একটা দরখাস্ত ছেড়ে দিলাম। অনেকের সঙ্গে নয়, মাত্র তিনজনের ইন্টারভিউ হলো। লক্ষ্য করেছিলাম আমার কণ্ঠস্বর শুনেই নরেন যেন হঠাৎ চম্‌কে উঠেছিল। তারপর নানাভাবে আমাকে একটার পর একটা প্রশ্ন করে যেতে লাগল। বুঝেছিলাম আমাকে সে তার পূর্বপরিচিত সন্দেহ-বশেই যাচাই করে দেখছিল—তার সন্দেহ বা অনুমান সত্য কিনা। কি বুঝল জানি না, তবে আমাকেই সে কাজে বহাল করলো।

মাথায় দীর্ঘ অবগুণ্ঠন টেনে থাকলেও এবং কারো সঙ্গে একমাত্র মধু ছাড়া ও বাড়িতে কোনপ্রকার কথাবার্তা না বললেও, দুটি কান আমার সর্বদা সজাগ থাকত। চক্ষুও আমার সজাগই থাকত অবগুণ্ঠনের তলায়।

কিছুদিন যেতেই দুটি ব্যাপার নজরে পড়লো। একটি হচ্ছে কৃষ্ণা ও কাবেরীর নরেনের গৃহে যাতায়াত আছে। এবং নরেন ওদের মধ্যে কৃষ্ণার প্রতি আসক্ত ও কাবেরী নরেনের প্রতি আসক্ত। এবং দ্বিতীয়তঃ কৃষ্ণা ও কাবেরীর মধ্যে কাবেরীই যেন পেয়েছে আমার অতীতের মনোবৃত্তি। কৃষ্ণা হয়েছে তার বাপের মত স্থির ধীর ও সংযত। আরো একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছিলাম, সুবিমল কাবেরীর প্রতি আসক্ত কিন্তু কাবেরী সুবিমলকে নিয়ে খেললেও তার নজর ছিল আসলে নরেনের প্রতি নয়, তার সঞ্চিত বা অর্জিত অর্থের প্রতি। সঙ্গে সঙ্গে আমি

সাবধান হলাম,—সতর্ক হলাম, যাতে করে নরেনের দ্বারা ওদের কোন অনিষ্ট না হয়। জানতাম আমি, মধ্যে মধ্যে রাত্রে কাবেরী বাগানের দ্বারপথে ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে বাথরুমের দরজাপথে নরেনের ঘরে গিয়ে প্রবেশ করত। তাদের দেখাসাক্ষাৎ হতো রাত্রে গোপনে। ঐ ব্যাপারটাই আমাকে সত্যিকারের চঞ্চল করে তোলে। অর্থের লোভে কাবেরীর নরেনের গৃহে রাত্রের ঐ গোপন অভিসার যে একদিন কাবেরীর সর্বনাশ ডেকে আনবে এ যেন কেন মন আমার পূর্বেই বলেছিল। তাই একদিন শেষ পর্যন্ত কাবেরীর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় ভীতা আমি রাত্রে নরেনের শয়নঘরে গিয়ে প্রবেশ করলাম।

আমি জানতাম রাত বারোটা সাড়ে বারোটার আগে কখনো সে ঘুমোয় না। সে রাত্রেও সে জেগেই ছিল। ঘরের দরজাটা ভেজানো ছিল। অবিশ্যি আশাও করি নি যে ঘরের দরজাটা খোলা থাকবে। বলতে পারেন দৈবই আমার সহায় ছিল বোধ হয় সেরাত্রে। নিঃশব্দে ভেজানো দরজাটা একটু ঠেলতেই দরজার কবাট দুটো ফাঁক হয়ে গেল। আর সেই ফাঁক দিয়ে ঘরের মধ্যে দৃষ্টিপাত করেই আমি যেন চম্‌কে উঠলাম। চেয়ারের উপর বসে আছে নরেন আর তার হাতে একটা ছোট কেসে একটা বাদামের আকারের পাথর যার সংকীর্ণ বিচ্ছুরিত জ্যোতি ঘরের টেবিল-ল্যাম্পের মৃদু আলোকে ছাপিয়ে যাচ্ছে যেন। পরে বুঝেছিলাম সেটা একটা দামী হীরা। সামান্য কয়েকটা মুহূর্ত ইতস্তত করে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করলাম। নিজের মধ্যে তন্ময় ছিল নরেন তাই বোধ হয় প্রথমটায় ঘরের মধ্যে আমার নিঃশব্দ পদসঞ্চার সে টের পায় নি। কিন্তু আমি দু'পা এগুতেই সে টের পেল। চম্‌কে লাফিয়ে উঠে হীরাটা জামার পকেটে লুকিয়ে ফেলে সে তখন উঠে দাঁড়িয়েছে।

কে? এ কি—বিনতা তুমি? তুমি এ সময়ে এ ঘরে কেন?

আমার দু-একটা কথা ছিল আপনার সঙ্গে।

আমার সঙ্গে কথা!

হাঁ।

কি কথা তোমার?

কৃষ্ণা কাবেরীর সঙ্গে আপনি মিশতে পারবেন না!

আমার বক্তব্য এত আকস্মিক ও এত বিস্ময়কর যে প্রথমটায় নরেন যেন হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে সম্পূর্ণ প্রসঙ্গান্তরে চলে গেল। নিষ্ঠুর হাসিতে তার মুখটা ভরে গেল। এবং প্রায় চাপা কণ্ঠেই সে বলল, তাহলে আমার অনুমান মিথ্যা নয়!

কি বলছেন আপনি?

কি যে ঠিক আমি বলছি তা তুমিও জান! তাহলে তুমি আজো বেঁচে আছো! বলতে বলতে হঠাৎ নরেন এগিয়ে এলো যেন মন্ত্রমুগ্ধের মত। করুণা—করুণা—তুমি তাহলে সত্যিই আজো বেঁছে আছো?

সঙ্গে সঙ্গে দু'পা পিছিয়ে গিয়ে কঠোর কণ্ঠে আমি বললাম, কি সব পাগলের মত যা-তা বলছেন! কে করুণা?

কেন মিথ্যে ছলনা করছো করুণা?

আপনি ভুল করছেন—আমি করুণা নই, আমি বিনতা।

তুমি করুণা নও?

না।

বেশ। করুণা তুমি নও—তুমি বিনতাই, কিন্তু কৃষ্ণা কাবেরীর সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক?

সে শুনে আপনার লাভ নেই। আপনাকে যা বললাম তাই করবেন।

ক্ষণকাল চুপ করে থেকে নরেন বললে, আর তা যদি না করি?

আপনার ভালর জন্যই কথাটা বললাম। যদি আমার কথা আপনি না শোনেন—

না শুনি তো কি?

কৃষ্ণা কাবেরীর বাপ সঞ্জীব চৌধুরীকে সব আমি জানাবো। জানবেন আপনার সত্যিকারের পরিচয় সে জানতে পারলে আপনাকে সে এবারে আর জীবন্ত রাখবে না।

আমার সত্যিকারের পরিচয়?

হাঁ। আমি সব জানি আপনার অতীত ইতিবৃত্ত। যা বললাম মনে থাকে যেন। আমি চললাম। বলে আর এক মুহূর্ত আমি অপেক্ষা করলাম না, ঘর থেকে বের হয়ে এলাম। কিন্তু তারপর কয়েকদিন লক্ষ্য করে দেখলাম, আমার সাবধান বাণী নরেনকে এতটুকুও বিচলিত করতে পারে নি।

তখন অনন্যোপায় হয়ে আমি কৃষ্ণাকেই একটি চিঠি দিলাম রাত্রে গোপনে বাগানে আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য। তাকে নরেন সম্পর্কে সাবধান করে দেবো, যাতে সে কাবেরীকে বুঝিয়ে বলে সময় থাকতে নিবৃত্ত করতে পারে।

নরেনের জন্মতিথির উৎসবের আগের রাত্রে কৃষ্ণা এলো গোপনে বাগানে আমার সঙ্গে দেখা করতে। মা ও মেয়েতে এই প্রথম সামনাসামনি ও প্রথম কথা।

কৃষ্ণা বললে, আপনি আমাকে চিঠি দিয়েছিলেন দেখা করবার জন্য?

হাঁ।

কেন বলুন তো?

এ বাড়ির মালিক নরেন মল্লিকের সঙ্গে তোমরা মিশো না।

কেন এ কথা বলছেন?

তোমাদের মঙ্গলের জন্যই বলছি। তা ছাড়া আমার নিশ্চয়ই ধারণা, তোমরা যে এখানে যাতায়াত কর এবং নরেন মল্লিকের সঙ্গে মেশো—নিশ্চয়ই তোমাদের বাবা জানেন না!

আমার শেষের কথায় যেন কৃষ্ণা ভয়ানক চমকে উঠলো।

আপনি—আপনি সে কথা জানলেন কি করে?

মৃদু হেসে বললাম, জানি।

আপনি—আপনি কি আমার বাবাকে চেনেন?

মৃদু, অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে বললাম, এককালে পরিচয় ছিল।

কিন্তু আপনি—আপনি কে?

আমি এ বাড়ির হাউস্-মেইড্।

না, না—তা নয়। আপনার পরিচয়—কি করে আমার বাবাকে আপনি জানলেন?

তোমার মা আমার বান্ধবী ছিলেন কলেজের ছাত্রীজীবনে।

আপনি তাহলে আমার মাকে জানতেন?

জানতাম। বলেই হঠাৎ যে কি হলো, একটা কথা কৃষ্ণাকে জিজ্ঞাসা করবার লোভ যেন কিছুতেই সামলাতে পারলাম না।

জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার—তোমার মাকে মনে আছে কৃষ্ণা?

মা!

হাঁ, মনে আছে তাকে তোমার?

খুব অস্পষ্ট মনে পড়ে, আবছা আবছা—

তোমার বাবার মুখে কোনদিন শোন নি তোমাদের মা'র কথা?

না। কেবল এইটুকুই একবার শুনেছিলাম—

কি—কি শুনেছিলে?

আমাদের খুব ছোটবেলায় মা নাকি কি একটা অ্যাকসিডেন্টে মারা যান।

অ্যাকসিডেন্টে মারা যান?

হাঁ। তাছাড়া—

তাছাড়া আর কি কৃষ্ণা?

বড় হয়ে ভাল করে জ্ঞান হবার পর বুঝতে পেরেছিলাম, বাবা নিজেও যেমন মা'র স্মৃতি কখনো মনে করতে চান না—তেমনি আমাদেরও মনে করতে দেন নি। তাতেই মনে হয়—

কি?

মা'র ব্যাপারে বাবার মনের মধ্যে কোথাও যেন একটা মর্মান্তিক দুঃখ লুকিয়ে আছে। তাই আমরাও কখনো ও সম্পর্কে ভুলেও উচ্চবাচ্য করি নি। একটা ছবি পর্যন্ত বাড়িতে কোথাও নেই মা'র। অথচ—

কি কৃষ্ণা?

মুখে বাবা যাই বলুন না কেন, আমার কিন্তু ধারণা বাবার মনের মধ্যে আজও মা বেঁচে আছেন।

কৃষ্ণা!

হাঁ, কতদিন ঘুমের মধ্যে বাবাকে মা'র নাম ধরে ডাকতে শুনেছি। তাই তো ব্যাপারটা চিরদিন যেন কেমন গোলমেলে মনে হয়েছে। আচ্ছা আপনি তো মা'র বান্ধবী ছিলেন, আপনি জানেন কিছু মা'র অ্যাকসিডেন্টে মৃত্যুর কথা?

না। কেবল শুনেছিলাম এক রাত্রে আগুনে পুড়ে তার মৃত্যু হয়।

আগুনে পুড়ে মারা গিয়েছিলেন মা?

হাঁ। কিন্তু আর দেরি করো না কৃষ্ণা—রাত অনেক হলো, এবারে বাড়ি যাও।

সে-রাত্রে কৃষ্ণা চলে গেল। কিন্তু বাকী রাতটুকু মুহূর্তের জন্যও চোখের পাতায় আমার ঘুম এলো না।

আমার বক্তব্য শেষ হয়ে এসেছে মিঃ রায়। এবার নরেন মল্লিকের মৃত্যুর কথা বলে এ কাহিনীর উপরে আমি পূর্ণচ্ছেদ টেনে দেবো।

মনে আছে সে তারিখটা, ২৭শে পৌষ সোমবার। নরেনের গৃহে তার জন্মতিথি উৎসব। বিরাট হৈ-চৈ হলো বিকেল চারটে থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত। ভিড় কমতে কমতে রাত প্রায় পৌনে আটটা হলো। নরেন উৎসবের পরে বের হয়ে গিয়েছিল। ফিরলো রাত দশটায়।

উৎসব-শেষে সমস্ত বাড়িটা যেন অকস্মাৎ একেবারে নিঝুম হয়ে গিয়েছে। উৎসবের খাটুনিতে শরীরটা ক্লান্ত হয়ে ছিল, নিজের ঘরে শয্যার উপরে আলো নিবিয়ে চোখ বুজে পড়েছিলাম। আপনি লক্ষ্য করেছেন কিনা জানি না, নরেনের শয়নঘরের ঠিক নীচের ঘরেই আমি থাকতাম। তাই উপরের ঘরের সামান্যতম শব্দও রাত্রে নীচের ঘরে আমার কানে আসতো। রাত তখন বোধ করি সাড়ে এগারটা হবে, হঠাৎ মনে হলো উপরের ঘরে কি যেন একটা ভারী বস্তু মেঝেতে পড়ল। তারপরই একটা দুপ্‌দাপ পায়ের শব্দ। কি রকম কৌতূহল হলো, তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বের হয়ে দোতলার সিঁড়ির দিকে এলাম। সিঁড়ির প্রথম ধাপ পার হয়ে দ্বিতীয় ধাপে উঠেছি, দেখি কে যেন অত্যন্ত দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে। সিঁড়ির আলোটা রাত্রে নেভানোই থাকত, তাই হয়তো অন্ধকারে সে আমাকে দেখতে পায় নি বা উত্তেজনায় আমার দিকে নজর দেবার ফুরসৎ পায় নি। আমি তাড়াতাড়ি একটু পাশে সরে দাঁড়ালাম। ঝড়ের মতই সে আমার পাশ দিয়ে নেমে, প্যাসেজটা পার হয়ে প্যাসেজের অপর প্রান্তের দরজাটা দিয়ে বাড়ির পিছনের বাগানের দিকে চলে গেল। প্যাসেজের শেষ প্রান্তের আলোয় অপস্রিয়মাণ সেই মূর্তিকে আমার চিনতে কষ্ট হয় নি, সে আমারই মেয়েদের মধ্যে একজন—হয় কৃষ্ণা, না হয় কাবেরী। কিন্তু খানিকটা দূর থেকে তাড়াতাড়ি দেখেছিলাম বলে ঠিক দুজনের মধ্যে কে, কৃষ্ণা না কাবেরী চিনে উঠতে পারি নি। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে না পেরে সিঁড়ির সেই ধাপে কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপরই সোজা উপরে উঠে গেলাম। নরেনের শোবার ঘরটা হা-হা করছে খোলা। ঘরের মধ্যে জ্বলছে আলো। খোলা দরজাপথে ঘরের মধ্যে পা দিয়েই থমকে দাঁড়ালাম। একপাশে কাত হয়ে নরেনের দেহটা পড়ে তখনো আক্ষেপ করছে। দুটো হাতই গোটানো। আরো একটু এগিয়ে গিয়ে নরেনের দিকে তাকাতেই চম্‌কে উঠলাম। একটা ছোরা সমূলে প্রায় বিদ্ধ হয়ে আছে নরেনের বুকের বাঁ দিকে। আর ছোরার বাঁটটা তখনও সে ডানহাতের মুষ্টি দিয়ে ধরে আছে। রক্তে সমস্ত জায়গাটা ভেসে গিয়েছে। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে নরেনকে চিৎ করে শুইয়ে দিলাম। নরেন একবার মাত্র যেন অতিকষ্টে চোখ মেলে আমার দিকে তাকাল, কি যেন বলবার চেষ্টা করল, সবটা নয়—কেবল বুঝলাম একটি কথা, ক্ষমা। তার পরই একটা হেঁচকি তুলে দেহটা স্থির হয়ে গেল। স্তব্ধ নির্বাক কতক্ষণ যে সেখানে দাঁড়িয়েছিলাম তার পরেও মনে নেই।

খেয়াল হতেই দেখি, বাথরুমের দরজাটা হা-হা করছে খোলা। ভয় পেয়ে আর সেখানে না দাঁড়িয়ে তাড়াতাড়ি আমি সোজা নিজের ঘরে নীচে চলে এলাম। নিজের ঘরে বসে আছি ভূতের মত, বোধ হয় আরো আধ ঘণ্টা পরে আবার উপরের ঘর থেকে ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ কানে এলো। আবার উপরে গেলাম কিন্তু খোলা দরজাপথে ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়ে থম্‌কে দাঁড়ালাম। আমার স্বামী কাবেরীর হাত ধরে টানতে টানতে তাকে বাথরুমের দরজা দিয়ে ঘর থেকে বের করে নিয়ে যাচ্ছেন। কাবেরী বাধা দিচ্ছে তাঁকে যাবে না বলে, আর কৃষ্ণা চাপা গলায় বলছে, চল্‌ কাবি, শীগ্‌গিরি এখান থেকে চল্‌—শীগ্‌গিরি চল্‌।

শেষ পর্যন্ত কোনমতে কৃষ্ণা ও আমার স্বামী কাবেরীকে নিয়ে চলে গেল। একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি, প্রথমবারে যখন উপরের ঘরে সেরাত্রে আমি যাই—ঘরে ঢুকবার পরই, বোধ হয় মিনিটখানেক পরেই, একটা গাড়ির শব্দ আমি পেয়েছিলাম। কৌতূহলে জানালাপথে তাকাতে দেখেছিলাম, বাড়ির গেটের সামনে থেকে একটা গাড়ি স্টার্ট দিয়ে চলে গেল।

গাড়িটা কালো রংয়ের সিডনবডি। গাড়ির নম্বরটা দেখেছিলাম এবং নম্বরটা আজও আমার মনে আছে, কারণ মধুর মুখে আগে একবার শুনেছিলাম ঐ নম্বরের ঐ গাড়িটাকে নাকি দু'একবার রাত্রে নরেনের ঘরে জল রেখে আসবার সময় জানালা বন্ধ করতে গিয়ে সে দেখেছিল, ঠিক গেটের অল্পদূরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে। এবং সে-ই আমাকে বলেছিল নম্বরটা—BLA 6786। তাই গাড়িতে পরিচিত নম্বরটা দেখে চম্‌কে উঠেছিলাম সেরাত্রে। মধু এও আমাকে বলেছিল, সে নাকি ড্রাইভার নন্দুয়ার মুখে শুনেছে—প্রায়ই একটা গাড়িকে নিঃশব্দে নন্দুয়া তার প্রভুর গাড়িকে অনুসরণ করতে দেখেছে। আমার যা জানাবার বা বলবার জানালাম। এবং এইটুকু আমি নিশ্চয়ই করে বলতে পারি, নরেনের হত্যার জন্য আমার মেয়ে কৃষ্ণা ও কাবেরী দায়ী নয়। এবং নরেনের মৃত্যুর ব্যাপারে নিশ্চয় একটা রহস্য আছে। আপনার কাছে তাই শেষ প্রার্থনা অভাগিনী জননীর প্রতি অনুকম্পায় কৃষ্ণা ও কাবেরীকে এ হত্যার কলঙ্ক থেকে আপনি যেন বাঁচাবার চেষ্টা করেন। আর একটা কথা, নরেনের মৃত্যুর পর কৃষ্ণার সঙ্গে আমি দু'চার দিন দেখা করেছি তাদের ফ্ল্যাটে গিয়ে—বিনতার পরিচয়েই। সে আজও জানে না আমিই তার হতভাহিনী কলঙ্কিনী স্বামী-পরিত্যক্তা জননী। তাদের চোখে আজ মৃতা হয়েও বেঁচে আছি। এবং দয়া করে একথা তাদের জানাবেন না। তারা যেমন জানে জননী তাদের মৃতা তাই যেন জানে। আমার কিছু অর্থ আছে ব্যাঙ্কে সঞ্চিত—সে টাকার জন্য আমি ব্যাঙ্কে আপনার নামে নির্দেশ দিয়ে গেলাম, আপনি টাকাটা তুলে কোন অবলা আশ্রমে দান করে দেবেন। আমাকে খোঁজবার চেষ্টা করবেন না, কারণ পৃথিবীতে কারো পক্ষে আমাকে খুঁজে বের করা সম্ভব হবে না। নমস্কারান্তে—

বিনতা দেবী।

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে কিরীটী একটানা চিঠিটা পড়ে গেল।

ঘরের মধ্যে উপস্থিত সকলেই তার মুখের দিকে তাকিয়ে কিসের ব্যাকুল প্রতীক্ষায় যেন। তারপর কিরীটী ঘরের সেই জমাট বরফের মত স্তব্ধতা ভঙ্গ করলে, ডাকল, কৃষ্ণা দেবী!

বলুন।

এই চিঠিটা কার জানেন?

কৃষ্ণা কিরীটীর কথার কোন জবাব না দিয়ে কেবল নির্বাক দৃষ্টিতে বারেকের জন্য তাকাল ওর মুখের দিকে। সে দৃষ্টিতে প্রশ্ন বা বিস্ময়, ভয় বা ব্যাকুলতা যেন কিছু নেই। ভাবলেশহীন স্থির পাথুরে দৃষ্টি।

চিঠিটা লিখেছেন বিনতা দেবী। তাঁর পরিচয়টা নিশ্চয়ই নতুন করে আর আপনাকে দিতে হবে না! আপনি তো তাঁকে ভাল করেই চেনেন, তাই না?

চিনি।

হঠাৎ ঐ সময় সঞ্জীব চৌধুরী ব্যাকুলকণ্ঠে কৃষ্ণাকে প্রশ্ন করলেন, কে—কাকে তুই চিনিস কৃষ্ণা? কার নাম বিনতা?

মিঃ চৌধুরী, আবার আপনাকে এই শেষবারের মত আমি বলছি—হয় আপনি চুপ করে থাকবেন যদি এঘরে থাকতে চান, নচেৎ বাধ্য হবো আমি আপনাকে পাশের ঘরে পাঠিয়ে দিতে!

কিন্তু কেন—কেন বলুন তো মিঃ রায় আপনি এভাবে আমাদের উপরে অত্যাচার

করছেন, জুলুম করছেন? আমি তো বলছি বার বার যে আমিই নরেন মল্লিককে হত্যা করেছি। ওরা—কৃষ্ণা কাবেরী কিছুই জানে না। নরেনের প্রতি বহুদিন আগে থাকতেই আমার কোন পারিবারিক ঘটনার জন্য আক্রোশ ছিল, তাই তাকে আমি হত্যা করেছি।

না। সে-সবই আমি জানি মিঃ চৌধুরী, আপনি নরেন মল্লিককে হত্যা করেন নি, করতে পারেন না। কথাটা তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলেই কিরীটী ঘুরে দাঁড়াল আবার কৃষ্ণার দিকে এবং প্রশ্ন করল, কৃষ্ণা দেবী, রাত দশটা থেকে সাড়ে দশটার মধ্যে আপনি নরেন মল্লিকের হত্যার রাত্রে তাঁর বাড়িতে তাঁর শয়নঘরে গিয়েছিলেন? বলুন, মিথ্যে আর সব কিছু গোপন করবার চেষ্টা করবেন না—আমি সব জানি।

হাঁ গিয়েছিলাম।

কোন্ পথ দিয়ে তাঁর শয়নঘরে প্রবেশ করেছিলেন?

বাথরুমের দরজা দিয়ে।

কৃষ্ণা—ওরে হতভাগী কি বলছিস তুই! আবার চেঁচিয়ে উঠলেন সঞ্জীব চৌধুরী যেন সব কিছু ভুলে।

বাধা দিও না বাবা, মিঃ রায় যা জানতে চান—সব আমাকে বলতে দাও। বলে উঠলো এবারে কৃষ্ণাই। এবং তার কণ্ঠস্বরে একটা অদ্ভুত দৃঢ়তা ও প্রতিজ্ঞার সুর যেন ঝরে পড়ল এতক্ষণে। কৃষ্ণা বলতে লাগল, হাঁ মিঃ রায়, গিয়েছিলাম সে-রাত্রে আমি নরেন মল্লিকের ঘরে।

কেন—কেন গিয়েছিলেন?

তাঁকে সাবধান করে দিতে গিয়েছিলাম, কাবেরীর সঙ্গে যেন তিনি আর ভবিষ্যতে না মিশবার চেষ্টা করেন।

তারপর দেখা হয়েছিল—কোন কথাবার্তা হয়েছিল তার সঙ্গে?

না।

কোন কথাবার্তাই হয় নি?

না, কারণ ঘরে যখন ঢুকছি দেখি বক্ষে ছোরাবিদ্ধ অবস্থায় তিনি তখন রক্তাক্ত ঘরের মেঝের উপরে পড়ে ছট্‌ফট করছেন। তাই দেখেই ভয় পেয়ে তখুনি আমি ছুটে পালাই।

সিঁড়ি দিয়ে আপনি পালিয়েছিলেন?

হাঁ।

সে সময় কারো সঙ্গে সিঁড়িতে আপনার দেখা হয়েছিল বা কাউকে সিঁড়ির নীচে দেখতে পেয়েছিলেন?

কোনদিকেই তখন আমার লক্ষ্য ছিল না, ছুটে পালাতেই তখন আমি ব্যস্ত।

আপনি যখন নরেন মল্লিকের ঘরে গিয়ে প্রবেশ করেন, ঘরের মধ্যে আর কাউকে দেখেছিলেন?

না।

ভাল করে ভেবে বলুন!

না, দেখি নি।

আর একটা কথার সত্যি জবাব দেবেন, কৃষ্ণা দেবী?

বলুন।

নরেনের মুখে কখনো দামী জুয়েলস্ বা অন্য জাতীয় কিছুর কথা শুনেছেন?

না।

কাবেরী দেবী, আপনি?

না।

আপনারা ঐজাতীয় কখনো কিছু তাঁর কাছে দেখেছেন?

উভয়েই একসঙ্গে জবাব দিল, না।

ঠিক এই সময় একটি সাধারণ বেশভূষায় সজ্জিত তরুণ যুবক ঘরে এসে প্রবেশ করল।

কিরীটা তার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, কি খবর বিভূতি?

ইনস্পেক্টর মিঃ রক্ষিত আমাকে পাঠিয়েছেন একটা কথা বলতে—

বল।

ফৈয়াজ খানের details পাওয়া গেছে। সে বর্মা থেকেই আসছে। এবং মাস দশেক আগে তার বর্মার বাড়ির সেফ থেকে একটা দামী হীরা আশ্চর্যরকমভাবে চুরি যায়, যার সন্ধান বর্মা পুলিস আজও করতে পারে নি। সে আদপেই দালাল নয়।

কথাগুলো শোনার সঙ্গে সঙ্গেই কিরীটীর চোখের তারা দুটো যেন কি এক উত্তেজনায় ঝক্‌ঝক্ করে ওঠে। সে ব্যগ্রকণ্ঠে বলে, আর কোন সংবাদ বলেছেন?

হাঁ, বলেছেন ফৈয়াজ খানের মুভমেণ্ট দেখে মনে হচ্ছে সে হয়তো দু'চার ঘণ্টার মধ্যেই হোটেল ছেড়ে চলে যাবে।

সঙ্গে সঙ্গে কিরীটী রহমানের দিকে তাকিয়ে বললে, আপনার সঙ্গে তো জীপ আছে রহমান সাহেব?

হাঁ।

তাহলে আসুন। কিরীটী দরজার দিকে এগুলো।

কোথায়—কোথায় যাবো?

আঃ, এখন তর্ক করবেন না—আসুন!

একপ্রকার যেন টানতে টানতেই কিরীটী রহমান সাহেবকে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। বাকী সবাই ঘরের মধ্যে স্তম্ভিত বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে রইল, নির্বাক।

সোজা কিরীটীর গাড়ি তাজ হোটেলের সামনে এসে দাঁড়াল। ম্যানেজারকে ডাকতেই সে চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে এলো, কি চান? সিট খালি নেই!

পরক্ষণে পুলিসের পোশাক পরা রহমানকে দেখে একটা ঢোঁক গিলে ম্যানেজার বললো, ব্যাপার কি?

ফৈয়াজ খাঁ নামে কোন পাঠান এখানে আপনার হোটেলে আছে? কোন্ ঘরে থাকে লোকটা? কিরীটী প্রশ্ন করল।

সে তো এইমাত্র আধ ঘণ্টাটাক হলো হোটেলের বিল চুকিয়ে দিয়ে গাড়ি নিয়ে বর্ধমান চলে গেল!

বাকী কথাটা আর কিরীটী শেষ করতে দিলে না, আবার রহমানকে হিড়হিড় করে টানতে টানতে নীচে নেমে গেল এবং গিয়ে জীপে উঠে বসল।

গভীর রাত্রি। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড। ঝড়ের বেগে কিরীটীর গাড়ি ছুটে চলেছে। ড্যাস্‌বোর্ডের নীলাভ আলোয় দেখা যায় স্পিডোমিটারের নিডল্‌টা কাঁপছে—৬০-৬৫, ৬০-৬৫! এগিয়ে চলে ঝড়ের বেগে নির্জন রাস্তা ধরে জীপটা।

লিলুয়া, উত্তরপাড়া, কোন্নগর, মাহেশ, শ্রীরামপুর—শ্রীরামপুর লেভেলক্রসিং পার হয়ে এলো বদ্যিবাটি। আরো—আরো দ্রুত। ব্যাণ্ডেলের স্টেশন ইয়ার্ডের আলো দেখা যাচ্ছে। ঐ—ঐ যে সেই গাড়ি ছুটে চলেছে! টেল ল্যাম্পে দেখা যাচ্ছে নম্বরটা ঃ BLA 6786। উল্লাসে কিরীটীর মন নেচে ওঠে।

অগ্রগামী গাড়ির আরোহীও বোধ হয় বুঝতে পারে একটা গাড়ি তাকে অনুসরণ করছে, গতিবেগ তারও বেড়ে যায়।

কিরীটীও তার গাড়ির গতি আরো বাড়িয়ে দেয় একসিলারেটারে আরো চাপ দিয়ে। স্পিডোমিটারের নিড্‌ল্‌টা এবারে কাঁপছে—৬৫-৭০, ৬৫-৭০! সামনের গাড়িটা ছুটছে ঝড়ের গতিতে।

কিরীটীর নির্দেশে রহমান সাহেব হাত বাড়িয়ে আগের গাড়ির পশ্চাতের চাকা লক্ষ্য করে গুলি চালায়।

দুড়ুম! দুড়ুম!

আগের গাড়িটা এঁকেবেঁকে চলে হঠাৎ মন্দগতিতে। আবার গুলির শব্দ।

হঠাৎ এবার সামনের গাড়িটার পশ্চাতের একটা টায়ার ভীষণ শব্দ করে ফেটে যায়, সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটা একটা গাছের সঙ্গে গিয়ে ধাক্কা খেয়ে উল্টে গেল।

কিরীটীর গাড়ি এসে থামল উল্টে-যাওয়া গাড়িটার সামনে। গাড়ির আরোহী মৃত। কিরীটী মৃতের বুকপকেট হতে পার্সটা টেনে বের করলে এবং পার্সের মধ্যে থেকেই বের হলো বাদামের মত একটা হীরা। অন্ধকারে ঝলমল করে উঠলো হীরাটা।

কিরীটী উত্তেজিত কণ্ঠে রহমান সাহেবকে বললে, এই কমল হীরাটা নরেন মল্লিক বর্মা থেকে ইসমাইল খানের মেয়ের সাহায্যে খান সাহেবের লোহার সেফ থেকে চুরি করে আনে। এরই খোঁজে এসেছিল হতভাগ্য ঐ পাঠান ইসমাইলের চর হয়ে, কিন্তু নরেন মল্লিককে হত্যা করেও সে হীরাটা পেল না—ভগবানের মার হাতে-হাতেই পেল। চল এবার ফেরা যাক।

উভয়ে আবার গাড়িতে উঠে বসল। গাড়ি ফিরে চললো কলকাতার দিকে।

দিন-দুই পরে। ডাঃ সুকুমার গুপ্তের চেম্বার। ডাক্তার একটা সোফার উপরে আড় হয়ে শুয়ে আপনমনে একখানা ইংরাজি নভেল পড়ছিল। সুইংডোরটা খুলে গেল। ডাক্তার চেয়ে দেখলে ঘরে প্রবেশ করছে কৃষ্ণা।

ডাক্তারের মুখখানা হাসিতে ভরে গেল, মধুর কণ্ঠে আহ্বান জানাল, আরে এসো এসো কৃষ্ণা!

কৃষ্ণা নই তো আমি, আমি কাবেরী!

পাশে এসে দাঁড়ায় ডাক্তার, মৃদু হেসে বলে, তবে প্রশ্নের উত্তর দাও আমার।

কর প্রশ্ন?

Ready !

Ready.

রাত্রি?

উঁহু, এখন সন্ধ্যা—ঠিক সন্ধ্যা।

শুভদৃষ্টি?

যাও। লজ্জায় রক্তিম হয়ে কৃষ্ণা মুখখানা নিচু করে।

যাও বললে চলবে না, জবাব দিতে হবে। সোফা ছেড়ে উঠে কাছে এসে দাঁড়াল সুকুমার কৃষ্ণার মুখোমুখি।

তবু কৃষ্ণা কোন জবাব দেয় না।

ডাক্তার, ওর হয়ে আমি জবাবটা দিচ্ছি শোন!

হঠাৎ কিরীটীর কণ্ঠস্বরে চম্‌কে উঠে দুজনেই দরজার দিকে ফিরে তাকায়।

দু'হাতে পর্দাটা সরিয়ে দরজার ধারে কেবল পর্দার ফাঁক দিয়ে মুখখানা মাত্র বের করে নিঃশব্দে হাসছে কিরীটী।

আরে কিরীটী! এসো এসো।

না ভাই, হীরাটা সরকারকে ফেরত না দিয়ে যার প্রাপ্য তার হাতেই তুলে দিতে এসেছি। নিন কৃষ্ণা দেবী, নরেনের হয়ে আপনাদের দেয় তাঁর বিবাহের যৌতুকটা আমিই দিয়ে গেলাম।

কৃষ্ণা সলজ্জ কুণ্ঠার সঙ্গে হাত বাড়িয়ে হীরাটা নেয়।

তবে ভাই চলি!

আরে শোন শোন—

না ভাই, কৃষ্ণা দেবীকে তোমার প্রশ্ন 'শুভদৃষ্টি' এবং তার জবাবটা শুনবার অধিকার একমাত্র তোমারই—তাছাড়া জান তো, আমাদের দেশে প্রথা আছে শুভদৃষ্টির সময় চাদর দিয়ে আচ্ছাদন দিতে হয় অন্যের দৃষ্টিকে। হাতের কাছে যখন চাদর নেই, মধুর অভাবে গুড়ং দদ্যাৎ—শাস্ত্রবিধি যখন আছেই, অতএব—

হাসতে হাসতে দু'হাতে দরজার পর্দাটা টেনে দিতে যাচ্ছিল, সেই সময় হঠাৎ কৃষ্ণা প্রশ্ন করে, একটা কথা মিঃ রায়, বিনতা দেবীর কোন সংবাদ পেলেন?

কিরীটী কৃষ্ণার দিকে তাকাল, না।

তারপরই কি রকম যেন সন্দেহ হতে সে-ই প্রশ্ন করে, তাঁকে কি আপনি চিনতে পেরেছিলেন কৃষ্ণা দেবী?

হাঁ।

চিনেছিলেন?

হাঁ, শুধু আমিই নয়, বাবাও। বাবা তাঁরই সন্ধানে বের হয়ে গিয়েছেন গত পরশু।

কৃষ্ণা চুপ করল। তার দু'চোখের কোলে যেন দু'ফোঁটা অশ্রু টলমল করছে।

রতিবিলাপ

মুখবন্ধ

কিছুদিন ধরেই লক্ষ্য করছিলাম পুলিসের বড়কর্তা মিঃ সেন রায় ঘন ঘন কিরীটীর কাছে যাতায়াত করছিলেন।

একদিন কৌতূহলটা আর দমন করতে না পেরে শুধালাম, কি ব্যাপার রে কিরীটী?

কিরীটী আনমনে একটা জুয়েলস সম্পর্কিত ইংরাজী বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছিল সামনের সোফাটার উপর বসে—মুখ না তুলেই বললে, কিসের কি?

সেন রায় সাহেবের এত ঘন ঘন যাতায়াত কেন তাই শুধাচ্ছিলাম।

কিরীটী মৃদু হেসে বলে, ক্ষ্যাপা খুঁজে ফেরে পরশপাথর।

পরশপাথর!

হ্যাঁ, কিছুদিন যাবৎ কলকাতা শহরে ইমিটেশন জুয়েলস নকল জহরতের সব ছড়াছড়ি দেখা যাচ্ছে।

নকল জহরৎ!

হ্যাঁ, তাই ভদ্রলোকের আহার নিদ্রা সব ঘুচে গিয়েছে।

তা ভদ্রলোকের কোন সুরাহা হল?

কোথায় আর হল?

তবে আজ যে সেন রায়কে ইকনমিক জুয়েলার্সের রাঘব সরকারের কথা কি বলছিলি?

কলকাতা শহরে জুয়েলসের মার্কেট তো ঐ ইকনমিক জুয়েলার্সের রাঘব সরকারই কনট্রোল করছে। তাই বলছিলাম ওদিকটায় একবার খোঁজ নিতে।

মৃদু হেসে বললাম, কেবল কি তাই?

তাছাড়া আর কি! বঁড়শী ফেলে রুই কাতলাই ধরা উচিত—পুঁটি ধরে কি হবে!

ঐ ঘটনারই দিন দুই পরে—

এক

মেয়েটির মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিলাম। মুখের মধ্যে কোথায় যেন একটু বিশেষত্ব আছে। এবং নিজের অজ্ঞাতেই বোধ হয় মুখটির মধ্যে কোথায় এবং কেন বিশেষত্ব সেইটাই অনুসন্ধান করছিলাম।

মনে হচ্ছিল যাকে বলে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালিনী না হলেও মনের মধ্যে যেন তার একটা বিশেষ অনুভূতি আছে, যে অনুভূতি অনেক কিছুরই ইশারা দেয় বুঝি।

তবে সেদিন মেয়েটি চলে যাবার পর কিরীটী এক সময় বলেছিল মেয়েটি সম্পর্কে আমার অভিমত শুনে, মিথ্যে নয়, ঠিকই ধরেছিস। তবে সেই অনুভূতিকে যেন আচ্ছন্ন করে রেখেছিল একটা আশংকার কালো ছায়া।

সত্যি বলছিস?

সত্যি।

তবে ওকথা মেয়েটিকে বললি কেন?

কিরীটী মৃদু হেসে প্রত্যুত্তর দিয়েছিল, মেয়েটির চেষ্টাকৃত ভণিতা দেখে।

ভণিতা?

কিন্তু ঐ পর্যন্তই। কিরীটী আর কোন কথা বলেনি বা বলতে চায়নি।

মাত্র হাত দুই ব্যবধানে আমাদের মুখোমুখি বসেছিল অন্য একটা সোফায় মেয়েটি শকুন্তলা চৌধুরী। এবং আর একটা সোফায় বসেছিলাম পাশাপাশি আমি আর কিরীটী।

একটু আগে শকুন্তলা তার বক্তব্য শেষ করেছে, এবং নিজের কথা বলতে বলতে সে যে যথেষ্ট উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল, তার রক্তিম শেষ আভাসটা যেন এখনো তার মুখের উপরে রয়েছে।

ইতিমধ্যে সন্ধ্যার ধূসর আবছায়া চারিদিকে নেমে এসেছিল। এবং বাইরের আলো ঝিমিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্যেও আবছায়া ঘনিয়ে এসেছিল।

আমি সোফা থেকে উঠে গিয়ে সুইচ টিপে ঘরের আলোটা জ্বালিয়ে দিলাম। হঠাৎ ঘরের আলোটা জ্বেলে দেওয়ায় শকুন্তলা যেন একটু নড়েচড়ে বসল।

সামনের ত্রিপয়ের উপরে রক্ষিত টোবাকোর সুদৃশ্য কৌটোটা তুলে নিল কিরীটী এবং হাতের নিভে যাওয়া পাইপটার তামাকের দগ্ধাবশেষ সামনে অ্যাসট্রের মধ্যে ফেলে দিয়ে নতুন করে আবার সেটার গহ্বরে তামাক ভরতে শুরু করল।

আমি কিন্তু শকুন্তলার মুখের দিকেই চেয়েছিলাম।

রোগা ছিপছিপে গড়ন এবং বেশ দীর্ঘাঙ্গী। মুখটা লম্বাটে ধরনের। নাক ও চিবুকের গঠনে একটা যেন দৃঢ়তার ছাপ। দুটি চোখে বুদ্ধির দীপ্তি স্পষ্ট বটে তবে সেই দীপ্তিকে আচ্ছন্ন করে কি যেন আরো কিছু ছিল।

সাধারণ একটি তাঁতের আকাশ-নীল রঙের শাড়ি পরিধানে ও গায়ে একটি চিকনের সাদা

ব্লাউজ। দু'হাতে একটি করে সরু সোনার রুলি ও বাম হাতের মধ্যমাতে সাদা পোখরাজ ও লাল চুনী পাথর বসানো আংটি ব্যতীত সারা দেহে আভরণের চিহ্নমাত্র নেই। মুখে প্রসাধনের ক্ষীণ প্রলেপ।

কিন্তু ঐ সামান্য বেশেই তরুণীর চেহারার মধ্যে যেন একটি স্নিগ্ধ সুন্দর শ্রী ফুটে উঠেছিল, বিশেষ একটা আভিজাত্য যেন প্রকাশ পাচ্ছিল। তরুণীর বয়স তেইশ-চব্বিশের বেশী হবে বলে মনে হয় না।

পাইপে অগ্নিসংযোগ করে দেশলাইয়ের কাঠির সাহায্যে কাঠিটি অ্যাশট্রের মধ্যে ফেলে দিতে দিতে এতক্ষণ বাদে কিরীটী কথা বলল।

শান্ত মৃদুকণ্ঠে বললে, কিন্তু মিস চৌধুরী, আপনার এই ব্যাপারে আমি কি ভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি বলুন!

তা আমি জানি না, তবে ঐ লোকটার সঙ্গে সত্যিই যদি আমার বিয়ে হয়, কাকার আদেশ মেনে নিয়ে সত্যিই যদি ওকেই আমায় বিয়ে করতে হয় এবং আপনি যদি এ ব্যাপারে আমাকে না সাহায্য করেন তো আমার সামনে একটি মাত্র পথ খোলা আছে—জানবেন সেটা হচ্ছে সুইসাইড করা।

ছিঃ, সুইসাইড করবেন কেন! বললাম এবারে আমিই।

তাছাড়া আমার অন্য কোন পথই তো নেই সুব্রতবাবু।

বুদ্ধিমতী আপনি, ওভাবে দুর্বলের মত সুইসাইড করতে যাবেন কেন, আপনার কাকাকে আর একবার বুঝিয়ে বলুন না। আমিই আবার বললাম।

কোন ফল হবে না সুব্রতবাবু। বললাম তো আপনাদের, কাকা এ ব্যাপারে অত্যন্ত অ্যাডামেণ্ট! তাছাড়া জানি—এবং দেখেছিও তো চিরদিন—ওঁর মতের বিরুদ্ধে কেউ যাবার চেষ্টা করলে তাকে তিনি কিছুতেই ক্ষমা করেন না। তাছাড়া—

কি?

দুষ্মন্ত, সেও কাকার বিরুদ্ধে যেতে রাজী নয়।

দুষ্মন্তবাবু তো আপনারই কাকার ছাত্র, তাই বললেন না? কিরীটী এতক্ষণে আবার কথা বলল।

হ্যাঁ। শুধু ছাত্র নয়—জীবনের সব চাইতে প্রিয় ছাত্র বলতে পারেন। হি ইজ সো মাচ প্রাউড অফ হিম! কিন্তু দুষ্মন্ত বিয়ের প্রপোজালটা তাঁকে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি না করে দিয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে বলে দিয়েছেন তা সম্ভব নয়।

দুষ্মন্ত জিজ্ঞাসা করেননি কেন সম্ভব নয়? আবার কিরীটী প্রশ্ন করে।

যখন তিনি কোন ব্যাপারে একবার না বলেন, তারপর তো কারো কোন কথাতেই আর কান দেন না এবং বলতে গেলে বলেন, ও-কথা শেষ হয়ে গিয়েছে, অন্য কথা বল। তাই সে আর অনুরোধ করেনি।

তা আপনি বলেননি কেন কাকাকে আপনার কথাটা? আপনাকে তো তিনি অত্যন্ত ভালবাসেন, একটু আগে বললেন!

হ্যাঁ, জানি ভালবাসেন এবং আমি বলেছিলামও—

বলেছিলেন!

হ্যাঁ—

কি বললেন আপনাকে তিনি জবাবে?

বললেন, না, তোমার বিয়ে আমি ঠিক করেছি রাঘব সরকারের সঙ্গে। এতদিন বিয়েটা তোমাদের হয়েও যেত। কিন্তু আমার ইচ্ছা, তুমি বি.এ.টা পাস কর, তার পর বিয়ে হবে, সেই কারণেই দেরি।

হঠাৎ যেন শকুন্তলার কথায় কিরীটী চম্‌কে ওঠে, বলে, কী—কী নাম বললেন?

রাঘব সরকার।

মিস্ চৌধুরী, আচ্ছা রাঘব সরকার কি—

কি?

ইকনমিক জুয়েলার্সের মালিক?

তা ঠিক জানি না।

জানেন না?

না।

ও! হ্যাঁ, কি যেন আপনি বলছিলেন, এই বছরেই বুঝি আপনি তাহলে বি. এ. পরীক্ষা দিচ্ছেন?

এইবার পাস করলাম।

রাঘব সরকারের সঙ্গে আপনার কাকার সম্পর্ক কি? বলছিলাম কি সূত্রে পরিচয়, আর কতদিনের এবং কি রকম পরিচয়?

আশ্চর্য তো আমার সেইখানেই লাগে মিঃ রায়—

আশ্চর্য! কেন?

কারণ পরিচয় ওঁদের পাঁচ-সাত বছর হবে, ঘনিষ্ঠতাও খুব, কিন্তু—

কি?

রাঘব সরকারকে কাকা যে রকম ঘৃণা করেন—

ঘৃণা?

হ্যাঁ, মুখে যদিও সেটা তিনি প্রকাশ করেন না কখনো কিন্তু আমি তা জানি। আশ্চর্য তো হয়েছি আমি তাইতেই, সেই লোকের সঙ্গেই কাকা আমার বিয়ে দিতে কেন দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ!

রাঘব সরকারকে ঘৃণা করেন আপনি ঠিক জানেন?

জানি বৈকি।

কি করে জানলেন?

কেউ কাউকে সত্যিকারের ঘৃণা করলে সেটা বুঝতে কি খুব কষ্ট হয় মিঃ রায়?

কিন্তু—

না, সেরকম কখনো কিছু আমার চোখে পড়েনি বটে তবে বুঝতে পেরেছি আমি।

আর একটা কথা মিস্ চৌধুরী—

বলুন।

খুব ঘন ঘন যাতায়াত আছে বুঝি রাঘব সরকারের আপনাদের বাড়িতে?

না, এক মাস দেড় মাস অন্তর হয়ত একবার সে আসে।

এক্সকিউজ মি মিস চৌধুরী, লোকটার মানে ঐ রাঘব সরকারের বয়স কত?

পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে বলেই মনে হয়—

হুঁ, চেহারা?

মিথ্যা বলব না—হি ইজ রিয়ালী হ্যাণ্ডসাম! একটু যেন কেমন ইতস্ততঃ করেই কথাটা বলে শকুন্তলা।

সত্যি?

হ্যাঁ—কিন্তু তাতে আমার কি? আই হেট হিম! গলায় অনাবশ্যক জোর দিয়েই যেন কথাটা বললে শকুন্তলা।

আর একটা কথা—

বলুন।

দুষ্মন্তবাবু দেখতে কেমন?

রাঘব সরকারের সঙ্গে তুলনায় কিছুই নয়—কিন্তু তাকে আমি—

জানি ভালবাসেন। কিরীটীই কথাটা শেষ করল, সে তো বুঝতেই পেরেছি।

মুহূর্তকাল তারপর যেন কিরীটী চুপ করে থাকে। মনে হয় কি যেন সে ভাবছে। মুখ থেকে পাইপটা হাতে নেয়।

এবং তার পরই হঠাৎ শকুন্তলার দিকে তাকিয়ে বলে, আপনার ঐ আংটিটা নতুন বলে মনে হচ্ছে মিস্ চৌধুরী!

হ্যাঁ।

আপনি নিজেই আংটিটা শখ করে তৈরী করেছেন, না কেউ দিয়েছে আংটিটা আপনাকে?

রাঘব সরকার দিয়েছেন।

কি বললেন! একটু যেন কৌতূহল কিরীটীর কণ্ঠে প্রকাশ পায়, রাঘব সরকার দিয়েছেন আংটিটা আপনাকে?

হ্যাঁ, কাকার হাত দিয়ে আর কাকার আদেশেই আমাকে আংটিটা আঙুলে পড়তে হয়েছে।

দুষ্মন্তবাবু জানেন নিশ্চয়ই ব্যাপারটা?

জানে।

কিছু বলেননি তিনি?

কি বলবে? কাকাকে সে কি জানে না!

হুঁ। কিন্তু মিস্ চৌধুরী—

বলুন।

এ-ব্যাপারে যা বুঝতে পেরেছি, মীমাংসা করতে পারেন আপনারাই—শান্তকণ্ঠে বলে কিরীটী।

আমরাই!

হ্যাঁ, আপনি আর দুষ্মন্তবাবু।

কিন্তু—

একটু চিন্তা করে দেখুন, তাই নয় কি? আপনিও সাবালিকা এবং দুষ্মন্তবাবুও ছেলেমানুষ নন। আপনারা পরস্পরকে যখন ভালবাসেন এবং পরস্পরকে যখন বিয়ে করতে চান তখন

কোন বাধা যদি কোথাও থাকে সে বাধাকে উত্তীর্ণ হতে হবে আপনাদেরই। হ্যাঁ—আপনাদেরই চেষ্টা করতে হবে।

কিন্তু আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন না মিঃ রায়—

পারছি! আর সেইজন্যেই তো বলছি—দায়িত্ব যখন আপনাদের, মীমাংসাটাও আপনাদেরই করে নিতে হবে।

মিঃ রায়—

তাছাড়া সত্যিই বলুন তো, কি ভাবে আপনাকে আমি সাহায্য করতে পারি!

আমি ভেবেছিলাম—

কি ভেবেছিলেন?

কত জটিল ব্যাপারেরই তো মীমাংসা আপনি করেছেন—আমাদের এ ব্যাপারেও—

সেরকম সত্যিই কিছু জটিল হলে সাহায্য নিশ্চয়ই আপনাকে আমি করতাম।

আমি—আমি তাহলে কোন পরামর্শই আপনার কাছে পাব না মিঃ রায়?

একটা যেন রীতিমত হতাশার সুর ধ্বনিত হয় শকুন্তলার কণ্ঠে। চোখের দৃষ্টিতেও একটা নিরাশার বেদনা ফুটে ওঠে যেন।

আচ্ছা, তাহলে উঠি। নমস্কার—বলতে বলতে শকুন্তলা উঠে দাঁড়ায় এবং যাবার জন্য পা বাড়ায়।

দরজা বরাবর গিয়েছে শকুন্তলা, সহসা ঐ সময় কিরীটী ডাকল, শুনুন মিস চৌধুরী—

শকুন্তলা কিরীটীর ডাকে ফিরে দাঁড়াল।

একটা কাজ করতে পারবেন?

কি?

কাল দুপুরের পরে মানে এই সন্ধ্যার দিকে আপনার ঐ দুষ্মন্তবাবুকে নিয়ে আমার এখানে একবার আসতে পারবেন আপনারা?

কেন পারব না, নিশ্চয়ই পারব।

বেশ, তবে তাই আসবেন।

কিন্তু—হঠাৎ যেন কি মনে হওয়ায় শকুন্তলা বলে ওঠে, কাল তো আসতে পারব না মিঃ রায়, কাল আমাদের বাড়িতে একটা উৎসব আছে—

উৎসব?

হ্যাঁ, কাকামণির জন্মতিথি উৎসব। প্রতি বৎসর ঐ দিনটিতে উৎসব হয়—তাঁর সব পরিচিত আত্মীয় বন্ধুবান্ধবেরা আসেন আর আমাকেই সব ব্যবস্থা করতে হয়। পরশু আসতে পারি—

তবে তাই আসবেন।

অতঃপর শকুন্তলা নমস্কার জানিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

দুই

শকুন্তলা ঘর থেকে বের হয়ে যাবার পর কিরীটী যেন একটু ক্লান্ত ভাবেই সোফায় হেলান দিয়ে চোখ বুজল এবং কয়েকটা মুহূর্ত চুপ করে থেকে যেন একেবারে প্রায় নিঃশব্দ কণ্ঠে বললে, আশ্চর্য!

একটু যেন চম্‌কেই ওর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলাম, কিছু বলছিস?

হ্যাঁ, ভাবছি—

কি?

ভাবছি মেয়েটি নিজেই এসেছিল আমার কাছে না কেউ পাঠিয়েছিল ওকে!

ও-কথা কেন বলছিস কিরীটী?

বলছি এই কারণে যে, আংটির অনুমানটা যদি আমার সত্যিই হয় তো—চমৎকার অভিনয় করে গেল মেয়েটি স্বীকার করতেই হবে।

অভিনয়!

হ্যাঁ, মেয়েরা অবিশ্যি আমার মতে সবাই, বলতে গেলে বেশীর ভাগই, জাত-অভিনেত্রী এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রেই তাদের অভিনয়টাই সত্যি এবং বাকি যা তা মিথ্যা ; কিন্তু তাদের মধ্যেও আবার কেউ কেউ অনন্যসাধারণ থাকে তো—

তার মানে তুই বলতে চাস, ঐ শকুন্তলা মেয়েটি সেই শেষোক্ত পর্যায়ে পড়ে?

কিছুই আমি বলতে চাই না কারণ একটু আগেই তো বললাম ব্যাপারটাই আমার অনুমান মাত্র ; কিন্তু শ্রীমান জংলীর ব্যাপারটা কি? সে কি আজ আমাদের চা-উপবাসীই রেখে দেবে স্থির করেছে নাকি?

কিন্তু কিরীটীর কথা শেষ হল না, ট্রেতে ধূমায়িত কাপ নিয়ে জংলী এসে ঘরে ঢুকল।

কি রে চা এনেছিস?

আজ্ঞে না।

আজ্ঞে না মানে! তবে ঐ কাপে কি?

ওভালটিন। জংলী বললে।

সত্যিই সুব্রত, চায়ের কাপের দিকে আদৌ হাত না বাড়িয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে কিরীটী এবারে, আমার স্বাস্থ্য ও তার রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে হঠাৎ যে মাঝে মাঝে কৃষ্ণা অতি-সচেতন হয়ে ওঠে—চায়ের বদলে সরবত বা ওভালটিনের অত্যাচার—

অসহ্য! কথাটা শেষ করল কৃষ্ণা।

না, মানে কৃষ্ণা তুমি—

হস্তধৃত কাচের প্লেটটা এগিয়ে দিতে দিতে মৃদু হাস্য সহকারে কৃষ্ণা এবারে বলে, ওভালটিনের সঙ্গে টোমাটোর পাঁপড় খেয়ে দেখো, সত্যি ডেলিসাস!

অবনক্সাস! মৃদু গম্ভীর কণ্ঠে বলে কিরীটী।

কি বললে? প্রশ্ন করে কৃষ্ণা।

বললাম ওটা পাঁপড়ও নয় টোমাটোরও নয়। সামথিং ক্যাডাভারাস লাইক ইয়োর মডার্ণ সো-কল্ড আপ-টু-ডেট সোসাইটি! অর্থাৎ সুকুমার রায়ের গজকচ্ছপেরই একটা সংস্করণ মাত্র।

কথাগুলো কিরীটী গম্ভীর হয়ে বলল বটে তবে দুটোই অর্থাৎ ওভালটিন ও পাঁপড় টেনে নিয়ে নির্বিবাদে সদ্ব্যবহার করতে শুরু করে দিল।

তার পর ঐ ব্যাচিলার ভদ্রলোকটিকে কি সারমন দেওয়া হচ্ছিল শুনি নারী সম্পর্কে। কিরীটীর দিকে চোখ পাকিয়ে প্রশ্নটা করে কৃষ্ণা।

কই না, নারী সম্পর্কে তো নয়, আমি তো বলছিলাম অভিনেত্রী সঙ্ঘের কথা।

অভিনেত্রী সঙ্ঘ!

হুঁ, মানে যারা এই আর কি অভিনয়ই করে। কথাটা চোখ বুজেই একটা পাঁপড়ের টুকরো আরাম করে চিবুতে চিবুতে কিরীটী বললে।

শুধু নিশ্চয়ই নারী অভিনেত্রীদের কথা নয়—পুরুষ অভিনেতাদের কথাও বলছ! কৃষ্ণা শুধায়।

য়্যাঁ, কি বললে? চোখ মেলে তাকায় কিরীটী।

বলছিলাম চমৎকার অভিনয় করতে পারে এমন তো শুধু নারীই নয়, পুরুষও আছে।

দুজনের—স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পরের কৌতুকপূর্ণ অথচ বুদ্ধিদীপ্ত কথার লেনদেন শুনতে আমি বেশ উপভোগই করছিলাম।

সহসা ঐ সময় কিরীটী বলে উঠল, সন্দেহ নেই, সন্দেহ নেই তাতে। কিন্তু প্রিয়ে, অভিনয়-শিল্পে নারীর স্থান যে একটু বিশেষ স্তরেই, নিশ্চয়ই কথাটা অস্বীকার করবে না?

নিশ্চয়ই করব।

বেশ। তবে তিষ্ঠ ক্ষণকাল। এবারে সত্যিই তোমাকে শ্রীকৃষ্ণ যে মোহিনী রূপ ধারণ করে সমস্ত দেবাসুরের মাথাটা ঘুরিয়ে দিয়েছিল সেই মোহিনী রূপের অভিনয় মহিমা তোমাকে দেখাব। কিন্তু আমাকে একটিবার বেরুতে হবে—

কথাটা বলতে বলতে কিরীটী উঠে দাঁড়ায় এবং সোজা গিয়ে তার শয়নঘরের সংলগ্ন তার একান্ত নিজস্ব যে প্রাইভেট কামরাটি তার মধ্যে প্রবেশ করে ভিতর থেকে অর্গল তুলে দিল টের পেলাম।

সেই কামরা থেকে বের হয়ে এল যখন, সম্পূর্ণ ভোল একেবারে পাল্টে ফেলেছে কিরীটী।

মুসলমানী চোস্ত পাজামা ও গায়ে শেরওয়ানী। মাথায় কালো টুপী। হাতে একটা ছোট চামড়ার কেস। মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। চোখে কালো চশমা।

কি ব্যাপার, হঠাৎ এ বেশ কেন? প্রশ্ন করলাম আমিই।

একটু সওদা করে আসি।

সওদা কিসের?

জহরতের। বলেই আমাকে তাড়া দিল, চল্ ওঠ্—

কোথায়?

বললাম তো সওদা করে আসা যাক। ওঠ্—আবার তাড়া দিল কিরীটী।

কিন্তু তবু উঠতে আমি ইতস্ততঃ করি।

কি রে, এর মধ্যেই গেঁটে বাত ধরল নাকি? ওঠ্—

অগত্যা উঠে দাঁড়াই।

রাস্তায় এসে ওর পাশে চলতে চলতে আবার পূর্বোক্ত প্রশ্নটাই করলাম, কিন্তু এই অসময়ে সত্যি কোথায় চলেছিস বল্ তো কিরীটী!

অসময় আবার কোথায়, মাত্র পৌনে আটটা রাত। আর একান্ত দেখা যদি নাই করে তো ফিরে আসব। তার বেশী তো কিছু নয়। তবু অন্তত একটু বেড়ানোও তো হবে।

তা যেন হবে, কিন্তু কার সঙ্গে দেখা করতে চলেছিস এ সময় হঠাৎ?

হঠাৎ আবার কোথায়! এই ট্যাক্সি—ইধার! কথাটা শেষ করল কিরীটী রাস্তার ওধারে গিয়ে, আমাদের দিকেই যে খালি ট্যাক্সি যাচ্ছিল সেই ট্যাক্সিটা ডেকে।

পাঞ্জাবী ট্যাক্সি ড্রাইভার সর্দারজী কিরীটী ডাকতেই সঙ্গে সঙ্গে ট্যাক্সিটা ঘুরিয়ে একেবারে রাস্তার এদিকে আমাদের সামনে এনে দাঁড় করাল।

আয়, ওঠ্—

উঠে বসলাম ট্যাক্সিতে। ট্যাক্সি ছেড়ে দিল।

কিধার যায়গা বাবুজী?

বৌবাজার। কিরীটী বলে।

ট্যাক্সি বৌবাজারের দিকেই ছোটে।

বৌবাজারের কোথায় যাচ্ছিস?

ইকনমিক জুয়েলার্সে। গম্ভীর কণ্ঠে কিরীটী বলে।

কিছু কিনবি বুঝি?

পূর্ববৎ গম্ভীর কণ্ঠে বললে, দেখি—তেমন মনমতো জুয়েলস যদি কিছু পাই তো কেনা চলতে পারে বৈকি।

বুঝলাম কিরীটী কেন যাচ্ছে সেখানে আপাততঃ ব্যাপারটা ভাঙতে আমার কাছে রাজী নয়। আবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় তবে কি ইকনমিক জুয়েলার্সের রাঘব সরকারের সঙ্গে মোলাকাত করতেই চলেছে!

হয়তো তাই। কথাটা নেহাত অসংগতও মনে হয় না। কারণ সেন রায়কেও ও বলেছিল ঐ রাঘব সরকারের সঙ্গে দেখা করতে। আবার শকুন্তলাও আজ সন্ধ্যায় ঐ রাঘব সরকারের কথাই বলে গেল।

জনাকীর্ণ আলোকিত পথ ধরে ট্যাক্সিটা ছুটে চলেছে। এবং গাড়ির মধ্যে অন্ধকার থাকলেও, মধ্যে মধ্যে এক-আধটা যে আলোর ঝাপ্টা রাস্তার আলো থেকে চলমান গাড়ির জানালাপথে ভিতরে এসে পড়ছিল, সেই আলোর মধ্যে কিরীটীকে দেখা যাচ্ছিল।

গাড়ির ব্যাকে হেলান দিয়ে কিরীটী চুপটি করে বসেছিল। চোখে তার কালো কাচের চশমা থাকায় ওর চোখ দুটো দেখতে পাচ্ছিলাম না। তবে এটুকু বুঝতে পারি, কি যেন সে ভাবছে।

পথে একটা বড় জুয়েলারী শপের সামনে গাড়ি থামিয়ে কিরীটী ভিতরে গেল এবং মিনিট কুড়ির মধ্যেই ফিরে এলো। গাড়ি আবার সামান্য চলে ইকনমিক জুয়েলার্সের সামনে এলে ট্যাক্সি থেকে নামলাম আমরা। পকেট থেকে টাকা বের করে কিরীটী ভাড়া মিটিয়ে দিল।

রাস্তার দু ধারেই সার সার সব জুয়েলারীর দোকান। প্রত্যেক দোকানেই তখনো বেচাকেনা চলেছে। আলোঝলমল শোকেসগুলোর মধ্যে নানা ধরনের সব দামী দামী অলংকার সাজানো।

পর পর অনেক দোকান থাকলেও তারই মধ্যে ইকনমিক জুয়েলার্স যেন বিশেষ ভাবেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

দু' দিককার দুটো রাস্তা জুড়ে অনেকখানি জায়গা নিয়ে বিরাট একটি ত্রিকোণ বাড়ি। বাড়ির মাথায় কোণাকুণি ভাবে বসানো বিরাট একটি নিওন সাইন বোর্ড। ইকনমিক জুয়েলার্স কথাগুলো নীল লাল নিওনে জ্বলছে নিভছে।

একতলায় পুরু কাচের পাল্লা বসানো শোকেস আগাগোড়া। ভিতরে আলোকিত শোকেসের মধ্যে নানাবিধ মহার্ঘ্য অলঙ্কারাদি থরে থরে সাজানো।

কিরীটী সোজা দোকানে প্রবেশ করবার দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

দরজার সামনেই দাঁড়িয়ে দাড়িওয়ালা বন্ধুকধারী শিখ দারোয়ান।

দোকানের ভিতরে দুজনে আমরা প্রবেশ করলাম।

কিরীটী সোজা কাউণ্টারের দিকে এগিয়ে যায় এবং কাউণ্টারের যে প্রৌঢ়-বয়েসী ভদ্রলোকটি চোখে একটা পুরু কাচের চশমা পরে লিখছিলেন তাঁকেই শুধায়, ম্যানেজিং ডাইরেক্টার মিঃ সরকারের সঙ্গে একটিবার দেখা হতে পারে?

কিরীটী হিন্দীতেই কথাটা জিজ্ঞাসা করল।

ভদ্রলোক কিরীটীর প্রশ্নে মুখ তুলে তাকালেন, একটু অপেক্ষা করুন, মেমোটা শেষ করে নিই।

তিন

মেমোটা লেখা শেষ করে প্রৌঢ় মুখ তুলে তাকালেন, কাকে চাই বলছিলেন?

ম্যানেজিং ডাইরেক্টারকে। কিরীটী তার কথাটার পুনরাবৃত্তি করল।

বড়বাবুকে?

হ্যাঁ, রাঘব সরকার মশাইকে।

কিরীটীর মুখে কর্তার নামটা শুনেই প্রৌঢ় ভদ্রলোকটিও ওর মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন এবং ক্ষণকাল তাকিয়ে তাকিয়ে কিরীটীর আপাদমস্তক তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ করে বললেন, কি নাম আপনার? কোথা থেকে আসছেন? বড়বাবুর সঙ্গে আপনার প্রয়োজনটা কি?

নাম বললে তো তিনি চিনবেন না, আসছি আপাততঃ আমেদাবাদ থেকে আর প্রয়োজনটা ব্যক্তিগত।

ভদ্রলোকও যেমন প্রশ্নগুলো পর পর একই সঙ্গে করে গিয়েছিলেন, কিরীটীও পর পর একই সঙ্গে জবাবগুলো দিয়ে গেল।

ওঃ, তা—

তিনি যদি থাকেন তো দয়া করে তাঁকে খবরটা দিলে বাধিত হব।

চেয়ার থেকে এবারে উঠে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক এবং মৃদুকণ্ঠে বললেন, হুঁ, দাঁড়ান, দেখি তিনি ঘরে আছেন কিনা?

ভদ্রলোক ভিতরের দিকে চলে গেলেন। আমরা এদিক-ওদিক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম।

প্রতিষ্ঠানটি বিরাট নিঃসন্দেহে। বিরাট হলঘর। অর্ধেকটা ঘরের পর পর একই সাইজের কাচের শোকেস দিয়ে একটা যেন বেষ্টনী গড়ে তোলা হয়েছে।

বেষ্টনীর ভেতরের অংশে রয়েছেন কর্মচারী ও সেলস্‌ম্যানরা আর বাহিরের অংশে খরিদ্দাররা। বেষ্টনীটি অর্ধচন্দ্রাকৃতি ভাবে যেন খাড়া করে তোলা হয়েছে।

ঘরের সর্বত্র উজ্জ্বল ফ্লুরসেণ্ট টিউব জ্বলছে। তারই আলোয় সমগ্র হলঘরটি যেন একেবারে ঝলমল করছে। প্রতিষ্ঠানটির অনুরূপ আড়ম্বরে কোন ত্রুটি নেই কোথাও যেন এতটুকু। ইতিমধ্যে সময় উত্তীর্ণ হওয়ায় খরিদ্দারের ভিড় একটু একটু করে কম হতে শুরু করেছিল।

একটু পরেই ভদ্রলোক ফিরে এলেন, আসুন বলে আহ্বান জানালেন।

কোন্ পথে যাব? কিরীটী প্রশ্ন করে।

ঐ দক্ষিণ দিক দিয়ে আসুন—ওখানে ভিতরে আসবার রাস্তা আছে। ভদ্রলোক আঙুল তুলে দেখিয়ে দিলেন।

ভদ্রলোকের নির্দেশমত আমরা ভিতরে গিয়ে প্রবেশ করলাম এবং তাঁকে অনুসরণ করেই হলঘর থেকে বের হয়ে বন্ধ একটা কাচের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালাম।

পুরু কাচের দরজার ওদিকে একটা ভারি পর্দা ঝুলছে। ঘরের অভ্যন্তরে কিছু নজরে পড়ে না।

সঙ্গের ভদ্রলোকটিই কাচের দরজাটা টেনে খুলে আমাদের বললেন, যান, বড়বাবু ভিতরে আছেন—

পর্দা সরিয়ে আমরা ভিতরে প্রবেশ করতেই নাতিপ্রশস্ত একটি ঘর আমাদের নজরে পড়ল। ঘরের দু পাশে দুটি লোহার সিন্দুক। এবং এক কোণে একটি কাচের টেবিলের সামনে সবুজ ঘেরা-টোপ দেওয়া টেবিল ল্যাম্পের নীলাভ আলোয় চোখে পড়ল টাক-মাথা এক ব্যক্তি, মাথা নীচু করে কি যেন পরীক্ষা করছেন। তাঁর সামনে নানা আকারের ছোট বড় জুয়েলস্‌য়ের বাক্স। পাশে কাচের কেসের মধ্যে একটি ওয়েয়িং অ্যাপারেটাস।

টেবিলের সামনে দেখা গেল খান-তিনেক আধুনিক ডিজাইনের স্টীলের চেয়ার।

মাথা না তুলেই সেই ব্যক্তি মৃদুকণ্ঠে আমাদের আহ্বান জানালেন, আসুন—বসুন।

বলা বাহুল্য আমরা এগিয়ে গিয়ে চেয়ারে বসলাম।

কাজ করতে করতেই ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন, আমেদাবাদ থেকে আসছেন?

কিরীটী এবারও মৃদু কণ্ঠে বললে, না, আসলে করাচী থেকে আসছি।

সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক মুখ তুললেন।

চোখে কালো মোটা সেলুলয়েড ফ্রেমের চশমা। চশমার কাচের ভিতর দিয়ে এক জোড়া চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আমাদের উপরে ন্যস্ত হল। মুহূর্তকাল সেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যেন কিরীটীর ও আমার উপরে স্থির রইল।

আপনারা—

মিঃ সরকার, আমার নাম ইসমাইল খান—আমার সঙ্গে ইনি আমার দোস্ত মধুবাবু—আমি একটা বিশেষ কাজে আপনার কাছে এসেছিলাম—একেবারে খাস হিন্দীতে কথাগুলো বললে কিরীটী।

বলুন?

কিছু বেলজিয়ান হীরা আমার কাছে আছে।

বেলজিয়ান হীরা!

হ্যাঁ। হীরাগুলো বিক্রি করতে চাই।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আবার কিছুক্ষণ চেয়ে রইল রাঘব সরকার। তারপর মৃদুকণ্ঠে বললেন, হীরা বিক্রী করতে চান?

হ্যাঁ।

অপরিচিত কারো কাছ থেকে তো কখনো আমি কোনো জুয়েলস্ কিনি না।

ব্যবসা করতে বসেছেন আপনি মিঃ সরকার, তাই ভেবেছিলাম—

কি ভেবেছিলেন মিঃ খান?

যাদের সঙ্গে কারবার করেন নিশ্চয়ই সকলেই আপনার পরিচিত আসেন না—সম্ভবও নয় তা।

না, তা আসেন না বটে—তবে—

বলুন?

আপনি এ দেশের হলে কথা ছিল না—কিন্তু আপনি আসছেন করাচী থেকে!

তা হয়ত আসছি, তবে একজনের কাছে আপনার নাম শুনেই এসেছিলাম।

কে সে?

ক্ষমা করবেন, নামটা বলা সম্ভব নয়।

অতঃপর রাঘব সরকার মুহূর্তকাল কি যেন ভাবলেন, তারপর বললেন, বেশ নিয়ে আসবেন, দেখব।

একটা স্যাম্পল এনেছি, যদি দেখতে চান তো দেখাতে পারি।

স্যাম্পল এনেছেন?

হ্যাঁ। কারণ দরদস্তুর একটা মোটামুটি স্থির না হলে মিথ্যে হীরাগুলো বয়ে নিয়ে এসে তো কোন লাভ হবে না।

কিরীটীর শেষোক্ত কথায় আবার রাঘব সরকার কিরীটীর দিকে মুখ তুলে তাকালেন।

আমি লোকটির—অর্থাৎ রাঘব সরকারের দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম।

বয়স লোকটার যে পঞ্চাশের নীচে নয় তা দেখলেই বোঝা যায়। কপালের কাছে এবং রগের দু পাশের চুলে পাক ধরেছে। কপাল ও নাকের পাশে বলিরেখা জাগতে আরম্ভ হয়েছে, বয়সের চিহ্ন। কিন্তু সত্যি সুপুরুষ ভদ্রলোক!

শকুন্তলা চৌধুরী মিথ্যা বলে নি, রাঘব সরকারের রূপবর্ণনায় এতটুকু অত্যুক্তি করে নি।

মাথার চুল পাতলা হয়ে এসেছে, মধ্যস্থলে টাক দেখা দিয়েছে। প্রশস্ত কপাল। দীর্ঘ চক্ষু। চক্ষুর দৃষ্টিতে বুদ্ধির দীপ্তি। রোমশ জোড়া ভ্রূ। খাড়া নাক। দৃঢ়বদ্ধ চোয়াল। বৃষস্কন্ধ। টকটকে গৌর গাত্রবর্ণ। পরিধানে ঢোলা পায়জামা ও পাঞ্জাবি। পাঞ্জাবির তলা থেকে নেটের গেঞ্জীর কিয়দংশ ও রোমশ বক্ষঃস্থলের কিছুটা দেখা যাচ্ছে।

কই দেখি কি স্যাম্পল এনেছেন? রাঘব সরকার আবার বললেন।

সেরওয়ানীর পকেটে হাত চালিয়ে একটি মরক্কো লেদারের ছোট কেস বের করল কিরীটী এবং বাক্সের গায়ের বোতামটি টিপতেই, স্প্রিং অ্যাক্সনে বাক্সের ডালাটা খুলে যেতেই বাক্সের মধ্যস্থিত প্রায় দশ রতির একটি হীরা ঘরের ঈষৎ নীলাভ আলোয় যেন ঝিলমিল করে উঠল।

এই দেখুন—কিরীটী বাক্সসমেত হাতটা এগিয়ে ধরল রাঘব সরকারের দিকে।

রাঘব সরকার কিরীটীর হাত থেকে হীরাটা নিলেন বাক্স থেকে দু আঙুলের সাহায্যে তুলে। এবং বেশ কিছুক্ষণ সময় হীরাটা আলোয় পরীক্ষা করে বললেন, বেলজিয়ান হীরাই। কতগুলো হীরা আছে আপনার কাছে, মিঃ খান?

কিছু আছে—

হুঁ। তা এ হীরা আপনি কোথা থেকে পেলেন মিঃ খান?

কিরীটী মৃদু হেসে বললে, হীরা বেচতে এসেছি, ঠিকুজী বেচতে তো আসি নি মিঃ সরকার।

রাঘব সরকার কিরীটীর কথায় আবার ওর মুখের দিকে তাকালেন পূর্ববৎ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এবং ক্ষণকাল তাকিয়ে থেকে মৃদু হেসে বললেন, এত দামী জিনিসের কারবার তো ঠিকুজী না জানলে হয় না মিঃ খান!

কেন বলুন তো?

কারণ ঠিকুজীর উপরই যে অনেক সময় দামটা নির্ভর করে।

ওঃ, এই কথা! তা বেশ তো, কি রকম ঠিকুজী হলে আপনার পছন্দ হবে বলুন?

মানে?

কথাটা তো আমার অস্পষ্ট বা দুর্বোধ্য নয় মিঃ সরকার, বিশেষ করে আপনার মত একজন অভিজ্ঞ কারবারীর পক্ষে।

তাহলে—

ধরে নিন না, আপনি যা ভেবেছেন তাই। বলুন এবারে দর।

আবার ক্ষণকাল যেন স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইলেন রাঘব সরকার কিরীটীর মুখের দিকে। তারপর বললেন নিম্নকণ্ঠে, দরের জন্য আটকাবে না। যত হীরা আপনার কাছে আছে নিয়ে আসবেন।

চেকে কিন্তু পেমেণ্ট নেব না।

নগদই পাবেন। কবে আসছেন বলুন?

ফোনে জানাব।

বেশ।

অতঃপর রাঘব সরকারকে নমস্কার জানিয়ে আমরা বের হয়ে এলাম তাঁর ঘর থেকে।

রাস্তায় বের হয়ে আবার একটা ট্যাক্সি নেওয়া হল এবং ট্যাক্সিতে উঠে প্রশ্ন করলাম, হীরাটা কার রে?

কিরীটী বললে, আড্ডি জুয়েলার্স থেকে এনেছি—কাল ফিরিয়ে দিতে হবে। অতঃপর ঘণ্টাখানেক ট্যাক্সিতে শহরের এদিক ওদিক উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে সাদার্ন অ্যাভিনুর কাছাকাছি এসে ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে ট্যাক্সি ছেড়ে দেওয়া হল।

রাত তখন প্রায় সাড়ে নটা।

কিরীটী লেকের দিকে হাঁটতে শুরু করল। আমিও ওকে অনুসরণ করলাম।

এতক্ষণ কিরীটী একটি কথাও বলে নি। একেবারে চুপ ছিল। লেকের দিকে হাঁটতে হাঁটতে এতক্ষণে কথা বলল, মিস শকুন্তলা চৌধুরীর কথা যদি সত্যই হয় সুব্রত তাহলে বলব—তার পক্ষে ঐ রাঘব সরকারকে এড়ানো সত্যিই কঠিন হবে।

কঠিন হবে!

নিশ্চয়ই। বুঝতে পারলি না লোকটাকে দেখে, ওর কথাবার্তা শুনে—সত্যি সত্যিই একটি খাঁটি রাঘব বোয়াল লোক। গ্রাস যখন করে সম্পূর্ণভাবেই গ্রাস করে ও-জাতের লোকগুলো।

তুই কি রাঘব সরকারকে স্রেফ দেখবার জন্যই ইকনমিক জুয়েলার্সে গিয়েছিলি নাকি কিরীটী? প্রশ্নটা না করে পারি না।

শুধু দেখবার জন্যে হবে কেন?

তবে?

আরো প্রয়োজন ছিল।

কি শুনি?

প্রথমতঃ মিস্ চৌধুরীকে আসতে বলেছি যখন—জানা তো আমার প্রয়োজন সত্যিই তাকে সাহায্য করা শেষ পর্যন্ত আমার পক্ষে সম্ভবপর কিনা!

হ্যাঁ, তা তো বটেই।

কি বললি?

না, বিশেষ কিছু না। এই বলছিলাম—

কি?

সুন্দর মুখের জয় তো সর্বত্রই।

আজ্ঞে না।

আর শাক দিয়ে মাছ ঢাকবার চেষ্টা কেন বন্ধু!

মাছ যে শাক দিয়ে ঢাকা যায় না তুইও যেমন জানিস আমিও জানি।

সত্যি বলছিস?

হ্যাঁ। সত্যিকারের রহস্যের ইঙ্গিত না পেলে ইকনমিক জুয়েলার্সে রাঘব সরকারকে দেখবার জন্য আর যেই যাক—কিরীটী রায় যেত না।

রহস্যের ইঙ্গিত? মানে তুই সেনরায়কে সেদিন যে কথা বলছিলি—

যাক সে কথা, তোর কেমন লাগল রাঘব সরকার লোকটাকে বল্?

বুদ্ধিমান নিঃসন্দেহে। কিন্তু—

সত্যি সত্যি লোকটার সঙ্গে কেন দেখা করতে গিয়েছিলি বল্ তো!

দেখতে গিয়েছিলাম শ্রীমান দুষ্মন্তর প্রতিদ্বন্দ্বীটি কি ধরনের—

সত্যিই কি তাই?

তা ছাড়া আর কি!

তা কি বুঝলি?

বুঝলাম, লোকটা সত্যিকারের ধনী আর—

আর?

আর সত্যিই যদি হাত বাড়িয়ে থাকে ও শকুন্তলার দিকে, তাকে সে করায়ত্ত করবেই। তাছাড়া আরো একটা কথা নিশ্চয়ই তোর মনে আছে সুব্রত—

কি?

শকুন্তলার কাকা ঐ রাঘব সরকারকে ঘৃণা করা সত্ত্বেও শকুন্তলাকে বলেছেন ওকেই নাকি বিয়ে করতে হবে তাকে।

হ্যাঁ, মনে পড়ছে বটে।

অথচ বিমল চৌধুরী—মানে শকুন্তলার কাকা অধ্যাপক বিমল চৌধুরীর সঙ্গে আমার পরিচয় না থাকলেও তাঁকে আমি জানি।

জানিস তুই ভদ্রলোককে?

জানি। অধ্যাপক বিমল চৌধুরী হচ্ছেন সেই শ্রেণীরই একজন যাঁরা পাব্লিক-এর চোখে একজন চিহ্নিত হয়ে দাঁড়াবার জন্য একটার পর একটা চেষ্টাই করে এসেছেন কিন্তু নেভার বিন সাকসিডেড্! কৃতকার্য হতে পারেন নি। হতাশের দলে—ডিফিটেড-এর দলে এবং তাঁরা হাতের কাছে কোন সুযোগ পেলে যেমন ছাড়তে পারেন না তেমনি সেই সুযোগের জন্য তাঁরা অনেক কিছুই বিসর্জনও দিতে পারেন। আর রাঘব সরকার হচ্ছে সেই শ্রেণীর একজন—যাঁরা ঐ ধরনের সুযোগের বেচা-কেনা করে উচিত মূল্য পেলে—

কি বলছিস তুই কিরীটী?

ঠিক ঐ কথাটাই বলতে চেয়েছি আমি, অর্থাৎ রাঘব সরকারের যদি সত্যিই লোভ হয়ে থাকে শকুন্তলার ওপরে—অনন্যোপায় বিমল চৌধুরীকে তা মেনে নিতেই হবে।

চার

কিরীটী পথ চলতে চলতেই বলতে লাগল, কিন্তু আমি ভাবছি এখনো মিস্ শকুন্তলা চৌধুরী আমার কাছে আগমনের তার সত্যিকারের কারণটা কেন শেষ পর্যন্ত বলতে পারল না!

কেন, সে তো বললেই, বিয়েটা কোনমতে বাধা দেওয়া যায় কিনা তাদের—

আদৌ না। সে তুই বুঝবি না। তুচ্ছ কারণে সে আমার কাছে আসে নি।

তবে?

সে এসেছিল সত্যিকারের কোন বিপদের আভাস পেয়ে—

বিপদের!

হ্যাঁ, কিন্তু কথাটা আমাকে শেষ পর্যন্ত যে কোন কারণেই হোক বলতে পারে নি।

তবে?

অবিশ্যি বিয়ের ব্যাপারটাও একটা কারণ ছিল। কিন্তু তার পশ্চাতে নিশ্চয়ই ছিল আরো একটা গুরুতর কারণ—যেজন্য সে ছুটে এসেছিল আমার কাছে।

কিন্তু—

কিরীটীর দিক থেকে আর কোন সাড়া পাওয়া গেল না। কথা বলতে বলতে হঠাৎ যেন সে চুপ করে গেল। পকেট থেকে একটা চুরুট বের করে সেটায় অগ্নিসংযোগ করে পুনরায় হাঁটতে লাগল।

লেকের ভিতর দিয়ে আমরা শর্টকার্ট করছিলাম।

লেকটা ইতিমধ্যেই নির্জন হয়ে গিয়েছে। ভ্রমণকারী ও বায়ুসেবীর দল অনেক আগেই চলে গিয়েছে। কদাচিৎ এক-আধজনকে চোখে পড়ছিল। অদ্ভুত একটা শান্ত স্তব্ধতা যেন চারিদিকে ঘনিয়ে উঠেছে।

কৃষ্ণপক্ষের রাত। কালো আকাশে কেবল তারাগুলো পিটপিট করে জ্বলছে।

কিরীটীর নাম ধরে একবার ডাকলামও, কিন্তু কোন সাড়া দিল না কিরীটী, যেমন হেঁটে চলছিল তেমনই হেঁটে চলতে লাগল। কোন একটা চিন্তা চলেছে কিরীটীর মনের মধ্যে। বরাবর দেখেছি মনের ঐ অবস্থায় কখনো সে কথা বলে না।

অগত্যা আমিও ওর পাশে পাশে হেঁটে চললাম।

বোধহয় একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম হঠাৎ কিরীটী দাঁড়িয়ে পড়ল, সুব্রত —

অ্যাঁ! কিছু বলছিলি?

হুঁ, বলছিলাম ভবিকে ভোলাতে পারি নি। নিম্নকণ্ঠে কথাগুলো বলল কিরীটী।

কি বললি?

রাঘব সরকারের লোক আমাদের ফলো করছে—

সে কি!

হ্যাঁ—পিছনে ফিরে দেখ—

সত্যিই ফিরে তাকিয়ে দেখলাম, আমাদের হাত-পনের দূরে একটা মূর্তি অদূরবর্তী লাইট পোস্টটার নীচে দাঁড়িয়ে।

ঠিক আছে, এক কাজ করা যাক, সামনেই টিপু সুলতান রোডে অমিয় চক্রবর্তী থাকে। এককালে এম-এস-সি ক্লাসে পরিচয় হয়েছিল—চল—

কিরীটী কথাটা বলেই হঠাৎ চলার গতি যেন বাড়িয়ে দিল।

সে-রাত্রে টিপু সুলতান রোডে অমিয়র ওখানে ঘণ্টা-দুই কাটিয়ে কিরীটীর বাসায় যখন ফিরে এলাম রাত তখন সাড়ে এগারোটা।

কিরীটীর অনুমানটা অর্থাৎ শকুন্তলা চৌধুরী তার কাছে আসার ব্যাপারটার মধ্যে যে সত্যিই কোনো গুরুতর কারণ ছিল সেটা প্রমাণিত হতে কিন্তু খুব বেশী দেরি হল না। চব্বিশ ঘণ্টাও পুরো অতিবাহিত হল না।

পরের দিন রাত তখন ন' টা হবে, নিত্যকার মত কিরীটীর গৃহে বসে বিকেল থেকে আড্ডা দিতে দিতে রাত ন'টা যে বেজে গিয়েছে টের পাই নি।

আরো একটা ব্যাপার নজরে পড়েছিল, আড্ডা দিলেও কিরীটী যেন কেমন একটু অন্যমনস্ক। এবং ব্যাপারটা একা আমারই নজরে পড়ে নি, কৃষ্ণাও লক্ষ্য করেছিল, কৃষ্ণার কথাতেই সেটা একসময় ধরা পড়ল।

কথার মাঝখানে হঠাৎ একসময় কৃষ্ণা বললে, সেই সকাল থেকে লক্ষ্য করছি কেমন যেন অন্যমনস্ক তুমি, কি ভাবছ বল তো?

কিরীটী তার ওষ্ঠপ্রান্ত থেকে অর্ধদগ্ধ সিগারেটটা হাতে নিয়ে সিগারেটের অগ্রভাগ থেকে অ্যাসট্রেতে ছাইটা ঝাড়তে ঝাড়তে বললে, সত্যিই ভাবছি একটা কথা কৃষ্ণা কাল থেকে।

আমরা দুজনেই ওর মুখের দিকে যুগপৎ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালাম।

কৃষ্ণা শুধাল, কি?

অভিজ্ঞান শকুন্তলম্—

সে আবার কি? প্রশ্নটা করে কিরীটীর মুখের দিকে তাকাল কৃষ্ণা।

শকুন্তলার হাতের হারানো আংটিটা খুঁজে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে চিনতে পেরেছিল যদিও সেটা নাটকীয়—কিন্তু—

কি?

কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম না কেন গত সন্ধ্যায় এ যুগের শকুন্তলা দেবীর মনের কথাটা! কেন ধরতে পারলাম না!

কালকেই সেই মেয়েটার কথাই ভাবছিস নাকি?

হ্যাঁ। শকুন্তলা কেন এসেছিল আমার কাছে? আর যদি এসেছিলই তো আসল কথাটা বলতে পারল না কেন? কি ছিল তার মনে?

কি আবার থাকবে?

তাই তো ভাবছি। তার সারা মুখে যে আশঙ্কার দুর্ভাবনার ছায়াটা দেখেছিলাম সে তো মিথ্যা নয়। শি মাস্ট—ইয়েস—শি মাস্ট—অ্যান্টিসিপেটেড সামথিং! ভয়ের কালো ছায়া সে দেখেছিল—ভয়—

কথাটা কিরীটীর শেষ হল না, ক্রিং ক্রিং করে ঘরের কোণে টেলিফোনটা বেজে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে যেন তড়িৎবেগে কিরীটী উঠে দাঁড়ায় এবং ফোনের দিকে যেতে যেতে নিম্নকণ্ঠে বলে, নিশ্চয়ই শকুন্তলা—

ফোনের রিসিভারটা তুলে নিল কিরীটী, হ্যালো! হ্যাঁ—হ্যাঁ, কিরীটী রায় কথা বলছি। কে—শকুন্তলা দেবী? হ্যাঁ হ্যাঁ—আই ওয়াজ সো লং এক্সপেকটিং ইউ! কি—কি বললেন, আপনার কাকা মারা গেছেন! হ্যাঁ, হ্যাঁ—যাবো, নিশ্চয়ই যাবো—আচ্ছা—ফোনটা রেখে দিল কিরীটী।

তারপর ফোনগাইড দেখে একটা নাম্বারে ফোন করল, কে—শিবেন? হ্যাঁ, আমি কিরীটী রায় কথা বলছি—বেলগাছিয়া তো তোমারই আণ্ডারে, তাই না? শোন—ঠিক ট্রাম ডিপোর পিছনে নতুন যে বাড়িগুলো হয়েছে—তারই একটা বাড়ি—নম্বর হচ্ছে পি ৬/১, অধ্যাপক বিমল চৌধুরীর বাড়ি—অধ্যাপক চৌধুরী,—হ্যাঁ, প্রবাবলি হি হ্যাজবিন কিল্ড! হ্যাঁ—হ্যাঁ—যাও—কি বললে—হ্যাঁ—হ্যাঁ—যাও। হ্যাঁ আমি আসছি, দেখা হলে সব বলব।

কিরীটী ফোনটা রেখে দিল।

কি ব্যাপার?

শুনলে তো শিবেন সোম থানা-ইনচার্জকে কি বললাম! অধ্যাপক বিমল চৌধুরী হ্যাজবিন কিল্ড!

সত্যিই?

আমার অনুমান তাই।

কে ফোন করছিল, শকুন্তলা চৌধুরী?

হ্যাঁ। কথাটা বলে কিরীটী গিয়ে ভিতরের ঘরে প্রবেশ করল। বুঝলাম সে প্রস্তুত হবার জন্যই ভিতরে গেল।

এতটুকুও আর বিলম্ব করবে না। এখুনি বেরুবে।

আমি ভাবছিলাম ব্যাপারটা সত্যি সত্যিই তাহলে যাকে বলে ঘনীভূত হয়ে উঠল।

মনে পড়ল ঐ সঙ্গে, আজই অধ্যাপক বিমল চৌধুরীর জন্মতিথি উৎসব ছিল। শকুন্তলা গতকাল বলে গিয়েছিল অধ্যাপকের জীবনের ঐ দিনটি বিশেষভাবে পালিত হয়। অতিথি, আত্মীয়, বন্ধুবান্ধবদের দল সব ঐ দিনটিতে আসেন বিমল চৌধুরীকে শুভকামনা জানাবার জন্য।

আজও নিশ্চয়ই এসেছিল সবাই এবং যা বোঝা গেল সেই উৎসবের ও আনন্দের মধ্যেই অকস্মাৎ মৃত্যুর কালো ছায়া নেমে এসেছে। আনন্দরস মৃত্যু-বেদনায় নীল হয়ে গিয়েছে।

কিরীটীর কণ্ঠস্বরে সম্বিৎ ফিরে এল, চল্ সুব্রত, একবার ঘুরে আসা যাক।

মনটা ইতিমধ্যে আমারও বুঝি কিরীটীর সঙ্গে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। উঠে দাঁড়ালাম। বললাম, চল্—

বিমল চৌধুরীর বাড়িটা খুঁজে পেতে আমাদের দেরি হয় নি। বাড়ির সামনেই পরিচিত কালো পুলিসভ্যান দাঁড়িয়েছিল এবং দুজন লালপাগড়ি দরজার গোড়ায় প্রহরায় ছিল।

বাড়িটা নতুন নয়। পুরাতন দোতলা বাড়ি। সামনে কিছুটা জায়গা জুড়ে বাগানের মত। নানা জাতীয় ফল ও ফুলের সব গাছ।

পরে জেনেছিলাম দীর্ঘদিন ভাড়াটে হিসেবে থেকে মাত্র বছর তিনেক পূর্বে কিনে নিয়েছিলেন অধ্যাপক বাড়িটা।

সেকালের পুরাতন স্ট্রাকচারের বাড়ি। দীর্ঘদিনের সংস্কারের অভাবে কেমন যেন একটা জীর্ণতার ছাপ পড়েছে বাড়িটার গায়ে। সামনেই একটা টানা বারান্দা। মোটা মোটা পাথরের কাজকরা সেকেলে থাম। বারান্দাটা অর্ধচন্দ্রাকৃতি ভাবে উত্তর থেকে পশ্চিমে ঘুরে গিয়েছে। বাড়িটার পিছনদিকে একটা দীঘি ও নারিকেল গাছ। তার ওদিকে খোলা মাঠ। অর্থাৎ সামনের দিকে শহর আর পিছনে গ্রাম।

উপরে ও নিচে খান-আষ্টেক ঘর। বেশ বড় সাইজের ঘরগুলি। পশ্চিম দিক থেকে চওড়া সেকেলে বেলোয়ারী কাচের রঙিন টুকরো বসানো সিঁড়ি। সিঁড়ির শেষপ্রান্তে নীচের তলার মতই বারান্দা।

দোতলায় পিছনের দিকে প্রশস্ত একটি খোলা ছাদ। সেই ছাদেই সামিয়ানা খাটিয়ে ও চেয়ার টেবিল পেতে অতিথিদের অভ্যর্থনার আয়োজন হয়েছিল।

এবং জলখাবারের ব্যবস্থা হয়েছিল নীচের হলঘরে।

নীচের তলায়ই শিবেন সোমের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। প্রথমে কিরীটীর মুখে নামটা শুনে ভদ্রলোকের চেহারাটা মনে করতে পারি নি।

কিন্তু সামনাসামনি দেখা হতেই মনে পড়ে গেল, বছর চারেক পূর্বে একটা আফিম চোরাইয়ের তদন্তের ব্যাপারে কিরীটীর ওখানেই ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল আমার। ভদ্রলোক, শিবেনবাবু আমাদের বয়সীই হবেন। তবে বয়সের অনুপাতে একটু যেন বেশী বুড়িয়ে পড়েছেন—গাল কুঁচকে গিয়েছে, কপালে ভাঁজ পড়েছে, মাথার চুল বেশীর ভাগই পেকে গিয়েছে।

এসো এসো কিরীটী, তোমার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম, আহ্বান জানালেন শিবেন সোম।

কিছু জানতে পারলে সোম?

না, এখনো সরেজমিন তদন্তই করি নি। ডেড্ বডিটা দেখেছি আর ব্যাপারটা মোটামুটি শুনেছি।

কি শুনলে?

যতটুকু শুনেছি ও দেখেশুনে যা মনে হচ্ছে—

কি?

সে-রকম কিছু নয়! ন্যাচারাল ডেথ—স্বাভাবিক মৃত্যু বলেই মনে হচ্ছে। তাছাড়া শুনলামও, ভদ্রলোক কিছুদিন যাবৎ রক্ত-চাপাধিক্যে নাকি ভুগছিলেন।

কিরীটী ঐ কথার কোন উত্তর না দিয়ে সম্পূর্ণ অন্য প্রশ্ন করল, কিন্তু বাড়িটা যেন কেমন চুপচাপ মনে হচ্ছে! নিমন্ত্রিতরা সব চলে গিয়েছেন নাকি?

হ্যাঁ, বেশীর ভাগই চলে গিয়েছেন। সামান্য চার-পাঁচজন আছেন, কিন্তু এখানে যে অনেক নিমন্ত্রিত আজ উপস্থিত ছিলেন তুমি জানলে কি করে?

কথাটা বলে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে শিবেন সোম কিরীটীর মুখের দিকে তাকালেন।

ওঁর ভাইঝি—মানে অধ্যাপকের ভাইঝি যে গত সন্ধ্যায় আমার ওখানে গিয়েছিলেন, তাঁর মুখেই শুনেছিলাম আজকের উৎসবের কথাটা।

কে, মিস্ শকুন্তলা চৌধুরী?

হ্যাঁ।

ওঃ, তা তোমার সঙ্গে মিস্ চৌধুরীর পূর্ব-পরিচয় ছিল নাকি?

না। গতকালই প্রথম তাঁকে দেখি ও প্রথম পরিচয়।

কি রকম?

কিরীটী সংক্ষেপে তখন গত সন্ধ্যার ব্যাপারটা খুলে বলল, কেবল ইকনমিক জুয়েলার্সে হানা দেবার কথাটা বাদ দিয়ে।

আই সী! তাহলে তুমি কি মনে কর—

কি?

ঐ দুষ্মন্তবাবুই—মানে ঐ দুষ্মন্ত রায়ই—

তিনি আসেন নি?

এসেছেন, তবে ঘটনার সময় তিনি ছিলেন না, পরে এসেছেন—

পরে? কখন?

আমি আসার মিনিট কয়েক আগে শুনলাম এসেছেন।

এখনো আছেন নিশ্চয়?

আছেন। কেউই যান নি ঐ ঘটনার পর।

আর কে কে আছেন?

বিমলবাবুর এক সতীর্থ সুধীর চক্রবর্তী, ওঁর এক ভাগ্নে রঞ্জন বোস, এই পাড়ারই এক রিটায়ার্ড জজ মহেন্দ্র সান্যাল, ইকনমিক জুয়েলার্সের মালিক রাঘব সরকার—

আর?

বিমলবাবুর ছেলেবেলার এক বন্ধু—বিনায়ক সেন।

কতক্ষণ আগে ব্যাপারটা জানা গিয়েছে?

তা ধরো ঘণ্টা দুই হবে।

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে কিরীটী বললে, এখন সোয়া দশটা। তাহলে আটটা পঁয়তাল্লিশের মত সময়ে—

ঐ রকমই হবে—ওঁরা বলছিলেন—

কে—কে বলছিলেন?

শকুন্তলা দেবী।

তিনি কোথায়?

উপরে তাঁর ঘরে।

মৃতদেহ কোথায় পাওয়া গিয়েছে?

তাঁর নিজের ঘরে। বিমলবাবুর বেডরুমেই।

নিজের শোবার ঘরে?

হ্যাঁ, তাঁর শয়নঘরে আরামকেদারাটার উপরে শায়িত অবস্থায়।

মৃতদেহ নিশ্চয়ই ডিসটার্ব করা হয় নি?

না, ঠিক যেমনটি ছিল তেমনটিই আছে।

ভদ্রলোকের তাহলে স্বাভাবিক মৃত্যুই হয়েছে, তাই তোমার ধারণা সোম?

সেই রকমই তো মনে হয়। তাছাড়া তো শুনলে ভদ্রলোক কিছুদিন যাবৎ হাইপারটেনসনে ভুগছিলেন, তাতেই মনে হয় সাডেন স্ট্রোক-এ—

হতে পারে অবিশ্যি, অসম্ভব কিছু নয়। তা ডাক্তার ডাকা হয়েছিল?

আমি এসে ডাক্তারকে আসবার জন্য ফোন করেছি।

মানে এঁরা করেন নি?

না। এভরিওয়ান ওয়াজ সো ননপ্লাসড্!

পাঁচ

আশ্চর্য, এখনো ডাক্তারই একজন ডাকা হয় নি! কতকটা যেন আত্মগত ভাবেই কথাটা উচ্চারণ করে কিরীটী।

না, হয় নি—তাছাড়া মাত্র তো ঘণ্টাখানেক আগে ব্যাপারটা জানা গিয়েছে, সোম বললেন।

ওঁর মৃত্যুর ব্যাপারটা প্রথমে কার নজরে পড়ে সোম এ-বাড়িতে?

এ বাড়ির অনেকদিনকার পুরাতন ঝি সরমা। সে-ই সর্বপ্রথমে নাকি ব্যাপারটা জানতে পারে, সোম বললেন।

ঠিক ঐ সময় বাইরে একটা গাড়ি থামার শব্দ শোনা গেল।

বোধহয় ডাক্তারবাবু এলেন কিরীটী, সোম বললেন, তুমি একটু অপেক্ষা করো, আমি দেখে আসি।

কথাটা বলে সোম ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

থানা অফিসার শিবেন সোমের অনুমান মিথ্যা নয়, একটু পরে এক প্রৌঢ় ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে সোম এসে ঘরে ঢুকলেন।

ডাক্তার কথা বলতে বলতে এসে ঘরে ঢুকলেন, শুনে হয়ত আশ্চর্য হবেন, আমি ঘণ্টা-দেড়েক আগে একবার একটা ফোনে কল পেয়েছিলাম। এই বাড়ি থেকেই কেউ ফোন করেছিল, অধ্যাপককে তাড়াতাড়ি একটিবার দেখে যাবার জন্য। কিন্তু অন্য এক জায়গায় জরুরী একটা কল পেয়ে আমি তখন বেরুচ্ছি, তাই দেরি হয়ে গেল—

সঙ্গে সঙ্গে কিরীটী যেন বাধা দিয়ে তাকে প্রশ্ন করে, কি বললেন ডাক্তার? ঘণ্টা দেড়েক আগে ফোন করেছিল, এ-বাড়ি থেকে আপনাকে কেউ?

হ্যাঁ।

কে? নাম বলে নি?

নাম! না বলে নি—আর তাড়াতাড়িতে আমিও জিজ্ঞাসা করি নি—

আপনাকে ফোন করেছিল পুরুষ না মেয়ে?

স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর মনে আছে আমার।

স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর?

হ্যাঁ।

এ বাড়ির সঙ্গে কি আপনার কোন পূর্ব-পরিচয় ছিল ডাক্তারবাবু? কিরীটী প্রশ্ন করে।

জবাব দিলেন থানা-অফিসার শিবেন সোম, হ্যাঁ, ডাঃ ঘোষ তো এ বাড়ির ফ্যামিলি-ফিজিসিয়ান। মিস চৌধুরীর মুখে ওঁর নাম শুনে তাই তো ওঁকেই আমি ফোন করেছিলাম—

আপনি এ বাড়ির ফ্যামিলি-ফিজিসিয়ান তাহলে ডাঃ ঘোষ?

হ্যাঁ।

কতদিন এঁদের সঙ্গে আপনার পরিচয়?

তা বছর বারো-তেরো তো হবেই—এ পাড়ায় আমি আসা অবধি ওঁরা আমার পেসেন্ট।

তাহলে তো খুব ভালই হল, অধ্যাপকের স্বাস্থ্য সম্পর্কে আপনি ডিটেলস্ খবর দিতে পারবেন! কিরীটী বলে।

তা পারব বৈকি। কিন্তু তার আগে একবার বিমলবাবুকে—

হ্যাঁ দেখবেন বৈকি, চলুন—সোম বললেন।

অতঃপর সকলে আমরা সিঁড়ি দিয়ে দোতলার দিকে অগ্রসর হলাম।

সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতেই কিরীটী ডাঃ ঘোষকে পুনরায় প্রশ্ন করে, ডাঃ ঘোষ, বিমলবাবু রক্তচাপে ভুগছিলেন শুনলাম—

হ্যাঁ, বেশ কিছুদিন ধরে ভুগছিলেন।

রক্তচাপ কি খুব বেশী হয়েছিল?

তা একটু বেশীই ছিল—

ওষুধ খেতেন না উনি?

মধ্যে মধ্যে খেতেন, তবে—

তবে?

রেগুলার কোন ওষুধ খেতেন না।

কেন?

কারণ প্রেসারটা ফ্লাকচুয়েট করত—

ভদ্রলোকের মেজাজ কেমন ছিল?

খুব কুল ব্রেনের লোক ছিলেন।

কিন্তু সাধারণত শুনেছি রক্তচাপাধিক্যে যাঁরা ভোগেন তাঁরা একটু রগচটা প্রকৃতির হন! কিরীটী সহসা প্রশ্ন করে।

না, সে-রকম বড় একটা তাঁকে মনে হয় নি কখনো, ডাঃ ঘোষ বললেন, এবং শুধু তাই নয়, রাগারাগি চটাচটি বিশেষ তিনি পছন্দ করতেন না এমনও শুনেছি।

আচ্ছা ডাঃ ঘোষ—

বলুন?

বিমলবাবুর শেষ ব্লাডপ্রেসার কবে নিয়েছিলেন, কিছু মনে আছে?

থাকবে না কেন—মাত্র দিন চারেক আগেই তো নিয়েছি।

আপনি মধ্যে মধ্যে নিশ্চয়ই এসে বিমলবাবুর ব্লাডপ্রেসারটা পরীক্ষা করে যেতেন!

না, প্রেসার নেওয়াটা তিনি বিশেষ পছন্দ করতেন না। তবে সেদিন তিনি নিজেই আমাকে ফোন করে ডেকেছিলেন—

কেন?

কিছুদিন থেকে মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছিল তাই—

তার কোন কারণ ঘটেছিল কি?

ঠিক বলতে পারি না, অত্যন্ত চাপা প্রকৃতির লোক ছিলেন তো। তবে—

তবে?

তবে সেদিন তাঁকে দেখে মনে হয়েছিল মনের মধ্যে যেন কিছু একটা দুশ্চিন্তা চলেছে, কেমন যেন একটু বিশেষ আপসেট—বিচলিত মনে হয়েছিল তাঁকে।

বিচলিত হবার মত কোন কারণ—

না, আমিও জিজ্ঞাসা করি নি—তিনিও বলেন নি।

দোতলায় যে ঘরের মধ্যে মৃতদেহ ছিল আমরা এসে সেই ঘরের দরজা ঠেলে প্রবেশ করলাম—ডাঃ ঘোষ, থানা-অফিসার শিবেন সোম, কিরীটী ও আমি।

ঘরটা বেশ বড় আকারেরই, দক্ষিণ-পূবমুখী।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে বারান্দা দিয়ে দক্ষিণমুখী এগুলে প্রথম দরজাটা দিয়েই সেই ঘরে প্রবেশ করতে হয়। দরজাটা ভেজানো ছিল এবং দ্বারে একজন লালপাগড়ী মোতায়েন ছিল।

ভিতরে প্রবেশ করে কিরীটী দাঁড়িয়ে গেল। ঘরের পূর্ব-দক্ষিণ কোণে একটা বেতের আর্মচেয়ারে শোয়া অবস্থায় ছিল মৃতদেহ।

হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন ভদ্রলোক চেয়ারে শুয়ে ঘুমিয়ে আছেন। নিমীলিত চক্ষু। একটি হাত বুকের উপরে ন্যস্ত, অন্য হাতটি বামপাশে ঝুলছে অসহায় ভাবে। পরিধানে গরদের পাঞ্জাবি ও দামী শান্তিপুরী ধুতি। সামনেই এক জোড়া কটকী চটি পড়ে আছে।

সামনে ত্রিপয়ের উপর সেদিনকার সংবাদপত্র ও একটি গোল্ড ফ্লেকের সিগারেট টিন, দেশলাই ও চিনামাটির একটি অ্যাশট্রে।

ঘরের উত্তরদিকে দুটি প্রমাণ সাইজের কাঠের আলমারি। একটির পাল্লায় আয়না বসানো—অন্যটিতে বই ঠাসা, কাচের পাল্লা দেওয়া।

ঘরের মধ্যে প্রবেশের তিনটি দরজা, তার মধ্যে উত্তরদিকের ঘরের মধ্যবর্তী দরজাটি বন্ধ ছিল এবং বাথরুমে যাবার দরজাটি ও অন্য দরজাটি খোলাই ছিল।

দক্ষিণমুখী তিনটি জানালাই খোলা ছিল। জানালায় পর্দা দেওয়া।

দক্ষিণ দিক ঘেঁষে জানালা বরাবর খাটের উপরে শয্যা বিস্তৃত। তার পাশে একটি বুক-সেল্‌ফ। সেল্‌ফ-ভর্তি বই।

শয়নঘরটি যে কোন অধ্যাপকের দেখলেই বোঝা যায়।

দেখলাম কিরীটী বেশ কিছুক্ষণ ঘরের চারিদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে এক সময় এগিয়ে গেল মৃতদেহের দিকে।

ইতিমধ্যে ডাক্তার ঘোষের মৃতদেহ পরীক্ষা করা হয়ে গিয়েছিল।

কিরীটী মৃদুকণ্ঠে ডাক্তার ঘোষকে প্রশ্ন করে, কি মনে হয় ডাক্তার ঘোষ? ডেথ ডিউ টু থম্বসিস বলেই কি মনে হয়?

শান্ত মৃদুকণ্ঠে 'না' শব্দটি উচ্চারণ করলেন ডাঃ ঘোষ। এবং সঙ্গে সঙ্গে শিবেন সোম ও আমি ডাক্তার ঘোষের মুখের দিকে তাকালাম।

কিরীটী কিন্তু তাকায় নি। বরং দেখলাম, প্রশ্নটা করে সে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে যেন মৃতের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

ডাক্তার ঘোষের কথাটা তার কানে গিয়েছিল কিনা বুঝতে পারলাম না। কারণ একটু পরেই দেখি সে মৃতদেহের একেবারে সামনাসামনি এগিয়ে গিয়ে মৃতের মুখের কাছে একেবারে ঝুঁকে পড়ে কি যেন তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে এবং দেখতে দেখতেই পকেট থেকে একটা লেন্স বের করে সেই লেন্সের সাহায্যে মৃতের মুখের উপরে কি যেন পরীক্ষা করতে লাগল।

তারপর একসময় লেন্সটা পকেটে রেখে সোজা হয়ে দাঁড়াল এবং এতক্ষণে কথা বলল, ইয়েস, আই এগ্রি উইথ ইউ ডাক্তার ঘোষ—আপনার সঙ্গে আমি একমত। এবং ইফ আই অ্যাম নট রং—আমার অনুমান যদি ভুল না হয়ে থাকে তো—ডাক্তার ঘোষের মুখের দিকে তাকিয়ে কিরীটী তার কথাটা শেষ করল, ওঁর মৃত্যু ঘটেছে কোন ত্বরিৎক্রিয়াশীল বিষে—

কি বললি কিরীটী? প্রশ্ন করলাম আমিই।

হ্যাঁ, বিষ সুব্রত! কোন বিষের ক্রিয়াতেই ওঁর মৃত্যু ঘটেছে এবং সে বিষ তাঁর অজ্ঞাতে খুনী প্রয়োগ করেছিল বলেই বোধ হয়—অর্থাৎ বিষপ্রয়োগের পূর্বে ওঁকে ক্লোরোফর্মের সাহায্যে খুব সম্ভব ঘুম পাড়ানো হয়েছিল—

ক্লোরোফর্ম! প্রশ্ন করলেন শিবেন সোম।

হ্যাঁ শিবেন, ভাল করে লক্ষ্য করে দেখো—ওঁর নাকের ডগায় কয়েকটি রক্তাভ বিন্দু আছে—

রক্তাভ বিন্দু!

হ্যাঁ, রুমালে বা কাপড়ে ক্লোরোফর্ম ঢেলে ওঁর নাকের ওপর হয়তো চেপে ধরা হয়েছিল, যার ফলে উনি জ্ঞান হারান। তারপর কোন তীব্র বিষ—

কিন্তু—

অবিশ্যি সঠিক কিভাবে কি ঘটেছে সেটা তদন্ত ও বিশ্লেষণ সাপেক্ষ, এই মুহূর্তেই সব কিছু তোমাকে আমি পরিষ্কার করে বলতে পারব না—সেটা সম্ভবপরও নয়। তবে ব্যাপারটা যে সাধারণ ও স্বাভাবিক মৃত্যু নয়, এমন কি আত্মহত্যাও নয়, সেইটুকুই বর্তমানে বলতে পারি।

মানে?

মানে বিমলবাবুকে হত্যা করা হয়েছে।

হত্যা!

আমার তাই ধারণা, কিন্তু একটা কিসের শব্দ পাচ্ছি যেন! কিরীটীর শ্রবণেন্দ্রিয় সজাগ হয়ে ওঠে।

বলা বাহুল্য সেই সঙ্গে আমাদের সকলেরই।

এতক্ষণ শব্দটা কানে প্রবেশ করে নি, কিন্তু কিরীটী কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই শব্দটা ঘরের মধ্যে উপস্থিত আমরা সকলেই যেন শুনতে পেলাম।

বাথরুমের দরজাটা ভেজানোই ছিল তবে সামান্য ফাঁক হয়ে ছিল, কিরীটী বাথরুমের দিকে এগিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আমিও।

দরজাটা হাত দিয়ে ঠেলে খুলে দিতেই শব্দের উৎসটা পরিষ্কার হয়ে গেল। বাথরুমের মধ্যে বেসিনের ট্যাপটা খোলা রয়েছে এবং বাথরুমের আলোটা জ্বলছে।

সেই ট্যাপ দিয়ে জল পড়ার শব্দটা আমাদের কানে এসেছিল।

কিরীটী থমকে দাঁড়ায়। পাশেই দাঁড়িয়েছিলাম আমি।

কিরীটী মৃদুকণ্ঠে ডাকল, সুব্রত!

কি?

একটা তীব্র অথচ মিষ্টি গন্ধ পাচ্ছিস!

গন্ধটা আমার নাকে প্রবেশ করেছিল এবং আমার পশ্চাতে দণ্ডায়মান শিবেন সোমের নাসারন্ধ্রেও প্রবেশ করেছিল।

তিনিই জবাব দিলেন, হুঁ, পাচ্ছি—

কিসের গন্ধ বলে মনে হচ্ছে বল তো শিবেন?

ঠিক বুঝতে পারছি না—

আমিও না। কথাটা বলে নাক দিয়ে টেনে টেনে গন্ধটা বোঝবার চেষ্টা করে কিরীটী কয়েকবার এবং তারপরই হঠাৎ একসময় বলে ওঠে, হ্যাঁ পেরেছি—ক্লোরোফর্ম—

ঠিক—ঠিক।

ইতিমধ্যে বেসিনের কাছেই একটা টার্কিশ টাওয়েল পড়ে ছিল, কিরীটী এগিয়ে গিয়ে নীচু হয়ে সেটা মাটি থেকে তুলে নিল।

ছয়

তোয়ালেটা নাকের কাছে তুলে ধরতেই এতক্ষণ যে গন্ধটা অস্পষ্ট আমাদের সকলের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করছিল—তার একটা ঝাপ্‌টা যেন সকলেরই নাসারন্ধ্রে এসে লাগল।

কিরীটী দেখি ততক্ষণে আলোর সামনে তোয়ালেটা ধরে পরীক্ষা করছে এবং পরীক্ষা করতে করতেই মৃদুকণ্ঠে বললে, দেখছি একেবারে নতুন তোয়ালেটা, সামান্য একটু ভিজেও আছে—বোঝা যাচ্ছে কিছুক্ষণ পূর্বেই তোয়ালেটা ব্যবহৃত হয়েছিল।

শেষের কথাগুলো কতকটা যেন আপনমনেই বলে কিরীটী। এবং আর কেউ না বুঝলেও আমি বুঝতে পারি, কিরীটীর মনের মধ্যে একটা চিন্তাধারা চলেছে, যদিচ চিন্তার ধারাটা সুসংবদ্ধ নয়, এলোমেলো তখনো।

এলোমেলো অসংবদ্ধ চিন্তার ধারাটা তার বিশেষ একটি কেন্দ্রে পৌঁছবার চেষ্টা করছে

কিন্তু হাতের কাছে এমন কোন নির্ভরযোগ্য সূত্র পাচ্ছে না যার সাহায্যে বা যার ওপর নির্ভর করে সে সেই কেন্দ্রে গিয়ে পৌঁছতে পারে।

আমিও যে মনে মনে ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করছিলাম না তা নয়, কিন্তু বিশেষ কোন নির্ভযোগ্য সূত্র আমিও যেন হাতের কাছে পাচ্ছিলাম না।

একটু বোধহয় অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম, এমন সময় কিরীটীর কণ্ঠস্বর কানে এল, চলুন ডাক্তার ঘোষ, ঘরে যাওয়া যাক!

সকলে আমরা পুনরায় ফিরে এলাম পূর্বের ঘরে।

ডাক্তার ঘোষ বললেন, আর একটা জরুরী কল আছে—তাঁকে ছেড়ে দিলে ভাল হয়।

শিবেন সোম কিরীটীর মুখের দিকে তাকালেন।

কিরীটী বললে, হ্যাঁ ডাক্তার ঘোষ, আপাততঃ আপনি যেতে পারেন, তবে আপনাকে পরে হয়ত শিবেনবাবুর প্রয়োজন হতে পারে।

বেশ তো, আমার দ্বারা যতটুকু সম্ভব আমি আপনাদের নিশ্চয়ই সাহায্য করব মিঃ রায়।

বলা বাহুল্য, ইতিমধ্যে একসময় শিবেন সোমই কিরীটী এবং আমার পরিচয় দিয়েছিলেন ডাক্তার ঘোষকে।

ডাক্তার ঘোষ নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিলেন।

ডাক্তার ঘোষ ঘর থেকে বের হয়ে যাবার পরই কিরীটী শিবেন সোমের দিকে তাকিয়ে বললে, এঁদের এখানকার সকলের জবানবন্দি নিশ্চয়ই এখনো তোমার নেওয়া হয় নি সোম?

না।

তাহলে সেটাই এবারে শুরু কর।

প্রথমেই ঘরে ডাকা হল শকুন্তলা চৌধুরীকে।

পাশের ঘরে এসে ইতিমধ্যে আমরা সকলে বসেছিলাম। এ ঘরটা মৃত অধ্যাপকের শয়ন-সংলগ্ন ঘর। জানা গেল পূর্বে ঘরটা খালিই পড়েছিল, ইদানীং মাসখানেক হবে বিমলবাবুর ভাগ্নে রঞ্জন বোস এসে ঘরটা অধিকার করেছেন।

ঘরটার মধ্যে বিশেষ কোন আসবাবপত্র ছিল না। একধারে একটি খাটে শয্যা বিছানো, একটি দেরাজ, একটি দেওয়াল-আলনা ও একটি আলমারি। ঘরের এক কোণে একটি টেবিল ও চেয়ার ছিল। গোটাচারেক চেয়ার ঐ ঘরে আনিয়ে ঐ টেবিলটা টেনে নিয়ে শিবেন সোম বসলেন, কিছুদূরে আমরা বসলাম।

শকুন্তলা চৌধুরী ঘরে এসে ঢুকল এবং প্রথমেই সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে কিরীটীর মুখের দিকে তাকালো।

কিরীটী তখন বললে, বসুন মিস্ চৌধুরী, শিবেনবাবু আপনাকে কিছু প্রশ্ন করতে চান। উনি যা জানতে চান—আশা করি আপনার বলতে আপত্তি হবে না!

না। বলুন উনি কি জানতে চান?

দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন?

শকুন্তলা নিঃশব্দে কিরীটী কর্তৃক নির্দিষ্ট চেয়ারটায় উপবেশন করল।

শিবেন সোম বললেন, মিস্ চৌধুরী, যদিও ব্যাপারটা আমি মোটামুটি শুনেছি—আপনার মুখ থেকে আর একবার শুনতে চাই।

মিস্ শকুন্তলা চৌধুরীর সংক্ষিপ্ত বিবৃতি হচ্ছে ঃ

বিমল চৌধুরী প্রথম যৌবনে বিবাহ করেছিলেন এম-এ পাস করবার পর, কিন্তু বৎসর-খানেকের মধ্যেই তাঁর স্ত্রী-বিয়োগ হয় এবং আর দ্বিতীয়বার তিনি বিবাহ করেন নি।

এম-এ পাস করবার পরই তিনি কোন একটি বেসরকারী কলেজে কলকাতায় অধ্যাপনার কাজ নেন। এবং অদ্যাবধি সেই অধ্যাপনার কাজেই নিযুক্ত ছিলেন। বর্তমানে তাঁর বয়স হয়েছিল বাহান্ন বছর।

অধ্যাপনা করে মাইনে যে একটা খুব বেশী পেতেন তা নয়, তাহলেও তাঁর মাসিক উপার্জনটা বেশ যাকে বলে ভালই ছিল, এবং সেই বাড়তি টাকাটা তিনি উপার্জন করতেন তাঁর লেখা কলেজের পাঠ্যপুস্তকগুলো ও অন্যান্য বিষয়ে গবেষণামূলক পুস্তকগুলো থেকে, কাজেই আর্থিক সচ্ছলতা তাঁর বরাবরই ছিল, বেসরকারী কলেজের একজন অধ্যাপক হলেও।

প্রত্যেক মানুষেরই নানা ধরনের কর্মব্যস্ততা ও নেশা বা হবি থাকে।

বিমল চৌধুরীরও ছিল অমনি একটি হবি বা নেশা—নানা ধরনের ব্যবসা করা। জীবনে বহুরকম ব্যবসাই তিনি করেছেন এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তাঁকে ঐসব ব্যাপারে লোকসান দিতে হয়েছে—একটার পর একটা অকৃতকার্যতায়, কিন্তু তবু তিনি নিরাশ বা নিরুৎসাহ হন নি।

সংসারে তাঁর আপনার জন বলতে ঐ একটিমাত্র ভাইঝি শকুন্তলাই।

শকুন্তলার, বিমলবাবুর মুখেই শোনা, বাবা প্রসাদ চৌধুরী বিমল চৌধুরীর একমাত্র সহোদর ছিলেন। শকুন্তলার যখন তিন বছর বয়স সেই সময় তাঁর মা'র মৃত্যু হয়। প্রসাদ চৌধুরীও আর দ্বিতীয়বার দ্বারপরিগ্রহ করেন নি। যদিচ শোনা যায়, সি. পি.-তে কেন্দ্রীয় সরকারের ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে মোটা মাইনের চাকরি করতেন প্রসাদ চৌধুরী—তথাপি মৃত্যুকালে একটি টাকাও নাকি মেয়ের জন্য রেখে যেতে পারেন নি, বরং কলকাতার কোন নামকরা মদের দোকানে কিছু ধারই রেখে গিয়েছিলেন।

চাকরিতে ঢোকার পর থেকেই মদ্যপান-দোষ প্রসাদ চৌধুরীর মধ্যে দেখা দেয় এবং স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকে সেটা ক্রমশই বৃদ্ধি পেতে থাকে। এবং মৃত্যুও হয়েছিল তাঁর অতিরিক্ত মদ্যপান করে মত্ত অবস্থায় গাড়ি চালাতে চালাতে, ভয়াবহ একটা দুর্ঘটনার ফলে স্ত্রীর মৃত্যুর কয়েক মাসের মধ্যেই।

কর্মজীবনে দুই ভাই বিমল ও প্রসাদ চৌধুরী পরস্পর থেকে দূরে অবস্থান করলেও পরস্পরের মধ্যে সম্পর্কটা ছিন্ন হয়ে যায় নি। উভয়েই উভয়ের দেখাসাক্ষাৎ বড় একটা না হলেও খোঁজখবর নিতেন, পরস্পরের মধ্যে পত্রের আদান-প্রদানও ছিল।

সহোদরের আকস্মিক মৃত্যুসংবাদটা তারযোগে পেয়েই সঙ্গে সঙ্গে সি. পি.-তে চলে গিয়েছিলেন এবং সেখানে গিয়ে বিমল চৌধুরী সঙ্গে করে সাড়ে তিন বছরের বাচ্চা ভাইঝি শকুন্তলাকে নিজের কাছে কলকাতায় নিয়ে এলেন। এবং সেই থেকেই শকুন্তলা তার কাকা বিমল চৌধুরীর কাছে আছে।

কিরীটী ঐ সময় বাধা দিল, অবিশ্যি আপনার মনে থাকবার কথা নয়, তবু শুনেও থাকেন কখনো যদি—আপনি যখন এখানে আসেন মিস্ চৌধুরী সে সময় কি ঐ সরমা ঝি এখানে ছিল?

সঙ্গে সঙ্গে শকুন্তলা কিরীটীর মুখের দিকে তাকালো এবং শান্ত মৃদু কণ্ঠে বললে, ছিল কিন্তু সরমা তো ঝি নয় কিরীটীবাবু!

শকুন্তলার কথায় একটু যেন বিস্ময়ের সঙ্গে কিরীটী ওর মুখের দিকে তাকালো।

ঝি নয়! মৃদু কণ্ঠে শুধাল।

না।

তবে যে শুনলাম সে এ বাড়ির পুরাতন ঝি?

না, যা শুনেছেন ভুল শুনেছেন—সে ঝি নয়।

তবে কে সে?

এ বাড়ির সঙ্গে তার কোন আত্মীয়তা বা কোন সম্পর্কই নেই সত্যি মিঃ রায়, তবু সে ঝি নয়। তারপর যেন একটু থেমে বলতে লাগল শকুন্তলা, সরমা এক কৈবর্ত পরিবারের মেয়ে, বারো বছর বয়সের সময় সে বিধবা হয় এবং কাকা তাকে নিজগৃহে আশ্রয় দেন। তার পূর্ব-ইতিহাস এর বেশী কিছু আমার জানা নেই—জানবার চেষ্টাও আজ পর্যন্ত করি নি। এখানে এসে ওকে আমি দেখেছিলাম, মায়ের মতই সে আমাকে মানুষ করেছে—ও ঝি নয়।

ও। আমি ভেবেছিলাম—

শুধু আপনি কেন, বাইরে থেকে কেউ এলে বা কথা শুনলে ঐ রকমই একটা কিছু ভাববে—কিন্তু সে ঝি নয়। এবং কাকা তাকে সেভাবে কোন দিনই দেখতেন না, এ বাড়িতে তার একটি বিশেষ স্থান বরাবরই দেখেছি—

ঠিক আছে। আপনি যা বলছিলেন বলুন।

শকুন্তলা চৌধুরী আবার বলতে শুরু করল ঃ

গত পাঁচ বছর ধরে শকুন্তলারই ইচ্ছায় তার কাকা বিমল চৌধুরীর জন্মতিথি উৎসব পালন করা হচ্ছে। আজ সেই জন্মতিথি উৎসবই ছিল।

প্রত্যেকবারই ঐ দিনটিতে বিমল চৌধুরীর কিছু পরিচিত বন্ধুবান্ধব ও সতীর্থকে নিমন্ত্রণ করা হয়। এবারেও জন-পঞ্চাশেককে করা হয়েছিল। উৎসবের সঙ্গে জলযোগের আয়োজন ছিল।

বেলা চারটে থেকেই নিমন্ত্রিতরা সব আসতে শুরু করে ও এক এক করে আবার সন্ধ্যার পর থেকেই চলে যেতে শুরু করে। রাত্রি তখন বোধ করি সওয়া সাতটা হবে। একে একে নিমন্ত্রিতরা সবাই তখন প্রায় চলে গিয়েছে।

সামনের দোতলার ছাদেই সামিয়ানা খাটিয়ে প্যাণ্ডেল বেঁধে উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল।

বিমল চৌধুরী সেখানেই একটা চেয়ারে বসে দীর্ঘদিনের সতীর্থ অধ্যাপক সুধীর চক্রবর্তীর সঙ্গে গল্প করছিলেন, এমন সময় রঞ্জন বোস এসে বলে তার মামাকে কে ফোনে ডাকছে।

বিমল চৌধুরী ভিতরে চলে যান সেই সংবাদ পেয়ে—

বাধা দিল ঐ সময় আবার কিরীটী, এক্সকিউজ মি মিস্ চৌধুরী, একটা কথা—

বলুন।

বলছিলাম ঐ রঞ্জনবাবুর কথা। কে যেন বলছিলেন উনি মাসখানেক হলো মাত্র এখানে এসেছেন!

হ্যাঁ, মাসখানেকই হবে।

আচ্ছা রঞ্জনবাবু কি বিমলবাবুর আপন বোনের ছেলে?

হ্যাঁ। ওঁদের একমাত্র বোন সরলা দেবীর ছেলে।

মাসখানেক তাহলে রঞ্জনবাবু এখানে আছেন! কিরীটী আবার প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ।

তার আগে উনি কোথায় ছিলেন?

মালয়ে। সেখানে পিসেমশাইয়ের কিসের যেন ব্যবসা ছিল।

ছিল কেন বলছেন, এখন কি নেই?

না, বছর তিনেক আগে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর রঞ্জনদাই ব্যবসাটা দেখছিল কিন্তু চালাতে পারল না, শেষ পর্যন্ত সেই ব্যবসা অন্যের হাতে চলে যাওয়ায় বাধ্য হয়েই গত মাসে তাকে এখানে চলে আসতে হয়।

আর আপনার পিসিমা?

পিসিমা বছর দশক আগেই মারা গিয়েছেন।

আর ওঁর কোন ভাই-বোন নেই?

না।

এখানে উনি কি করছিলেন?

কিছুই না।

তবে কি বসেছিলেন নাকি?

না, ঠিক তাও নয়—প্রেস ও বইয়ের দোকান করবে বলে কাকার সঙ্গে কিছুদিন ধরে কথাবার্তা চলছিল।

কোন কিছু স্থির হয় নি?

না। কাকা রাজী হচ্ছিলেন না কিছুতেই।

কেন?

বলতে পারি না। তবে—

তবে?

আমার মনে হয়, কাকা যেন রঞ্জনদাকে ঠিক পছন্দ করছিলেন না। দিন দশেক আগে—

কি?

দুজনের মধ্যে খানিকটা কথা-কাটাকাটি হয়ে গিয়েছিল সরমাদির মুখে শুনি।

কি বিষয় নিয়ে হয়েছিল কথা-কাটাকাটি কিছু জানেন?

না।

আপনার কাকা কেন রঞ্জনবাবুকে পছন্দ করতেন না, সে সম্পর্কে কিছু আপনার ধারণা আছে?

না।

রঞ্জনবাবুর স্বভাবচরিত্র কেমন?

ভালই। তাছাড়া রঞ্জনদা অত্যন্ত ভদ্র ও বিনয়ী—

বয়স কত হবে তাঁর?

আমার চাইতে বছর চারেকের বড়।

লেখপড়া?

ম্যাট্রিক পাস।

সাত

শকুন্তলা আবার তার কাহিনী শুরু করল ঃ

বিমল চৌধুরী ফোন ধরবার জন্য আধঘণ্টা চলে যাবার পর রিটায়ার্ড জজ মহেন্দ্র সান্যাল মশাই প্রথম বললেন, চৌধুরী এখনো ফিরছে না কেন? তিনি এবারে বিদায় নেবেন।

ভৃত্যকে ডেকে বিনয়েন্দ্র সেন বিমলবাবুর এক বাল্যবন্ধু, বিমলবাবুকে ডেকে দেবার জন্য বলেন ঐ সময়।

ভৃত্য ডাকতে যাবার কিছুক্ষণ পরেই ভিতর থেকে একটা গোলমালের শব্দ শোনা যায়।

ওঁরা সকলে সেই গোলমাল শুনে এগুতে যাবেন, ভৃত্য ছুটতে ছুটতে এমন সময় এসে হাজির হলো এবং হাউমাউ করে বলে, তার বাবু মারা গিয়েছে—

বিনয়েন্দ্র সেন যেন থমকে যান, সে কি রে!

হ্যাঁ, বাবু! ভৃত্য কাঁদতে কাঁদতে বলে, বাবু নেই—

সকলে একসঙ্গে প্রশ্ন করে, কোথায়—কোথায় তোর বাবু?

চলুন দেখবেন, তাঁর শোবার ঘরে চেয়ারের ওপর মরে পড়ে রয়েছেন।

তাড়াতাড়ি সকলে গিয়ে বিমলবাবুর শোবার ঘরে হাজির হয়, এবং ঘরে ঢুকে এখন যে অবস্থায় মৃতদেহ চেয়ারে পড়ে আছে—ঠিক সেই অবস্থায় দেখতে পায়, আর তার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে সরমা।

সরমার দেহে যেন এতটুকু প্রাণেরও স্পন্দন নেই। একেবারে পাথরের মূর্তি। মাথার ঘোমটা খসে পড়েছে, দু'চোখের কোল বেয়ে নিঃশব্দে দুটি অশ্রুর ধারা গড়িয়ে পড়ছে।

ওঁরা সকলেই স্তম্ভিত বিস্ময়ে যেন কিছুক্ষণ ঐ দৃশ্যের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। কারো মুখে কোন কথা ফোটে না, কারো ওষ্ঠে কোন প্রশ্ন আসে না, সবাই যেন বোবা, সবাই যেন স্তব্ধ।

কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ যেন সরমার মধ্যে সম্বিৎ ফিরে আসে। সে মাথার কাপড়টা তুলে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় একটি কথাও না বলে।

মানুষটা যে মারা গিয়েছে কারোরই বুঝতে দেরি হয় না। তবু রিটায়ার্ড জজ মহেন্দ্র সান্যাল বিমলবাবুকে পরীক্ষা করে দেখেন।

দেহটা যদিও তখনো গরম রয়েছে—শ্বাস-প্রশ্বাসের কোন চিহ্নই নেই।

সকলে তবু মহেন্দ্র সান্যালের মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো।

ক্ষীণকণ্ঠে মহেন্দ্রবাবু বললেন, ডেড!

তারপর? শিবেন সোম শকুন্তলার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন।

তারপর সরমাদিকেই প্রশ্ন করে জানা যায়, বিমলবাবুকে কি একটা কথা বলতে নাকি সরমা ঐ সময় তাঁর শোবার ঘরে এসে তাঁকে ঐ মৃত অবস্থায় দেখে হঠাৎ পাথর হয়ে গিয়েছিল।

এবারে কিরীটীই প্রশ্ন করল, তাহলে সরমা দেবীই প্রথম ব্যাপারটা জানতে পারেন?

হ্যাঁ।

আপনি ঐ সময় কোথায় ছিলেন মিস্ চৌধুরী?

সন্ধ্যা থেকেই মাথার মধ্যে বড় যন্ত্রণা হচ্ছিল, আমি সাতটা নাগাদ গিয়ে আমার ঘরে আলো নিভিয়ে অন্ধকারে শুয়েছিলাম, গোলমাল শুনে ছুটে যাই।

কোন্ ঘরে আপনি থাকেন?

রঞ্জনদার পাশের ঘরটাই আমার ঘর।

আপনি তারপরই বোধ হয় আমাকে টেলিফোন করেন?

হ্যাঁ।

কেন বলুন তো, হঠাৎ আমাকে ফোন করতে গেলেন কেন মিস্ চৌধুরী? প্রশ্নটা করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায় কিরীটী শকুন্তলার মুখের দিকে।

কারণ আমার—আমার এ ব্যাপারটা দেখেই মনে হয়েছিল—

কি? কি মনে হয়েছিল মিস্ চৌধুরী?

স্বাভাবিক মৃত্যু নয়। সামথিং হ্যাপেণ্ড!

কেন?

তা আমি ঠিক বলতে পারব না মিঃ রায়, তবে—তবে আমার যেন তাই মনে হয়েছিল, আর তাই আপনাকে আমি ফোন করি।

ফোনটা কোথায় এ-বাড়ির?

ঘরের সামনে বারান্দাতেই আছে।

মিস্ চৌধুরী!

বলুন?

ফোনে আপনার কাকাকে কেউ ডাকছে এ খবরটা তাঁকে কে দিয়েছিল বলতে পারেন?

বোধ হয় ভোলা।

ভোলা বুঝি চাকরটার নাম?

হ্যাঁ।

কতদিন কাজ করছে এ বাড়িতে ভোলা?

নতুন এসেছে ও, এক মাসও হবে না, বোধ করি দিন-কুড়ি।

আর চাকর নেই?

আছে, রামচরণ—অনেকদিন সে এ বাড়িতে আছে কিন্তু বুড়ো হয়ে গিয়েছে—তাছাড়া হাঁপানির টান, কাজকর্মের বড় অসুবিধা হয় বলে ঐ ভোলাকে রাখা হয়েছিল। অবিশ্যি আরো একজন ঝি আছে—বুনী!

আচ্ছা মিস্ চৌধুরী, আপনাদের ফ্যামিলি-ফিজিসিয়ান ডাঃ ঘোষ বলছিলেন, কিছুদিন

থেকে ইদানীং নাকি বিমলবাবুর মনটা বিক্ষিপ্ত ছিল, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিল—আপনি জানেন কিছু সে সম্পর্কে?

হ্যাঁ, কাকাকে যেন কিছুদিন ধরে বড্ড বেশী চিন্তিত মনে হতো। ফলে মাথার যন্ত্রণাও হচ্ছিল—আর তাই ডাঃ ঘোষকে তিনি কয়েক দিন আগে ডেকে পাঠিয়েছিলেন তাও জানি।

কারণ কিছু জানেন না?

না।

আচ্ছা, ব্যাপারটা রঞ্জনবাবু সম্পর্কে কোন কিছু বলে আপনার মনে হয় নি?

না, তবে—

তবে?

ইদানীং কিছুদিন ধরে একটা ব্যাপার আমার চোখে পড়ছে—

কি?

রাঘব সরকার প্রায়ই কাকার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন।

রাঘব সরকার!

হ্যাঁ এবং প্রতি রাত্রেই তিনি এলে, কাকার শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করে দুজনের মধ্যে কি সব কথাবার্তা হতো ঘণ্টাখানেক ঘণ্টাদেড়েক ধরে।

কি ব্যাপারে আলোচনা হতো আপনি জানেন না কিছু?

না।

আর একটা কথা মিস্ চৌধুরী—

বলুন?

আপনার যখন ধারণা ব্যাপারটা স্বাভাবিক নয়, কাউকে আপনি কোন রকম সন্দেহ করেন?

সন্দেহ!

হ্যাঁ।

না, সন্দেহ কাকেই বা সন্দেহ করব!

কাকে করবেন তা জিজ্ঞাসা করি নি, জিজ্ঞাসা করছি কাউকে করেন কিনা?

না।

আচ্ছা আপনি যেতে পারেন—বিনয়েন্দ্রবাবুকে পাঠিয়ে দিন—শিবেন সোম বললেন।

শকুন্তলা ঘর থেকে চলে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছিল, হঠাৎ ঐ সময় কিরীটী আবার বাধা দিল, ওয়ান মিনিট মিস্ চৌধুরী—আর একটা কথা!

শকুন্তলা ঘুরে তাকাল কিরীটীর মুখের দিকে।

আপনার কাকার কোন উইল ছিল, আপনি জানেন?

না।

আচ্ছা আপনি যান।

শকুন্তলা ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

বিনয়েন্দ্র সেন।

বিমল চৌধুরীর দীর্ঘদিনের বন্ধু। বেশ হৃষ্টপুষ্ট গোলগাল চেহারা। মাথার কাঁচা-পাকা চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো। দু'চোখে বুদ্ধির দীপ্তি। দাড়ি-গোঁফ নিখুঁতভাবে কামানো। পরিধানে দামী অ্যাশকালারের ট্রপিক্যাল সুট।

নমস্কার মিঃ সেন, বসুন।

বিনয়েন্দ্র সেন শিবেন সোমের নির্দেশে ওঁর মুখোমুখি চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসলেন।

শুনছিলাম বিমলবাবুর সঙ্গে আপনার দীর্ঘদিনের পরিচয় মিঃ সেন! শিবেন সোম প্রশ্ন শুরু করেন।

হ্যাঁ, হিন্দু স্কুলে একসঙ্গে আমরা চার বছর পড়েছি, তারপর বিদ্যাসাগর কলেজেও চার বছর একসঙ্গে পড়েছি। সেন বললেন।

কি করেন আপনি?

আমার ছবির ডিস্ট্রিবিউসন অফিস আছে বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীটে—স্বাগতা পিকর্চাস অ্যাণ্ড ডিস্ট্রিবিউটার্স।

কলকাতায় কোথায় আপনি থাকেন?

শ্যামবাজারে।

কাছেই থাকেন তাহলে বলুন?

হ্যাঁ।

প্রায়ই তাহলে আপনাদের উভয়ের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ হতো নিশ্চয়ই?

না, প্রায়ই হতো না, তবে মাসে এক-আধবার হতো।

এবারে কিরীটী প্রশ্ন করল, আজকের আগে শেষ আপনার ওঁর সঙ্গে কবে সাক্ষাৎ হয়েছিল মনে আছে?

বোধ করি দিন দশেক আগে। এই পথ দিয়েই এরোড্রোম থেকে ফিরছিলাম, দেখা করে গিয়েছিলাম ফিরতি পথে। প্রায় ঘণ্টা দেড়েক এখানে ছিলামও সেদিন।

কি ধরনের কথাবার্তা সেদিন আপনাদের মধ্যে হয়েছিল?

বিশেষ সেদিন কোন কথাবার্তা হয় নি, বিমল তার ডাইরী থেকে আমাকে পড়ে শোনাচ্ছিল অতীতের সব কথা।

ডাইরী রাখতেন নাকি তিনি?

রাখতো যে সেদিনই প্রথম জানতে পারি, আগে কখনো শুনি নি।

তা হঠাৎ সেদিন ডাইরী পড়ে শোনালেন কেন?

বলছিল হিসেব-নিকেশের সময় ঘনিয়ে এসেছে, তাই একটা জমাখরচের খসড়া নাকি সে তৈরী করেছে!

মিঃ সেন?

বলুন।

সেদিন আপনার সেই বন্ধুর ডাইরী পাঠ থেকে তাঁর জীবনের এমন কোন বিশেষ গোপন কথা কিছু কি জানতে পেরেছিলেন যা পূর্বে কখনো আপনি শোনেন নি তাঁর মুখ থেকে?

তা কিছু জেনেছিলাম।

কি? যদি আপত্তি না থাকে আপনার—

ক্ষমা করবেন, তার জীবনের একান্ত ব্যক্তিগত কথা সে-সব। ইউ মে বী রেস্ট অ্যাসিওরড্ কিরীটীবাবু, আজকের দুর্ঘটনার সঙ্গে সে-সবের কোন সম্পর্ক আছে বলে আমার মনে হয় না। তাছাড়া আমার পক্ষে সে-সব কথা বলা সম্ভবও নয়।

বেশ, বলতে আপনার অনিচ্ছা থাকে আপনাকে আমি পীড়াপীড়ি করব না সে সম্পর্কে। কিন্তু একটা কথা, সেদিন আপনার বন্ধুর কথাবার্তায় বা হাবভাবে এমন কিছু কি আপনি লক্ষ্য করেছিলেন যাতে মনে হয় তিনি বিচলিত বা চিন্তিত?

হ্যাঁ, তাকে যেন একটু বিচলিতই মনে হয়েছিল সেদিন।

আর একটা কথা, আপনার বন্ধুর আর্থিক অবস্থা কেমন ছিল জানেন কিছু?

ভালই। ব্যাঙ্কে তার বেশ কিছু নগদ টাকা ফিকসড্ ডিপোজিটে এবং কিছু ক্যাশ সার্টিফিকেটে আছে আমি জানি।

তার পরিমাণ আন্দাজ কত হবে বলে আপনার ধারণা?

তা হাজার পঞ্চাশেক হবে। তাছাড়া—

বলুন?

হাজার পঁচিশেক টাকার জীবন-বীমাও তার আছে।

হুঁ। আচ্ছা বলতে পারেন—তাঁর কোন উইল বা ঐ টাকাকড়ি সম্পর্কে কোন ফিউচার প্ল্যান ছিল কিনা?

উইল ছিল কিনা জানি না তবে ইদানীং কিছুদিন ধরে একটা বাড়ি করবে বলে জায়গা দেখছিল বিমল আমি জানি।

আচ্ছা, থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ—আপনি যেতে পারেন।

শিবেন সোম বললেন, অধ্যাপক চক্রবর্তীকে দয়া করে একবার পাঠিয়ে দেবেন এ-ঘরে মিঃ সেন।

মিঃ সেন চলে গেলেন।

আট

অধ্যাপক সুধীর চক্রবর্তী এসে ঘরে ঢুকলেন।

রোগা লম্বা চেহারা। মাথার চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা। খাঁড়ার মত উঁচু নাক। চোখে মোটা কালো সেলুলয়েডের ফ্রেমে পুরু লেন্সের চশমা। কালো কুচকুচে গায়ের বর্ণ। পরিধানে খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবি।

অধ্যাপক সুধীর চক্রবর্তী ঘরের মধ্যে পা দিয়েই যেন একেবারে যাকে বলে ফেটে পড়লেন। ক'টা রাত হয়েছে আপনার কিছু খেয়াল আছে দারোগাবাবু? বেশ চড়া সুরেই কথাগুলো বললেন অধ্যাপক চক্রবর্তী।

শিবেন সোম বললেন, তা একটু হয়ে গিয়েছে—

একটু হয়ে গিয়েছে! ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখুন তো, সোয়া এগারোটা রাত এখন—তাছাড়া আমাদের সকলকে এভাবে আটকে রাখার মানেটাই বা কি? আপনার কি ধারণা আমরা কেউ এর সঙ্গে জড়িত আছি?

কিন্তু বুঝতেই তো পারছেন মিঃ চক্রবর্তী, আকস্মিকভাবে দুর্ঘটনাটা ঘটেছে বলেই আপনাদের এভাবে কষ্ট দিতে হল আমাদের—

দুর্ঘটনা! দুর্ঘটনা কিসের? লোকটা হাইপারটেনশনে ভুগছিল—সাডেন স্ট্রোকে হার্টফেল করেছে—এর মধ্যে দুর্ঘটনার কি আপনারা দেখলেন?

হ্যাঁ মিঃ চক্রবর্তী, কথা বললে এবারে কিরীটী, হার্টফেল করেই উনি মারা গিয়েছেন সত্য, কিন্তু স্বাভাবিক হার্টফেল নয়—ইট'স্ এ মার্ডার অ্যাণ্ড ডেলিবারেট মার্ডার!

কি—কি বললেন?

নিষ্ঠুরভাবে কেউ আপনার বন্ধু বিমলবাবুকে হত্যা করেছে।

হত্যা? বিস্ময়ে যেন অধ্যাপক চক্রবর্তীর কণ্ঠরোধ হয়ে আসে, হত্যা—ইউ মীন—

হ্যাঁ—খুন!

না না—হাউ অ্যাবসার্ড—

অ্যাবসার্ড নয়—নিষ্ঠুর সত্যি। সত্যিই হত্যা করা হয়েছে বিমলবাবুকে। কিরীটী আবার বলল শান্ত দৃঢ়কণ্ঠে।

হঠাৎ যেন একটা নির্মম আঘাতে মনে হল অধ্যাপক চক্রবর্তী একেবারে বোবা হয়ে গেলেন। কয়েক মুহূর্ত কেমন যেন ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকেন কিরীটীর মুখের দিকে।

তারপরই চেয়ারটার উপর থপ্ করে যেন বসে পড়লেন।

সত্যি বিমল নিহত হয়েছে! কিন্তু কে—কে করল এ কাজ? কতকটা যেন আত্মগতভাবেই নিম্নকণ্ঠে কথাগুলো উচ্চারণ করলেন চক্রবর্তী।

মিঃ চক্রবর্তী!

বোবা দৃষ্টিতে চক্রবর্তী কিরীটীর দিকে মুখ তুলে তাকালেন।

বুঝতে পারছি ব্যাপারটা সত্যিই আপনার কাছে অবিশ্বাস্য লাগছে, আমাদেরও তাই মনে হয়েছিল প্রথমে, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে—

কি—কি মনে হচ্ছে আপনাদের?

আপনাদের সকলের সাহায্য পেলে হয়ত এই অবিশ্বাস্য ব্যাপারটা কি করে ঘটল আমরা তার একটা কিনারা করতে পারব।

আমাদের সাহায্যে?

হ্যাঁ।

কিন্তু কি—কি সাহায্য আমি আপনাদের করতে পারি?

আপনার বন্ধুর আত্মীয়স্বজন বা পরিচিত বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে কেউ এ কাজ করতে পারে বলে আপনার মনে হয়? বলছিলাম এমন কোন ঘটনা আপনি কিছু কি জানেন আপনার বন্ধুর—সতীর্থের জীবনের, যার মূলে এই নৃশংস হত্যার বীজ লুকিয়ে থাকতে পারে!

না না—বিমলের কেউ শত্রু থাকতে পারে বলে অন্ততঃ আমার জানা নেই।

শত্রুই যে এ কাজ করতে পারে মনে করছেন কেন? কোন বিশেষ মিত্রস্থানীয় লোকও স্বার্থের জন্য তো এ কাজ করতে পারে!

স্বার্থ?

হ্যাঁ।

কি স্বার্থ?

তা অবিশ্যি বলতে পারছি না, তবে এটা তো ঠিকই—হত্যাকারী বিনা উদ্দেশ্যে ঐ গর্হিত কাজটা করে নি! দেয়ার মাস্ট বী সাম কজ! আচ্ছা একটা কথা কি আপনি জানেন মিঃ চক্রবর্তী, ইদানীং কিছুদিন ধরে আপনার সতীর্থের মনটা বিক্ষিপ্ত ছিল?

হ্যাঁ, সেটা আমি লক্ষ্য করেছিলাম—

লক্ষ্য করেছিলেন?

করেছি বৈকি—

কারণ কিছু জানতে পারেন নি?

না। মানুষটা বরাবর এমন চাপা-প্রকৃতির ছিল, কাউকে কিছু বলতো না—কাউকে নিজের চিন্তার ভাগটা দেওয়াকেও সে দুর্বলতা মনে করতো।

তাহলে আপনি কিছু জানেন না, তিনিও আপনাকে কিছু বলেন নি!

অধ্যাপক সুধীর চক্রবর্তীর পরে ঘরে ডাক পড়ল রিটায়ার্ড জজ—বিমল চৌধুরীর প্রতিবেশী মহেন্দ্র সান্যালের।

কিন্তু মহেন্দ্র সান্যালও ব্যাপারটার উপরে এতটুকু আলোকসম্পাত করতে পারলেন না।

তিনি বললেন, অধ্যাপকের সঙ্গে প্রতিবেশী হিসাবে যতটুকু ঘনিষ্ঠতা থাকা সম্ভব তার চাইতে কিছুই বেশী ছিল না। তিনিও কখনো তাঁর বাড়ির বা নিজের খবর যেমন জিজ্ঞাসা করেন নি, তেমনি অধ্যাপকও গায়ে-পড়া হয়ে কোনদিন কিছু বলেন নি। অতএব তিনি পুলিসকে কোনরূপ সাহায্য ঐ ব্যাপারে করতে পারছেন না বলে দুঃখিত।

অগত্যা মহেন্দ্র সান্যালকে বিদায় দিতেই হল।

মহেন্দ্র সান্যাল ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

নিমন্ত্রিত হিসাবে সেদিন বাইরের লোক যারা ছিল তাদের সকলকেই অতঃপর বিদায় দেওয়ার জন্য শিবেন সোম বললেন। তারপর বললেন, ওদের বাকী দুজন—ঐ রাঘব সরকার আর দুষ্মন্ত রায়কেই বা আটকে রেখে আর কি হবে কিরীটী, ওদেরও ছেড়ে দিই, কি বল?

না না—রাঘব সরকার আর দুষ্মন্ত রায়কে যে আমার অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করবার আছে! কিরীটী বলে।

জিজ্ঞাসা করছ করো, তবে বিশেষ কিছু ওদের কাছ থেকেও জানা যাবে বলে তো আমার মনে হয় না কিরীটী। শিবেন সোম বললেন।

কিরীটী মৃদু কণ্ঠে বলে, কিছু কি বলা যায়! তাছাড়া তোমাকে তখন বললাম না, মিস্ চৌধুরী চাইছিলেন দুষ্মন্ত রায়কে বিয়ে করতে আর বিমলবাবু চাইছিলেন রাঘব সরকারের সঙ্গে ভাইঝির বিয়ে দিতে!

হ্যাঁ, তা বলেছিলে বটে, কিন্তু—

ডাকো, ডাকো—আগে তোমার ঐ রাঘব সরকারকেই ডাকো!

রাঘব সরকার এসে ঘরে ঢুকলেন।

শিবেন সোমই কয়েকটা মামুলী প্রশ্ন করবার পর কিরীটী মাঝখানে বাধা দিল।

মিঃ সরকার, এ কথা কি সত্যি যে অদূর ভবিষ্যতে একদিন বিমলবাবুর একমাত্র ভাইঝি শকুন্তলা দেবীর সঙ্গে আপনার বিবাহ দেবেন বলে তিনি আপনাকে কথা দিয়েছিলেন?

কথার মাঝখানে কিরীটীর কথাটা এমন অতর্কিতে উচ্চারিত হয়েছিল যে রাঘব সরকার যেন হঠাৎ চমকে উঠে কিরীটীর মুখের দিকে না তাকিয়ে পারলেন না।

কিরীটী আবার প্রশ্ন করল, কথাটা কি সত্যি?

হ্যাঁ।

কথাটা তাহলে সত্যি?

হ্যাঁ। কিন্তু হঠাৎ এ কথাটা আপনি জানলেনই বা কি করে আর জিজ্ঞাসাই বা করছেন কেন?

জানলাম কি করে নাই বা শুনলেন, আর জিজ্ঞাসা করছি কেন যদি প্রশ্ন করেন তো বলব, ব্যাপারটা কেমন যেন একটু অস্বাভাবিক তাই জানতে চাইছিলাম—

অস্বাভাবিক কেন?

দেখুন মিঃ সরকার, আজকের দিনে অসবর্ণ বিবাহের কথাটা আমি তুলব না, কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই জানেন শকুন্তলা দেবী মনে মনে বিমলবাবুর ছাত্র দুষ্মন্ত রায়কে ভালবাসেন!

না, জানি না।

জানেন না?

না।

কিন্তু—

আর যদি বাসেই, তাতে আমার কি?

কিন্তু একজন নারী মনে মনে অন্য এক পুরুষকে কামনা করে জেনেও সেই নারীকে আপনি বিবাহ করতে চলেছেন!

দেখুন আপনারা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে এনক্রোচ করবেন না।

অবশ্যই করতাম না, যদি আজকের এই দুর্ঘটনাটা না ঘটতো!

মানে কি বলতে চান আপনি?

বলতে যা চাই সেটা কি খুব অস্পষ্ট মনে হচ্ছে আপনার মিঃ সরকার?

অবশ্যই! কারণ সে কথা আসছেই বা কি করে?

আচ্ছা ছেড়ে দিন সে কথা, অন্য একটা কথার জবাব দিন!

বলুন?

অধ্যাপকের সঙ্গে আপনার কি সূত্রে আলাপ হয় প্রথমে?

প্রথমে আলাপ হয়েছিল আমার দোকানের একজন কাস্টোমার হিসাবে।

তারপর?

তারপর আবার কি! সেই আলাপই ক্রমে ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়।

এমন ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হল যে একেবারে বিবাহ-সম্পর্ক! একটু বেশী হল না কি মিঃ সরকার?

কথাটা কিরীটী বেশ শান্ত ও নির্বিকার কণ্ঠে বললেও, মনে হল যেন ব্যঙ্গের একটু সুর লেগে আছে তার বলার ভঙ্গীতে, তার কণ্ঠের স্বরে।

এই সব অবান্তর প্রশ্ন আপনারা কেন করছেন আমি বুঝতে পারছি না! রাঘব সরকার বিশেষ বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠেই যেন কথাটা বলে উঠলেন।

আচ্ছা রাঘববাবু, আপনি নিশ্চয়ই জানতেন আপনার ক্লায়েন্ট ও ভাবী শ্বশুরমশাই রক্তচাপাধিক্যে ভুগছেন! কিরীটী আবার কথা বললে।

না। তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ।

জানতেন না?

না।

আশ্চর্য! অমন একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আপনাদের মধ্যে হতে চলেছিল, অথচ ঐ কথাটাই আপনি জানতেন না?

বিরক্তি ও ক্রোধপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন রাঘব সরকার কিরীটীর মুখের দিকে এবং তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললেন, মশাই আপনি কে জানতে পারি কি?

উনি পুলিসেরই লোক মিঃ সরকার। জবাব দিলেন শিবেন সোম, উনি যা জিজ্ঞাসা করছেন তার জবাব দিন।

মিঃ সরকার! আবার কিরীটী ডাকল।

মুখে কোন জবাব না দিয়ে পূর্ববৎ বিরক্তিপূর্ণ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে পুনরায় তাকালেন রাঘব সরকার কিরীটীর মুখের দিকে।

আপনার কি এটাই প্রথম সংসার করবার অভিলাষ নাকি?

মানে?

মানে জিজ্ঞাসা করছিলাম, ইতিপূর্বে কি আপনি বিবাহাদি করেন নি?

করেছি।

কি বললেন আপনি? বিবাহ—

হ্যাঁ করেছিলাম—সে স্ত্রী আজ পাঁচ বছর হল গত হয়েছেন।

ছেলেপুলে?

না, নেই।

তাহলে পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা বলুন!

কটমট করে আবার রাঘব সরকার তাকালেন কিরীটীর মুখের দিকে এবং রূঢ়কণ্ঠে বললেন, আপনি বিমলবাবুর মৃত্যুর তদন্ত করছেন, না আমার ঠিকুজিনক্ষত্র সম্পর্কে খোঁজ নিচ্ছেন—কোন্‌টা করছেন বলতে পারেন?

এক ঢিলে দুই পাখিই মারছি! তবে আপনি একটু ভুল করছেন মিঃ সরকার, বিমলবাবুর মৃত্যুর নয়—হত্যার তদন্ত করছি আমরা!

কি বললেন?

বললাম তো হত্যা!

ও, আপনাদের ধারণা বুঝি বিমলবাবুকে হত্যা করা হয়েছে?

ধারণা নয়, সেটাই সত্য। যাক সে কথা—আচ্ছা আপনি বলেছেন অবিশ্যি একজন খরিদ্দার হিসাবেই বিমলবাবুর সঙ্গে আপনার প্রথম পরিচয় ও পরে ঘনিষ্ঠতা, কিন্তু আমি যেন শুনেছিলাম আপনার সঙ্গে বিমলবাবুর ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল রেসের ময়দানে—কথাটা কি সত্যি?

কি বললেন?

জিজ্ঞাসা করছি রেসের ময়দানেই কি আপনাদের উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল?

হঠাৎ যেন মনে হল রাঘব সরকারের সমস্ত আক্রোশ ও বিরক্তি দপ করে নিভে গিয়েছে। মুখখানা তার যেন একেবারে হঠাৎ চুপসে গিয়েছে।

কি, জবাব দিচ্ছেন না যে?

কিসের জবাব চান?

যে প্রশ্নটা করলাম!

জবাব দেবার কিছু নেই।

কেন?

কারণ কিছু নেই বলে!

I see! আচ্ছা মিঃ সরকার, আপনি যেতে পারেন।

রাঘব সরকার মাথা নিচু করে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। এবং রাঘব সরকার ঘর থেকে বের হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই শিবেন সোম কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, ব্যাপারটা ঠিক কি হল মিঃ রায়?

কিসের ব্যাপার?

লোকটা যে রেস খেলে, জানলেন কি করে?

সামান্য একটা সূত্রের উপর নির্ভর করে—স্রেফ অনুমানের ওপরেই ঢিল ছুঁড়েছিলাম।

সামান্য সূত্র!

হ্যাঁ, গতকাল ইসমাইল খানের ছদ্মবেশে ওঁর বৌবাজারের ইকনমিক জুয়েলার্সের দোকানে গিয়েছিলাম—

হঠাৎ?

হঠাৎ ঠিক নয়—

তবে?

লোকটা চোরাই জুয়েলস্ ও সিন্থেটিক জুয়েলস্ অর্থাৎ নকল জহরতের কারবার করে, পূর্বে সেই রকম একটা কথা আমার কানে এসেছিল। তারপর গতকাল ঐ লোকটির কথাই শকুন্তলা দেবীর মুখে শুনে বিশেষ যেন সন্দিগ্ধ হয়ে উঠি। সোজা ইকনমিক জুয়েলার্সে চলে যাই। সেখানে ওর ঘরে বসবার টেবিলে একটা রেসকোর্সের বই দেখতে পাই, তারই ওপরে নির্ভর করে ঢিলটা ছুঁড়েছিলাম অন্ধকারে। কিন্তু যাই হোক, অনুমানটা যে আমার মিথ্যা নয় সে তো আপনিও কিছুক্ষণ আগে দেখলেন!

কিন্তু—

শিবেনবাবু, রাঘব সরকারের মত একজন লোকের সঙ্গে বিমলবাবুর মত একজন লোকের এতদূর ঘনিষ্ঠতা—ব্যাপারটা যেন কিছুতেই আমার মন মেনে নিতে পারছিল না! এবং সত্যি কথা বলতে কি, সহজভাবে যে ব্যাপারটা সম্ভব নয়—এবং তাই সেই গোলকধাঁধা থেকে বেরুবার জন্যই ঐভাবে ঢিলটি আমি ছুঁড়েছিলাম! যাক, এখন আমি নিশ্চিন্ত—অনেক জটিলতাই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে।

জটিলতা?

হ্যাঁ। কিন্তু রাত সাড়ে এগারোটা বেজে গিয়েছে, আপনার তদন্ত-পর্ব এবারে সত্যি সত্যিই শেষ না করলে যে রাত পুইয়ে যাবে!

নয়

এবারে রঞ্জন বোসকে ডাকা হল।

বয়েস ভদ্রলোকের চব্বিশ থেকে পঁচিশের মধ্যেই বলে মনে হয়। দোহারা চেহারা, গায়ের রঙটা একটু চাপা। চোখে মুখে বেশ একটা বুদ্ধির দীপ্তি রয়েছে। দাড়িগোঁফ নিখুঁতভাবে কামানো। চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা। হাতে সোনার রিস্টওয়াচ। পরিধানে দামী গ্রে কলারের গ্যাবার্ডিনের লংস ও সাদা সার্কস্কিনের হাওয়াই সার্ট।

ভদ্রলোক যে শৌখীন প্রথম দৃষ্টিতেই বোঝা যায়।

শুনেছেন বোধহয় রঞ্জনবাবু, কিরীটীই প্রশ্ন শুরু করে, আপনার মামার মৃত্যুটা স্বাভাবিক নয়—কেউ তাঁকে হত্যা করেছে!

শুনেছি—আপনাদের তাই ধারণা, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না।

বিশ্বাস করেন না?

না।

কেন বলুন তো?

কেন আবার কি? মামার মত নিরীহ একজন ভদ্রলোককে কার আবার হত্যা করবার প্রয়োজন হতে পারে?

ও-কথা বলবেন না রঞ্জনবাবু, প্রয়োজন যে কার কখন কিসের হয় কেউ কি বলতে পারে! কিন্তু যাক সে কথা, আপনি তাহলে কথাটা শুনেছেন?

হ্যাঁ।

কিন্তু কার মুখে শুনলেন কথাটা?

কার মুখে!

হ্যাঁ।

তা—তা ঠিক মনে নেই, তবে কানাঘুষা শুনছিলাম ভিতরে—

হুঁ। আচ্ছা রঞ্জনবাবু, মালয় থেকে হঠাৎ আপনি চলে এলেন কেন?

মালয়ের কথাটা যখন শুনেছেন, তখন নিশ্চয় এও শুনেছেন কেন সেখান থেকে চলে আসতে বাধ্য হয়েছি!

হ্যাঁ শুনেছি—তবু আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই।

কি ঠিক শুনতে চান বলুন?

আপনার বাবার ব্যবসাটা হঠাৎ ফেল করল কি করে?

বাবার নিজের গাফিলতির জন্য!

কি গাফিলতি?

সে-সব শুনে কি করবেন? টাকার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনে অনেক রকম সমস্যা এসে দেখা দেয়—সেই সব আর কি!

ওঃ, আচ্ছা রঞ্জনবাবু, মালয়ে থাকতে আপনার মামা বিমলবাবুর সঙ্গে নিশ্চয়ই আপনাদের নিয়মিত চিঠিপত্র চলতো?

চলতো বৈকি। যাকে বলে—বাবার মামার সঙ্গে রেগুলার চিঠিপত্র চলতো।

তাহলে আপনাদের পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ ছিল?

নিশ্চয়ই।

রঞ্জনবাবু, আপনার মামাকে হত্যা করার ব্যাপারটা কি মনে হয়? কাউকে সন্দেহ করেন কি?

না মশাই, সন্দেহ করব কি, শোনা অবধি তো যাকে বলে একেবারে তাজ্জব বনে গিয়েছি!

ভাল কথা রঞ্জনবাবু, রাঘব সরকারের সঙ্গে আপনার বোন শকুন্তলা দেবীর বিয়ের কথা কিছু শুনেছিলেন?

এখানে এসেই তো শুনেছি—

আপনার সমর্থন ছিল ব্যাপারটায়?

আদপেই না। মামাকে সে কথা বলেছিও, কিন্তু মামা অ্যাডামেণ্ট—কারো কথাই শুনবেন না!

বলতে পারেন, তা আপনার মামাই বা এ ধরনের বিয়েতে কেন জিদ করছিলেন?

কে জানে মশাই কেন—তাছাড়া মামা যদি বিয়ে দিতে পারেন আর শকুন্তলা যদি বিয়ে করতে পারে তো আমার কি বলুন!

দুষ্মন্ত রায়কে শকুন্তলা দেবী মনে মনে ভালবাসেন, আপনি জানেন?

তা জানতাম।

জানতেন?

হুঁ। শকুন্তলাই তো আমাকে কথাটা বলেছিল।

তাই বুঝি! তা দুষ্মন্ত রায়কে আপনার কেমন লোক বলে মনে হয় রঞ্জনবাবু?

এমনি মন্দ লোক নয়, তবে এক নম্বরের কাওয়ার্ড! ভীতু—

ভীতু?

নয় তো কি—ভালবাসতে পারিস, আর জোর করে যাকে ভালবাসিস তাকে বিয়ে করতে পারিস না!

তা সত্যি। আচ্ছা রঞ্জনবাবু, আপনি তো আপনার মামা যে ঘরে থাকতেন তার পাশের ঘরেই থাকেন!

হ্যাঁ।

ইদানীং রাঘব সরকার রাত্রে এলে আপনার মামার ঘরে দরজা বন্ধ করে তাঁদের মধ্যে কি সব কথাবার্তা হতো কখনো শুনেছেন কিছু?

না মশাই। তবে—

তবে?

একটা ব্যাপার ইদানীং লক্ষ্য করে কেমন যেন আশ্চর্যই লাগছিল!

কি?

মামা যেন রাঘব সরকারের কাছে কেমন কেঁচোটি হয়ে থাকতেন!

হুঁ। আচ্ছা রাঘব সরকার লোকটিকে আপনার কি রকম মনে হয় রঞ্জনবাবু?

একটি বাস্তুঘুঘু।

বাঃ, বেশ বলেছেন! সত্যি আশ্চর্য, জন্মাবধি আপনি মালয়ে থেকেও এমন চমৎকার বাংলা দেশের প্রবচনগুলো আয়ত্ত করেছেন! সত্যিই আপনার তারিফ না করে পারছি না!

অ্যাঁ, কি বললেন? যেন একটু থতমত খেয়েই কথাটা বলেন রঞ্জনবাবু।

না, কিছু না। আচ্ছা রঞ্জনবাবু, সরমা দেবী তো এ বাড়িতে অনেক দিন আছেন, তাই না?

সেই রকমই তো শুনেছি।

আচ্ছা তাঁর সম্পর্কে আপনার কি ধারণা?

ওসব স্ক্যাণ্ডেলাস অ্যাফেয়ার নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি নাই বা করলেন মশাই—

স্ক্যাণ্ডেলাস অ্যাফেয়ার!

নয় তো কি—ওসব হচ্ছে ডুবে ডুবে জল খেয়ে একাদশী করা! ও ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় করলে কি হবে—ব্যাপারটা তো আর জানতে কারো বাকী নেই!

কথাটা খুলেই বলুন না।

না মশাই, মরে গেলেও গুরুজন ব্যক্তি তো—পাপ-কথা আর এ-মুখে না-ই উচ্চারণ করলাম!

হুঁ, আচ্ছা থাক থাক।

দশ

রঞ্জন বোসকে বিদায় দেবার পর কিরীটীর ইচ্ছাক্রমেই ডাকা হল এবারে দুষ্মন্ত রায়কে।

গত সন্ধ্যায় দুষ্মন্ত রায়ের চেহারার বর্ণনাপ্রসঙ্গে শকুন্তলা বলেছিল রাঘব সরকারের চেহারার সঙ্গে তুলনায় নাকি দুষ্মন্ত রায় আদৌ আকর্ষণীয় নয়। কথাটা যে মিথ্যে নয় প্রথম দৃষ্টিতে তাই মনে হবে সত্যিই।

কিন্তু কিছুক্ষণ দুষ্মন্ত রায়ের দিকে চেয়ে থাকলে মনে হবে ঠিক উল্টোটিই।

দুষ্মন্ত রায়ের চেহারার মধ্যে কোন একটা সহজগ্রাহ্য রূপ বা সৌন্দর্যের আকর্ষণ নেই সত্যি, কিন্তু এমন একটা বিশেষ অথচ চাপা আকর্ষণ আছে যা একবার নজরে পড়লে নজর ফিরিয়ে নেওয়া কষ্টসাধ্য। যেহেতু একবার সেই বিশেষত্ব কারো চোখে পড়লে সেটা মনের মধ্যে দাগ কেটে বসবেই—এবং সে রূপের বর্ণনাও দেওয়া যেমন দুঃসাধ্য, বোঝানোও বুঝি তেমনি কষ্টকর।

লোকটি লম্বা, কিন্তু দেহে ঠিক পরিমিত পেশী ও মেদ থাকার দরুন লম্বা মনে হয় না। দেহের রঙ কালো—যাকে বলে রীতিমত কালো। কিন্তু সেই কালো রঙের মধ্যেও যেন অদ্ভুত একটা দ্যুতি আছে। গাল দুটো ভাঙা। নাকটা খাড়া। প্রশস্ত ললাট। রেশমের মত একমাথা অযত্নবিন্যস্ত তৈলহীন লালচে চুল। দাড়িগোঁফ নিখুঁতভাবে কামানো।

পরিধানে ধুতি ও গেরুয়া রঙের খদ্দরের পাঞ্জাবি।

আপনার নাম দুষ্মন্ত রায়? শিবেন সোমই প্রশ্ন শুরু করলেন।

হ্যাঁ। মৃদুকণ্ঠে জবাব এল। এবং কণ্ঠস্বরে একটা আত্মপ্রত্যয় বা আত্মদৃঢ়তা যেন স্পষ্ট। সেই

হেতুই বোধ হয় আবার দুষ্মন্ত রায়ের মুখের দিকে তাকালাম।

বসুন। শিবেন সোম বললেন।

দুষ্মন্ত রায় একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন।

কি করেন আপনি?

বিমলবাবুর কাছে ডক্টরেটের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম।

এ বাড়ির সকলের সঙ্গেই আপনার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আছে দুষ্মন্তবাবু, তাই না? প্রশ্নটা করল কিরীটীই এবারে।

এ বাড়ির সকলকেই আমি চিনি। জবাব দিলেন দুষ্মন্ত রায়।

দুষ্মন্তবাবু! আবার কিরীটী প্রশ্ন করে।

বলুন?

কথাটা কি সত্যি যে, শকুন্তলা দেবীকে আপনি বিশেষ দৃষ্টিতে দেখেন এবং তিনিও আপনাকে দেখেন?

ঠিকই শুনেছেন। পরস্পর আমরা পরস্পরকে ভালোবাসি।

আপনার অধ্যাপক নিশ্চয়ই ব্যাপারটা জানতেন! কিরীটী আবার প্রশ্ন করে।

বলেছিলাম তাঁকে।

কি বলেছিলেন?

কুন্তলাকে আমি বিয়ে করতে চাই—

আপনার সে কথার কি জবাব দিয়েছিলেন তিনি? সম্মত হয়েছিলেন কি?

রাজী হন নি। প্রথমদিকে তাঁর নীরব সম্মতিই ছিল, কিন্তু পরে কথাটা তুলতে কেন জানি না—

রাজী হন নি?

না। তবে রাজী তিনি না হলেও আমাদের কি এসে যাচ্ছে—সে সাবালিকা, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি দাঁড়াতে পারেন না আইনত!

তাঁকে এ কথা বলেছিলেন নাকি?

না, প্রয়োজন বোধ করি নি।

আচ্ছা আপনি কি জানতেন, আপনার অধ্যাপকের ইচ্ছা ছিল শকুন্তলা দেবীকে তিনি রাঘব সরকারের সঙ্গে বিয়ে দেবেন?

শুনেছিলাম কথাটা। শকুন্তলাই আমাকে বলেছিল। কিন্তু তাতেই বা কি এসে গেল!

আচ্ছা শকুন্তলা দেবী কি আপনার সঙ্গে একমত?

না।

মানে—তাঁর মত—

না, তার মত ছিল না। কাকা যতদিন বেঁচে আছেন তাঁর বিরুদ্ধে শকুন্তলার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয় এই কথাই সে বলেছিল।

তা হলে বলুন আপনার পরিকল্পনাটা ভেঙে গিয়েছিল?

না, ভেঙে যাবে কেন? এইটুকুই শুধু বুঝেছিলাম, কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে—মানে বিমলবাবুর মৃত্যু পর্যন্ত—

কিন্তু দুষ্মন্তবাবু, আপনার অধ্যাপক হঠাৎ রাঘব সরকারের সঙ্গেই বা শকুন্তলা দেবীর বিয়ে দেবার জন্য স্থিরপ্রতিজ্ঞ হয়েছিলেন কেন? কিছু শুনেছিলেন সে-সম্পর্কে কখনো কারো কাছে?

না।

শকুন্তলা দেবীও আপনাকে কিছু বলেন নি?

না।

আচ্ছা রাঘব সরকারের সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে নিশ্চয়ই?

না।

কিন্তু এ বাড়িতে তো আপনাদের দুজনেরই যাতায়াত ছিল, সেক্ষেত্রে তো পরস্পর আপনাদের দেখা-সাক্ষাৎ হওয়াটা—

দেখা হবে না কেন—বহুবার হয়েছে!

তবে?

কেন যেন লোকটাকে আমার ভাল লাগে না—

লোকটাকে আপনার ভাল লাগত না?

না।

কিন্তু একটু আগে তার সঙ্গে, সামান্যক্ষণের জন্য হলেও, আলাপ করে তো আমাদের ভালই লাগল। তবে আপনার—

তবে আমার কেন ভাল লাগে না লোকটাকে, এই তো আপনার প্রশ্ন? দেখুন কাউকে কারো ভালো লাগালাগির ব্যাপারটা একান্তই ব্যক্তিগত নয় কি! এবং তার জন্য কি সর্বক্ষেত্রেই কোন কারণ থাকে বা থাকতেই হবে—এমন কোন কথা আছে?

দুষ্মন্ত রায়ের কথা বলার ভঙ্গির মধ্যে এমন একটা বিশেষত্ব ছিল যে পুনরায় তার মুখের দিকে আপনা হতেই যেন দৃষ্টি আমার আকর্ষণ করে।

মনে হল মুখের কোথাও হাসি না থাকলেও, তার দুই চোখের দৃষ্টিতে একটা চাপা হাসির বিদ্যুৎ যেন খেলছে। এবং বলাই বাহুল্য, ব্যাপারটা যে কিরীটীর প্রখর দৃষ্টিকে এড়িয়ে যায় নি—তার পরবর্তী কথাতেই সেটা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়।

কথাটা সত্যিই আপনি মিথ্যা বলেন নি দুষ্মন্তবাবু! নইলে দেখুন না, ভাগ্যে মনের অগোচরে পাপ নেই—নচেৎ পাশাপাশি দিনের পর দিন আমাদের কত বন্ধু, সুহৃদ ও পরিচিত জনের পক্ষেই বাস করাটা অসম্ভব হয়ে উঠত, তাই নয় কি?

চেয়ে ছিলাম তখনো আমি একদৃষ্টে দুষ্মন্ত রায়েরই মুখের দিকে।

মনে হল কিরীটীর ঐ কথায় মুহূর্তের জন্য যেন দুষ্মন্তর দুই চোখের তারায় বিদ্যুৎ ঝিলিক দিয়ে গেল, অথচ সমস্ত মুখখানা মনে হল ভাবলেশহীন, একান্ত নিস্পৃহ।

দুষ্মন্তবাবু! আবার প্রশ্ন করে কিরীটী, আজ নিশ্চয়ই এখানে আপনিও নিমন্ত্রিতদের মধ্যেই একজন ছিলেন?

হ্যাঁ।

দেরিতে এসেছেন একটু শুনলাম?

হ্যাঁ, একটা কাজে আটকা পড়েছিলাম—

তা হলে আর আপনাকে কি জিজ্ঞাসা করব আজকের ব্যাপারে! কথাটা বলেই একটু যেন থেমে আবার প্রশ্ন করে, আচ্ছা দুষ্মন্তবাবু, আজকের এই দুর্ঘটনাটা আপনার ঠিক কি বলে মনে হয়? মানে বলছিলাম, আপনার অধ্যাপকের হত্যার ব্যাপারটা—

ব্যাপারটা আদৌ হত্যা বলে মনে হয় না।

কেন?

আপনারা চেনেন না, কিন্তু আমার অধ্যাপককে দীর্ঘদিন ধরে আমি চিনতাম—তাঁকে কেউ হত্যা করবে তা যে কারণেই হোক আমার চিন্তা, বুদ্ধি, বিবেচনা বা যুক্তির বাইরে।

কিন্তু তবু তাঁকে হত্যা করাই যে হয়েছে আমরা জানি! দৃঢ়কণ্ঠে কিরীটী কথাটা বলে।

শুনেছি। তবু ঐ কথাই আমি বলব।

আচ্ছা দুষ্মন্তবাবু, আপনি যেতে পারেন। শিবেন সোম বললেন।

ধন্যবাদ।

দুষ্মন্ত রায় উঠে ঘর থেকে বের হয়ে যেতে উদ্যত হতেই কিরীটী তাকে কতকটা বাধা দিয়েই যেন পিছন থেকে ডেকে ওঠে, এক্সকিউজ মি, জাস্ট এ মিনিট দুষ্মন্তবাবু!

ঘুরে দাঁড়ায় দুষ্মন্ত রায় কিরীটীর দিকে তাকিয়ে।

আপনি নিশ্চয়ই জানেন দুষ্মন্তবাবু, শকুন্তলা দেবীকে মনোনীতা স্ত্রী হিসাবে রাঘব সরকার একটি আংটি দিয়েছেন এবং সে আংটিটি শকুন্তলা দেবীর আঙুলেই এখনো আছে!

না।

সে কি! জানেন না আপনি?

না।

দেখেনও নি?

না।

ওঃ। আচ্ছা আপনি যেতে পারেন।

দুষ্মন্ত রায় অতঃপর ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

কিরীটী দুষ্মন্ত রায়ের গমনপথের দিকেই তাকিয়েছিল, দুষ্মন্ত রায়ের দেহটা দরজার ওপাশে অদৃশ্য হয়ে যাবার পর কিরীটী শিবেন সোমের দিকে ফিরে তাকাল, শিবেনবাবু!

কিছু বলছিলেন মিঃ রায়?

না, কিছু না—বলছিলাম কেবল রাত অনেক হল, এবারে সরমা দেবীকে ডেকে যা জিজ্ঞাসা করবার করে আজকের পর্বটা তা হলে চুকিয়ে ফেলুন! ক্ষিদেটা তো থিতিয়েই গেল—ঘুমটাও না আজকের রাতের মত থিতিয়ে যায়!

মৃদু হেসে কথাটা বলতে বলতে কিরীটী এতক্ষণে পকেট থেকে একটা সিগার বের করে সেটায় অগ্নিসংযোগ করল।

শিবেন সোম সরমা দেবীকে ডাকবার জন্যই বোধ হয় ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

সরমা দেবীকে সঙ্গে নিয়েই মিনিট পাঁচেক পরে শিবেন সোম ঘরে এসে পুনঃপ্রবেশ করলেন।

বসুন সরমা দেবী, আপনাকে এ সময় বিরক্ত করতে হচ্ছে বলে আমরা দুঃখিত, কিন্তু উপায় নেই—

সরমা নিঃশব্দে খালি চেয়ারটার উপরে উপবেশন করল।

তাকালাম আমি মহিলাটির দিকে। এবং তার মুখের দিকে চেয়ে প্রথম দৃষ্টিতেই মনে হয়েছিল সেরাত্রে বিমলবাবুর গৃহে সরমার পরিচয় যাই হোক না কেন, সে যে এ-বাড়ির দাসী নয়—কথাটার মধ্যে এতটুকুও শকুন্তলার অত্যুক্তি ছিল না।

মাথার উপরে পরিধেয় সরু কালোপাড় ধুতির গুণ্ঠনটা আধাআধি টানা সাদা সিঁথি। অনবগুণ্ঠনটি বলা উচিত।

লম্বা দোহারা গড়ন দেহের। গাত্রবর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম। চোখেমুখে কোন তীক্ষ্ণতা বা বুদ্ধির দীপ্তি নেই বটে তবে কোমলতা আছে। আর আছে যেন আত্মসমাহিতের একটি নিবিড়তা। সুডৌল দুটি হাতে একগাছা করে ক্ষয়ে যাওয়া সোনার রুলি আর গলায় সোনার সরু একটি বিছেহার। হাত দুটি কোলের উপরে রেখে বসেছিল সরমা নিঃশব্দে।

সরমা দেবী!

কিরীটীর ডাকে চোখ তুলে তাকাল সরমা। চোখের দৃষ্টিতে যেন একটু বিস্ময়।

দেবী বলে সম্বোধন করাতেই সে অমনি করে তাকিয়েছিল কিনা কে জানে!

এ বাড়িতে—মানে বিমলবাবুর এখানে আপনি অনেকদিন আছেন শুনলাম—

দৃষ্টি নত করল সরমা। কোন জবাব দিল না।

কত বছর হবে আন্দাজ?

অনেক দিন আছি আমি এখানে—

এতক্ষণে শান্ত মৃদু কণ্ঠে কথাগুলো উচ্চারিত হল।

আপনি এ বাড়িতে যখন অনেকদিন আছেন—এঁদের একপ্রকার পরম আত্মীয়ার মতই হয়ে গিয়েছিলেন ধরে নিতে পারি নিশ্চয়ই সরমা দেবী!

অনাত্মীয় হলেও এবং এঁদের সঙ্গে কোনপ্রকার সম্পর্কই আমার না থাকলেও, এঁরা বরাবর আমাকে স্নেহ ও ভালবাসা দিয়ে এসেছেন।

এঁরা মানে—আপনি নিশ্চয়ই বলছেন অধ্যাপক বিমলবাবুর কথা ও তাঁর ভাইঝি শকুন্তলা দেবীর কথা!

হ্যাঁ।

অবশ্যই সেটা তো স্বাভাবিক, কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করছিলাম—এঁদের সংসারের একজনের মত থেকে নিশ্চয়ই আপনি এঁদের পারিবারিক অনেক কথাই জানবার সুযোগ পেয়েছেন সরমা দেবী!

আপনাকে তো একটু আগেই বললাম, এঁদের পরিবারের মধ্যে থাকলেও আমি তো এঁদের কোন আপনজন নই—

এতক্ষণে বুঝতে পারি, চোখেমুখে সরমার বুদ্ধির দীপ্তি না থাকলেও ভদ্রমহিলা বুদ্ধিমতী। এবং শুধু বুদ্ধিমতীই নয়—নিরতিশয় সতর্ক।

কিরীটীও বোধ হয় উপলব্ধি করতে পেরেছিল ব্যাপারটা। তাই এবারে সোজাসুজিই প্রশ্ন করল, সরমা দেবী, এঁদের আপনি একজন আত্মীয় না হলেও নিশ্চয়ই জানেন দুষ্মন্তবাবুর সঙ্গে শকুন্তলা দেবীর একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল উভয়ের মেলামেশার ফলে?

অনুমান করেছি।

হুঁ। আচ্ছা বিমলবাবু নিশ্চয়ই সে কথা জানতেন?

অনুমান হয় জানতেন।

অনুমানের চাইতে বেশী কিছুই নয় আপনি বলতে চান কি?

যতটুকু আমি জানি তাই বলেছি। শান্ত কণ্ঠে জবাব এল।

এগার

সরমা দেবীর শেষের কথায় মনে হল, কিরীটী মুহূর্তকাল যেন কি ভাবল। তারপর সহসা যেন দু'পা এগিয়ে এল, চেয়ারে উপবিষ্টা সরমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, আপনি মুখে স্বীকার না করলেও আমার কিন্তু ধারণা এ বাড়ির, বিশেষ করে বিমলবাবু ও তাঁর ভাইঝির কোন কথাই আপনার অজানা নয়!

চোখ তুলে তাকাল নিঃশব্দে সরমা কিরীটীর মুখের দিকে।

হ্যাঁ, কারণ আপনার সম্পর্কে যেটুকু ইতিপূর্বে শকুন্তলা দেবীর কাছ থেকে জেনেছি, তাতে করে আমার অনুমান আপনি অনেক কিছুই জানেন।

দেখলাম নিঃশব্দে তখনো সরমা তাকিয়ে রয়েছে কিরীটীর মুখের দিকে।

হ্যাঁ, কিরীটী আবার বললে, আপনি হয়তো সব কথা বলতে ইচ্ছুক নন, অবশ্যই আপনি স্বেচ্ছায় না বললে আমি পীড়াপীড়ি করব না, কিন্তু আমি ভেবেছিলাম—

দেখছি ঠিক পূর্বের মতই তাকিয়ে আছে সরমা কিরীটীর মুখের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে, নিঃশব্দে তাকিয়ে আছে।

ভেবেছিলাম বিমলবাবুর নৃশংস হত্যার তদন্তের ব্যাপারে অন্ততঃ আপনার অকপট সাহায্যই পাব!

ধীরে ধীরে সরমা এতক্ষণে কথা বলল আবার, আমি যা জানি সবই বলেছি।

কিরীটী মৃদু হাসল। তারপর পূর্ববৎ শান্তকণ্ঠে বলল, ঠিক আছে। আচ্ছা সরমা দেবী, দুষ্মন্তবাবুর মত পাত্রকে বাদ দিয়ে বিমলবাবু হঠাৎ প্রৌঢ় রাঘব সরকারের সঙ্গে শকুন্তলা দেবীর বিবাহ দেবেন স্থির করলেন কেন বলুন তো? কিছু অনুমান করতে পারেন?

না, অনুমান করতে পারি না—কিন্তু কার কাছে শুনলেন এ-কথা?

শকুন্তলা দেবীর মুখে। কিরীটী বলে।

সে বলেছে আপনাকে এ কথা?

হ্যাঁ।

তা হলে সে নিশ্চয় একথা বলেছে, কেন তিনি ঐ কাজ করতে মনস্থ করেছিলেন!

না, সে-কথা তিনি স্পষ্ট করে কিছুই বলেন নি। কেবল বলেছেন, বিমলবাবু তাই স্থির করেছিলেন—

তা তো ঠিকই, তাঁর ভাইঝি—ভাইঝির বিবাহ তিনি কার সঙ্গে দেবেন বা না-দেবেন সেটা সম্পূর্ণ তাঁর ইচ্ছা—

কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করছিলাম, কেন তাঁর অমন ইচ্ছাটা হল সে-সম্পর্কে কিছু আপনি জানেন কিনা?

ব্যাপারটা অনেকদিন আগে থাকতেই স্থির হয়েছিল শুনেছি—

কতদিন আগে?

বলতে পারব না।

আচ্ছা আপনার মত আছে এ বিবাহে?

আমার মতামতের কতটুকু মূল্য থাকতে পারে বলুন? কেউ তো নই আমি এদের!

তবু তো শুনেছি, আপনি শকুন্তলা দেবীকে একপ্রকার কন্যার মতই পালন করেছেন।

তা করেছি।

তবে?

কিন্তু তাই যদি বলেন তো পাত্র হিসাবে রাঘব সরকার নিন্দনীয়ই বা কি?

সে-কথা আমি বলি নি।, আমি বলছিলাম ওরা যখন পরস্পর পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট—

ক্ষমা করবেন, আমি এর বেশী কিছু জানি না।

ওঃ। আচ্ছা সরমা দেবী, এই রঞ্জন বোসকে আপনার কেমন মনে হয়?

নামটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই যেন একটু চমক লক্ষ্য করলাম সরমার চোখেমুখে। কিন্তু সেও ক্ষণিকের জন্য।

পরমুহূর্তে সে যেমন শান্ত ছিল শান্ত হয়ে গেল।

আমার কথার জবাবটা এখনো পাই নি সরমা দেবী!

ওর সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানি না।

তবু যে কয়দিন ওকে দেখেছেন—

ও কারো সঙ্গেই বড় একটা কথা বলে না বা মেলামেশা করে না—

আপনিও কি সেই দলে?

অন্য রকম আমার বেলায় হবার কোন কারণ নেই।

ওকে আপনি পূর্বে কখনো দেখেছেন?

না—না।

আচ্ছা সরমা দেবী, আপনি এবারে যেতে পারেন।

চেয়ার থেকে উঠে ঘর ছেড়ে বের হয়ে গেল সরমা।

সরমা ঘর ছেড়ে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে যেন একটা অদ্ভুত স্তব্ধতা ঘরের মধ্যে থমথম করতে থাকে।

কয়েকটা মুহূর্ত কেউ কোন কথা বলে না।

অবশেষে কিরীটীই সে স্তব্ধতা ভঙ্গ করে একসময় উঠে দাঁড়িয়ে বললে, এবারে আমি বিদায় নেব শিবেনবাবু!

হ্যাঁ চলুন, আমরাও উঠব।

কেবল একটা কথা শিবেনবাবু—

কি?

ঐ ঘরটা অর্থাৎ যে ঘরে বিমলবাবু নিহত হয়েছেন, তালা দিয়ে রাখবার ব্যবস্থা করবেন। কথাটা বলে আর দাঁড়ায় না কিরীটী, আমার দিকে তাকিয়ে বলে, চল্ সুব্রত।

দুজনে ঘর থেকে বের হয়ে গেলাম।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে একতলায় আসতেই দেখা গেল সিঁড়ির ঠিক সামনেই রেলিং ধরে পাথরের মত দাঁড়িয়ে আছে শকুন্তলা।

শকুন্তলাকে সামনে দেখে কিরীটী দাঁড়াল, কিছু বলবেন মিস চৌধুরী?

মিঃ রায়! শকুন্তলা কিরীটীর মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাল।

বলুন?

আপনি—মানে সত্যিই আপনার স্থির বিশ্বাস—

কি?

কাকা—কাকাকে সত্যিই কেউ হত্যা করেছে?

মনে হল কথাটা বলতে গিয়ে শকুন্তলার গলাটা যেন কেঁপে উঠল।

হ্যাঁ, সত্যি তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছে।

তবু কিন্তু শকুন্তলা পথ ছাড়ে না।

কিরীটী পুনরায় প্রশ্ন করে, আর কিছু বলবেন?

আপনি—আপনি কাউকে সন্দেহ করেছেন?

কিরীটী মুহূর্তকাল মনে হল যেন কি ভাবল, তারপর মৃদুকণ্ঠে বললে, আপনার ঐ প্রশ্নের জবাবে বর্তমানে কেবল এইটুকুই বলতে পারি মিস চৌধুরী, কোন অজ্ঞাত বা অপরিচিত ব্যক্তির হাতে তিনি নিহত হন নি!

তবে? যেন একটা অস্ফুট আর্তনাদ বের হয়ে এল শকুন্তলার কণ্ঠ চিড়ে।

যে তাঁকে হত্যা করেছে, সে তাঁর অত্যন্ত পরিচিত কেউ। তাই—

তাই?

তাই শেষ মুহূর্তে ব্যাপারটা তাঁর কাছে যেমন আকস্মিক তেমনি অভাবিতই ছিল হয়তো!

কি বলতে চান আপনি?

হত্যাকারী যখন তাঁকে হত্যা করবার জন্য সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি পরমুহূর্তেই ব্যাপারটা কি ঘটতে চলেছে! ইট ওয়াজ সো সাডেন! কিন্তু মিস চৌধুরী—

কি?

আপনি বোধ হয় একটু সতর্ক থাকলে ব্যাপারটা ঘটত না!

কি বললেন?

বলছিলাম ইউ অ্যাপ্রিহেণ্ডেড ইট—আপনি পূর্বেই ঐ ধরনের একটা কিছু যে ঘটবে বা ঘটতে পারে অনুমান করেছিলেন—

না না—বিশ্বাস করুন মিঃ রায়, আমি—

হ্যাঁ, আপনি সেটা অনুমান করতে পেরেছিলেন বলেই কাল আমার কাছে ছুটে গিয়েছিলেন!

না না—আমি—

কিন্তু কেন যে কাল সব কথা বললেন না শেষ পর্যন্ত তা আপনিই জানেন। বললে হয়তো আজকের এই দুর্ঘটনাটা না ঘটতেও পারত।

আপনি—আপনি বিশ্বাস করুন মিঃ রায়, যা আপনি বলছেন তার বিন্দুবিসর্গও আমি—

মিস চৌধুরী, বিয়ের ব্যাপারে চিন্তিত হয়ে যে কাল আপনি আমার কাছে ছুটে যান নি সে বিষয়ে আমি স্থিরনিশ্চিন্ত। কিন্তু কেন জানেন, মাত্র একটি কারণে—

একটি কারণে!

হ্যাঁ, একটি কারণে। আপনার আঙুলের ঐ আংটিটিই—

আংটি!

হ্যাঁ, আংটিটিই কাল আমাকে বলে দিয়েছিল আমার কাছে ছুটে যাবার যে কারণ আপনি দেখিয়েছেন তা মিথ্যা!

মিঃ রায়!

কিন্তু আর নয়, এদিকে রাত প্রায় শেষ হয়ে এল। যদি সত্যিই কিছু আপনার বলবার থাকে তো কাল বিকেলের দিকে আমার বাড়িতে আসতে পারেন। আচ্ছা আসি নমস্কার—চলো সুব্রত।

কিরীটী কথাটা শেষ করেই দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

আমি তাকে অনুসরণ করলাম।

বারো

পরের দিন দ্বিপ্রহরে কিরীটীর বাড়িতে বসে আমি, কিরীটী ও শিবেন সোম তিনজনে মিলে বিমলবাবুর হত্যার ব্যাপার নিয়েই আলোচনা করছিলাম।

শিবেন সোম এসেছেন প্রায় ঘণ্টাখানেক হবে।

দ্বিপ্রহরের কিছু আগে হঠাৎ যেন কিছুটা হন্তদন্ত হয়েই শিবেন সোম এসে হাজির।

কিরীটী অত্যন্ত শিথিল ভঙ্গীতে বসে এক প্যাকেট তাস নিয়ে পেসেন্স খেলছিল একা একা। আর আমি একটা রহস্য উপন্যাসের পাতায় ডুবেছিলাম।

হন্তদন্ত হয়ে শিবেন সোমকে ঘরে ঢুকতে দেখে দুজনেই আমরা মুখ তুলে তাকালাম। একই সঙ্গে যুগপৎ।

কি ব্যাপার, অত হাঁপাচ্ছেন কেন? কিরীটী শুধায়।

না, হাঁপাই নি—সোফাটার উপর বসতে বসতে শিবেন সোম কথাটা বললেন।

নতুন কোন সংবাদ আছে বুঝতে পারছি, কিন্তু কি বলুন তো? কিরীটী আবার প্রশ্ন করে।

যে তালাটা গতকাল বিমলবাবুর শোবার ঘরের দরজায় লাগিয়ে এসেছিলাম—

শিবেন সোমের কথাটা শেষ হয় না, হাতের তাসগুলো সাফল করতে করতে একান্ত যেন নির্বিকার কণ্ঠেই কিরীটী জবাব দেয়, তালাটা খোলা—এই তো!

শুধু খোলাই নয় মিঃ রায়, তালাটা ভাঙা!

ও একই কথা হল।

আমি অবিশ্যি সঙ্গে সঙ্গে তালাটার গা থেকে ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেবার ব্যবস্থা করে এসেছি—

বেশ করেছেন। তবে পণ্ডশ্রমই করেছেন—

পণ্ডশ্রম মানে?

মানে আর কি, সকলের আঙুলের ছাপই হয়তো তাতে পাবেন ঐ বাড়ির একমাত্র খুনীটির বাদ দিয়ে—

কিন্তু—

শিবেনবাবু, একটা কথা আপনার জানা দরকার বলেই বলছি—খুনী অসাধারণ চালাক, শুধু তাই নয়, প্রতিটি স্টেপ তার সুচিন্তিত। এভরিথিং ওয়েলপ্ল্যান্‌ড্‌—পূর্বপরিকল্পিত!

আপনি—আপনি কি তবে—

না শিবেনবাবু, হত্যাকারীর নাগাল এখনো আমি পাই নি। যতই আপনারা কিছু তথাকথিত অতিবোদ্ধা কিন্তু আসলে বঞ্চিত ও উন্নাসিকের দল আমাকে অদ্ভুত করিৎকর্মা বলে নিছক হিংসার জ্বালায় গাল পাড়ুন না কেন, কিরীটী রায়ও মানুষ, দোষত্রুটি তারও আছে—হয়তো অজ্ঞতা হেতু মধ্যে মধ্যে কথা বলতে গিয়ে দু-চারটে ভুল ইংরাজী শব্দেরও প্রয়োগ করতে পারে, কিন্তু তার মস্তিষ্কে সত্যিই কিছু না থাকলে যে এতদিন টিকতো না কথাটা—সত্যিই অত্যুক্তি নয়। যাক গে সেকথা, কাল থেকে একটা কথা ভাবছি—

কি বলুন তো?

আমাদের রঞ্জনবাবুর অতীত সম্পর্কে ইন-ডিটেইলস যতটা সম্ভব খবরটা আপনাদের ডিপার্টমেন্টের থ্রু দিয়ে একটু সংগ্রহ করবার চেষ্টা করতে পারেন?

কেন পারব না! আজই বড়সাহেবকে বলে মালয়ে সংবাদ পাঠাবার চেষ্টা করছি সেখানকার পুলিস ডিপার্টমেন্টে—

হ্যাঁ, তাই করুন। আর—

আর?

রাঘব সরকার সম্পর্কেও একটু খোঁজখবর করুন।

তাও করব। কিন্তু আমি বলছিলাম, ঐ তালা ভাঙার ব্যাপারটা—

কিরীটী মৃদু হেসে বলে, তালা ভাঙার ব্যাপারটা দেখছি আপনি কিছুতেই ভুলতে পারছেন না শিবেনবাবু!

না, আমি বলছিলাম—হয়তো খুনীই—

কোন বিশেষ কারণে আবার তালা ভেঙে ঐ ঘরে ঢুকেছিল—এই কি?

হ্যাঁ, মানে—

অনুমানটা আপনার মিথ্যা নয় শিবেনবাবু। খুব সম্ভবত তাই। কিন্তু বিমলবাবুর হত্যারহস্যের কিনারা করতে হলে আপাততঃ আপনাকে যে অন্য দিকেও আর একটা দৃষ্টি দিতে হবে!

অন্য দিকে?

হ্যাঁ। বর্তমানে রহস্য-কাহিনীর নায়ক-নায়িকা—বলছিলাম তরুণ নায়ক ও তরুণী নায়িকা দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার উপরে—

সে কি!

ভুলে যাচ্ছেন কেন, ওদের বয়সটাই যে বিশ্রী—তার উপরে রয়েছে একজনের প্রতি অন্যের আকর্ষণ, জানেন তো আকর্ষণেরই উল্টো দিক হচ্ছে বিকর্ষণ!

মিঃ রায়, আমি ঠিক আপনার কথাটা বুঝতে পারছি না—

সে কি মশাই! প্রথম যৌবনে কোন মেয়ের প্রেমে পড়েন নি নাকি?

কিরীটীর ঐ ধরনের আচমকা স্পষ্ট কথায় সহসা শিবেন সোমের মুখখানা লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে। মুখটা উনি নীচু করেন।

কিরীটী হেসে ওঠে।

জংলী ট্রেতে করে চা নিয়ে ঘরে প্রবেশ করল।

চা-পান করতে করতেই কিরীটী বললে, ভাল কথা শিবেনবাবু, পোস্টমর্টেম হয়ে গেল?

ডাঃ রুদ্রকে বলেছি আজই যাতে পোস্টমর্টেমটা করে ফেলেন—

হ্যাঁ, ডাঃ রুদ্রের রিপোর্টটা না পাওয়া পর্যন্ত আমাদের ধারণাটা যে মিথ্যা নয় সেটা প্রমাণ করা যাবে না।

কাল-পরশুর মধ্যেই আশা করছি পেয়ে যাব। আচ্ছা মিঃ রায়—

শিবেন সোমের ডাকে তাঁর দিকে মুখ তুলে তাকাল কিরীটী, কিছু বলছিলেন?

আমার কিন্তু ঐ রাঘব সরকার লোকটাকেই বেশী সন্দেহ হচ্ছে!

শুধু একা রাঘব সরকার কেন, সন্দেহ তো সে রাত্রে যাঁরা যাঁরা অকুস্থানে ঐ সময় উপস্থিত ছিলেন তাঁদের প্রত্যেকের উপরেই হওয়া উচিত।

কিন্তু—

হ্যাঁ শিবেনবাবু, ওঁরা কেউই সন্দেহের বাইরে যেতে পারছেন না। বিশেষ করে রাঘব সরকার, দুষ্মন্ত রায়, রঞ্জনবাবু, শকুন্তলা দেবী, সরমা দেবী—

কি বলছেন আপনি? সরমা দেবী, শকুন্তলা দেবী—

ভুলে যাবেন না শিবেনবাবু, নারীর মন শুধু বিচিত্রই নয়—এমন অন্ধকার বাঁকা গলিঘুঁজি ওদের মনের মধ্যে থাকে যার হদিস এ জীবনেও কোনদিন আপনি পাবেন না—

কিন্তু তাঁদের কি এমন মোটিভ্ থাকতে পারে—বিশেষ করে সরমা দেবী ও শকুন্তলা দেবীর বিমলবাবুকে হত্যা করবার?

মোটিভের কথাই যদি বলেন তো সে কখন কি রূপে প্রকাশ পায় বা মূলে কি থাকতে পারে, বিশেষ করে নারীমনের—সে-কথা চিন্তা করতে গেলে খেই পাবেন না! যাক সে কথা, সরল ও দ্বিধাহীন মন নিয়ে ভাববার চেষ্টা করুন—বলতে বলতে হঠাৎ কিরীটীর কণ্ঠস্বরে লঘু রহস্যপ্রিয়তার একটা সুর যেন ধ্বনিত হয়ে ওঠে। সে আমার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে শিবেন সোমকে সম্বোধন করে বলে, আরে বেশী দূরে যেতে হবে কেন, আপনি ঐ সুব্রতকেই জিজ্ঞাসা করে দেখুন না—এত বয়স হল তবু আজও যে ও কুমার কার্তিকটিই রয়ে গেল, সেও ঐ নারীমনের কোন হদিস পেল না বলেই না!

সে কি, সুব্রতবাবু—

শিবেন সোমের প্রশ্নসূচক কথাটা শেষ করল কিরীটীই। বললে, না, বেচারী আজও ও-পথে পা মাড়ায় নি। কিন্তু এবারে সত্যিই গাত্রোত্থান করতে হবে, তালাটা যখন ভাঙা তখন একটিবার সেখানে আমাদের যাওয়া প্রয়োজন—বলতে বলতে কিরীটী উঠে দাঁড়াল, একটু অপেক্ষা করুন আমি আসছি—

বিমলবাবুর গৃহে যখন আমরা এসে পৌঁছলাম আসন্ন সন্ধ্যার ধূসর ছায়ায় চারদিক তখন ম্লান হয়ে এসেছে। বাড়ির দোতলায় ইতিমধ্যেই আলো জ্বলে উঠেছে, নীচের তলাটা অন্ধকার।

বারান্দার কাছাকাছি আসতেই বারান্দার ডান দিক থেকে পুরুষকণ্ঠে প্রশ্ন ভেসে এল, কে?

জবাব দিলেন শিবেন সোম, আমি শিবেন সোম।

প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গেই ভদ্রলোক এগিয়ে এসেছিলেন। আবছা আলোছায়ায় সামনের দিকে তাকিয়ে ভদ্রলোককে চিনতে কষ্ট হল না, মৃত বিমলবাবুর ছোটবেলার বন্ধু বিনায়ক সেন।

বিনায়ক সেন বারেকের জন্য আমাদের সকলের মুখের উপরে একবার দৃষ্টিটা বুলিয়ে নিয়ে বললেন, ও আপনারা!

বিনায়ক সেনের গলার স্বর শুনে সেই দিকে তাকাতেই আবছা আলোছায়ার মধ্যেও একটা ব্যাপার লক্ষ্য করছিলাম, বিনায়ক সেনের পাশ থেকে আবছা একটা ছায়ামূর্তি যেন আমাদের সাড়া পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওদিককার অন্ধকারে দ্রুত মিশিয়ে গেল। এবং ব্যাপারটা যে কিরীটীরও নজরে এসেছিল বুঝতে পারলাম তার পরবর্তী প্রশ্নেই।

অন্ধকারে আপনার পাশে ওখানে আর কে ছিল মিঃ সেন?

কিরীটীর আচমকা প্রশ্নে যেন বিনায়ক সেন হঠাৎ কেমন থতমত খেয়ে যান, বলেন, আ—আমার পাশে? কই না—কেউ তো নয়!

কিন্তু মনে হল যেন—

কই না—আমি তো একাই ছিলাম!

কিন্তু অন্ধকারে একা একা ওখানে দাঁড়িয়ে কি করছিলেন?

না, মানে—এত বড় একটা মিসহ্যাপ হয়ে গেল তাই একবার খোঁজখবর নিতে এসেছিলাম। তারপরই একটু থেমে আবার বললেন বিনায়ক সেন, বুঝতেই তো পারছেন মিঃ রায়, বিমলের মৃত্যুটা স্বাভাবিক নয়, কেউ তাকে হত্যা করেছে ব্যাপারটা জানার পর থেকেই সকলেই এরা কেমন যেন আপসেট হয়ে পড়েছে—

তা তো হবারই কথা!

হ্যাঁ, দেখুন তো কোথাও কিছু নেই হঠাৎ কোথা থেকে কি একটা দুম করে বিশ্রী ব্যাপার ঘটে গেল!

তা তো বটেই!

বলুন তো, আমি তো মশাই সত্যি কথা বলতে কি, মাথামুণ্ডু ব্যাপারটার কিছুই এখনো বুঝতে পারছি না! হঠাৎ তাকে ঐভাবে কেউ হত্যাই বা করতে গেল কেন?

ব্যাপারটা হঠাৎ নয় বিনায়কবাবু, শান্ত দৃঢ় কণ্ঠে কিরীটী কথাটা বললে।

হঠাৎ নয়?

না, আদৌ নয়। সব কিছুই পূর্ব-প্রস্তুতি এবং পূর্ব-প্ল্যান বা পরিকল্পনা মত ঘটেছে।

মানে?

মানে কালই ঠিক না হলেও আজ-কাল-পরশু খুব শীঘ্রই যে কোন একদিন তিনি নিহত হতেনই!

না না—এ আপনি কি বলছেন মিঃ রায়?

কথাটা আমি একবিন্দুও মিথ্যা বলছি না বা অত্যুক্তি করছি না মিঃ সেন। সত্যিই মৃত্যু তাঁর পাশে এসে একেবারে দাঁড়িয়েছিল—মৃত্যুর কালো ছায়া তাঁকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছিল। যাক সেকথা, চলুন ওপরে যাওয়া যাক।

না না—এখন আর ওপরে যাব না আমি। আমার একটু কাজ আছে, আমি যাই—

দেখা করবেন না ওঁদের সঙ্গে?

না, থাক। অন্য সময় আসব'খন। আচ্ছা চলি মিঃ রায়, নমস্কার।

কথাটা বলে আর মুহূর্তমাত্র দাঁড়ালেন না বিনায়ক সেন, বারান্দা থেকে নেমে দ্রুত সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে গেটের দিকে এগিয়ে গেলেন।

হঠাৎ যেন মনে হল সকলে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। কারো মুখে কোন কথা নেই।

স্তব্ধতা ভঙ্গ করল কিরীটীই, শিবেনবাবু, মৃতদেহ প্রথম ডিসকভার্ড হয় কাল রাত্রে ঠিক ক'টার সময় যেন?

রাত আটটা পঁয়তাল্লিশ, মানে—

পৌনে নটা নাগাদ, না? এবং সোয়া সাতটা নাগাদ রঞ্জনবাবু এসে জানান ফোনে কেউ তাঁকে ডাকছে—

হ্যাঁ।

কাল দেখেছিলাম, মনে আছে মৃতদেহ পরীক্ষার সময়, তখনো রাইগার মর্টিস সেট ইন করে নি। তা হলে মনে হচ্ছে সম্ভবতঃ সোয়া সাতটা থেকে পৌনে নটার মধ্যে—অর্থাৎ মাঝখানের ঐ দেড় ঘণ্টা সময়ের মধ্যেই কোন এক সময় হত্যা করা হয়েছে। দেড় ঘণ্টা সময়—নট এ জোক! শেষের দিকে কথাগুলো কিরীটী যেন কতকটা আত্মগতভাবেই অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে বললে।

ফলে শেষের কথাগুলো বোধ করি শিবেনবাবুর কর্ণগোচর হয় নি। তাই তিনি বলেন, কি বললেন মিঃ রায়?

মৃদুকণ্ঠে কিরীটী আবার বলে, র‍্যাদার কুঈয়ার—বেশ একটু আশ্চর্যই—

আশ্চর্য! কি আশ্চর্য মিঃ রায়?

কিছু না। চলুন ওপরে যাওয়া যাক। কিন্তু নীচের তলাটা একেবারে খালি, একজন চাকরবাকরকেও তো দেখছি না—ব্যাপার কি? এ বাড়িতে চাকরবাকর কেউ নেই নাকি?

তেরো

কিরীটীর কথাটা শেষ হল না, দপ্ করে ঐ সময় সিঁড়ির আলোটা জ্বলে উঠল। দেখা গেল একজন প্রৌঢ় এবং বেশভূষায় ও চেহারায় ভৃত্য শ্রেণীরই কোন লোক হবে, সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে।

লোকটার পরনে একটা আধময়লা ধুতি, গায়ে ফতুয়া। কাঁচায়-পাকায় মেশানো মাথার চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা। ভারী পুরুষ্টু একজোড়া কাঁচা-পাকা গোঁফ ওষ্ঠের ওপরে।

লোকটি সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে আমাদের সিঁড়ির নীচে দেখেই সিঁড়ির মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে যায়, কে—কে আপনারা?

প্রশ্ন করলেন শিবেন সোম, তুমি কে? কি নাম তোমার?

এতক্ষণে বোধ হয় শিবেন সোমের পরিহিত পুলিসের ইউনিফর্মের উপরে ভাল করে নজর পড়ে লোকটার। সঙ্গে সঙ্গে সে আরো দু-ধাপ নেমে এসে সম্ভ্রমের সুরে বলে, আজ্ঞে আমার নাম রামচরণ বটে। এ বাড়িতে কাজ করি। চাকর।

রামচরণ!

আজ্ঞে—আরো দু-ধাপ নেমে এসেছে রামচরণ ততক্ষণে।

রঞ্জনবাবু, শকুন্তলা দেবী—ওঁরা বাড়িতে আছেন?

যে যাঁর নিজের ঘরেই আছেন।

শকুন্তলা দেবীকে খবর দাও, থানা থেকে শিবেনবাবু এসেছেন।

আজ্ঞে আপনি বাইরের ঘরে বোস করেন, আমি তেনাদের খবর দিচ্ছি এখুনি। চলেন—

রামচরণই নীচের বসবার ঘর খুলে আলো জ্বেলে আমাদের বসতে দিল। ছিমছাম করে সাজানো ঘরটি, যদিচ আসবাবপত্র সামান্যই।

খবর দেবার জন্যই বোধ হয় রামচরণ ঘর থেকে বের হয়ে যাচ্ছিল, বাধা দিল কিরীটী, রামচরণ!

আজ্ঞে—

কাল কই তোমাকে এ বাড়িতে তো দেখি নি! কোথায় ছিলে কাল? বাড়িতে ছিলে না নাকি?

আজ্ঞে ছিলাম।

ছিলে?

আজ্ঞে নীচেই ছিলাম। এখনো বিশ্বাস করতে পারছি না বাবু, এমনটা কেমন করে হল? কালই আমি দেশে চলে যাচ্ছি বাবু—কথাটা বলতে বলতে দেখলাম, দু চোখের কোল বেয়ে রামচরণের টপ্ টপ্ করে দু ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

কালই চলে যাচ্ছ?

হ্যাঁ বাবু। আর একদণ্ডও এখানে টিকতে পারছি না।

কতদিন আছ এখানে?

দিদিমণি এ বাড়িতে আসার বছর দুই পরে—ছোট্টটি এসে দেখেছি দিদিমণিকে। সে কি আজকের কথা বাবু! জীবনটাই তো এ বাড়িতে আমার কেটে গেল। সব শেষ হয়ে গেল যখন তখন আর কেন—বলতে বলতে কাপড়ের খুঁটে প্রবহমান অশ্রুধারা মুছতে লাগল রামচরণ।

রামচরণ!

কিরীটীর ডাকে জলে-ভেজা চোখ তুলে তাকাল রামচরণ ওর মুখের দিকে।

কাল যখন বাবুরা সব এসেছিলেন তখন তুমি কোথায় ছিলে?

উপরেই তো খাটা-খাটনি করছিলাম বাবু। উপরেই ছিলাম।

তুমি বোধ হয় শুনেছ তোমার বাবুকে কেউ খুন করেছে!

শুনেছি বৈকি। তাই তো কাল থেকে ভাবছি, কে এমন কাজটা করলে?

আচ্ছা রামচরণ, কাল যখন রঞ্জনবাবু এসে তোমার কত্তাবাবুকে ফোনের খবর দেন তখন তুমি কোথায় ছিলে?

ছাদেই ছিলাম। টেবিল পরিষ্কার করছিলাম।

তার পর যখন সকলে জানল তোমার কত্তাবাবু মারা গিয়েছেন, তখন তুমি কোথায় ছিলে?

দোতলায় ঘরের সামনে বারান্দায় মা বলেছিলেন খাবারগুলো গুছিয়ে রাখতে, তাই গুছোচ্ছিলাম।

মা! মা কে?

আজ্ঞে সরমা মাকে দেখেন নি?

ও, তুমি বুঝি তাকে মা বলে ডাক?

আজ্ঞে।

তিনি তোমাকে খুব স্নেহ করেন, তাই না?

মা'র মত দয়া আর স্নেহ এ পৃথিবীতে আমি তো আর দেখি নি বাবু। অমন মানুষ হয় না। বিধাতা যে আমার অমন মায়ের কপালে এত বড় দুঃখ কেন লিখে দিলেন তাই তো মাঝে মাঝে ভাবি—

দুঃখ!

দুঃখ নয়? শুনেছি এগারো বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু একটি বছর ঘুরতে না ঘুরতেই সব শেষ হয়ে গেল। তবু ভাগ্যি ভাল আমার কত্তাবাবুর এখানে ঠাঁই পেয়েছিলেন—কিন্তু দেখুন না কপাল, সেটুকুও বিধাতার সইল না, এবারে যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবেন কে জানে!

কেন? এখানে?

এখানে! হুঁ, এখন রঞ্জনবাবু হলেন এ বাড়ির কত্তা, তিনি তাড়িয়ে দিলেন বলে!

তাড়িয়ে দেবেন?

না তাড়িয়ে দিলেও যা কথার ঝাঁজ রঞ্জনবাবুর—তাছাড়া এখানে পা দেওয়া অবধি প্রথম দিন থেকেই যে কি বিষনজরে দেখেছেন রঞ্জনবাবু মাকে আমার—তাই তো মাকে বলছিলাম, চলো মা, আমার দেশে আমার কুঁড়েতেই না হয় চলো। ছেলের দু-মুঠো জুটলে তোমারও জুটবে। না হয় উপোস করেই থাকবে। আমি তো জানি এ অপমান সারাক্ষণ তোমার সইবে না।

চেয়ে ছিলাম রামচরণের মুখের দিকে, শুনছিলাম ওর কথাগুলো। কথাগুলো তো কোন গেঁয়ো চাষার চাষাড়ে কথা নয়! কেবলমাত্র তো সরল দরদই নয়, আরো কিছু যে আছে প্রতিটি কথার মধ্যে!

আচ্ছা রামচরণ?

বলেন আজ্ঞে—

বাবুকে—তোমার কত্তাবাবুকে তাঁর ঘরে ঢুকতে তুমি কাল দেখেছিলে?

না। তবে—

তবে?

ফোন ধরবার জন্য কত্তাবাবু কখন ঘরে ঢুকেছিলেন তা জানি না—তবে তার কিছুক্ষণ পর বারান্দায় ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আমি কাজ করছি, শুনছিলাম বাবু যেন কার সঙ্গে ঘরের মধ্যে কথা বলছেন। পরে ভেবেছি ফোনেই হয়তো কত্তাবাবু কথা বলছেন—

ঘরের মধ্যে ফোন করছেন মানে? তোমার কত্তাবাবুর ঘরে তো ফোন নেই! ফোন তো বারান্দায়! কিরীটী যেন বিস্ময়ের সঙ্গেই প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ বাবু, বারান্দাতেই ফোন থাকে, তবে কত্তাবাবুর ঘরেও প্লাগ পয়েন্ট আছে।

কাল যখন ফোন আসে তখন কোথায় ফোনটা ছিল?

কত্তাবাবুর ঘরেই কাল দুপুর থেকে ফোনটা ছিল।

বলো কি! তবে—

কি বাবু?

কাল রাত্রে আমরা যখন ঘরে গিয়ে ঢুকলাম তখন তো ফোনটা কই তোমার কত্তাবাবুর ঘরে ছিল না!

ছিল না?

না। তবে ফোনটা আবার কে বাইরে নিয়ে এল? নিশ্চয়ই কেউ এনেছে—তুমি কিছু জানো রামচরণ কে এনেছিল ফোনটা আবার বারান্দায়?

আজ্ঞে জানি না তো!

হুঁ, আচ্ছা ঠিক আছে—তুমি এবারে দিদিমণিকে তোমার একটা খবর দাও রামচরণ। বলো গে যে আমরা এসেছি।

কিরীটী এতক্ষণ সোফায় বসেছিল এবং কথা বলতে বলতে অন্যমনস্কতার মধ্যে কখন এক সময় যেন তার সিগারটা নিভে গিয়েছিল, সিগারটায় পুনঃঅগ্নিসংযোগ করে সিগারটা মুখে দিয়ে কিরীটী ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগল।

মিনিট দশেকের মধ্যেই শকুন্তলা এসে ঘরে প্রবেশ করল।

মিঃ রায় আপনি কতক্ষণ?

এই কিছুক্ষণ। আচ্ছা শকুন্তলা দেবী, কাল রাত্রে আপনি যখন আমাকে ফোন করেন তখন ফোনটা কোথায় ছিল নিশ্চয় আপনার মনে আছে—ঘরে না বারান্দায়?

মনে আছে বৈকি, বারান্দাতেই স্ট্যাণ্ডের ওপর ফোনটা ছিল। কেন এ কথা জিজ্ঞাসা করছেন?

আচ্ছা আপনার কাকাকে যখন ফোনে ডাকছে বলে রঞ্জনবাবু সংবাদ দেন তখন ফোনটা কোথায় ছিল জানেন কিছু?

না। তবে—

তবে?

আমার যতদূর মনে পড়ছে কাল দুপুর থেকে ফোনটা বোধ হয় কাকার ঘরেই ছিল।

বলতে পারেন ফোনটা কে তাহলে বাইরের বারান্দায় নিয়ে এল? কিরীটী প্রশ্ন করে।

না তো!

কেউ নিশ্চয়ই নিয়ে এসেছে, কিন্তু কে? বিড়বিড় করে কথাটা যেন আপন মনেই কিরীটী বলে, কে নিয়ে এল?

কে—কিছু বললেন?

না, কিছু না। আচ্ছা শকুন্তলা দেবী, কাল রাত সোয়া সাতটা থেকে পৌনে নটা পর্যন্ত আপনি ঠিক কোথায় ছিলেন, কি করছিলেন—মনে করে আমাকে বলতে পারেন?

যতদূর মনে পড়ছে আমি ঐ সময়টা দোতলাতেই আমার ঘরে বোধ হয় ছিলাম।

আর রঞ্জনবাবু?

সে তো ছাদেই ছিল বেশীর ভাগ সময়, তবে—

বলুন?

একবার যেন মনে পড়ছে কাকাকে ফোনের সংবাদটা দেবার পর কাকার পিছনে পিছনে গিয়েছিল। হ্যাঁ মনে পড়েছে, একবার তাকে যেন আমি তাঁর ঘর থেকে বের হয়ে আসতে দেখেছি।

রাত তখন কটা বাজে, মনে করতে পারেন কি?

না। তবে কত আর হবে—বোধ করি সাড়ে আটটা কি আটটা চল্লিশ—হ্যাঁ তাই হবে, তার কারণ একটু আগেই দুষ্মন্ত এসেছে—তাকে আমি বলছিলাম, এতক্ষণে তোমার সময় হল, ক'টা বাজে দেখেছ! মনে আছে তো ডিনার নয়, টি-র নিমন্ত্রণ ছিল!

তারপর? কিরীটী শুধায়, কোথায় দেখা হয়েছিল আপনাদের?

দোতলার বারান্দায়। এবং দুষ্মন্ত তাতে জবাব দিয়েছিল, এই তো সবে আটটা বেজে দশ মিনিট।

আটটা দশ নিশ্চয়ই সন্ধ্যা নয়!

একটা জরুরী ব্যাপারে আটকে গেলাম। তা কোথায় তিনি, তাঁকে একটা প্রণাম করে নিই দীর্ঘায়ু কামনা করে!

শকুন্তলা বলতে লাগল, তারপরে রঞ্জনকে যখন তার ঘর থেকে বের হয়ে আসতে দেখি—রাত তখন ঐ সাড়ে আটটার মতন হবে মনে হয়।

হুঁ এবং পৌনে নটা নাগাদ বিমলবাবুর মৃত্যুর ব্যাপারটা আবিষ্কৃত হয়!

হঠাৎ যেন কিরীটীর শেষের কথায় শকুন্তলা চমকে ওঠে এবং চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে বলে, হোয়াট—হোয়াট আর ইউ ড্রাইভিং অ্যাট মি রায়? কি—কি আপনি বলতে চান?

কিরীটী যেন শকুন্তলার কথাগুলো শুনতেই পায় নি এমন ভাবে বলে, তা হলে হিসাব পাওয়া যাচ্ছে না মাত্র পনেরটা মিনিটের—জাস্ট ফিফটিন মিনিটস্!

কিরীটীবাবু? শকুন্তলা উদ্বেগাকুল কণ্ঠে পুনরায় ডাকে।

আচ্ছা শকুন্তলা দেবী, ঐ সময়টা সরমা দেবীকে আশেপাশে কোথাও দেখেছিলেন?

সরমা! কই না—মনে পড়ছে না তো!

ট্রাই টু রিমেম্বার! খুব ভাল করে চিন্তা করে বলুন!

না, মনে পড়ছে না!

আর ইউ সিয়োর?

হ্যাঁ, মানে—

মিস চৌধুরী, আবার ভাবুন। ভাবলেই বলতে পারবেন। সব মনে পড়বে, কারণ সে সময়টা আপনি অকুস্থানের—প্লেস অফ অকারেন্স-এর আশপাশেই ছিলেন।

না, আমার মনে পড়ছে না।

কিন্তু মিস চৌধুরী, আমি যদি বলি—স্থির দৃষ্টিতে তাকাল কিরীটী শকুন্তলার চোখের দিকে, আপনি—হ্যাঁ আপনি দেখেছেন সে-সময় আরো একজনকে সেখানে—

কে—কাকে?

সরমা দেবীকে!

না না—আমি দেখি নি, আপনি বিশ্বাস করুন মিঃ রায়। আর দেখেই যদি থাকি তা বলব না কেন?

যাক শকুন্তলা দেবী, আপনি কি জানেন, অকস্মাৎ কিরীটী তার প্রসঙ্গের মোড় ঘুরিয়ে দিল, কাল রাত্রে এখান থেকে যাবার আগে শিবেনবাবু আপনার কাকার ঘরে যে তালাটা দিয়ে গিয়েছিলেন সে তালাটা কেউ ভেঙে ফেলেছে—

সে কি! কে বললে?

শিবেনবাবু আজ বেলা বারোটা নাগাদ এখানে একবার এসেছিলেন। আপনি তো জানেন তখনই তিনি তালাটা ভাঙা দেখে গিয়েছেন—

শিবেনবাবু, সত্যি? শিবেন সোমের মুখের দিকে তাকিয়ে শকুন্তলা উৎকণ্ঠার সঙ্গে প্রশ্নটা করল।

হ্যাঁ, মিস চৌধুরী। তালাটা এখনো ভাঙাই আছে।

আশ্চর্য! কে আবার তালাটা ভাঙল?

চোদ্দ

মিস চৌধুরী, রঞ্জনবাবু তো বাড়িতেই আছেন, তাঁকে একটু ডেকে দেবেন?

হ্যাঁ, দিচ্ছি—কথাটা বলে শকুন্তলা ঘর থেকে বের হয়ে গেল। এবং শকুন্তলা ঘর থেকে বের হয়ে যেতেই কিরীটী শিবেন সোমের দিকে তাকিয়ে বললে, একটা কাজ আপনাকে করতে হবে শিবেনবাবু!

কি বলুন?

সাতজনের ফটো আমাকে যোগাড় করে দিতে হবে—

সাতজনের ফটো!

হ্যাঁ।

কার কার?

সাতজনের—দুটি নারীর ও পাঁচটি পুরুষের। ফটোতে শুধু সমস্ত মুখখানা বুক পর্যন্ত।

কিন্তু কার কার?

রাঘব সরকার, দুষ্মন্ত রায়, রঞ্জন বোস, অধ্যাপক বিমল চৌধুরী, বিনায়ক সেন, সরমা ও শকুন্তলার।

বেশ তো। কালই তোলাবার ব্যবস্থা করছি—পরশুই পাবেন।

হ্যাঁ, তা হলেই হবে। আর একটা কথা—কিন্তু কিরীটীর কথা শেষ হল না, রঞ্জন এসে ঘরে ঢুকল।

আসুন, আসুন মিঃ বোস! কিরীটী রঞ্জনকে আহ্বান জানায়।

রঞ্জন কিন্তু কিরীটীর কথার কোন জবাব না দিয়ে সোজা একেবারে শিবেন সোমের দিকে তাকিয়ে বললে, এই যে শিবেনবাবু, আমি আপনাকে ফোন করব ভাবছিলাম, তা আপনি এসে পড়েছেন ভালই হয়েছে—কাল সকালের দিকে ডেড বডি আমরা পাব তো?

নিশ্চয়ই। ইচ্ছা করলে আজ রাত্রেই নিতে পারেন, সে ব্যবস্থাও হতে পারে।

দরকার নেই। কাল খুব সকাল সকাল যাতে পাই সেই ব্যবস্থাই করবেন।

বেশ তাই হবে।

কিরীটী এতক্ষণ চুপ করে ছিল, আবার কথা বলল, রঞ্জনবাবু, আপনাকে আমাদের কয়েকটা কথা জিজ্ঞাস্য ছিল।

রঞ্জন বোস কিরীটীর দিকে চোখ তুলে তাকাল। মনে হল ভ্রূদুটো কুঁচকে কপালের উপরে যেন বিরক্তির চিহ্ন একটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে রঞ্জন বোসের।

বলুন?

গতকাল রাত্রে সোয়া সাতটা থেকে পৌনে নটা পর্যন্ত আপনি কোথায় ছিলেন, কি করছিলেন?

কোথায় ছিলাম আর কি করছিলাম! না মশাই, আমি অত্যন্ত দুঃখিত—ঠিক মনে করতে পারছি না।

মনে করতে পারছেন না?

না।

ওঃ, আচ্ছা আপনার মামাবাবুকে কেউ ফোনে ডেকেছিল আর আপনি তাঁকে ডেকে দিয়েছিলেন সে কথাটা আশা করি মনে আছে আপনার?

তা আছে।

কে তাঁকে ফোনে ডেকেছিল মনে আছে আপনার?

না। তাছাড়া জানব কি করে বলুন, আমি তো আর নাম জিজ্ঞাসা করি নি।

নাম জিজ্ঞাসা করেন নি?

না।

ছেলে না মেয়ে?

পুরুষেরই কণ্ঠস্বর যেন শুনেছিলাম।

কি বলেছিলেন তিনি?

বিশেষ কিছুই না, কেবল বলেছিলেন, মামার সঙ্গে তাঁর বিশেষ কি জরুরী কথা আছে—একবার দয়া করে তাঁকে ডেকে দিতে।

ফোনটা তখন কোথায় ছিল?

মামার ঘরেই।

ঠিক মনে আছে তা আপনার?

তা মনে আছে বৈকি।

আপনি আপনার মামার পিছনে পিছনে এসেছিলেন, তাই না?

এসেছিলাম।

আপনার মামার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ঘরে ঢুকেছিলেন কি?

মামার ঘরে? কই না তো!

তবে আপনি কোথায় গেলেন?

আমি তো আবার ছাদেই ফিরে যাই।

না, আপনি ছাদে ফিরে যান নি!

ফিরে যাই নি? তার মানে?

ফিরে যান নি তাই বললাম। কিন্তু কেন যে ফিরে যান নি সে তো আমি বলতে পারব না, আপনিই পারবেন!

তবে কোথায় গিয়েছিলাম আমি সেটা আপনি নিশ্চয় জানেন বলেই মনে হচ্ছে!

জানি না বলেই তো জিজ্ঞাসা করছি।

রঞ্জন বোস অতঃপর চুপ করে থাকে।

মনে করে দেখুন, আপনার ঘরেই ফিরে যান নি তো?

না।

যান নি?

না।

তা হলে মিঃ বোস, ঐ সময়টা আপনি কি করেছেন, কোথায় ছিলেন, কিছুই মনে নেই বলতে চান?

তাই।

মনে নেই যখন—আচ্ছা আপনি আসতে পারেন। হ্যাঁ ভাল কথা, সরমা দেবীকে একটিবার এই ঘরে পাঠিয়ে দেবেন কি?

কি বললেন! ভ্রূ-দুটো কুঁচকে ওঠে রঞ্জন বোসের।

বলছিলাম সরমা দেবীকে—

দেবী নয়, আপনারা হয়তো জানেন না, সে সামান্য একজন চাকরানী ছাড়া কিছুই নয়।

তাই নাকি? তা কথাটা আপনি জানলেন কি করে? আপনি তো কিছুদিন মাত্র এখানে এসেছেন রঞ্জনবাবু, ওঁর আসল ও সত্যকারের পরিচয়টা এত শীঘ্র কি করে জেনে ফেললেন বলুন তো!

পরিচয়! পরিচয় আবার কি? এভরিবডি নোস্ শি ইজ নাথিং বাট এ মেড-সারভেন্ট ইন দিস হাউস! সামান্য একজন চাকরানী মাত্র এ বাড়ির—

কিরীটী আবার হাসল এবং হাসতে হাসতে বললে, আপনি মনে হচ্ছে যে কারণেই হোক সরমা দেবীর ওপরে তেমন সন্তুষ্ট নন রঞ্জনবাবু! কিন্তু একটা কথা কি জানেন, একজনের ওপরে কোন কারণে আপনি সন্তুষ্ট নন বলেই তাঁকে অশ্রদ্ধা করবেন, তাঁর সম্পর্কে কটুভাবে কথা বলবেন সেটাও তো ভদ্রতা নয়!

থামুন মশাই, আপনারা দেখছি সব এক দলের! একটা অতি সাধারণ—

কিরীটী কিন্তু কথাটা রঞ্জনকে শেষ করতে দিল না। তার আগেই শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে এক প্রকার যেন বাধা দিয়েই বললে, থাক রঞ্জনবাবু, আপনাকে কষ্ট করে তাঁর পরিচয় দিতে হবে না, আপনি দয়া করে একবার বরং মিস চৌধুরীকে বলে দেবেন, সরমা দেবীকে যেন একটিবার এ ঘরে তিনি পাঠিয়ে দেন। যান—

এক প্রকার যেন ঠেলেই কিরীটী রঞ্জন বোসকে ঘর থেকে বের করে দিল।

কিরীটীর প্রতি একটা ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হেনে রঞ্জন ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

মিনিট পনের বাদে সরমা ঘরে এসে ঢুকল।

সেই শান্ত আত্মসমাহিত চেহারা।

বসুন সরমা দেবী। যতদিন না ব্যাপারটার কিনারা হয় মধ্যে মধ্যে হয়তো আপনাকে বিরক্ত করতে আমরা বাধ্য হব। একটা কথা বলছিলাম, রামচরণ বলছিল রঞ্জনবাবু নাকি আপনাকে ঠিক সহ্য করতে পারছে না! কথাটা কি সত্য?

শান্ত স্থির দৃষ্টি তুলে তাকাল সরমা কিরীটীর মুখের দিকে নিঃশব্দে।

বুঝেছি, আপনাকে আর বলতে হবে না, কিন্তু কেন বলুন তো, আপনার প্রতি তাঁর এত

বিতৃষ্ণার কারণটা কি কিছু বুঝতে পেরেছেন? আগে তো তিনি আপনাকে কখনো দেখেন নি, আপনার সঙ্গে তাঁর কোন পরিচয়ও ছিল না—

বলতে পারি না!

বিমলবাবু নিশ্চয়ই ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিলেন?

ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারলেও এতদিন এতটা উগ্র হয়ে দেখা দেয় নি। কিন্তু—

বুঝেছি তাঁর মৃত্যুর পর থেকেই—

হ্যাঁ, এ বাড়িতে আমার যে আর জায়গা হবে না তাও—

তাও বলেছেন উনি?

হ্যাঁ, আজই দুপুরে বলেছেন সে কথা।

শকুন্তলা দেবী জানেন সে কথাটা?

না, তাকে আমি বলি নি কিছু।

কিন্তু কেন বলেন নি? এ বাড়িতে সব অধিকার তো একমাত্র রঞ্জনবাবুরই নয়, মিস চৌধুরীরও তো সমান অধিকার আছে!

সে তারা বুঝবে। আমি তো এ বাড়িতে সত্যিই সামান্য দাসী বই কিছুই নয়।

কিন্তু সরমা দেবী, আমি যদি বলি, সামান্য দাসী মাত্রই আপনি নন—

কি—কি বললেন?

হঠাৎ যেন কথাটা বলতে বলতে চমকে তাকাল কিরীটীর মুখের দিকে চোখ তুলে সরমা, মেঘে ঢাকা আকাশের গায়ে বিদ্যুৎচমকের মতই যেন তার অটুট শান্ত গাম্ভীর্য মুহূর্তের জন্য খসে পড়ল বলে মনে হল।

হ্যাঁ, আপনি এ বাড়িতে সামান্য দাসী নন! কিরীটী আবার কথাটা উচ্চারণ করে।

না, না—আমি দাসী—দাসী বৈকি—দাসীই তো!

সরমার কণ্ঠ থেকে শেষের বেদনাসিক্ত কথাগুলো যেন একটা আকস্মিক কান্নার মতই উচ্চারিত হল। এবং স্পষ্ট লক্ষ্য করলাম সরমার দু'চোখের কোল ছলছল করছে।

হ্যাঁ সরমা দেবী, আর কেউ না জানুক, বুঝতে না পারুক, আমি জানি, আমি বুঝতে পেরেছি। যাক সে কথা, আপনাকে শুধু আমার একটা অনুরোধ—

অনুরোধ!

হ্যাঁ, আমাকে না জানিয়ে এ বাড়ি থেকে আপনি যাবেন না।

কিন্তু—

বলুন, কথা দিলেন?

আমি—

জানি। বুঝতে পারছি বৈকি, এখানে থাকা আর একটা দিনও আপনার পক্ষে সত্যই দুঃসাধ্য ব্যাপার। প্রতি মুহূর্তে আপনাকে দুঃসহ অপমান মেনে নিতে হবে তাও জানি—সব জেনেও কটা দিন এখানে আপনাকে আমি থাকতে বলছি বিশেষ কোন কারণ আছে বলেই।

কারণ! সরমা কিরীটীর দিকে মুখ তুলে তাকাল।

হ্যাঁ কারণ, নচেৎ জানবেন এখানে এই অপমানের মধ্যে কিছুতেই আপনাকে আমি ধরে রাখতাম না—অনুরোধও করতাম না।

সরমা চুপ করে থাকে। কোন জবাব দেয় না।

সরমা দেবী! কিরীটী আবার ডাকে কয়েকটা মুহূর্ত চুপ করে থেকে।

কি?

আপনি কি জানেন কাল রাত্রে পুলিস বিমলবাবুর ঘরে যে তালাটা দিয়ে গিয়েছিল, সেই তালাটা কেউ ভেঙেছে!

ভেঙেছে?

হ্যাঁ, ভেঙেছে। যাক্ গে। আর একটা কথা—

কি?

শুনেছি বিমলবাবু নাকি ডাইরী রাখতেন, সে-সম্পর্কে আপনি কিছু জানেন?

না।

আচ্ছা আজ বিনায়কবাবু কেন এসেছিলেন, জানেন কিছু?

কে—কে এসেছিল?

বিমলবাবুর বাল্যবন্ধু বিনায়ক সেন! দেখা হয় নি আপনার তাঁর সঙ্গে আজ কিছুক্ষণ আগে?

সরমা চুপ।

কিরীটী বলে চলে, জানি আপনার সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল, কিন্তু কেন এসেছিলেন তিনি?

সরমা তথাপি নীরব।

আপনার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছিলেন, তাই না?

পূর্ববৎ নিশ্চুপ সরমা। সে যেন নিষ্প্রাণ, একেবারে পাথর।

কি বলতে এসেছিলেন তিনি আপনাকে? বিমলবাবুর সম্পর্কে কোন কথাই কি?

হঠাৎ যেন ভেঙে পড়ল সরমা, আমি—আমি জানি না, আমি জানি না—কথাগুলো বলতে বলতে দু'হাতে অকস্মাৎ মুখ ঢাকল সে।

কিরীটী ক্ষণকাল স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সরমার মুখের দিকে। তারপর অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে বললে, আচ্ছা আপনি যেতে পারেন সরমা দেবী।

পনেরো

একটি নিষ্প্রাণ দম-দেওয়া পুতুলের মতই যেন অতঃপর চেয়ার থেকে উঠে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বের হয়ে গেল সরমা।

সরমার ক্রম-অপস্রিয়মাণ দেহটার দিকেই তাকিয়েছিল কিরীটী এবং সরমার দেহটা যখন দরজার ওপাশে আমাদের দৃষ্টি থেকে মিলিয়ে গেল কিরীটী মৃদুকণ্ঠে একটিমাত্র কথা বললে, বেচারী!

কথাটা ঘরের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি শিবেন সোমের কানে না গেলেও আমার কানে গিয়েছিল, আমি মুখ তুলে তাকালাম কিরীটীর দিকে। কিন্তু কোন প্রশ্ন করতে পারলাম না ওকে, কারণ মনে হল ও যেন একটু অন্যমনস্ক। কিন্তু সে ঐ মুহূর্তে কিছু একটা ভাবছিল এবং সেটা যে সরমাকে কেন্দ্র করেই, সেটা বুঝতে আমার দেরি হয় না। এবং এও যেন আমি

অনুভব করতে পারছিলাম—নাটক দানা বেঁধে উঠেছে বিশেষ করে দুটি প্রাণীকে কেন্দ্র করে, অথচ—

সহসা আমার চিন্তাজাল ছিন্ন হয়ে গেল শিবেন সোমের কথায়।

দোতলার ঘরটা একবার দেখলে হতো না মিঃ রায়?

হ্যাঁ, হ্যাঁ—দেখতে হবে বৈকি। আচ্ছা শিবেন, তোমার কি মনে হয়?

কিসের কি মনে হয়?

বলছিলাম ঐ সরমা দেবীর কথা—

সরমা দেবী!

হ্যাঁ। ওঁর কথা শুনলে, ওঁর মুখের দিকে তাকালে, ওঁর কণ্ঠস্বরে, ওঁর মুখের চেহারায় কি মনে হয় না যে ওঁর মনের মধ্যে কোথাও একটা গভীর লজ্জা, গভীর ব্যথা জমাট বেঁধে আছে—

গভীর লজ্জা, ব্যথা!

হ্যাঁ, যে লজ্জা যে ব্যথা কারো কাছে প্রকাশ করবার নয়। যাক গে, কি যেন বলছিলে একটু আগে তুমি? ওপরের ঘরটা দেখবার কথা! হ্যাঁ চলো, ঘরটা দেখে আসা যাক। রামচরণকে একবার ডাকো না, তাকেই সঙ্গে নিয়ে না-হয় ওপরে যাওয়া যাবে।

বলা বাহুল্য, রামচরণকে নিয়েই আমরা উপরের ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

ঘরের তালাটা ভাঙা ছিল, সেটা ধরে সামান্য টানতেই খুলে গেল। খোলা দরজাপথে অতঃপর প্রথমে শিবেন সোম, তাঁর পশ্চাতে আমি, কিরীটী ও রামচরণ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলাম।

অন্ধকার ঘর। ঘরের মধ্যে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হল, একটু আগেও ঘরের মধ্যে কেউ ছিল, যে আমাদের ঘরে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঠিক ঐ মুহূর্তেই ঘর থেকে চলে গেল।

নিজেদের অজ্ঞাতেই, বুঝি আমাদের ঐ কথাটা মনে হওয়াতেই থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলাম আমরা। এবং সকলেই যেন নিশ্চুপ, মুহূর্তের জন্য বোবা হয়ে গিয়েছিলাম।

ঘরের আলোটাও যে জ্বালানো দরকার, সে কথাটাও যেন ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু রামচরণ আমাদের বাঁচাল। সুইচ টিপে সে ঘরের আলোটা জ্বেলে দিল।

দপ করে ঘরের বিদ্যুৎ-বাতিটা জ্বলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের সমস্ত অন্ধকার অপসারিত হল।

সেই ঘর—যে ঘরে কাল রাত্রে প্রবেশ করেই চেয়ারটার উপরে শায়িত অধ্যাপকের মৃতদেহটা আমাদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করেছিল।

আজও সর্বপ্রথমেই সেই চেয়ারটার উপরে, বুঝি একান্ত স্বাভাবিকভাবেই, আমাদের দৃষ্টি গিয়ে পড়ল। কিন্তু আশ্চর্য, চেয়ারটা ঠিক গতকাল যেখানে ছিল সেখানে তো নেই, চেয়ারটা একটু যেন কাত হয়ে রয়েছে—হ্যাঁ, তাই!

বেতের হাতলওয়ালা আরামকেদারা। এবং চেয়ারটা কাত হয়ে থাকার দরুনই যে ব্যাপারটা আমাদের ঐ সঙ্গে দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে সেটা হচ্ছে চেয়ারের ডান পায়াটা ভাঙা। মনে হল, কেউ যেন কোন কিছু দিয়ে চাপ দিতে গিয়েই পায়াটা ভেঙে ফেলেছে।

কিন্তু পায়াটা হঠাৎ কেউ অমনভাবে ভাঙতেই বা গেল কেন? কি এমন প্রয়োজন হয়েছিল কারো চেয়ারের পায়াটা ভাঙবার?

কিরীটী কিন্তু ততক্ষণে চেয়ারটার দিকে এগিয়ে গিয়েছে, আমিও এগিয়ে গেলাম।

চেয়ারের ভাঙা পায়াটা লক্ষ্য করতে করতে কিরীটী বললে, হুঁ, বুঝতে পেরেছি—চেয়ারের ঐ পায়ার সঙ্গে একটা কোটর ছিল। কোটরের ডালাটা খুলতে পারে নি, বোধ হয় চাবি পায় নি, তাই শেষ পর্যন্ত কোন কিছু লোহার পাত জাতীয় শক্ত জিনিস ডালার ফাঁকের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে ডালাটা খোলবার চেষ্টা করেছিল, তাতেও কৃতকার্য না হয়ে শেষ পর্যন্ত পায়াটা ভেঙে ফেলেছে!

পরীক্ষা করে দেখলাম, কিরীটীর কথাটা মিথ্যা নয়।

কিরীটী আবার বলে, খুব সম্ভবত ঐ কোটরের মধ্যে এমন কিছু ছিল আর সেটা এমন মারাত্মক কিছু অবশ্য-প্রয়োজনীয় ছিল খুনীর পক্ষে, যেজন্য গতরাত্রে আমরা চলে যাবার পর এই ঘরে তাকে প্রবেশ করতেই হয়েছিল।

কিরীটীর শেষের কথায় যেন চমকে উঠি এবং সঙ্গে সঙ্গে ওর মুখের দিকে তাকাই। তবে কি খুনী—কিন্তু সহসা চিন্তাসূত্রে আমার বাধা পড়ল কিরীটীর পরবর্তী কথাতেই, সে বললে, চলো শিবেন, এ শূন্য ঘরে বসে থেকে আর কি হবে!

কিন্তু ঘরটা তো দেখলে না ভাল করে?

কিরীটী মৃদু হাসতে হাসতে বললে, যা দেখবার সে তো স্পষ্টই চোখের সামনে রয়েছে। আর কি দেখব! তাছাড়া দেখবার নতুন করে আর আছেই বা কি!

কিন্তু—

না হে—মস্ত বড় একটা ফাঁক ভরাট হয়ে গিয়েছে—

ফাঁক!

হ্যাঁ, খানিকটা এগিয়ে আর এগুতে পারছিলাম না, দুটি ফাঁকের জন্যে এক জায়গায় এসে—তার মধ্যে একটি ফাঁক খুনী নিজেই ভরাট করে দিয়ে গিয়েছে—বাকি আর একটি, আশা করি সেটার জন্যও আর বেশী ভাবতে হবে না আমাদের!

তাহলে কি তুমি—

হ্যাঁ শিবেন, ব্যাপারটা প্রথমে যত জটিল মনে হয়েছিল আসলে এখন দেখছি ততটা বোধ হয় নয়।

তুমি—

কি?

তুমি কি তবে হত্যাকারী কে—

তা আন্দাজ একটা করেছি বৈকি!

কে—কে?

অত তাড়াতাড়ি করলে কি আর হয় ডিয়ার ফ্রেণ্ড! কথায় বলে হত্যারহস্য! দুম করে কি হত্যাকারীর নামটা উচ্চারণ করা যায়! তাছাড়া—

কি?

হত্যাকারী যদি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারে তাকে আমরা সন্দেহ করছি সে সাবধান হয়ে

যাবে। কিন্তু আমি চাই সে স্বাভাবিক নিশ্চয়তার সঙ্গেই আমাদের সকলের সামনে এসে দাঁড়াক। যাতে করে বিনা ক্লেশে প্রয়োজনের মুহূর্তটিতে আমরা অনায়াসেই শিবেনবাবুর আইনের লোহার হাতকড়াটা দিয়ে তার হাত দুটো শক্ত করে বেঁধে ফেলতে পারি, এবং সে আর না পালাবার সুযোগ কোন দিক দিয়েই পায়। যাক চলো, রাত হলো।

দিন-দুই পরে দ্বিপ্রহরে।

কিরীটীর ঘরের মধ্যেই আমরা—মানে আমি, কিরীটী ও কৃষ্ণা বসে কতকগুলো ফটো নিয়ে বিশ্লেষণ করছিলাম।

বলা বাহুল্য, ফটোগুলো ঐদিনই ময়না-তদন্তের পুরো রিপোর্টের সঙ্গে একটা সরকারী লেফাফায় ভরে শিবেন সোম কিরীটীর নির্দেশমত ঘণ্টাখানেক আগে মাত্র একজন কনস্টেবল মারফত পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

ময়না-তদন্তের রিপোর্টে প্রকাশ, তীব্র ডিজিট্যালিনের বিষক্রিয়ায় অধ্যাপকের মৃত্যু ঘটেছে। এবং খুব সম্ভবতঃ ক্লোরোফরমের হুইপ দিয়ে তাঁকে অজ্ঞান করে ঐ ডিজিট্যালিন অধ্যাপকের দেহে প্রবেশ করানো হয়েছিল।

রিপোর্টটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই কিরীটী যেন কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। তারপর একটি মাত্র কথাই বলেছিল, হত্যাকারী বুদ্ধির খেলা দেখিয়েছে নিঃসন্দেহে!

আর একটা কথাও বলে নি ঐ কথাটা ছাড়া।

তারপরই ময়না-তদন্তের রিপোর্টটা ভাঁজ করে এক পাশে রেখে দিয়ে কতকটা যেন নিশ্চিন্ত হয়ে ফটোগুলো দেখতে শুরু করে।

পাঁচখানি ফটো পাঠিয়েছিলেন শিবেন সোম।

অধ্যাপক বিমলবাবুর, সরমার, শকুন্তলার, বিনায়ক সেনের এবং রঞ্জন বোসের। এবং পাঁচখানি ফটোর উপরে বারেকের জন্য চোখ বুলিয়ে নিয়ে পরপর শেষ পর্যন্ত শকুন্তলা ও সরমার ফটোটি দু'হাতে তুলে নেয় কিরীটী। এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ফটো দুটো বার বার পর্যবেক্ষণ করতে থাকে।

তারপরই কিরীটী আমাদের দুজনের দিকে ফটোগুলো এগিয়ে দিতে দিতে বললে, দেখ তো তোমরা, ফটোগুলোর মধ্যে কোন বিশেষত্ব আছে কিনা?

বলা বাহুল্য, আমরা কিন্তু ফটোগুলো বহুক্ষণ ধরে পরীক্ষা করেও কিরীটী ঠিক কী বলতে চায় ধরতে পারি না।

ষোল

কি হল, কিছু পেলে না তোমরা খুঁজে?

কিরীটীর প্রশ্নে ওর মুখের দিকে দুজনেই আমরা তাকাই।

আশ্চর্য! চোখে পড়ল না কিছু এখনো তোমাদের কারো?

আমি তখনো সরমা ও শকুন্তলার ফটো দুটি পাশাপাশি রেখে দেখছিলাম, হঠাৎ কিরীটীর শেষের কথায় যেন চমকে উঠি। সত্যিই তো, অদ্ভুত একটা সৌসাদৃশ্য আছে তো ফটো দুটির মধ্যে! কপাল, নাক ও চোখের অদ্ভুত মিল!

চট্ করে অবিশ্যি প্রথমে কারো নজর না পড়বারই কথা। কিন্তু ভাল করে দেখলে চোখে পড়বেই।

বললাম, হ্যাঁ, যদিও বয়সের তফাৎ রয়েছে তবু দেয়ার আর সিমিলারিটিজ—দুটো মুখের মধ্যে সৌসাদৃশ্য রয়েছে!

হ্যাঁ রয়েছে, কিরীটী বললে, এবং সব চাইতে বড় সৌসাদৃশ্য হচ্ছে ডান দিককার চিবুকের কাছে কালো তিলটি দুজনেরই মুখে। তবে সরমার তিলটা ছোট্ট, কিন্তু শকুন্তলারটা বড়। হ্যাঁ, ঐ তিলটিই আমার মনে গতকাল খটকা বাধিয়েছিল—যে মুহূর্তে ওটা সরমার মুখে দেখি শকুন্তলার মুখে দেখবার পর!

বাবাঃ, কি শকুনের মত নজর তোমার গো! কৃষ্ণা বলে ওঠে ঈষৎ যেন ব্যঙ্গের সুরে।

কাজটাই যে শকুনের কাজ প্রিয়ে! কিরীটী মৃদু হাসির সঙ্গে বলে ওঠে, বলছিলাম না কৃষ্ণা তোমাকে সেদিন, মেয়েদের মত অভিনেত্রী হয় না—প্রমাণ পেলে তো হাতে হাতেই!

আবার আমি চমকে উঠি, কি বলতে চাস তুই কিরীটী?

কি আবার বলতে চাই, যা বলতে চাইছিলাম সে তো নিজেরাই বুঝতে পেরেছিস—

না, না—ও কথা নয়—

তবে আবার কি?

তুই কি বলতে চাস তাহলে—

হ্যাঁ—সরমা সাধারণ ঝি নয়—সরমা হচ্ছে ঐ শকুন্তলার জননী। আর তাইতেই তার স্থান হয়েছিল অধ্যাপকের গৃহে অমনি সুদৃঢ়।

তবে—তবে কি—

না। যতদূর আমার মনে হচ্ছে অধ্যাপকের রক্ত শকুন্তলার দেহে নেই—

হঠাৎ ঐ সময় দ্বারপ্রান্তে শিবেন সোমের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, ভিতরে আসতে পারি?

আরে শিবেনবাবু, আসুন, আসুন—আপনার কথাই ভাবছিলাম।

শিবেন সোম ঘরে এসে প্রবেশ করলেন, রিপোর্ট দেখলেন?

হুঁ।

কিন্তু এ যে তাজ্জব ব্যাপার, ডিজিট্যালিন শেষ পর্যন্ত—

হ্যাঁ, বেচারী একে হাইপারটেনসনে ভুগছিলেন—তাই অধিক মাত্রা ডিজিট্যালিনের দ্রুতক্রিয়া মারাত্মক বিষক্রিয়ায় পরিণত হয়েছে। যদিও অত্যন্ত ক্রুড হয়ে—তবু বলব হত্যাকারী সুনিশ্চিত পন্থাটাই গ্রহণ করেছিল। কিন্তু সে তো পরের কথা—ইতিমধ্যে সুব্রত যে আরো একটি মারাত্মক আবিষ্কার করে বসে আছে!

সে আবার কি? শিবেন সোম আমার দিকে তাকালেন।

আমি লজ্জিত হয়ে বলি, না-না—আমি নয়, কিরীটীই। ইট ওয়াজ হিজ ডিসকভারি! ওরই আবিষ্কার—

কিন্তু ব্যাপারটা কি সুব্রতবাবু?

জবাব দিল এরপর কিরীটীই। সে বললে, শকুন্তলা চৌধুরী অধ্যাপক বিমল চৌধুরীর ভাইঝি নন—

সে কি!

হ্যাঁ, সরমার ইতিহাস যদি সত্যিই হয়—অর্থাৎ সে যদি সত্যিই কৈবর্তকন্যাই হয়ে থাকে তো শকুন্তলা অধ্যাপকের কেউ নয়—কোনো রক্তের সম্পর্ক পরস্পরের মধ্যে ওদের নেই।

মানে—কি বলছেন?

ঐ ফটো দুটো দেখলেই বুঝতে পারবেন। দেখুন না ফটো দুটো একটু চোখ মেলে পরীক্ষা করে!

সরমা ও শকুন্তলার ফটো দুটো শিবেনের দিকে এগিয়ে দিল কিরীটী।

ফটো দুটো দেখতে দেখতে শিবেন সোম বলেন, আশ্চর্য! ব্যাপারটা তো আগে আমার নজরে পড়ে নি? কিন্তু—

বুঝতে পারছি শিবেনবাবু, সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে—এই তো?

না, তা নয়—

তবে? ভাবছেন তাহলে ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে, এই তো?

হ্যাঁ, মানে—

ব্যাপারটার একটা মীমাংসার প্রয়োজন বৈকি। আর সেই জন্যেই আজ আবার আপনাকে কষ্ট করে রাত এগারোটার পর এখানে আসতে হবে—

রাত এগারোটার পর?

হ্যাঁ, রাত এগারোটার পর।

বলা বাহুল্য, ঐদিনই রাত্রে কিরীটীর দোতলার বসবার ঘরেই আমরা বসেছিলাম। আমি, কিরীটী, শিবেন সোম ও কৃষ্ণা।

দেওয়াল-ঘড়িতে রাত এগারোটা বেজে কুড়ি মিনিট হয়ে গিয়েছে। শিবেন সোম যে একটু অধৈর্য হয়ে উঠেছেন বুঝতে পারছিলাম। কিরীটীর কথামত বেচারী সেই রাত সাড়ে দশটা থেকে এখানে এসে বসে আছেন।

কিরীটী দ্বিপ্রহরে যতটুকু বলেছিল তার বেশী আর একটি কথাও বলে নি। একেবারে যেন চুপ।

ঘন ঘন শিবেন সোম একবার ঘড়ির অগ্রসরমান কাঁটার দিকে এবং পরক্ষণেই আবার কিরীটীর মুখের দিকে তাকাচ্ছিলেন।

কিরীটী কিন্তু নির্বিকার। পাইপটা ওষ্ঠপ্রান্তে চেপে ধরে একান্ত নির্বিকার চিত্তেই যেন ধূমপান করছে।

রাত যখন সাড়ে এগারোটা, একটা রিকশার ঠুং ঠুং শব্দ আমাদের সকলের কানে এসে প্রবেশ করল।

কিরীটী যে অন্যমনস্কতার ভান করলেও ভিতরে ভিতরে বিশেষ কারো আগমন প্রতীক্ষায় কতখানি উদ্‌গ্রীব হয়েছিল বুঝতে পারলাম ঐ রিকশার ঠুং ঠুং শব্দটা কানে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে মুহূর্তে কিরীটী উঠে সোজা গিয়ে পথের দিককার খোলা জানালা দিয়ে উঁকি দিল।

কৌতূহল যে আমারও হয়েছিল সেটা বলাই বাহুল্য। কারণ আমি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উঠে গিয়ে ওর পাশে দাঁড়ালাম।

নীচে জানালাপথে উঁকি দিতেই চোখে পড়ল, একটি রিকশা এসে কিরীটীর ঠিক দোরগোড়ায় থামল।

জায়গাটায় ঠিক আলো না থাকার দরুন এবং রাস্তার লাইট হাতকয়েক দূরে থাকার দরুন একটু যেন আলোছায়ায় অস্পষ্ট। তাই পরিষ্কার বা স্পষ্ট দেখা যায় না।

কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলাম, কেউ এল রিকশা করে মনে হচ্ছে তোরই বাড়িতে ! কে রে?

যার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম—

অপেক্ষা করছিলি!

হ্যাঁ। অবিশ্যি মনে একটু সন্দেহ যে ছিল না তা নয়—আসবে কি আসবে না শেষ পর্যন্ত, কিন্তু যাক, শেষ পর্যন্ত এসেছে !

কথা বলছিলাম আমরা নীচের রাস্তার দিকে তাকিয়েই। দেখলাম আপাদমস্তক চাদরে আবৃত এবং গুণ্ঠনবতী এক নারীমূর্তি রিকশা থেকে নামল।

একজন ভদ্রমহিলা দেখছি !

হ্যাঁ।

ঐ সময় নীচের সদর দরজাটা খুলে গেল এবং জংলীকে দেখা গেল।

বুঝলাম কিরীটী জংলীকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিল পূর্ব থেকেই।

কে এলেন? শিবেন সোম এতক্ষণে পিছন দিক থেকে প্রশ্ন করেন।

এলেই দেখতে পাবে—আসছেনই তো এই ঘরেই! কিন্তু একটা কাজ করতে হবে তোমাকে আর সুব্রতকে—

কি?

তোমাদের সামনে অর্থাৎ তৃতীয় ব্যক্তি এখানে কেউ ওঁর সামনে থাকলে উনি মুখ খুলতে ইতস্তত করবেন, কাজেই তোমরা ঐ পাশের ঘরে যাও। দরজাটা ঈষৎ ফাঁক করে রেখো—তাহলেই ওঁকে তোমরা দেখতেও পাবে, ওঁর কথাও শুনতে পাবে।

চলুন তাহলে শিবেনবাবু।

আমার কথায় শিবেনবাবু এবং কৃষ্ণা দুজনেই উঠে দাঁড়ায়। আমরা পাশের ঘরে গিয়ে অতঃপর প্রবেশ করি।

দরজার ফাঁক দিয়ে আমরা দেখতে লাগলাম।

অবগুণ্ঠনবতী সেই নারী সামনের কক্ষে এসে প্রবেশ করল।

আসুন, আসুন—কিরীটী আগন্তুক অবগুণ্ঠনবতী ভদ্রমহিলাকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে সাদর আহ্বান জানাল।

ভদ্রমহিলা ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে একটা শূন্য সোফায় উপবেশন করলেন।

সরমা দেবী!

কিরীটীর সম্বোধনে যেন রীতিমত আমি চমকেই উঠি। আগন্তুক মহিলা তবে অন্য কেউ নয়—সরমা!

কিরীটীর কথায় সরমা দেবীও যেন একটু চমকেই উঠল মনে হল।

কিরীটী আবার বলে, আমি জানতাম যে সরমা দেবী আপনি আসবেন—আর আজই।

সরমা মাথার গুণ্ঠন সরিয়ে এবারে কিরীটীর দিকে তাকালেন।

তাঁর দু'চোখের দৃষ্টিতে বুঝি সীমাহীন বিস্ময়।

আপনি—

হ্যাঁ, জানতাম আপনি আসবেন আর কেন যে আসবেন তাও জানতাম।

আপনি—আপনি জানতেন?

জানতাম।

মনে হল অতঃপর কিরীটীর ঐ কথায় সরমা যেন নিজেকে নিজে একটু সামলে নিলেন। তারপর বললেন, কিরীটীবাবু, আপনি কি জানেন আমি জানি না, তবে একটা কথা শুধু বলতে এসেছিলাম—

মৃদু হেসে কিরীটী কতকটা যেন বাধা দিয়েই বললে, শকুন্তলা বিমলবাবুকে হত্যা করে নি এই কথাটাই তো বলতে এসেছেন?

হ্যাঁ, আপনারা মিথ্যে তার ওপরে সন্দেহ করে আজ তাকে ধরে এনেছেন সন্ধ্যার দিকে।

শকুন্তলা দেবীকে তাহলে গ্রেপ্তার করা হয়েছে?

হ্যাঁ, সন্ধ্যার পরই তাকে গ্রেপ্তার করে এনেছে।

সবিস্ময়ে এবং নিঃশব্দেই আমি পার্শ্বে দণ্ডায়মান শিবেন সোমের দিকে তাকালাম। শিবেন সোম নিঃশব্দে ঘাড় হেলিয়ে সম্মতি জানালেন।

বুঝলাম কিরীটীর নির্দেশে শিবেন সোম শকুন্তলাকে আজ সন্ধ্যায় গ্রেপ্তার করেছেন বটে, কিন্তু ব্যাপারটা তিনি না বুঝেই নির্দেশ পালনের জন্য করেছেন মাত্র।

সতেরো

ঘরের মধ্যে আবার দৃষ্টিপাত করলাম দরজার ফাঁক দিয়ে। মুখোমুখি বসে কিরীটী ও সরমা।

ঘরের উজ্জ্বল আলোয় দুজনের মুখ আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম।

কিন্তু কিরীটী বলছিল, শকুন্তলার গ্রেপ্তারের জন্য কিছুটা আপনিই দায়ী সরমা দেবী—

আমি দায়ী?

দায়ী বৈকি। কারণ সেদিন সব কথা গোপন না করে যদি অন্ততঃ আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়েও সত্যটা বলতেন তাহলে হয়তো এই দুর্ঘটনা ঘটত না।

সত্য আমি গোপন করেছি!

করেছেন। প্রথমতঃ আপনি আপনার সত্যকারের পরিচয় দেন নি—

আমার পরিচয়!

হ্যাঁ, আপনি যে ঐ বাড়িতে সাধারণ একজন দাসী হিসাবে স্থান পান নি, সে কথা আর কেউ না জানলেও প্রথম রাত্রেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম—

না না কিরীটীবাবু—আমি—

আপনি দাসী নন। এবং শকুন্তলার জন্যেই ঐ গৃহে আপনার স্থান কায়েমী হয়েছিল।

কি বলছেন আপনি? শকুন্তলা—

হ্যাঁ—বলুন শকুন্তলা আপনার কে?

শকুন্তলা—না, না—শকুন্তলা আমার কে—কেউ না, কেউ না! আর্তকণ্ঠে যেন প্রতিবাদ জানাল সরমা।

এখনো আপনি স্বীকার করবেন না! কিন্তু আমার অনুমান যদি মিথ্যা না হয় তো সে আপনার নিকট হতেও নিকটতম, আপন থেকেও আপন—

না, না, না—

বলুন—বলুন কে সে আপনার?

হঠাৎ দু'হাতে মুখ ঢেকে কান্নায় ভেঙে পড়লেন সরমা, কেউ না, কেউ না—সে আমার কেউ না—বিশ্বাস করুন কিরীটীবাবু, আপনি বিশ্বাস করুন—

মর্মান্তিক এক বেদনায় যেন দু'হাতের মধ্যে মুখটা ঢেকে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলেন সরমা।

ক্ষণকাল কিরীটী সেই করুণ দৃশ্যের দিকে চেয়ে থেকে আবার এক সময় শান্ত মৃদু কণ্ঠে বললে, সরমা দেবী, এখন বুঝতে পারছি অনুমান আমার মিথ্যা নয় এবং নিষ্ঠুর সত্য আজ দিনের আলোর মতই প্রকাশ হয়ে পড়েছে। হয়তো চিরদিনের মত আজও গোপনই থাকত, কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা হয়তো তা নয়, তাই আজ এতদিন পরে সব কিছু প্রকাশ হয়ে পড়ল। দুঃখ করবেন না, কে বলতে পারে হয়তো বিধাতার ইচ্ছায় সব প্রকাশ হয়ে পড়ল—ঐ শকুন্তলার ভালর জন্যই!

কিন্তু কি লাভ হবে—কি লাভ হবে, কি মঙ্গল হবে তার এ কথাটা আজ সে জানতে পারলে? অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে মুখটা তুলে আবার সরমা কথা বললেন।

হবে, আপনি বিশ্বাস করুন—

না, না—সে হয়তো ঘৃণায় আর কোনদিন আমার মুখের দিকে তাকাবেই না। সে যখন জানবে যে সে এক বিধবার সন্তান—

সে যদি আজ তার জন্মের জন্য নিজের মায়ের বিচারের ভার নিজের হাতে তুলে নেয় তাহলে বুঝব যে সত্যিই সে হতভাগিনী! কিন্তু ভয় নেই আপনার—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, যদি সত্যিই তাই আপনার অভিপ্রায় হয় তো একথা এতদিন যেমন গোপন ছিল তেমনি গোপনই থাকবে আজও। কিরীটী রায়ের মুখ দিয়ে এ কথা আর দ্বিতীয়বার উচ্চারিত তো হবেই না, এমন কি তার পরিচিত শিবেন সোম বা সুব্রতর মুখ দিয়েও নয়—

কিরীটীবাবু! একটা আর্ত চিৎকার করে ওঠে সরমা।

হ্যাঁ সরমা দেবী, তারাও জানে এ কথা।

তাঁরাও জানেন?

জানে। তবে তাদের আপনি বিশ্বাস করতে পারেন। কিন্তু এবারে আমার একটা প্রশ্নের জবাব দিন, বিমলবাবু ছাড়া এ কথা কি আর কেউ জানত?

জানি না। তবে—

বুঝতে পেরেছি, আপনার অনুমান আরো কেউ জানত। হ্যাঁ, আমারও তাই ধারণা—আরো একজন জানত। তিনি বোধ হয় বিমলবাবুর বন্ধু ঐ রাঘব সরকার—তাই নয় কি?

মাথাটা নীচু করে সরমা।

ঠিক আছে। আপনি এবার ফিরে যেতে পারেন। যদি বলেন তো আমি নিজে গিয়ে আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসতে পারি। রাত অনেক হয়েছে—

না, না—আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না! আমি একাই ফিরে যেতে পারব। কিন্তু—

কি বলুন?

শকুন্তলা—শকুন্তলার কি হবে?

সত্যি যদি তার এ ব্যাপারে কোন দোষ না থেকে থাকে তো আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, সে আবার রাহুমুক্ত হয়ে সসম্মানে আপনার কাছে ফিরে আসবেই। ভয় নেই, সত্যিকারের মিথ্যা চিরদিন টিকে থাকতে পারে না। মিথ্যার ভিতটা হুড়মুড় করে একদিন-না-একদিন ভেঙে পড়েই।

ঢং করে ঐ সময় দেওয়াল-ঘড়িতে সাড়ে বারোটা রাত্রি ঘোষণা করল।

না, সত্যি রাত অনেক হয়ে গেল—কিরীটী একটু যেন ব্যস্ত হয়েই ওঠে সরমার মুখের দিকে তাকিয়ে, চলুন, আমিই আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি—

আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না কিরীটীবাবু। তাছাড়া কোথায় আপনি আমাকে পৌঁছে দেবেন? হ্যাঁ, আমি তো সেখানে আর ফিরে যাচ্ছি না—

ফিরে যাচ্ছেন না!

না, সেখানে আর নয়। আজকের মতই একদিন অসহায় আমার হাত ধরে সেখানে নিয়ে গিয়ে তার আশ্রয়ে আমাকে যে আশ্রয় দিয়েছিল, আজ সে-ই যখন নেই তখন আর কোন্ ভরসায় সেখানে থাকব বলতে পারেন! আর কোন্ দুঃসাহসেই বা থাকব! না কিরীটীবাবু, পৃথিবীতে বিশ্বাস বস্তুটা এমনই জিনিস যে একবার তার মূলে ভাঙন ধরলে আব কোন কিছুতেই তাকে টিকিয়ে রাখা যায় না। হুড়মুড় করে শেষ পর্যন্ত নিজের ঘাড়ের ওপরেই ভেঙে পড়ে। না কিরীটীবাবু, আর সেখানে কোনদিন ফিরব না বলে স্থির করেই এক বস্ত্রে বেরিয়ে এসেছি—

কিন্তু কোথায় যাবেন?

কোথায় যাব জানি না, কিন্তু সেদিন যে দুশ্চিন্তাটা নবজাত এক শিশুর মা হয়ে সরমার বুকের মধ্যে ছিল আজ তো সে দুশ্চিন্তাটা আর তার বুকের মধ্যে নেই। আজ আর ভয় কি—যেদিকে দু'চোখ যায় চলে যাব।

অকস্মাৎ যেন সরমার মধ্যে একটা আমূল পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। হঠাৎ একটা পাথর যেন ফেটে চৌচির হয়ে গিয়েছে। এক নিমেষে সমস্ত কুণ্ঠা সমস্ত দ্বিধার অবসান ঘটেছে।

বিস্মিত দৃষ্টিতে দরজার মধ্যবর্তী ফাঁক দিয়ে দেখছিলাম সরমার মুখের দিকে তাকিয়ে।

কিন্তু সরমা দেবী, আপনি আমাকে কথা দিয়েছিলেন এ ব্যাপারে একটা হেস্তনেস্ত না হওয়া পর্যন্ত আপনি ও-বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাবেন না! কিরীটী এবারে বললে।

হ্যাঁ দিয়েছিলাম, মনে আছে। আর সেটাই তো এখানে এত রাত্রে আসবার আমার দ্বিতীয় কারণ কিরীটীবাবু!

শান্ত মৃদু কণ্ঠে কথাগুলো বললেন সরমা দেবী এবং যাবার জন্যই বোধ করি অতঃপর উঠে দাঁড়ালেন, আমি তা হলে এবারে যাই!

না সরমা দেবী, তা হয় না। আমাকে কথা দিয়ে আপনি কথা রেখেছেন বলে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কিন্তু আজ আর একজনকে না জানিয়েও তো কোথাও এভাবে চলে যাবার আপনার অধিকার নেই।

কিরীটীবাবু!

আপনার মেয়ে শকুন্তলা—তার প্রতি কি আর আপনার কোন কর্তব্যই অবশিষ্ট নেই? তাকে আপনি কার কাছে রেখে যাচ্ছেন?

আমি জানি কিরীটীবাবু, সে দুষ্মন্তকে ভালবাসে আর দুষ্মন্তও তাকে ভালবাসে—দুষ্মন্তই তাকে আশ্রয় দেবে। বরং আমি থাকলেই তার সেই নিশ্চিন্ত আশ্রয়টা ভেঙে যাবার সম্ভাবনা আছে—

তা আছে কিনা জানি না, তবে রাঘব সরকারের কথাটাই বা ভুলে যাচ্ছেন কেন?

রাঘব!

হ্যাঁ—

মৃদু অথচ অতিশয় করুণ হাসির একটা আভাস যেন সরমার ওষ্ঠপ্রান্তে জেগে ওঠে। এবং হাসিটা মিলিয়ে যাবার পরক্ষণেই সমস্ত মুখখানি যেন কঠিন হয়ে ওঠে।

সরমা দেবী!

নিশ্চিন্ত থাকুন, সে এখনো জানে না যে তার মৃত্যুবাণ আমারই হাতে রয়েছে!

মৃত্যুবাণ?

হ্যাঁ। আমি এবারে যাই—

কিন্তু সরমা দেবী, একটা কথা—আপনাকে হয়তো আমার প্রয়োজন হবে এবং অন্য কোন কারণে নয়—আপনার মেয়ে শকুন্তলাকে বাঁচানোর জন্যই, তখন কোথায় আমি আপনাকে পাব?

আমি রামচরণের সঙ্গেই থাকব।

রামচরণ!

হ্যাঁ, আমার ধর্ম-ছেলে। আমি তার ধর্ম-মা।

আপনি তা হলে এখন তার দেশের বাড়িতেই যাচ্ছেন?

না, বসিরহাটে তার ছেলে, ছেলের বৌ আছে—সেখানেই আপাততঃ কিছুদিন থাকব আমি। তা হলে চলি—

চলুন, আপনাকে নীচে পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসি।

সরমা আগে ও পিছনে কিরীটী বের হয়ে গেল ঘর থেকে।

আমরাও পুনরায় ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করলাম।

একটু আগে ঘরের মধ্যে যেন একটা নাটক অভিনীত হয়ে গিয়েছে এবং তার সুরটা ঘরের বাতাসে যেন এখনো ছড়িয়ে রয়েছে।

আঠারো

সরমাকে বিদায় দিয়ে কিরীটী পুনরায় ঘরে ফিরে এল।

ক্ষণপূর্বে নাটকের দর্শক ও শ্রোতা আমরা তখন যেন বিমূঢ় নির্বাক হয়ে ঘরের মধ্যে বসে আছি।

কিরীটী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে, কিন্তু বসল না—পূর্বেরই সেই খোলা জানালাটার সামনে গিয়ে বাইরের অন্ধকারে দৃষ্টি মেলে দাঁড়িয়ে রইল। তারপরও কিছুক্ষণ একটা যেন জমাট স্তব্ধতার মধ্যেই আমাদের কেটে গেল।

মনে হচ্ছিল কারোর যেন কিছু আর বলবার নেই। সবারই কথা যেন শেষ হয়ে গিয়েছে। নাটক শেষ হয়ে গিয়েছে, যবনিকা নেমে এসেছে, শূন্য প্রেক্ষাগৃহে যেন ক'জন আমরা বসে আছি।

প্রথমে সেই স্তব্ধতা ভঙ্গ করে কৃষ্ণাই কথা বললে, সরমা চলে গেল?

কৃষ্ণার ডাকে কিরীটী ওর দিকে ফিরে তাকাল, হ্যাঁ, চলে গেল।

আচ্ছা একটা কথা আমি বুঝতে পারছি না এখনো—

কি?

শকুন্তলার বাপ তা হলে কে?

জন্ম যখন তার হয়েছে—সরমা যখন তার মা—বাপও তার একজন আছে বৈকি কৃষ্ণা।

কিন্তু কথাটা ওকে তুমি জিজ্ঞাসা করলে না কেন?

ছিঃ কৃষ্ণা! তাই কি পারি? মেয়েমানুষ হয়েও কি বুঝতে পারো না, মেয়েমানুষের জীবনে এ কত বড় লজ্জা! তাছাড়া হৃদয়হীনতার কি একটা সীমা নেই!

কিন্তু—

না। তাছাড়া তোমাদের চোখ আর মন থাকলে শকুন্তলার বাপের সংবাদটা পেতে তোমাদেরও দেরি হত না। যাক সে কথা। তার জন্ম-বৃত্তান্তটা যখন প্রকাশ হয়েছে, সে কথাটাও অপ্রকাশ থাকবে না। কিন্তু শিবেনবাবু—

সহসা শিবেনের দিকে ফিরে তাকিয়ে এবার কিরীটী বললে, দ্বিতীয় ফাঁকটাও আমার ভরাট হয়ে গিয়েছে। তাই বলছিলাম কাল প্রত্যুষে সরমার গৃহত্যাগের ব্যাপারটা জানাজানি হবার পূর্বেই আমাদের যা করবার করতে হবে—

কি?

দেওয়াল-ঘড়ির দিকে তাকাল কিরীটী, রাত পৌনে দুটো এখন, ঠিক পৌনে পাঁচটায়—মানে আর তিন ঘণ্টা পরেই আমরা বের হয়ে পড়ব। আপনাকে কালকের জন্য যেমন যেমন বলেছিলাম ফোনে তেমন তেমন ব্যবস্থা সব করে রেখে দিয়েছেন তো?

হ্যাঁ, কিন্তু শকুন্তলা—তাকে কি ছেড়ে দেব?

পাগল হয়েছেন! এখন তাকে ছেড়ে দিলে তাকে বাঁচাতে পারবেন না—

বাঁচাতে পারব না?

না। কারণ সে-ই যে একমাত্র সাক্ষী সেদিন রাত্রের নৃশংস সেই হত্যার ব্যাপারের!

বলেন কি? সে তা হলে সব জানে?

জানে। তবে—

তবে?

এইটুকুই কেবল জানে না—লোকটা কে—আসলে কে সে, কারণ ঘর অন্ধকার ছিল—

শকুন্তলা তা হলে জানে!

জানবেই তো, সে যে তখন রঞ্জনের ঘরে ছিল—

রঞ্জনের ঘরে!

হ্যাঁ। অথচ রঞ্জন সেটা ঘুণাক্ষরেও সেদিন যেমন জানতে পারেনি, তেমনি আজও জানে না।

তবে কি—সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে শিবেন তাকালেন কিরীটীর মুখের দিকে।

কিন্তু কিরীটী যেন পরমুহূর্তেই শিবেনের সমস্ত উৎসাহ দপ্ করে একটা ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিল। একটা হাই তুলতে তুলতে বললে, এখনো হাতে প্রায় ঘণ্টা-তিনেক সময় আছে—বড্ড ঘুম পেয়েছে—আমি একটু ঘুমিয়ে নিই।

কথাটা বলে এবং কাউকে কথা বলার দ্বিতীয় অবকাশমাত্রও না দিয়ে সোজা ঐ ঘর থেকে বের হয়ে কিরীটী নিজের শয়নঘরের দিকে পা বাড়াল।

আমরা তিনটি প্রাণী যেন একটা দুর্বোধ্য প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে বিমূঢ় বিহ্বল হয়ে বসে রইলাম। বিশেষ করে শিবেন সোম।

প্রথমে কথা বললেন শিবেন সোমই, সুব্রতবাবু, কিছুই তো বুঝতে পারলাম না!

আমার মনের অন্ধকারটা ততক্ষণে কাটতে শুরু হয়েছে, অন্ধকারে বেশ আলো দেখতে পাচ্ছি।

আমি ওঁর মুখের দিকে তাকালাম, কিছু বলছিলেন মিঃ সোম?

বলছিলাম, তা হলে কি হল? কিছু বুঝতে পারছেন আপনি?

আমার কাছ থেকে আর কেন শুনবেন—হয়তো বলতে গিয়ে জট পাকিয়ে ফেলব, ও তো বলেই গেল ঘণ্টা-তিনেক বাদেই বোধ হয় সব জানতে পারবেন—কিন্তু কৃষ্ণা, এবারে একটু চা হলে মন্দ হত না বোধ হয়!

কৃষ্ণা ঘর থেকে উঠে গেল নিঃশব্দে।

পৌনে পাঁচটা নয়, বেরুতে আমাদের প্রায় পাঁচটা হয়ে গেল।

কিরীটীর গাড়িতে চেপেই আমরা চলেছিলাম আমাদের গন্তব্যস্থলে। হীরা সিং গাড়ি চালাচ্ছিল।

শিবেন সোম আর নিজেকে চেপে রাখতে পারেন না, প্রশ্ন করেন, কিন্তু কোথায় আমরা যাচ্ছি কিরীটীবাবু? বেলগাছিয়ায় কি?

না। কিরীটী মৃদুকণ্ঠে বলে।

তবে কোথায়?

বিনায়ক সেনের ওখানে, শ্যামবাজারে।

সেখানে—সেখানে কেন?

গেলেই জানতে পারবেন।

যাই হোক, বিনায়ক সেনের গৃহে, রামধন মিত্র লেনে, যখন গিয়ে আমরা পৌঁছলাম সকাল সাড়ে পাঁচটা। সবে ভোর হয়েছে বলা চলে।

সুন্দর তিনতলা সাদা রঙের বাড়িটি। দারোয়ান সবে তখন গেট খুলেছে। গাড়ি নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে দারোয়ানকে দিয়েই ভিতরে সংবাদ পাঠানো হল।

একজন ভৃত্য এসে আমাদের বাইরের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসতে দিল। শুনলাম বিনায়ক সেন তখনো ঘুম থেকে ওঠেননি। একটু বেলা করেই নাকি ওঠেন।

ভৃত্যকে বলা হল বাবুকে তুলে দেবার জন্য। কথাটা কিরীটীই বললে।

ভৃত্য প্রথমে বোধ হয় একটু আপত্তি জানাবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু কিরীটীর মুখের দিকে চেয়ে শেষ পর্যন্ত কি জানি কেন সে আর 'না' করতে পারল না। ভিতরে চলে গেল।

এবং মিনিট পনেরোর মধ্যেই একটা স্লিপিং গাউন গায়ে চাপিয়ে ঘাসের চটি পায়ে ঘরে এসে প্রবেশ করলেন বিনায়ক সেন।

ঘরে ঢুকেই যেন থমকে দাঁড়ালেন। কয়েকটা মুহূর্ত যেন বোবা। তারপর ক্ষীণকণ্ঠে বললেন কেবল, আপনারা!

হ্যাঁ মিঃ সেন, বসুন। বলা বাহুল্য কিরীটীই কথা বললে, এবং কেন যে এ সময় এসেছি তাও নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন—

একটা সোফায় মুখোমুখি বসতে বসতে বিনায়ক সেন বললেন, না। কিন্তু কি ব্যাপার বলুন তো?

কিন্তু বোঝা উচিত ছিল আপনার অন্তত মিঃ সেন!

বোঝা উচিত ছিল?

হ্যাঁ। শুনুন মিঃ সেন, আপনি বোধ হয় শুনেছেন—

কি?

শকুন্তলা অ্যারেস্টেড্!

সে কি! চমকে ওঠেন বিনায়ক সেন।

হ্যাঁ, তাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে—অথচ সে নির্দোষ—

আমি—আমি কি করে তা জানব?

সে কি কথা, নিজের সন্তানকে আপনি জানেন না—

কি বললেন? অকস্মাৎ যেন চম্‌কে উঠলাম কিরীটীর কথায়।

হ্যাঁ মিঃ সেন, সুনন্দা আমাদের সব বলেছে—

সুনন্দা!

হ্যাঁ সুনন্দা। যে আজো জীবিত আছে জানতে পেরে সেদিন সন্ধ্যায় তার সঙ্গে বিমলবাবুর গৃহে আপনি গোপনে দেখা করতে গিয়েছিলেন—

কি বলছেন আবোল-তাবোল সব আপনি কিরীটীবাবু?

সত্যকে আর গোপন করবার চেষ্টা বৃথা বিনায়কবাবু। সত্য সব প্রকাশ হয়ে পড়েছে। আপনার দুষ্কৃতি আর গোপন নেই। শান্ত মৃদু কণ্ঠে কিরীটী কথাগুলো বললে।

আমি—

কিন্তু আপনার নিজের আত্মজা শকুন্তলা জেনেও কি করে এত বড় অন্যায়টা করতে গিয়েছিলেন মিঃ সেন?

অন্যায়!

নিশ্চয়ই। আপনার মেয়ে শকুন্তলা দুষ্মন্তকে ভালবাসে জেনেও রাঘবের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে তার হাতে শকুন্তলাকে তুলে দেবার চেষ্টা করতে আপনার এতটুকু দ্বিধা হল না?

না না—

হ্যাঁ। আর কেন যে আপনি ঐ ঘৃণ্য কাজ করতে দ্বিধা করেননি তাও আমি জানি। ফিল্ম বিজনেস-এ আপনার গত কয় বছর ধরেই শোচনীয় অবস্থা চলেছে, তাই রাঘব সরকার জোচ্চুরি করে সিনথেটিক হীরা আসল হীরা বলে চালাচ্ছে জেনেও, সে আপনাকে ফাইনানসিয়ালি সাহায্য করছিল বলে তার বদলে শকুন্তলাকে সেই শয়তানটার হাতে তুলে দেবার ষড়যন্ত্রে আপনি লিপ্ত হয়েছিলেন। কারণ আপনি জানতেন আপনার বাল্যবন্ধু

অধ্যাপক বিমলবাবু গোপনে বিধবা কুলত্যাগিনী সুনন্দা অর্থাৎ সরমাকে বিবাহ করেছিল সেই কথাটা প্রকাশ হয়ে পড়লে বিমলবাবু সমাজে আর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবেন না। তাই তার পক্ষে বাধা দেওয়াও সম্ভব নয়—

না না—

হ্যাঁ, তাই। বলুন যা বলছি তা মিথ্যা?

হ্যাঁ মিথ্যা, মিথ্যা—কোথায়—কোথায় সুনন্দা? এক্ষুনি তার কাছে আমি যাব—

সে এখন আপনার নাগালের বাইরে—

নাগালের বাইরে!

হ্যাঁ, আমিই তাকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে দিয়েছি। ছি ছি বিনায়কবাবু, আপনি এত নীচ—এত ছোট মন আপনার! নিজের ঔরসজাত সন্তানের এত বড় সর্বনাশ করতে আপনি উদ্যত হয়েছিলেন? টাকাটাই কি দুনিয়ায় সব? কিন্তু কার জন্য বলুন তো আপনার এই সম্পত্তি—এই অন্ধ অর্থের নেশা? সংসারে তো আপনার নিজের বলতে আর কেউ নেই—

কোথায়—কোথায় সুনন্দা? নিয়ে চলুন আমাকে তার কাছে—নিয়ে চলুন, আমি তাকে খুঁজেছি—

তাঁর কাছে গিয়ে আজ আর আপনার কোন লাভ নেই মিঃ সেন!

মিঃ রায়?

হ্যাঁ, তাঁর কাছে আজ আপনি মৃত। ডেড্। যে ভালবাসার ওপরে বিশ্বাস রেখে একদিন সে আপনারই হাত ধরে নিশ্চিত আশ্রয় ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিল, সে ভালবাসা তো আপনি একদিন গলা টিপে শেষ করে দিয়েছেন—

বিনায়ক সেন আর একটি কথাও বলতে পারলেন না। যেন পাথরের মত বসে রইলেন। এবং অনেকক্ষণ পরে ধীরে ধীরে মাথা তুলে বললেন, শকুন্তলার কাছে আমি যাব।

না, সে-চেষ্টাও আর করবেন না মিঃ সেন। সে যে পরিচয় তার জানে সেই পরিচয় নিয়েই সে থাক। কোন ক্ষতি হবে না তার ঐ কুৎসিত সত্যটা আজ আর না জানলেও।

বিনায়ক সেন চুপ করে রইলেন।

হ্যাঁ, যে পাপের জন্য সে দায়ী নয়—সে পাপ-স্পর্শ তার জীবন থেকে দূরেই থাক। কোন ক্ষতি হবে না তাতে করে তার। জীবনে যে প্রতিষ্ঠা আর পরিচয় সে আজ পেয়েছে সেটাই থাক তার জীবনের সত্য হয়ে।

বিনায়ক সেন বসে রইলেন। একটি শব্দও আর মুখ থেকে তাঁর বেরুল না।

কিরীটীই আমাদের চোখের ইঙ্গিতে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য বলে নিজে দরজার দিকে অগ্রসর হল।

আমরা তাকে অনুসরণ করলাম।

উনিশ

আবার সকলে এসে আমরা গাড়িতে উঠে বসলাম।

ঘণ্টা-দুয়েক আগেকার অভিযানের সমস্ত উত্তেজনা তখন যেন একেবারে ম্লান হয়ে গিয়েছে। সমস্ত মন জুড়ে যেন কেমন একটা বেদনাতুর অবসন্নতা। কারো কোন কথা বলবার আর যেন উৎসাহমাত্রও তখন আর আমাদের মধ্যে অবশিষ্ট নেই।

কিরীটীর নির্দেশমত তখন আবার তার বাড়ির দিকেই গাড়ি চলতে শুরু করেছে।

ভেবেছিলাম অতঃপর কিরীটী বুঝি আর কোন কথাই বলবে না। কিন্তু কিরীটীই কথা বললে।

শিবেনবাবু, আমার কাজ ভাই শেষ হয়েছে। এবারে যা করবার আপনিই করুন।

কিন্তু কিরীটীবাবু, আমি তো এখনো কিছুই বুঝতে পারছি না—

কি বুঝতে পারছেন না?

কে তা হলে অধ্যাপককে হত্যা করল আর কেনই বা হত্যা করল?

এখনো বুঝতে পারেননি?

না।

কিন্তু কেন বলুন তো? সব কিছু কি এখনো আপনার কাছে প্রাঞ্জল হয়ে যায়নি?

না ভাই। সত্যি কথা বলতে কি, আরো যেন সব জট পাকিয়ে গেল!

জট পাকালো নয়—বরং জট সব খুলে গেল!

খুলে গেল?

তাই নয় কি?

কিন্তু—

শুনুন শিবেনবাবু, অধ্যাপক বিমল চৌধুরীর হত্যার ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত একটা পুরোপুরি ট্র্যাজেডি অফ এররস যাকে বলে তাতেই পর্যবসিত হয়েছে—

ট্র্যাজেডি অফ এররস!

হ্যাঁ। আর এও বলে দিচ্ছি—বিনায়ক সেন, রঞ্জন বোস, সরমা ও শকুন্তলার মধ্যেই একজন হত্যাকারী।

বলেন কি—এদের চারজনের মধ্যে একজন?

হ্যাঁ, ওয়ান অফ দেম! কিন্তু আর একটি কথাও বেশী বলব না। হত্যার কারণটাও আপনারা ইতিপূর্বেই জেনেছেন, অতএব সে-সম্পর্কেও আর আলোচনা নিরর্থক।

কিন্তু কিরীটীবাবু—

না, আপনারা না পারেন যারা এই কাহিনী শুনবে বা পড়বে তাদেরই ওপর না হয় ছেড়ে দিন—তারাই খুঁজে বের করুক কে হত্যাকারী!

কিরীটীবাবু!

ভয় নেই, হত্যাকারী পালাবে না। কারণ তার পালাবার পথ নেই—অতএব সেদিক দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন আপনি।

পরিশিষ্ট

কুড়ি

সত্যিই সেদিন বিনায়ক সেনের গৃহ থেকে নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করে, পরে সমস্ত দিন কিরীটী তার বসবার ঘরে এক প্যাকেট তাস নিয়ে সর্বক্ষণ একা একা আপন মনে নিঃশব্দে পেসেন্স খেলেই কাটিয়ে দিল।

কেবল মধ্যে মধ্যে জংলীকে চায়ের আদেশ দেওয়া ব্যতীত একটি কথাও বললে না।

সন্ধ্যার দিকে এসে কৃষ্ণার কাছ থেকেই ব্যাপারটা অবগত হলাম।

আমি গৃহে পা দিতেই কৃষ্ণা এসে শুধাল, কি ব্যাপার ঠাকুরপো, ভদ্রলোক হঠাৎ এত চুপচাপ কেন? ফেরা অবধি কারো সঙ্গে একটা কথা পর্যন্ত বলছে না!

মৃদু হেসে সকালবেলাকার নাটকীয় ব্যাপারটা খুলে বললাম।

সব শুনে কৃষ্ণা বললে, হুঁ, এই ব্যাপার তা হলে? এদিকে বেচারী শিবেনবাবু ফোনের পর ফোন করছেন।

ব্যাপারটা একটা লঘু রহস্য। ভদ্রলোক ধরতে পারেননি। হেসে বললাম।

যাই হোক ঘরে এসে প্রবেশ করলাম। কিন্তু কিরীটী আমার দিকে ফিরেও তাকাল না। যেমন আপন মনে পেসেন্স খেলছিল তেমনি খেলতেই লাগল।

আমিও তাকে কোনরূপ সম্বোধন করে বিরক্ত না করে একটা সোফায় বসে একটি রহস্য-কাহিনীতে মনোনিবেশ করলাম।

আরো ঘণ্টা দুই অতিবাহিত হয়ে গেল। এবং রাত আটটা নাগাদ শিবেন সোম আবার এসে হাজির।

আমার পাশে বসে ফিস ফিস করে শুধালেন, কি হল সুব্রতবাবু?

কিসের কি?

কিছু জানতে পারলেন?

জানবার কথা তো ওর নয়, জানবার কথা যে আপনার শিবেনবাবু! হঠাৎ কিরীটী মুখ তুলেই তাস সাজাতে সাজাতে কথাটা বললে।

কিন্তু এদিকে যে আর এক জটিল সমস্যা দেখা দিয়েছে আজই দ্বিপ্রহরে কিরীটীবাবু! তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন শিবেন সোম।

মুখ না তুলেই প্রশ্ন করে কিরীটী, জটিল সমস্যা!

তাছাড়া আর কি? শকুন্তলাকে সকালবেলা থানাতে গিয়েই ছেড়ে দিয়েছিলাম—

ও, তা হলে আপনার ধারণা শকুন্তলা হত্যা করেননি? কিরীটী শুধায়।

না, অন্তত এটুকু বুঝতে পেরেছি।

কেন বলুন তো সে হত্যাকারী নয়?

দুটো কারণে সে হত্যা করেনি বা করতে পারে না বলেই আমার মনে হয় কিরীটীবাবু।

যথা!

হয়তো আমার ভুল হতে পারে—

না, না,—ভুল হয়েছেই যে ভাবছেন কেন? বলুন না?

প্রথমতঃ যাকে নিজের কাকা বলে এতকাল পর্যন্ত জেনে এসেছে—তা সে মিথ্যা জানাই হোক বা সত্য জানাই হোক এবং যার কাছ থেকে এমন অকুণ্ঠ স্নেহ ও ভালবাসা পেয়ে এসেছে তাকে সে হত্যা করবে এ যেন ভাবাই যায় না!

আর দ্বিতীয় কারণ?

অধ্যাপককে যেভাবে হত্যা করা হয়েছে ক্লোরোফরম দিয়ে প্রথমে অজ্ঞান করে, তারপর ডিজিট্যালিন প্রয়োগে—সে কাজ তার মত এক নারীর পক্ষে শুধু অসম্ভব নয়, অবিশ্বাস্য বলেই মনে হয় না কি?

ঠিক।

সেই কারণেই তাকে আমি আজ সকালেই মুক্তি দিয়েছিলাম।

কিন্তু তবু—

জানি মিঃ রায়, সে কথাটাও যে আমি ভাবিনি তা নয়। আপনি হয়তো বলবেন রাঘব সরকারের সঙ্গে বিবাহের ব্যাপারে ক্রুদ্ধ হয়ে শেষ পর্যন্ত অনন্যোপায়—মুক্তির কোন পথ না দেখতে পেয়ে সে অন্য কারো সাহায্যে বা প্ররোচনায় নিজে হয়তো অধ্যাপককে হত্যা না করলেও হত্যার ব্যাপারে সাহায্যকারিণী হওয়াটা অস্বাভাবিক ছিল না তার এবং এমন যে আগে কখনো ঘটেনি তাও নয়। নারী জাতি কোন কারণে হিংস্র হয়ে উঠলে তারা যে কি না করতে পারে সেটাও চিন্তার বিষয় ছিল, কিন্তু—

চমৎকার—চমৎকার অ্যানালিসিস আপনার হয়েছে শিবেনবাবু! আমার মনে হয় শকুন্তলার ব্যাপারে অন্তত আপনি সেণ্ট পারসেণ্ট কারেক্ট···রাইট! কিন্তু হোয়াট অ্যাবাউট আদার্স?

তারপর ধরুন সুনন্দা বা সরমা দেবী!

বলুন?

তাকেও আমি সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দিয়েছি।

কেন?

প্রথমতঃ সুনন্দার প্রতি অধ্যাপকের গভীর ভালবাসা বা প্রেম যা তাকে শুধু তার চরম দুর্দিনে আশ্রয়ই কেবল দেয়নি, দিয়েছিল পরিচয় সম্মান ও নিশ্চিন্ত আশ্বাস এবং যে তার আত্মজাকে নিজের ভাইঝি বলে সকলের কাছে পরিচয় দিয়েছে, তাকেই সুনন্দা হত্যা করবে ব্যাপারটা চিন্তা করাও বাতুলতা ছাড়া আর কি বলুন!

হুঁ, তা বটে। কিন্তু—

শুনুন, শেষ হয়নি বক্তব্য আমার—সুনন্দাও নারী—শকুন্তলার মত তার পক্ষেও ঐভাবে অধ্যাপককে হত্যা করা একপ্রকার অসম্ভব নয় কি!

তা বটে! তবু—

জানি তবু হয়তো আপনি বলবেন, দুষ্মন্তের সঙ্গে বিয়ে না দিয়ে রাঘব সরকারের সঙ্গে শকুন্তলার বিয়ের জেদাজেদির জন্য সরমা হয়তো নিষ্ফল হয়ে শেষ পর্যন্ত ঐভাবে অধ্যাপককে হত্যা করতে পারত। কিন্তু যার কাছে সে এতখানি কৃতজ্ঞ তাকে সে মেয়েমানুষ হয়ে অমন নৃশংসভাবে হত্যা করবে আর যে-ই ভাবুক আমি কিন্তু ভাবতে পারলাম না।

উঁহু, আইনের প্রতিভূ হয়ে আপনার ঐ দুর্বলতা তো শোভা পায় না শিবেনবাবু! কিরীটী বলে ওঠে।

কিন্তু আইন যারা গড়েছে একদিন তারা শুধু মানুষই নয়, মানুষের দিকে তাকিয়েই তাদের আইন গড়তে হয়েছিল। আইন স্বেচ্ছাচারিতাও নয়—অবিশ্বাস্যও কিছু নয়।

কিরীটী এবারে মৃদু হেসে বললে, বেশ, মেনে নিলাম সুনন্দার নির্দোষিতার কথাও—তা হলে বাকি থাকছেন দুজন!

হ্যাঁ, বিনায়ক সেন ও রঞ্জন বোস। এদের মধ্যে হত্যা করা কারো পক্ষেই অসাধ্য কিছু নয়। এদের দিক থেকে হত্যার কারণও যথেষ্ট আছে বা ছিল। এবং এদের মধ্যে একজনের পরিচয়

আমরা যতটা সংগ্রহ করতে পেরেছি অন্যজনের বেলায় ততটা পারিনি। আমি বলতে চাই রঞ্জনবাবুর কথা।

সে কি, রঞ্জনবাবুর যথেষ্ট পরিচয়ও তো আমরা পেয়েছি!

কেমন করে? তার অতীত সম্পর্কে তো এখনো কিছুই আমরা জানি না।

জানি বৈকি। হেড কোয়ার্টারে খোঁজ নিলেই আপনি জানতে পারতেন।

মানে?

আপনি হেড কোয়ার্টারের থ্রু দিয়ে যে মেসেজ পাঠিয়েছিলেন মালয়ে, পরশু রাত্রেই তার কি জবাব এসেছে তা জানেন না?

কই না! আমি তো কিছু শুনিনি!

ডি. সি.-ই আমাকে ফোনে জানিয়েছেন আজ সকালে। মালয় সম্পর্কে সে যা বলেছিল মোটামুটি তা ঠিকই।

তা হলে—

কি, তা হলে?

রঞ্জনবাবুই সত্যি সত্যি তা হলে বিমলবাবুর যাবতীয় সম্পত্তির বর্তমানে সত্যিকারের একমাত্র উত্তরাধিকারী!

আইন তাই বলে।

তবে তো পেয়ে গিয়েছি! উল্লাসে বলে ওঠেন হঠাৎ শিবেন সোম।

পেয়েছেন?

হ্যাঁ, হ্যাঁ—সে তা হলে—সে-ই হত্যা করেছে সেরাত্রে অধ্যাপককে!

অসম্ভব নয় কিছু। কিন্তু প্রমাণ কি তার?

প্রমাণ?

হ্যাঁ, হাউ উড ইউ প্রুভ দ্যাট? ভুলবেন না শিবেনবাবু, তিনটি মারাত্মক ব্যাপারের এখনো কোন মীমাংসাই করতে পারেননি বন্ধু!

তিনটি মারাত্মক ব্যাপার?

হ্যাঁ। প্রথমতঃ অধ্যাপকের ঘরের ভাঙা আরামকেদারাটা—কি করে ভাঙল, কে ভাঙল এবং কেন ভাঙল?

কি বলছেন কিরীটীবাবু!

ঠিকই বলছি। সেটা বর্তমান হত্যা-রহস্য মীমাংসার মূলে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপার এবং দ্বিতীয়তঃ—

বলুন?

শকুন্তলার হাতের অভিজ্ঞানটি—মানে আংটিটা!

আংটি?

হ্যাঁ, ভুলবেন না আংটি স্বেচ্ছায় হাতে না পরলে কেউ কারো হাতে জোর করে যেমন পরাতে পারে না, তেমনি মনের মধ্যে স্বীকৃতি না থাকলে কারো অনুরোধেই বিবাহের প্রাক্-অভিজ্ঞান হিসাবে কেউ নিজের হাতে আংটি পরে না! এবং তৃতীয় হচ্ছে—

কি?

হত্যার আসল কারণটা কি ছিল? অথ বিবাহঘটিত না অর্থম অনর্থম? শেষ মাইলস্টোন-এ পৌঁছবার পূর্বে ঐ তিনটি পয়েন্ট নিজের কাছে নিজে ক্লিয়ার করে নিতে হবে!

শিবেন সোম একেবারে চুপ।

একুশ

শুধু শিবেন সোমই কেন, আমিও যেন বোবা হয়ে যাই। কি বলব বা অতঃপর কি বলা উচিত বুঝে উঠতে পারি না।

হঠাৎ স্তব্ধতা ভঙ্গ করে কিরীটী আবার কথা বললে, কিন্তু একটু আগে না আপনি কি জটিল এক সমস্যার কথা বলছিলেন শিবেনবাবু!

জটিল সমস্যা? হ্যাঁ—সকাল থেকে এদিকে রঞ্জনবাবু—

কি? কি হল তার আবার?

সে উধাও!

বলেন কি? সঙ্গে সঙ্গে কথাটা বলতে বলতে যেন কিরীটী সোফার উপরে সোজা হয়ে বসে।

হ্যাঁ, সকালবেলা থেকেই তার কোন পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না।

কেন—কেন আপনি এতক্ষণ এ-কথাটা আমাকে বলেননি? সঙ্গে সঙ্গে সোফা থেকে উঠে কিরীটী সোজা ঘরের কোণে রক্ষিত ত্রিপয়ের উপরে ফোনের সামনে গিয়ে দাঁড়াল এবং রিসিভারটা তুলে ডায়েল শুরু করে, হ্যালো, ডি. সি. মিঃ সিন্‌হাকে দিন—

অতঃপর শুনতে লাগলাম ফোনে ডি. সি.-কে রঞ্জনের নিখুঁত চেহারার বর্ণনা দিয়ে সর্বত্র রেলওয়ে স্টেশনে স্টেশনে তাকে খোঁজ করবার জন্য অবিলম্বে জরুরী মেসেজ পাঠাবার ব্যবস্থা এবং ফোন শেষ করে ফিরে এসে বললে, রাত এখন পৌনে দশটা—চলুন, আর দেরি নয় শিবেনবাবু—এখুনি আমাদের একবার বেলগাছিয়ায় অধ্যাপক-ভবনে যেতে হবে!

দশ মিনিটের মধ্যে আমরা শিবেনবাবুর গাড়িতে করেই বেলগাছিয়ার উদ্দেশে বের হয়ে পড়লাম। চলন্ত গাড়িতে বসে কিরীটী আবার বললে, বড্ড দেরি হয়ে গেল শিবেনবাবু। রঞ্জন বোস অনেকটা টাইম পেয়ে গেল—

কিন্তু আমিও চুপ করে বসে ছিলাম না কিরীটীবাবু, আমি দুপুরেই তার সন্ধানে চারিদিকে লোক পাঠিয়েছি—

আপনি পাঠিয়েছিলেন?

পাঠিয়েছি বৈকি!

উঃ, বড় একটা ভুল হয়ে গেল! হঠাৎ বলে কিরীটী।

ভুল?

হ্যাঁ, একটা জরুরী—অত্যন্ত জরুরী ফোন করার প্রয়োজন ছিল একজনকে, তাড়াতাড়িতে ভুল হয়ে গেল।

সামনেই তো সেন্ট্রাল টেলিগ্রাফ অফিস পড়বে, ঐখান থেকেই তো ফোন করতে পারেন!

ঠিক বলেছেন, ওখানে একটু দাঁড়াবেন।

পথেই একটু পরে সেন্ট্রাল টেলিগ্রাফ অফিসে গাড়ি থেকে নেমে কিরীটী ফোন করে মিনিট পনেরো বাদে আবার ফিরে এল গাড়িতে।

শিবেনবাবু শুধান, ফোন করলেন?

হ্যাঁ।

কাকে ফোন করলেন?

হত্যাকারীকে।

সে কি!

হ্যাঁ আমার অনুমান, যাকে আমি ফোন করলাম তিনিই আমাদের বিমল-হত্যারহস্যের মেঘনাদ!

কিন্তু—

আহা ব্যস্ত হচ্ছেন কেন। চক্ষুকর্ণের বিবাদ তো অনতিবিলম্বেই ভঞ্জন হবে—কিন্তু বড় চায়ের পিপাসা পাচ্ছে, কোথাও এক কাপ চা পাওয়া যায় না?

বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীটের মোড়ে একটা চীনা রেস্টুরেণ্ট আছে—সেখানে পেতে পারেন।

তা হলে চলুন সেই দিকেই। তৃষ্ণা নিয়ে কোন মহৎ কাজ করতে যাওয়া ভাল নয়। মনটা তাতে করে উৎক্ষিপ্ত থাকবে।

পথে চা-পান করে আমরা যখন বেলগাছিয়ার অধ্যাপক-ভবনে এসে পৌঁছলাম রাত তখন ঠিক এগারোটা বেজে দশ। যদিও গ্রীষ্মকালের রাত্রি এবং বেলগাছিয়া বৃহত্তর কলকাতারই বিশেষ একটি অংশ, তবু ঐদিকটা ইতিমধ্যে যেন শান্ত হয়ে এসেছে।

পানের দোকান ও ডাক্তারখানাগুলো ছাড়া রাস্তার সব দোকানই প্রায় দু'-পাশের বন্ধ হয়ে গিয়েছে। মানুষজনের চলাচলও কমে এসেছে।

লাস্ট ট্রাম চলে গিয়েছে, তবে ডিপোমুখী ট্রামগুলো তখনো এক এক করে ফিরে আসছে এবং সে-সব ট্রামে যাত্রী একপ্রকার নেই বললেও অত্যুক্তি হয় না।

কিরীটীর নির্দেশে অধ্যাপক-ভবনের কিছু দূরেই গাড়িটা দাঁড় করানো হয়েছিল। আমরা পায়ে হেঁটে ক'জন অধ্যাপক-ভবনের দিকে অগ্রসর হলাম। আকাশে সেরাত্রে একফালি চাঁদ ছিল, তারই মৃদু আলোয় প্রকৃতি যেন স্বপ্নময় মনে হয়।

হঠাৎ নজরে পড়ল অধ্যাপকের বাড়ির দোতলায় আলো জ্বলছে। নীচের তলাটা কিন্তু অন্ধকার।

গেট দিয়ে গিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলাম।

বারান্দা বরাবর গিয়েছি, অন্ধকারে প্রশ্ন ভেসে এল, কে?

জবাব দিল কিরীটী, রামচরণ, আমরা!

রায়বাবু? আসুন—রামচরণ এগিয়ে এল।

তুমি তা হলে এখানেই আছ রামচরণ?

আজ্ঞে, সেরাত্রে তো আপনি তাই বলেছিলেন। সকালেই ফিরে এসেছি আপনার আজ্ঞামত—

ঠিক করেছ। তোমার মা'র খবর কি রামচরণ?

আজ্ঞে তিনি আমার ভাইপোর ওখানেই আছেন।

এঁরা খোঁজেনি তোমার মাকে?

খুঁজেছিলেন। বোধ হয় পুলিসেও ছোটবাবু খবর দিয়েছেন।

রঞ্জনবাবু ফিরেছেন?

এই কিছুক্ষণ হল ফিরে এসেছেন—

ফিরেছেন?

আজ্ঞে।

কোথায়?

বোধ হয় নিজের ঘরে।

কিরীটী অতঃপর মুহূর্তকাল যেন কি ভাবল, তারপর বললে, তোমার দিদিমণি?

আপনি জানেন না, পুলিস তো তাঁকে ছেড়ে দিয়েছে—তিনিও বাড়িতেই আছেন।

রঞ্জনবাবু শুনেছেন সে-কথা?

বলতে পারি না।

আচ্ছা ঠিক আছে। আমরা একবার ওপরে যাব। তুমি এখানেই থাকো রামচরণ, যেমন তোমাকে আমি নজর রাখতে বলেছিলাম তেমনি নজর রাখো।

যে আজ্ঞে। রামচরণ বিনীত কণ্ঠে সম্মতি জানায়।

আমরা এগুতেই রামচরণ পিছন থেকে শুধায়, আলোটা সিঁড়ির জ্বেলে দেব রায়বাবু?

না না—আলোর দরকার নেই, আমরা অন্ধকারেই যেতে পারব।

রাস্তা থেকে যে আলোটা আমাদের চোখে পড়েছিল, সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে বুঝতে পারলাম সেটা শকুন্তলার ঘরের আলো।

কিরীটী সেই দিকেই অর্থাৎ শকুন্তলার ঘরের দিকেই অগ্রসর হচ্ছিল কিন্তু হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে আমরাও দাঁড়াতে বাধ্য হলাম।

ফিস ফিস করে কিরীটী পার্শ্বেই দণ্ডায়মান শিবেন সোমকে শুধাল, চাবিটা সঙ্গে আছে আপনার শিবেনবাবু?

কোন্ চাবি? শিবেন শুধায়।

অধ্যাপকের ঘরে যে তালা লাগিয়েছেন তার চাবি—

আছে।

আমাকে দিন।

শিবেন সোম পকেট থেকে চাবিটা বের করে কিরীটীর হাতে দিলেন।

সঙ্গে পিস্তল আছে আপনার?

আছে।

দিন আমাকে।

কোমরের বেল্ট-সংলগ্ন চামড়ার কেস থেকে পিস্তলটা খুলে অন্ধকারে কিরীটীর দিকে এগিয়ে দিলেন শিবেন সোম।

অতি সন্তর্পণে, প্রায় বলতে গেলে নিঃশব্দেই, কিরীটী হাতের চাবি দিয়ে অন্ধকারেই

অধ্যাপকের ঘরের তালাটা খুলে ফেলল এবং ধীরে ধীরে দরজাটা খুলে বাঁ হাত বাড়িয়ে দরজার একেবারে গায়ে সুইচ-বোর্ডের আলোর সুইচটা টিপে দিল।

দপ করে ঘরের আলোটা জ্বলে উঠল এবং কিরীটীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল—বজ্রকঠিন কণ্ঠস্বর, মিঃ সেন আপনার খেলা শেষ হয়েছে! উহুঁ, আমি জানি আপনার পকেটে কি—পকেটে হাত দেবার চেষ্টা করবেন না, আমার হাতের দিকে চেয়ে দেখুন—আমি প্রস্তুত হয়েই এসেছি।

সত্যি! ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমাদের সামনে বিনায়ক সেনই!

কিন্তু মুখে তাঁর আর কোন কথাই নেই। একেবারে যেন বোবা।

নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন তখনো মিঃ সেন অর্থাৎ বিনায়ক সেন কিরীটীর মুখের দিকে।

আবার কিরীটী বলে, yes, that's like a good boy! এবং একটু থেমে আমাকে সম্বোধন করে বলে, সুব্রত, মিঃ সেনের পকেট থেকে বস্তুটি নিয়ে এসে তোমার জিম্মায় রাখো। মারাত্মক বস্তুকে সাবধানে রাখাই ভাল—

সঙ্গে সঙ্গে আমি এগিয়ে গিয়ে বিনায়ক সেনের পকেট থেকে পিস্তলটা বের করে নিলাম।

দাও সুব্রত, শিবেনবাবুকে এবারে জিম্মা করে দাও ওটা।

পিস্তলটা অতঃপর আমি শিবেন সোমের হাতে তুলে দিলাম।

যাক, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। মনের মধ্যে একটা ধুকপুকুনি নিয়ে কথাবার্তা কি হয়! কিন্তু সত্যি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি মিঃ সেন, আপনি আমার ফোনের একটু আগের সতর্ক-বাণীটা সত্যি সত্যিই সিরিয়াসলি নিয়েছেন বলে!

বিনায়ক সেন কিন্তু পূর্ববৎ নির্বাক এবং দণ্ডায়মান।

কিরীটীর যেন সেদিকে কোন খেয়ালই নেই। সে বলেই চলে, বুঝতেই পারছেন মিঃ সেন, নেহাৎ অনন্যোপায় হয়েই শঠে শাঠ্যং নীতি মানে সামান্য ঐ চাতুরির আশ্রয়টুকু আমাকে নিতে হয়েছিল, অন্যথায় আপনার মত মহৎ ব্যক্তিকে এইভাবে রেড-হ্যাণ্ডেড ধরা স্বয়ং কিরীটী রায়েরও দুঃসাধ্য হত—কিন্তু আপনি দাঁড়িয়ে কেন—বসুন, প্লিজ বি সিটেড!

কিন্তু বিনায়ক সেন যেমন দাঁড়িয়ে ছিলেন তেমনিই দাঁড়িয়ে রইলেন। বসবার কোন ইচ্ছাই তাঁর প্রকাশ পেল না।

বাইশ

কিরীটী মৃদু হাসল, বসবেন না? কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকবেনই বা কতক্ষণ? আমার যে—

কিরীটীর কথাটা শেষ হল না, মধ্যবর্তী দ্বারপথে রঞ্জন বোস উঁকি দিল।

আরে রঞ্জনবাবু, আসুন আসুন—ঘরে আসুন!

রঞ্জন যেন একটু ইতস্তত করেই ঘরে প্রবেশ করল।

কি ব্যাপার কিরীটীবাবু? এত রাত্রে এসব কি?

কিরীটী রঞ্জনের প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে শিবেনের দিকে তাকিয়ে বললে, শিবেনবাবু, রঞ্জনবাবুর পকেটটাও একবার সার্চ করে নিন—নো রঞ্জনবাবু নো—দ্যাট্‌স ব্যাড! আমি প্রস্তুত হয়েই আছি—দেখছেন না হাতে আমার এটা কি! হ্যাঁ, দিয়ে দিন—

শিবেনবাবু রঞ্জনবাবুর পকেট থেকেও পিস্তলটা বের করে নিলেন।

ইয়েস, দ্যাট্‌স্ গুড! দ্যাট্‌স্ লাইক এ গুড বয়! নাউ বি সিটেড প্লিজ—কিরীটী হাসতে হাসতে বললে।

আকস্মিক ঘটনা-বিপর্যয়ে রঞ্জন বোসও যে বেশ একটু থতমত খেয়ে গেছে বুঝতে পারি।

রঞ্জনবাবু, কৌতূহল বড় বিশ্রী জিনিস! ধরা পড়লেন আপনি আপনার কৌতূহলের জন্যই—কিন্তু শিবেনবাবুর হাতে ধরা যখন পড়েছেন আর তো উপায় নেই—বসুন, না না—মিঃ সেনের অত কাছে নয়—একটু সরে দাঁড়ান—

রঞ্জন বিনায়ক সেনের কাছে এগিয়ে যাচ্ছিল, থেমে গেল।

মিঃ সেন, রঞ্জনবাবু—আপনারা দুজনেই উপস্থিত, এখন শকুন্তলা দেবী হলেই আমাদের কোরাম পূর্ণ হয়। শিবেনবাবু, পাশের ঘর থেকে শকুন্তলা দেবীকেও ডেকে আনুন।

শিবেন সোম সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

কিরীটী আমার মুখের দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বলে, কি ভাবছ সুব্রত, এমন চমৎকার মিলনান্ত নাটক বহুদিন দেখোনি, না? বিধাতা-পুরুষের মত নাট্যকার সত্যিই দুর্লভ হে! কলম তাঁর নিখুঁত—এমন চমৎকার ছন্দ-যতি-মিল, এমন টেম্পো, এমন স্পীড্, এমন আঙ্গিক সত্যিই মানুষের কল্পনারও বুঝি বাইরে! বলতে বলতেই শিবেন সোমের সঙ্গে শকুন্তলা ঘরে ঢুকল।

এই যে মিস চৌধুরী, আসুন—কিরীটীই আহ্বান জানাল ওকে।

কেমন যেন বিহ্বল দৃষ্টিতে ঘরের মধ্যে ঐ মুহূর্তে উপস্থিত সকলের দিকে একবার দৃষ্টিটা বুলিয়ে নিয়ে সর্বশেষে দৃষ্টিপাত করল শকুন্তলা কিরীটীর মুখের উপরে নিঃশব্দে।

বসুন মিস্ চৌধুরী, আমিই আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম—বসুন।

শকুন্তলা আবার ঘরের মধ্যে উপস্থিত সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে উপবেশন করল একটা চেয়ারে।

শকুন্তলার মুখের দিকে চেয়ে মনে হল যেন প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গিয়েছে ওর উপর দিয়ে। সমস্ত মুখে একটা দুঃসহ ক্লান্তি ও বিষণ্ণতার সুস্পষ্ট প্রকাশ। চোখের কোলে কালি, মাথার চুল বিস্রস্ত। পরে অবিশ্যি শিবেনবাবুর মুখেই শুনেছিলাম—তিনি যখন শকুন্তলার ঘরে গিয়ে প্রবেশ করেন, দেখেন সে আলো জ্বেলে ঘরের মধ্যে একটা চেয়ারে স্তব্ধ হয়ে বসেছিল।

এই ঘরের মধ্যেই মাত্র কয়েকদিন আগে এক সন্ধ্যারাত্রে অধ্যাপক বিমলবাবু নিহত হয়েছেন নিষ্ঠুরভাবে, কিরীটী বলতে লাগল, এবং যিনি বা যাঁরা তাঁকে হত্যা করেছেন তিনি বা তাঁরা যে কত বড় একটা ভুলের বশবর্তী হয়ে তাঁকে সেদিন হত্যা করেছিলেন সর্বাগ্রে আমি সেই কথাটাই বলব।

ভুল! শিবেনবাবু প্রশ্ন করেন।

হ্যাঁ ভুল, বলতে পারেন ট্র্যাজেডি অফ এররসও ব্যাপারটাকে।

কিরীটীর শেষের কথায় যেন স্পষ্ট মনে হল বিনায়ক সেন ঈষৎ চমকে কিরীটীর মুখের দিকে তাকালেন।

কিরীটীর কিন্তু ব্যাপারটা দৃষ্টি এড়ায়নি। সে মৃদু হেসে বলে, হ্যাঁ মিঃ সেন, যেগুলোর জন্যে আপনি এত কাণ্ড করেছেন—সেগুলো আসল বা রিয়াল জুয়েল্‌স্ নয়। সিন্‌থেটিক প্রডাক্টস্

—কেমিক্যালে প্রস্তুত জুয়েল্‌স্‌! এবং আপনি জানেন না, বর্তমানে পুলিসের কর্তৃপক্ষের সেটা আর অগোচর নেই। ব্যাপারটা ধরে ফেলেছে এবং আজই সন্ধ্যায় তারা ইকনমিক জুয়েলার্স রেড করে মালসমেত রাঘব সরকারকে অ্যারেস্ট করেছে। খুব সম্ভবতঃ এতক্ষণে হি ইজ আণ্ডার পুলিস-কাস্টডি! আর তা যদি নাও হয়ে থাকে এখনো, অন্ততঃ কালকের সংবাদপত্রে দেখবেন নিউজটা প্রকাশ হয়েছে—

শিবেন সোমই প্রথমে কথা বললেন, রাঘব সরকারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে মিঃ রায়? কিন্তু আমি তো—

না, আপনি জানেন না। আপনি কেন—একমাত্র এনফোর্সমেণ্ট ব্রাঞ্চ-এর ডি. সি. মিঃ সিনহা ও আমি ছাড়া এখনো কেউই ব্যাপারটা জানে না। আমারই ইচ্ছাক্রমে ব্যাপারটা গোপন রাখা হয়েছে। এবং গোপন রাখা হয়েছিল রঞ্জনবাবু ও বিনয়বাবুর জন্যই। যাকগে সে কথা, আমি এবারে আমার আসল কাহিনীতেই আসি।

কিরীটী বলতে লাগল ঃ হত্যার পশ্চাতে কোন একটি বিশেষ কার্যকরণ বা উদ্দেশ্য না থাকলে কখনই হত্যা সংঘটিত হয় না। অধ্যাপক বিমলবাবুর হত্যার পশ্চাতে তেমনি একটি বিশেষ কারণ ছিল এবং বলতে আমার দ্বিধা নেই যার মূলে—অর্থাৎ এও বলা যেতে পারে ঐ হত্যার বীজ একদিন অধ্যাপক নিজেই বা নিজ হাতেই রোপণ করেছিলেন। অবিশ্যি সেটা তাঁর জ্ঞাতে নয়—অজ্ঞাতেই।

কি রকম? প্রশ্ন করেন শিবেনবাবু কিরীটীকে।

কিরীটী বলে, কোথায় কি ভাবে সঠিক বলতে পারি না তবে এটা ঠিক যে রাঘব সরকার ও অধ্যাপক বিমল চৌধুরীর মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল। কারণ পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক বিমল চৌধুরীকে দিয়ে রাঘব সরকার ঐ সব সিন্‌থেটিক জহরৎ তৈরী করাতেন তাঁর নিজস্ব ল্যাবরেটারিতে। প্রথমটায় হয়তো অধ্যাপক ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে পারেননি, কিন্তু যখন পারলেন তখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে—নিজের অজ্ঞাতেই নিজের জালে তখন তিনি জড়িয়ে পড়েছেন। সে জালের বাঁধন ছিঁড়ে তখন তাঁর আর বের হয়ে আসার কোন রাস্তাই নেই। জগতের কাছে তাঁর সম্মান ও পরিচয়টাই তাঁর মুখ বন্ধ করে রেখেছিল, আর তারই পূর্ণ সুযোগ নিল শয়তান রাঘব সরকার। রাঘব সরকারের কনফেসন থেকেই অবিশ্যি এ কথাগুলো আমি বলছি। যাই হোক, সে তো নাটকের প্রথম দৃশ্য—

একটু থেমে কিরীটী আবার বলতে লাগল, এবারে নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্যে আসা যাক। বড়লোকের স্পয়েল্‌ড্‌ চাইল্ড আমাদের রঞ্জনবাবু ইতিমধ্যে সর্বস্ব হারিয়ে মালয় থেকে এসে হাজির হলেন এখানে তাঁর মামার আশ্রয়ে। রঞ্জনবাবুর ইচ্ছা ছিল তাঁর মামার ঘাড় ভেঙে আবার ব্যবসার নাম করে কিছুদিন মজা লুটবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাঁর, অধ্যাপকের নিজের ঐ ভাগ্নেটিকে চিনতে দেরি হয় নি—ফলে তিনি রঞ্জনের প্রস্তাবে সম্মত হতে পারেন না এবং অবশ্যম্ভাবী যা তাই ঘটে এক্ষেত্রেও। অতঃপর মামা-ভাগ্নের মধ্যে মন-কষাকষি শুরু হল। ইতিমধ্যে আর একটা ব্যাপার এ বাড়িতে ঘটেছিল। শয়তান রাঘব সরকারের নজর পড়েছিল শকুন্তলা দেবীর ওপরে। অধ্যাপক নিশ্চয় রাঘব সরকারের প্রস্তাবে চমকে উঠেছিলেন। এবং যদিচ রাঘব সরকারের প্রতি অধ্যাপক কোনদিনই বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন না, যেটা শকুন্তলা দেবীর জবানবন্দী থেকেই আমরা জানতে পারি, অধ্যাপকের পক্ষে তথাপি সরাসরি রাঘব সরকারের প্রস্তাবটা নাকচ করা সম্ভবপর হয় নি হয়ত—অবিশ্যি এটা আমার অনুমান,

অন্যথায় রাঘব সরকার অধ্যাপককে বিপদে ফেলতে পারে তার সঙ্গে তাঁর গোপন যোগাযোগের কথাটা অর্থাৎ ঐ সিন্‌থেটিক হীরের ব্যবসার কথাটা প্রকাশ করে দিয়ে। বেচারী অধ্যাপকের সাপের ছুঁচো গেলার মত অবস্থা হয়েছিল—মানে রাঘব সরকারের প্রস্তাবটা যেমন ফেলতে পারছিলেন না মন থেকে, তেমনি তাঁর অশেষ স্নেহের পাত্রী শকুন্তলা দেবীকেও সব জেনেশুনে ঐ শয়তান রাঘবের হাতে তুলে দিতে পারছিলেন না। এদিকে শকুন্তলা দেবীর অবস্থাটাও সঙ্কটজনক হয়ে ওঠে। তাঁর পক্ষেও যেমন অধ্যাপকের দিকটা অবহেলা করা সম্ভব-পর ছিল না, তেমনি দুষ্মন্তকেও অস্বীকার করাটা সম্ভবপর ছিল না—তাই না শকুন্তলা দেবী?

হ্যাঁ, শকুন্তলা মৃদুকণ্ঠে এতক্ষণে কথা বললে, রাঘব সরকার কাকাকে আল্‌টিমেটাম দিয়েছিল এই মাসের পনেরো তারিখের মধ্যেই অর্থাৎ কাকার জন্মতিথি উৎসবের দশ দিনের মধ্যেই বিবাহের ব্যাপারটা চুকিয়ে না দিলে কাকার পক্ষে ভাল হবে না—

আর তাই আপনি ভয় পেয়ে আমার কাছে ছুটে গিয়েছিলেন, তাই নয় কি?

হ্যাঁ। আমার আর—

অন্য উপায় ছিল না। তা বুঝতে পারছি, কারণ সিন্‌থেটিক হীরার ব্যাপারটাও আপনি কোনক্রমে জেনেছিলেন—ঠিক কিনা শকুন্তলা দেবী?

প্রশ্নটা করে কিরীটী শকুন্তলার মুখের দিকে তাকাল।

হ্যাঁ, আমি—

আপনি জানতেন।

হ্যাঁ।

শুধু আপনি কেন, আরো দুজন ইদানীং ব্যাপারটা কিছুদিন ধরে জানতে পেরেছিলেন মিস চৌধুরী।

আরো দুজন?

শকুন্তলা প্রশ্নটা করে কিরীটীর মুখের দিকে তাকাল।

হ্যাঁ আরো দুজন—মিঃ সেন আর ঐ রঞ্জনবাবু। আর তাইতেই তো গোলমালটা বিশ্রীভাবে সহসা পাকিয়ে উঠল।

কিরীটী বলতে বলতে আবার একটু থামল।

ঘরের মধ্যে সব ক'টি প্রাণীই যেন অখণ্ড মনোযোগের সঙ্গে কিরীটী-বর্ণিত কাহিনী শুনছিল।

তেইশ

কিরীটী বলতে লাগল, সেই কথাতেই এবার আসছি—অর্থাৎ বর্তমান নাটকের তৃতীয় দৃশ্যে। ব্যাপারটা অবিশ্যি রঞ্জনবাবুই প্রথমে জানতে পারেন, কারণ তিনি এ বাড়িতে আসা অবধি অধ্যাপকের পাশের ঘরটিতেই স্থান নিয়েছিলেন। রাঘব সরকার মধ্যে মধ্যে রাত্রের দিকে অধ্যাপকের সঙ্গে দেখা করতে আসত এবং অধ্যাপকের ঘরের মধ্যে বসেই তাদের মধ্যে আলোচনা হতো। কোন একদিন সেই রকম কোন আলোচনাই রাঘব ও অধ্যাপকের মধ্যে তাঁর কানে হয়ত যায় এবং ব্যাপারটা তিনি জানতে পারেন। যাই হোক ইতিমধ্যে আমার ধারণা

একটি ঘটনা ঘটে—বিনায়ক সেনের নিতান্ত সঙ্গীন অবস্থা চলছিল, চারিদিকে ধার-দেনা, অনন্যোপায়ে তিনি হয়তো রাঘব সরকারের কাছে গিয়ে কিছু অর্থের জন্য বলেন, যার ফলে মাত্র মাস-দুই আগে সংবাদপত্রে একটা বিজ্ঞাপন আমার নজরে পড়েছিল—স্বাগতা পিকচার্সের নবতম চিত্রার্ঘ্য জুয়েলার শ্রীরাঘব সরকারের প্রযোজনায় অভিজ্ঞান শকুন্তলম্! হ্যাঁ, ঐ অভিজ্ঞান শকুন্তলমের বিজ্ঞপ্তিটিই আমার চোখ খুলে দেয়। যার ফলে আমি বুঝতে পারি রাঘব সরকার বিনায়ক সেনের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। কিন্তু রাঘব সরকারের মত ঝানু লোক এত সহজে অনিশ্চিত ফিল্ম বিজনেসের কবলিত হবে সম্ভব তো নয়। কথাটা মনে মনে পর্যালোচনা করতে গিয়েই একটা সম্ভাবনা আমার মনের মধ্যে উঁকি দেয়, নিশ্চয় ঐ যোগাযোগের স্বীকৃতির মধ্যে কোন কার্যকারণ আছে। পরে ভেবে মনে হয়েছে, সেটা ঐ শকুন্তলা দেবী। রাঘব সরকার নিশ্চয়ই মিঃ সেনের প্রস্তাবে রাজী হয়েছিলেন, বিনায়কবাবু অধ্যাপকের বাল্যবন্ধু এবং বিশেষ প্রীতি আছে দুজনের মধ্যে, অতএব বিনায়ক সেন চেষ্টা করলে এই বিবাহ ঘটাতে পারেন, এই আশাতেই বিবাহ ঘটাবার চুক্তিতে—কি মিঃ সেন, তাই নয়? প্রশ্নটা করে কিরীটী তাকাল বিনায়ক সেনের দিকে।

বিনায়ক সেন কোন জবাব দিলেন না, মাথা নীচু করেই রইলেন নিঃশব্দে।

বুঝতে পেরেছি আমার অনুমান মিথ্যে নয় মিঃ সেন। আপনার ও রাঘব সরকারের পরস্পরের মধ্যে ঐ চুক্তিই হয়েছিল। যাক, কিন্তু দুর্ভাগ্য বিনায়কবাবু জানতেন না যে সিন্থেটিক হীরার ব্যাপারে ইতিমধ্যেই তাঁর বাল্যবন্ধু অধ্যাপক বিমলবাবুকে রাঘব সরকারের কুক্ষিগত হতে হয়েছিল। সেটা বোধ হয় জানতে পারেন সর্বপ্রথম রঞ্জনবাবুর মুখেই। রঞ্জনবাবুর সম্পর্কে আরো কিছু আমার বক্তব্য আছে। রঞ্জনবাবু বিনায়কবাবু ফিল্ম-এর বিজনেস করেন জেনে তাঁর কাছে গিয়েছিলেন হয়তো কোন সময় কাজের জন্য, কিন্তু বিনায়কবাবু হয়তো তাঁকে পাত্তা দেন নি এবং ঐ সময় হীরার ব্যাপারটা তাঁর গোচরীভূত হওয়ায় আবার হয়তো তিনি বিনায়কের কাছে যান এবং বিনায়ক এবারে আর রঞ্জনবাবুকে প্রত্যাখ্যান জানাতে পারেন নি, তাঁর সঙ্গে হাতে হাত মিলান। কি মিঃ সেন, আমার অনুমান কি মিথ্যা?

পূর্ববৎ বিনায়ক সেন চুপ করে রইলেন।

কিরীটী আবার বলতে লাগল, মিথ্যা নয় আমি জানি। যাই হোক এবারে বিনায়কও রাঘব সরকারের পক্ষ থেকে বেচারী অধ্যাপককে চাপ দিতে শুরু করলেন। অথচ তিনি তখনও জানতেন না শকুন্তলার সত্য পরিচয়টা। অবিশ্যি জানলেও যে উনি পিছপাও হতেন আমার মনে হয় না। ব্যাপারটা তা হলে শেষ পর্যন্ত কিভাবে জটিল হয়ে উঠল আপনারা ভেবে দেখুন এবং সব জটিলতার মূলে ঐ শকুন্তলা দেবীর প্রতি শয়তান রাঘবের শ্যেনদৃষ্টি—হ্যাঁ শকুন্তলা দেবী, আপনিই এই নাটকের মূল। যে নাটক গত কিছুদিন ধরে এই বাড়িতে আপনাকে কেন্দ্র করে সংঘটিত হয়েছে এবং যার চরম ক্লাইমেক্সে অধ্যাপকের শোচনীয় মৃত্যু হল—

আমি! অস্ফুট কণ্ঠে বলল শকুন্তলা।

হ্যাঁ, আপনি। কিন্তু সে কাহিনীরও পশ্চাতে রয়েছে আপনাকেই কেন্দ্র করে আর এক কাহিনী—

আর এক কাহিনী!

হ্যাঁ। কিন্তু সে কাহিনীর বিবৃতির আজ আর আপনার কাছে কোন প্রয়োজন নেই।

কিরীটীবাবু—কি যেন বলবার চেষ্টা করে শকুন্তলা।

কিন্তু শকুন্তলাকে থামিয়ে দিয়েই কিরীটী বলে, ব্যস্ত হবেন না শকুন্তলা দেবী, হয়তো সে কাহিনী একদিন আপনা হতেই আপনার কাছে প্রকাশ হয়ে যাবে। কিন্তু যাক সে কথা, মিঃ সেন ও রঞ্জনবাবুর কথা আমি বলছিলাম সেই কথাই শেষ করি। একটু আগে যে কাহিনীর ইঙ্গিত মাত্র আমি দিলাম, সম্ভবতঃ সেটা রঞ্জনবাবু জেনেছিলেন কোন এক সময় অধ্যাপকের পাশের ঘরেই থাকার দরুন—অধ্যাপক ও বিনায়কবাবুর মধ্যে আলোচনা প্রসঙ্গে অথবা অধ্যাপক ও সরমা দেবীর মধ্যে আলোচনা প্রসঙ্গে। এবং যার ফলে নাটকের গতি আবার মোড় নিল। অর্থাৎ রঞ্জনবাবু বিনায়কবাবুকে সাহায্যই নয়—ঐ সুযোগে নিজের ভবিষ্যৎটাকে নতুন করে গড়ে তোলবারও আবার স্বপ্ন দেখতে লাগলেন আর সেই সঙ্গে নাটকের শেষ দৃশ্যও ঘনিয়ে আসতে লাগল। অধ্যাপক, বিনায়কবাবু, রাঘব সরকার ও রঞ্জন বোসকে নিয়ে নাটক ঘনীভূত হয়ে উঠল। চারজন লোকের পরস্পরের বিচিত্র স্বার্থে লাগল সংঘর্ষ—যে স্বার্থের কথা আমি এইমাত্র আপনাদের বললাম। যদি ভেবে দেখেন আপনারা তো দেখতে পাবেন ওঁদের মধ্যে একজনের অর্থাৎ অধ্যাপক বিমল চৌধুরীর সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও সম্মান এবং রাঘব সরকারের শকুন্তলা লাভ ব্যতীত অন্য দুইজনের স্বার্থ ছিল অর্থ। এবং ঠিক সেই সময় ঘটল আর একটি বিচিত্র ব্যাপার—নাটকের ঐ সঙ্গীন মুহূর্তেই ঐ বিচিত্র ব্যাপারটি ঘটল—বলতে বলতে কিরীটী থামল যেন হঠাৎ।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে সেই মুহূর্তে আমার মনে হল কিরীটী যেন রীতিমত এক সংশয়ে পড়েছে।

অতঃপর কাহিনীর শেষাংশ সে উদ্‌ঘাটিত করবে কি করবে না এবং কেন যে তার ঐ দ্বিধা তাও আমি বুঝতে পারছিলাম।

সরমা—সরমার কথা ভেবেই সে হঠাৎ চুপ করে গেল।

কিরীটী মনে মনে কি ভাবল সে-ই জানে—তবে মনে হল তার মুখের দিকে তাকিয়ে, অতঃপর বাকিটুকু সে বলবে বলেই মনে মনে স্থির করেছে। এবং আমার অনুমান যে মিথ্যা নয়, পরমুহূর্তেই বুঝলাম।

সে বলতে শুরু করল পুনরায় ঃ

বুদ্ধিমতী সরমা ব্যাপারটা জানতে পেরেছিল ইতিমধ্যে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, সে অধ্যাপককে ভুল বুঝেছিল—সে ভেবেছিল বুঝি ইচ্ছা করেই অধ্যাপক নিজের স্বার্থের জন্য শকুন্তলাকে রাঘব সরকারের হাতে তুলে দিচ্ছেন। এবং শুধু যে সরমাই ভুল বুঝেছিল অধ্যাপককে তাই নয়, বিনায়কবাবুও ভুল বুঝেছিলেন তাঁর বাল্যবন্ধু অধ্যাপক বিমলবাবুকে। তিনি অর্থাৎ মিঃ সেন ভেবেছিলেন—এই পর্যন্ত বলেই কিরীটী আবার থামল এবং হঠাৎ শকুন্তলার দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল, মিস চৌধুরী যদি কিছু মনে না করেন তো—বড্ড পিপাসা পেয়েছে একটানা বকে বকে, যদি একটু চায়ের ব্যবস্থা করতেন—

শকুন্তলা তাকাল কিরীটীর মুখের দিকে।

কিরীটী ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই বোধ হয় মৃদু হাস্যসহকারে বলে, না, আপনি না ফিরে

আসা পর্যন্ত আমি চুপ করেই আছি—তবে একটু তাড়াতাড়ি করবেন।

মনে হল একান্ত যেন অনিচ্ছার সঙ্গেই শকুন্তলা দেবী ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

চব্বিশ

কিরীটী যেন কান পেতেই ছিল, শকুন্তলার পায়ের শব্দটা মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই কিরীটী ইঙ্গিতে দরজাটা ভেজিয়ে দেবার জন্য বলল।

আমি এগিয়ে গিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দিলাম।

শিবেনবাবু, উনি ফিরে আসবার আগেই আমাকে শেষ করতে হবে—আই মাস্ট ফিনিশ ইট বিফোর সি কামস্ ব্যাক্! হ্যাঁ, বলছিলাম বিনায়কবাবুও তাঁর বাল্যবন্ধু অধ্যাপককে ভুল বুঝেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন বিনায়কবাবুর পীড়াপীড়ির হাত থেকে শকুন্তলার রাঘবের সঙ্গে বিবাহের ব্যাপারে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যই হয়তো শেষ পর্যন্ত অধ্যাপক রাঘবের কাছে শকুন্তলার সত্যিকারের জন্মবৃত্তান্তটা খুলে বলবেন। রাঘব তা হলে জেনেশুনে সমাজের জন্মপরিচয়হীন এক মেয়েকে নিশ্চয়ই বিবাহ করবে না এবং তার ফলে এক ঢিলে দুই পাখীই মারা হবে। রাঘবের হাত থেকেও নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে এবং শকুন্তলাকেও দুঃখ দেওয়া হবে না। কিন্তু বিনায়কবাবু বুঝতে পারেন নি—অধ্যাপকের পক্ষে ঐ কাজ কখনোই সম্ভবপর ছিল না—

সহসা ঐ সময় এতক্ষণে বিনায়ক সেন কথা বলে উঠলেন, ছিল—ইউ ডোণ্ট নো হিম—

মিঃ সেন!

হ্যাঁ, হ্যাঁ—অ্যাণ্ড ইন ফ্যাক্ট হি থ্রেটেণ্ড্ মি, আমাকে সে শাসিয়েছিল।

তবু আমি বলব তিনি তা করতেন না।

করতেন—আর তা করতেন বলেই দেয়ার ওয়াজ নো আদার অল্টারনেটিভ—

মিঃ সেন!

ইয়েস—হ্যাঁ হ্যাঁ, আই কিল্ড হিম! আমি তাকে হত্যা করেছি—ইয়েস—আমি স্বীকার করছি তাকে আমি হত্যা করেছি—

আমি জানতাম মিঃ সেন—আমি জানতে পেরেছিলাম পরের দিনই ব্যাপারটা টেলিফোন অফিসে এনকোয়ারি করে। আপনার বাড়ি থেকেই সেরাত্রে আপনার পূর্ব-নির্দেশমতই এখানে ফোন-কল এসেছিল এবং আপনার ও রঞ্জনবাবুর পূর্ব-প্ল্যানমত সেই ফোন আসা মাত্রই রঞ্জনবাবু ফোনটা অধ্যাপকের ঘরে নিয়ে গিয়ে রেখে তাঁকে সংবাদ দেন—তাই না রঞ্জনবাবু?

মৃদু কণ্ঠে রঞ্জন বলল, হ্যাঁ।

তারপর—কিরীটী বলতে লাগল, বেচারী যখন ঘরে ঢুকে নিশ্চিন্তে ফোন তুলে নিয়েছেন—বিনায়কবাবু রঞ্জনবাবুর ঘর থেকে দুই ঘরের মধ্যবর্তী দরজাপথে এসে পশ্চাৎ থেকে অতর্কিতে ক্লোরোফরম নিয়ে আক্রমণ করেন অধ্যাপককে। এবং অজ্ঞান করে পরে ডিজিট্যালিন সম্ভবত হাই ডোজে ইনজেক্ট করে অধ্যাপককে হত্যা করা হয়—তাই নয় কি?

রঞ্জনই আবার মৃদু কণ্ঠে বলে, হ্যাঁ।

দেখুন দুর্ভাগ্য আপনাদের রঞ্জনবাবু ও বিনায়কবাবু, আপনারা ভেবেছিলেন কেউ সে-

কথা জানতে পারবে না—কিন্তু তা তো হল না—আপনারাই রেখে গিয়েছিলেন হত্যার নিদর্শন পশ্চাতে—

নিদর্শন! শিবেন সোম প্রশ্ন করলেন।

হ্যাঁ, প্রথমতঃ ফোন-কল। দ্বিতীয়তঃ ফোনটাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে। তৃতীয়তঃ ক্লোরোফরমের ভেজা টাওয়েলটা বাথরুমে ফেলে রেখে গিয়ে। চতুর্থ ক্লোরোফরমের গন্ধ ঢাকবার জন্য ট্যাপ খুলে বাথরুমে হাত ধুয়েও ট্যাপটা তাড়াতাড়িতে বন্ধ করতে ভুলে গিয়ে। এবং পঞ্চম সেই রাত্রেই ঐ ঘরটা পুলিস বন্ধ করে চলে যাবার পর আবার রঞ্জনবাবু আপনি বিনায়কবাবুর পরামর্শে তালা ভেঙে ঘরে ঢুকে অধ্যাপকের বসবার চেয়ারটা ভেঙে—

কিন্তু আফটার অল, উনি চেয়ারটা ভাঙতে গেলেন কেন? শিবেন সোম প্রশ্ন করেন।

হীরার জন্য।

কি বললেন, হীরার জন্য?

হ্যাঁ, ল্যাবরেটারি থেকে এনে সিনথেটিক হীরাগুলো অধ্যাপক ঐ চেয়ারের পায়ার গুপ্ত কোটরেই লুকিয়ে রাখতেন। বিনায়কবাবুর পরামর্শেই তিনি ঐভাবে হীরাগুলো লুকিয়ে রেখেছিলেন, অবিশ্যি বিনায়কবাবু তখন মরীয়া হয়ে উঠেছেন, রাঘব সরকারকে যদি সহজে কায়দা না করতে পারেন তো ঐ হীরার সাহায্যেই কায়দা করবেন এই বোধ হয় ভেবেছিলেন, তাই নয় কি বিনায়কবাবু?

বলাই বাহুল্য, বিনায়ক সেন কোন জবাব দিলেন না।

বুঝতে পারছি অনুমান আমার মিথ্যে নয়। কিন্তু রঞ্জনবাবু, বিনায়কবাবু যেমন ভুল করেছেন তেমনি আপনিও একটা মারাত্মক ভুল করেছেন!

রঞ্জন সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে যেন তাকাল কিরীটীর মুখের দিকে।

হ্যাঁ ভুল, আপনি ভেবেছিলেন অধ্যাপকের অর্থাৎ আপনার মামার সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায় শেষ পর্যন্ত হয়তো তিনি শকুন্তলা দেবীকে তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি ও টাকাকড়ি লিখে দিয়ে যাবেন আপনাকে বঞ্চিত করে—

না, ভুল করি নি—তিনি তাই আমাকে স্পষ্ট বলেছিলেন!

কিন্তু তিনি তা করতেন না। আর করলেও তা আইনে টিকত না। কারণ শকুন্তলা দেবীর তো তাঁর সম্পত্তির উপরে আইনতঃ কোন অধিকারই বর্তাতো না!

কি বলছেন!

ঠিকই বলছি, শকুন্তলা তাঁর কেউ নয়।

কেউ নয়?

না, চৌধুরী-বাড়ির কেউ নয় সে—

সহসা ঐ সময় দড়াম করে ঘরের ভেজানো দরজা খুলে গেল এবং উদ্‌ভ্রান্তের মতই শকুন্তলা ঘরে এসে ঢুকল।

কি—কি বললেন মিঃ রায়?

কিরীটী চুপ।

মিঃ রায়, চুপ করে আছেন কেন, বলুন—তবে কে আমি? কেন এ বাড়িতে আমি—বলুন মিঃ রায় বলুন—

তিনি দয়া করে এখানে আপনাকে স্থান দিয়েছিলেন—

দয়া করে!

হ্যাঁ।

কিন্তু কেন? কেন তাঁর এ দয়া?

যেহেতু তিনি ছিলেন সত্যিকার মহৎ ব্যক্তি। আপনি—সরমা দেবী ও বিনায়কবাবুর সন্তান।

কি—কি বললেন? আমি—আমি—বাকী কথাগুলো আর শকুন্তলা উচ্চারণ করতে পারল না। জ্ঞান হারিয়ে ঘরের মেঝের উপর পড়ে গেল।

কিরীটী তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে তাকে মাটি থেকে তুলে নিল কোলের উপরে।

আরো ঘণ্টা দুই পরে।

থানায় শিবেন সোমের অফিস ঘরে বসেছিলাম আমরা।

শকুন্তলাকে রামচরণের জিম্মায় রেখে চলে এসেছি আমরা রঞ্জন ও বিনায়কবাবুকে অ্যারেস্ট করে সঙ্গে নিয়ে।

কিরীটী বলছিল, তাই আমি বলছিলাম শেষ পর্যন্ত অধ্যাপকের ব্যাপারটা ট্র্যাজেডি অফ এররস্-এ পর্যবসিত হয়েছিল।

কিন্তু আপনি বিনায়ক সেনকে সাসপেক্ট করলেন কি করে?

সরমার জবানবন্দীর পরই সে-রাত্রে আমি বুঝতে পেরেছিলাম ঐ সরমাকে কেন্দ্র করে কোন একটি গোপন ইতিহাস আছে বিমলবাবুর হত্যার পশ্চাতে। তারপর অকুস্থলের জিওগ্রাফি—অধ্যাপকের পাশের ঘরেই রঞ্জনবাবু থাকতেন, তাতে করে মনে হয়েছিল তিনি অর্থাৎ রঞ্জনবাবু হয়তো অনেক কিছুই জানেন বা জানতে পেরেছেন আড়ি পেতে। আরো রঞ্জনবাবুই অধ্যাপককে ফোনের সংবাদটা সরবরাহ করেছিলেন। স্বাভাবিক ভাবে অবিশ্যি তাতে করে রঞ্জনবাবুর উপরেই সন্দেহ পড়ার কথা, কিন্তু বাড়িতে অত লোকজনের উপস্থিতির মধ্যে রঞ্জনবাবুর একার পক্ষে অত বড় রিস্ক নেওয়া আদৌ সম্ভবপর ছিল না বলেই আমার মনে হয়েছিল, আরো কেউ ওর পিছনে আছে এবং কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গেসঙ্গেই আমি আর কার পক্ষে ঐ ব্যাপারে লিপ্ত থাকা সম্ভবপর ছিল ভেবেছি। ইতিমধ্যে ময়না তদন্তের রিপোর্টটা পেয়ে গেলাম এবং ময়না তদন্ত রিপোর্টে মৃত্যুর কারণ ডিজিট্যালিন জানতে পেরে ঐ সন্দেহটা আমার দৃঢ় হয় যে, রঞ্জনবাবুর সঙ্গে আরো কেউ আছে। কিন্তু কে সে? কার পক্ষে থাকা সম্ভব? এদিকে যেভাবে নিহত হয়েছিলেন অধ্যাপক, তাতে করে একটা সন্দেহ আমার প্রথম থেকেই মনের মধ্যে বদ্ধমূল হয়েছিল—যে-ই অধ্যাপককে হত্যা করুক না কেন সে তার বিশেষ পরিচিত এবং পরিচয়ের ঐ সুযোগটা নিয়েই সে অর্থাৎ হত্যাকারী আকস্মিক আঘাত হেনেছিল অধ্যাপককে। এখন প্রশ্ন, পরিচিতের মধ্যে সে-রাত্রে ঐ সময় অকুস্থানে কে কে উপস্থিত ছিল! দুষ্মন্ত, শকুন্তলা ও সরমাকে আমি আগেই সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দিয়েছিলাম। কারণ দুষ্মন্ত ঐ সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল না এবং পরে খবর নিয়েও জেনেছিলাম সত্যিই সে হত্যার সময়টা তার কলেজের রিসার্চরুমে ব্যস্ত ছিল। এবং বাকী দুজনকে বাদ দিয়েছিলাম তারা নারী বলে। কোন নারীর পক্ষে ঐভাবে হত্যা করা সম্ভবপর আদৌ ছিল না। তাহলে

এখন বাকী থাকে তিনজন—বিনায়ক সেন, রাঘব সরকার ও রঞ্জন বোস। রঞ্জন বোস সম্পর্কে আগেই ভেবেছি—বাকী রইল বিনায়ক সেন। বিনায়ক সেন সম্পর্কে আমি অনুসন্ধান শুরু করি। এবং অনুসন্ধানের ফলে দুটো ব্যাপার আমি জানতে পারি। প্রথম তার বর্তমান আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠেছিল। দ্বিতীয়, একদা ফোর্থ ইয়ার পর্যন্ত সে ডাক্তারী পড়েছিল। কাজেই হত্যার কারণ ও উপায়ের দিক থেকে তারই ওপর গিয়ে আমার সন্দেহ পড়ে। আরো একটা ব্যাপার এর মধ্যে ছিল, সেটা হচ্ছে সরমার উপরে আমার সন্দেহ। আমার কেমন যেন প্রথম থেকেই ধারণা হয়েছিল সরমা হত্যাকারী কে জানতে পেরেছিল—কিন্তু আশ্চর্য লেগেছিল আমার কথাটা ভেবে যে, সরমা হত্যাকারী কে জানা সত্ত্বেও ব্যাপারটা গোপন করে গেল কেন? ভাবতে শুরু করি এবং ভাবতে ভাবতে হঠাৎ আমার মনে হয়, সরমার অতীতের সঙ্গে ঐ বিনায়ক সেন জড়িত নয় তো! কারণ দীর্ঘদিন সরমা অধ্যাপকের গৃহে আছে এবং বিনায়ক অধ্যাপকের বাল্যবন্ধু। ঠিক সেই সংশয়ের মুহূর্তে শকুন্তলাকে আমি অ্যারেস্ট করবার জন্য শিবেনবাবু আপনাকে বলি। সেদিন আপনাকে কোন রিজন্ দিই নি, কিন্তু আজ বলছি, সরমা ও শকুন্তলার ফটো থেকে উভয়ের মধ্যে অদ্ভুত সৌসাদৃশ্য দেখবার আগেই ওদের দুজনের মুখের বিশেষ তিলটি ও উভয়ের মুখের একই ধরনের গঠন আমার দৃষ্টিকে আকর্ষণ করেছিল—সেই কারণেই আমি ফটোর কথা বলেছিলাম এবং সেই সন্দেহের আমার নিরসনের জন্যই শকুন্তলাকে অ্যারেস্ট করতে বলেছিলাম। তীর ছুঁড়েছিলাম আমি সরমার প্রতিই এবং আমার অনুমান যে মিথ্যা নয় তা প্রমাণ হয়ে গেল সেই রাত্রে যে মুহূর্তে সরমা এসে আমার গৃহে উপস্থিত হল শকুন্তলার অ্যারেস্টের পর। সে-রাত্রে নীচে গিয়ে সরমাকে বিদায় দেবার সময় বিনায়ক সেনের প্রতি আমার সন্দেহের কথাটা বলাতেই সরমার মুখের দিকে তাকিয়ে তার মুখে যে পরিবর্তন দেখেছিলাম, আমার তাতে করে আর কোন সন্দেহই রইল না যে শকুন্তলার বাপই ঐ বিনায়ক সেন। তার পরের ব্যাপার তো আপনারা সকলে জানেনই।

পঁচিশ

একটানা অনেকক্ষণ ধরে কথা বলে কিরীটী থামল।

ধীরে ধীরে পকেট থেকে টোবাকো পাউচ ও পাইপটা বের করে পাইপে তামাক ভরে তাতে অগ্নিসংযোগ করল কিরীটী।

এবং কয়েক সেকেণ্ড ধূমপান করে বলল, শুধু মাত্র শকুন্তলাকে তার জন্মবৃত্তান্তের লজ্জা থেকে বাঁচাবার জন্যই সেদিন আমি সরে দাঁড়াতে চেয়েছিলাম শিবেনবাবু। কিন্তু নিয়তি বুঝি কেউ এড়াতে পারে না। নচেৎ এমনি করে শকুন্তলার কাছে শেষ পর্যন্ত সব প্রকাশ হয়ে পড়বেই বা কেন ঘটনাচক্রে!

শিবেন সোম বললেন, সত্যি মেয়েটার জন্য দুঃখ হয়—

হ্যাঁ, দুঃখ হয় বৈকি। আর হয়তো বাকী জীবনটা দুষ্মন্তর স্মৃতি বয়েই বেড়াতে হবে বেচারীকে অতঃপর!

কেন—এ কথা বলছেন কেন?

বলছি ঐ শকুন্তলার আঙুলের অভিজ্ঞানটির জন্য।

অভিজ্ঞান?

মনে পড়ছে না শকুন্তলার হাতের আংটিটা!

সেটা তো রাঘব সরকারের দেওয়া?

না। স্থিরকণ্ঠে কিরীটী বললে।

না মানে? প্রশ্ন করলাম এবারে আমিই, তবে কার দেওয়া আংটি?

দুষ্মন্তর।

দুষ্মন্তর? কি করে জানলে?

সরমা বলেছিল।

তবে—

কি তবে? আংটিই তো কাল হয়েছিল শেষ পর্যন্ত শকুন্তলার পক্ষে, কারণ সেই কথাটা—মানে বিনায়ক সেন আংটির ব্যাপারটা জানতে পারার দরুনই সে আরো হেস্টি স্টেপস্ নিয়েছিল। তাই বলছিলাম ঐ অভিজ্ঞানটিই হয়তো বাকী জীবনটা শকুন্তলার কাছে দুষ্মন্তর স্মৃতি হয়ে থাকবে।

কিন্তু তা নাও তো পারে! দুষ্মন্ত তাকে বিয়েও তো করতে পারে! বললাম আমি।

না বন্ধু না, শকুন্তলার জন্মবৃত্তান্ত শোনার পরই দুষ্মন্তর প্রেম দেখো ঠিক শুকিয়ে যাবে। আর শুধু দুষ্মন্তর কথাই বা বলছি কেন, সামান্য ক'দিনের পরিচয়ে শকুন্তলাকে যতটুকু চিনেছি—শকুন্তলাই হয়তো দুষ্মন্তর জীবন থেকে সরে দাঁড়াবে।

শেষের দিকে কিরীটীর কণ্ঠস্বরটা যেন কেমন ব্যথায় বিষণ্ণ ও ম্রিয়মাণ মনে হল। কিরীটী অন্যদিকে মুখ ফেরাল।

স্তব্ধ কক্ষের মধ্যে যেন একটা নিঃশব্দ ব্যথার সুর করুণ কান্নার মতই গুমরে গুমরে ফিরতে লাগল।

মদনভস্ম

কল্যাণীয়া করবী গুপ্ত (সীপু)

আশীর্বাদক—বাবা

এই পুস্তকে বর্ণিত কোনও চরিত্রের সঙ্গে জীবিত বা মৃত কোন চরিত্রের কোন সম্পর্ক নাই এবং কোনও ঘটনা বা স্থানের সঙ্গেও কোন সম্পর্ক নাই।

॥ লেখক ॥

এক

জবানবন্দী দিচ্ছিল সুসীম।

বিষণ্ণ ম্লান মুখখানির দিকে তাকালে মনে হবে মাত্র কিছুক্ষণ আগেই বুঝি তার উপর দিয়ে একটা ঝড় বয়ে গিয়েছে। অসহায় চোখের দৃষ্টি যেন যে-কোন একটা অবলম্বন খুঁজছিল।

অদূরে দাঁড়িয়েছিলেন সুসীমের ভগ্নীপতি হরপ্রসাদ। আর মুখোমুখিই প্রায় একটা চেয়ারে বসে থানা-অফিসার সাধন দত্ত একটির পর একটি প্রশ্ন করে যাচ্ছিলেন।

কতদিনের পরিচয় ছিল আপনাদের?

অনেক দিনের। মৃদুকণ্ঠে প্রশ্নের জবাবটা দিয়ে পার্শ্বেই দণ্ডায়মান হরপ্রসাদের দিকে একবার তাকাল সুসীম।

হরপ্রসাদও সঙ্গে সঙ্গে সায় দিলেন, হ্যাঁ, অনেক দিনের পরিচয় ওদের।

তবু কত দিনের?

তা ধরুন বারো বছর তো হবেই। কি বল সুসীম! হরপ্রসাদ সুসীমকেই যেন পাল্টা প্রশ্ন করলেন।

হ্যাঁ, তা হবে।

বারো বছর—অনেক দিন বলুন!

হ্যাঁ, অনেক দিনের আলাপ ছিল ওদের পরস্পরের। কতকটা যেন পুনরাবৃত্তির মতই কথাটা বললেন হরপ্রসাদ।

হুঁ।

মনে হলো সাধন দত্ত যেন কি ভাবতে লাগলেন আপন মনেই।

মিঃ দত্ত!

সুসীমের মৃদুকণ্ঠের ডাকে মুখ তুলে তাকালেন সাধন দত্ত।

আমি এবারে বাইরে যেতে পারি?

হ্যাঁ, হ্যাঁ—যাবেন বৈকি, যান না।

সুসীম ঘর থেকে বের হয়ে আসবার জন্য পা বাড়াতেই সাধন দত্ত বললেন, সুসীমবাবু, আপনার স্ত্রীকে যদি এ ঘরে একবার পাঠিয়ে দেন!

সুসীম কিছু বলবার আগেই হরপ্রসাদ বললেন, নিশ্চয়ই, আমি ডেকে আনছি শ্রাবণীকে।

সুসীম আর দাঁড়াল না। ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

ঘরে একাকী শ্রাবণী বসেছিল।

পরিধানে বৌভাতের দামী সবুজ বেনারসী শাড়ি। গলায় জড়োয়ার হীরা ও মুক্তা বসানো হার, হাতে হীরা বসানো বালা, কানে হীরার কর্ণাভরণ। লাল শাঁখা, লোহা, রুলিও ছিল হাতে। কপাল জুড়ে সযত্ন-অঙ্কিত চন্দন-তিলক।

রাত্রি শেষ হয়ে আসছে।

খোলা জানালাপথে বাইরের সেই তরল অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বসে ছিল শ্রাবণী।

সুসীমের নববধূ শ্রাবণী।

হরপ্রসাদ এসে ঘরে ঢুকলেন।

হরপ্রসাদের পদশব্দে ফিরে তাকাল শ্রাবণী।

শ্রাবণী, মিঃ দত্ত তোমাকে আর একবার ডাকছেন।

কেন?

তা তো ঠিক জানি না। চল একবার।

জামাইবাবু?

বল?

কিছু জানতে পারা গেল?

কি?

কে—মানে বলছিলাম, কে তাঁকে হত্যা করলো?

না।

এখনো জানতে পারা গেল না?

না।

জানতে নিশ্চয়ই পারা যাবে না—

তা জানতে হবে বৈকি।

কিন্তু—

কিছু বলছিলে?

না, কিছু না—চলুন।

হরপ্রসাদের পিছনে পিছনে ঘর থেকে বের হয়ে এলো শ্রাবণী।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে উপরের যে ঘরে সাধন দত্ত বসেছিলেন, হরপ্রসাদের সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় সেই ঘরে এসে ঢুকল শ্রাবণী।

আসুন মিসেস্ নাগ। আবার আপনাকে বিরক্ত করতে হলো বলে আমি দুঃখিত। বসুন—

যন্ত্রচালিত একটা পুতুলের মতই যেন শ্রাবণী এগিয়ে গিয়ে নির্দিষ্ট খালি চেয়ারটায় সাধন দত্তর মুখোমুখি বসল।

আচ্ছা মিসেস্ নাগ, সে-সময় একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে মনে ছিল না আমার—

চোখ তুলে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল শ্রাবণী সাধন দত্তর মুখের দিকে নিঃশব্দে।

আপনি আপনার জবানবন্দীতে বলেছেন সুনন্দা চ্যাটার্জীর সঙ্গে আপনার পূর্বে পরিচয় ছিল—

হ্যাঁ।

কি সূত্রে আপনাদের পরিচয়?

কিছুদিন এক কলেজে পড়েছিলাম—

কিছুদিন মানে কতদিন হবে?

তা তিন বছর হবে।

ঘনিষ্ঠতা ছিল কি আপনাদের মধ্যে?

না। তাকে—তাকে আমার কোনদিনই ভাল লাগে নি।

ভাল লাগে নি! কেন?

তা—তা আমি বলতে পারবো না। তবে—তবে তাকে কখনো আমার ভাল লাগে নি। তবু—তবু আপনি বিশ্বাস করুন মিঃ দত্ত, আমি কখনো চাই নি তার এভাবে মৃত্যু হোক।

হুঁ। আচ্ছা মিসেস, নাগ, আপনাদের বিবাহের পূর্বে আপনার স্বামীর সঙ্গে যে সুনন্দা চ্যাটার্জীর পূর্ব-পরিচয় ছিল, আপনি কি তা জানতেন?

জানতাম।

খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল নাকি ওদের শুনলাম!

আমিও তাই জানতাম।

আর একটা কথা, আপনি ঠিক জানেন—আপনাদের আজকের এই উৎসবে আপনার স্বামী তাকে প্রথমে নিমন্ত্রণ করেন নি?

জানি করে নি—

তারপর যেচে সে যে নিজে থেকে নিমন্ত্রণ নিয়েছিল—এ কথাটা কি আপনি শুনেছিলেন?

শুনেছি। আমার স্বামীই কাল রাত্রে আমাকে বলেছিল।

আচ্ছা আপনার কি মনে হয়, যেচে হঠাৎ অমন করে কেন সে নিমন্ত্রণ নিতে গেল?

কি করে বলবো!

আজ এখানে আসবার পর আপনার সঙ্গে নিশ্চয়ই তার দেখা হয়েছিল?

হয়েছিল।

কথাবার্তাও হয়েছিল নিশ্চয়ই?

হয়েছিল।

ও সম্পর্কে আপনাদের মধ্যে কোন কথা হয় নি?

না।

আপনি নিশ্চয়ই তার ঐভাবে যেচে নিমন্ত্রণ নিয়ে এখানে আসায় খুশি হতে পারেন নি!

সেটাই তো স্বাভাবিক।

তা বটে। আর একটা কথা—

বলুন।

এ ব্যাপারে কাউকে আপনার সন্দেহ হয়?

না।

আচ্ছা আপনি যেতে পারেন।

শ্রাবণী ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

দোতলার বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে শ্রাবণী লক্ষ্য করল, তার স্বামী সুসীম রেলিংয়ের সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

কিন্তু কি জানি কেন, স্বামীকে যেন দেখেও দেখলো না শ্রাবণী। নিজের ঘরের দিকেই সে চলে গেল।

সুসীমও শ্রাবণীকে দেখে যেন ডাকতে গিয়েও ডাকতে পারল না।

চুপ করেই দাঁড়িয়ে রইলো।

মৃত্যু মানুষের জীবনে একান্তই স্বাভাবিক ঘটনা নিঃসন্দেহে।

কিন্তু তবু সেই মৃত্যুকেই মনে হয় অস্বাভাবিক, যখন অকস্মাৎ বিনা নোটিশে এসে হাজির হয়। শুধু অস্বাভাবিকই নয়, যেন একেবারে অকস্মাৎ বিমূঢ় করে ফেলে।

সুনন্দা চ্যাটার্জীর আকস্মিক মৃত্যুটাও ঠিক তেমনি করেই বাড়ির মধ্যে অতগুলো লোককে যেন একেবারে অভিভূত, বিমূঢ় করে দিয়েছিল মুহূর্তে। কিছুক্ষণের জন্য সকলে যেন একবারে বোকা বনে গিয়েছিল।

লর্ড বায়রনের সেই বিখ্যাত কবিতার ঘটনা—ভিসন অফ ব্যালসেজারের মতোই সুনন্দার মৃত্যুটা অমোঘ নিষ্ঠুর এক অদৃশ্য হাতে যেন লেখা হয়ে গেল!

সুনন্দা চ্যাটার্জী মৃত।

ঐ যে বিরাট হলঘরটার এক কোণে দামী সোফাটার উপরে হেলান দিয়ে এখনো বসে আছে সুনন্দা চ্যাটার্জী, শুধু মাথাটা বুকের সামনে ঝুলে পড়েছে করুণ অসহায় এক ভঙ্গিতে—ঐ সুনন্দা চ্যাটার্জী মৃত। মাত্র কিছুক্ষণ পূর্বেই অমোঘ নিষ্ঠুর সত্যতা আবিষ্কৃত হয়েছে—সুনন্দা চ্যাটার্জী মৃত।

পরিধানে দামী সাদা ইটালীয়ান সিফনের শাড়ি, গায়ে ডিপ্ রেড্ ভেলভেটের ব্লাউজ, কনুই পর্যন্ত হাতা। চোখেমুখে সূক্ষ্ম একটা প্রসাধনের প্রলেপ। তার জামাকাপড় সর্বাঙ্গ থেকে এখনো ঘরের বাতাসে ভাসছে তার প্রিয় সেন্ট কালিফোর্নিয়ান পপির মৃদু স্নিগ্ধ সুবাসটা। মাথার খোঁপাটা ভেঙে ঘাড়ের পাশে লুটিয়ে পড়েছে। এক হাত নিরাভরণ, অন্য হাতের সুডৌল মোমের মত মসৃণ মণিবন্ধে দামী সোনার ওমেগা রিস্ট্ওয়াচ্টা এখনো টিক্‌টিক্ করে চলছে। সব ঠিক তেমনিই আছে, শুধু সুনন্দার ঐ দেহের মধ্যে প্রাণটুকুই নেই।

সুনন্দা মৃত।

একটু আগেও নাকি বিশাখা হলঘরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে সুনন্দার উচ্ছ্বসিত হাসি শুনেছিল। মৃত সুনন্দা চ্যাটার্জী—তবু এখনো তার সেই যৌবন-ঢলঢল-দেহ ঠিক তেমনিই আছে।

মৃত্যু কখন এসেছিল এবং নিঃশব্দে এসে কখন বাড়িভর্তি এতগুলো আমন্ত্রিত লোকের চোখকে ফাঁকি দিয়ে সুনন্দার মোমের মতো নরম এবং শঙ্খের মতো ধবল গ্রীবায় সরু সাদা ঐ সিল্ক কর্ডের ফাঁসটি লাগিয়ে যে তাকে চিরতরে শ্বাসরুদ্ধ করে রেখে গিয়েছে সেটাই কেউ জানতে পারে নি।

শুধু আশ্চর্যই নয়, বিস্ময়কর। তবু সুনন্দা চ্যাটার্জী মৃত।

একদা প্রথম যৌবনে যাকে ঘিরে কত হতভাগ্য যুবক আশা-আকাঙ্ক্ষা আর কল্পনার জাল বুনেছে এবং তাদের সে আশা-আকাঙ্ক্ষা আর কল্পনাকে নির্মম নিষ্ঠুর ব্যঙ্গোক্তিতে রূঢ় প্রত্যাখ্যান জানালেও মরীচিকার মত যার পিছনে পিছনে তারা ঘুরেছে আর ঘুরেছে—এই সেই সুনন্দা চ্যাটার্জী। শোনা যায়—তেত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত কোন পুরুষ তাকে স্পর্শ করা দূরে থাক—নির্দিষ্ট একটা ব্যবধান ছাড়া কাছে গিয়ে দাঁড়াবারও সাহস পায় নি। তেত্রিশটি বসন্ত তার রুদ্ধ দ্বারে ব্যর্থ আঘাত হেনে ফিরে গেলেও সুনন্দার দিকে চাইলে মনে হবে—যৌবন বুঝি ওর দেহে অষ্টাদশীর মতোই অটুট। দীর্ঘদিন ধরেই সে দেহচর্চার সঙ্গে লাঠি ছোরা আর যুযুৎসু বিদ্যায়ও পারদর্শিনী হয়ে উঠেছিলো, তাই ছেলেরা বরাবরই বলে এসেছে—ও মেয়ে নয়, আগুনের শিখা।

সেই সুনন্দা চ্যাটার্জীকে কিনা অমনি করে সরু একটা সিল্ক কর্ডের ফাঁসে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরতে হলো!

এর চাইতে অভাবিত, বিস্ময়কর আর কি ঘটতে পারে?

কিন্তু অভাবিতই হোক আর বিস্ময়করই হোক, সুনন্দা মৃত।

রাতও বেশি নয়—মাত্র সাড়ে এগারটা। তাও গ্রীষ্মের রাত্রি সাড়ে এগারটা। উৎসবের বাড়িতে রাত সাড়ে এগারটা তো রাতই নয়। তখনো আমন্ত্রিতদের মধ্যে কেউ কেউ এসে পৌঁছায় নি বলেই সুসীম নিচের করিডোরে নিজেই অভ্যর্থনা করবার জন্য দাঁড়িয়ে ছিল। উৎসবটা তারই বৌভাতের।

এ-কান ও-কান হতে হতে তার কানে গিয়ে সংবাদটা পৌঁছাতেই দ্রুতপদে সুসীম উপরে উঠে আসে।

এবং হলঘরটার মধ্যে ঐ সময় যারা মূক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল তাদেরই মধ্যে বান্ধবী বিশাখাকে সামনে দেখে তাকেই প্রশ্ন করে, কি—কি ব্যাপার?

বিশাখা ততক্ষণে বোধ হয় নিজেকে সামলে নিতে পেরেছিল কিছুটা। সে বলে অত্যন্ত নিম্নকণ্ঠে, যেন একপ্রকার ফিসফিস করেই, সুনন্দা ইজ ডেড্!

ডেড্!

যেন ভূত দেখার মতই হঠাৎ চম্‌কে ওঠে কথাটা বলে সুসীম।

সি হ্যাজ বিন ব্রুটালি মাডারড্!

সত্যি—সত্যি—

এবারে বিশাখা চোখের ইঙ্গিতে অদূরে সোফার উপরে উপবিষ্ট ভঙ্গিতে বসা সুনন্দার মৃতদেহটা দেখিয়ে দিল।

সেই দিকে তাকিয়ে যেন মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে যায় সুসীম।

কয়েক মুহূর্ত সেই নিষ্প্রাণ দেহটার দিকে তাকিয়ে থেকে পায়ে পায়ে সোফাটার সামনে এগিয়ে যন্ত্রণাকাতর রুদ্ধকণ্ঠে বলে, হাউ অ্যাবসার্ড! নো, নো—দ্যাট্ কাণ্ট্ বি—কাণ্ট্ বি—

বিরাট হলঘরটি ফুলে আর লতাপাতায় এবং অত্যুজ্জ্বল সব ফ্লুরোসেণ্ট আলোয় ঝলমল করছে। মেঝেতে দামী কার্পেট বিছানো। চারপাশে দাঁড়িয়ে স্তব্ধ মূক সব সুসজ্জিত আমন্ত্রিত নরনারীর দল।

সুসীম যেন অসহায় বোবা দৃষ্টিতে চারিদিকে একবার চোখ তুলে তাকালো। সুনন্দা যে তার গৃহে আজ অভ্যাগতা—অতিথি!

বলতে গেলে সবার আগে সেই বিকেলেই এসেছে সুনন্দা!

মাত্র মাসখানেক পূর্বের সেই ব্যাপারের পরও সুনন্দা যে একপ্রকার নিজে থেকে যেচেই নিমন্ত্রণ নিয়ে তার বিবাহের উৎসবে আসবে, সুসীম তা বিশ্বাস কেন—ভাবতেও বুঝি পারে নি।

আর ভাবতে পারে নি বলেই নিজে তো সুনন্দার কাছে যায়ই নি, নিমন্ত্রণের একটা চিঠি পাঠাবার কথাটা পর্যন্ত ভাবতে পারে নি, সাহস পর্যন্ত হয় নি।

কারণ সুসীমের চাইতে কে আর বেশী করে চিনত সুনন্দাকে!

মনশ্চক্ষে যেন সুসীম স্পষ্ট দেখেছিল সেই ধনুকের মতো ভ্রূ ঈষৎ উত্তোলিত করে সামনের

উপরের পাটির দাঁত দুটো দিয়ে নীচের ওষ্ঠটা কামড়িয়ে ধরে ক্ষণকাল মুখের দিকে চেয়ে থেকে সুনন্দা জবাব দিচ্ছে তার স্বভাবসিদ্ধ ব্যঙ্গের ভঙ্গিতে ও কণ্ঠস্বরে, সুসীম বুঝি ভেবেছিলে দেশাচার আছে বলেই নিমন্ত্রণ করবার অধিকারটাও সকলেরই সকলকে আছে!

আজ সুসীমও ঐ কথার পর সহসা পরমুহূর্তেই কোন জবাব জুগিয়ে উঠতে পারত না নিজের ওষ্ঠে। আর সুনন্দাও তাকে কেবল এটুকু বলেই নিষ্কৃতি দিত না।

পরমুহূর্তেই বলতো, তা এসেছো যখন—সামাজিকতা আমারও করা কর্তব্য, কি বল? আমার ড্রাইভার মহীন তো তোমার বাড়ি চেনে, সেই যাবে'খন লৌকিকতাটুকু সেরে আসতে। হ্যাঁ দেখো, ভুলে যেও না যেন আবার ওকে দুটো খাইয়ে দিতে!

তারপর কি আর দাঁড়াতে পারত সুসীম?

সেদিনকার মতোই হয়তো অসহ্য অপমানে আর হিংস্র একটা আক্রোশে—ঠিক যাকে বলে একেবারে ফেটে পড়তো সে এবং সেদিনকার মতোই 'ইতর' বলে বের হয়ে আসা ছাড়া উপায়ই বা শেষ পর্যন্ত কি আর থাকত তার! তাই তো সে যায় নি। অথচ রীতিমত পরিচিত, স্বল্প-পরিচিত সকলকেই সুসীম নিমন্ত্রণ করেছিল তার বিবাহোৎসবে, করেছিল অবিশ্যি দুটো কারণে।

প্রথমতঃ সে পুরুষ। সৌভাগ্যবান্ কৃতী পুরুষ। জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। অর্থে, বিদ্যায়, স্বাস্থ্যে, পরিচিতিতে—কিসে নয়?

সব দিক দিয়েই সে যখন প্রতিষ্ঠিত, তখন বয়সটা আটচল্লিশ বছর হয়েছে বলেই যে তার ভাগ্যে মনের মতো এবং দশজনকে দেখাবার মতো বৌ জুটবে না, এ কথাটা যে কত বড় মিথ্যে সেটা প্রমাণিত করার এই একটা মস্ত সুযোগ এবং দ্বিতীয়তঃ সুনন্দাকেও বুঝিয়ে দেওয়া যে সুসীমের মত স্বামী-সৌভাগ্য সুনন্দার ছিল না!

কিন্তু সত্যিই কি তাই? এ বিয়েতে কি সে মনের মধ্যে সত্যিকারের তৃপ্তি পেয়েছে? নিশ্চয়ই পায় নি। আর যাকেই ফাঁকি দেওয়া যাক না, নিজের মনকে তো আর ফাঁকি দেওয়া যায় না! নইলে শ্রাবণীর মতো মেয়েকে বধূরূপে পাচ্ছে জেনেও বিয়ের আগের রাত্রে কেন নিদ্রাহীন রাত্রি কেটেছিল তার?

বাসরঘরের নির্জনতার মধ্যেও কেন সে শ্রাবণীর মুখের দিকে সহজভাবে তাকাতে পারে নি? নিজের মনকে বার বার কেন বোঝাতে হয়েছে নিজেকে, আমি ঠকি নি—আমি ঠকি নি!

বধূসহ গৃহে প্রত্যাগমন করেও কেন সে ঝিম মেরে ছিল?

কিছুতেই উৎসাহ পাচ্ছিল না!

কাল বৌভাতের উৎসব বাড়িতে। আত্মীয়স্বজনে বাড়িটা গমগম করছিল। রাত বোধ করি তখন বারোটা বেজে গিয়েছে। অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ করছিল সুসীম নিজেকে। শুতে যাবে এমন সময় ফোনটা বেজে উঠলো।

ঘরে সে-সময় কেউ ছিল না, নইলে সুসীম নিশ্চয়ই ফোনটা ধরত না। ভাগ্যে কেউ ঐ সময় ঘরে ছিল না!

একান্ত অনিচ্ছায় শিথিল হাতে ফোনের রিসিভারটা তুলে নিয়েছিল সে, হ্যালো!

সুসীম?

পরিচিত—অত্যন্ত পরিচিত সেই নারী-কণ্ঠস্বর সঙ্গে সঙ্গে যেন একটা বিদ্যুৎ-তরঙ্গ বইয়ে দেয় সুসীমের শিরায় শিরায়।

সোজা হয়ে বসে সুসীম, কে সুনন্দা?

আশ্চর্য তো, তুমিই ঠিক ফোনটা ধরলে! সুনন্দার সেই পরিচিত কণ্ঠস্বর পুনরায় শোনা গেল।

হ্যাঁ, আমিই।

খুব ব্যস্ত বুঝি?

না না, ব্যস্ত কি—

আজ তো তোমার কালরাত্রি, তাই না?

কালরাত্রি কথাটা প্রথমটায় ঠিক যেন বুঝতে না পেরে পুনরাবৃত্তি করে সুসীম, কালরাত্রি!

তাই তো বলে আজকের রাতটাকে?

এতক্ষণে কথাটা বুঝতে পেরে সুসীম বলে, ও হ্যাঁ!

বেহুলার স্বামীকে কালনাগিনী দংশেছিল এই রাত্রে, তাই এই রাতটাকে বলে কালরাত্রি। তা কই—আমাকে তো নিমন্ত্রণও করলে না!

তুমি—কথাটা বলতে গিয়েও যেন বলতে পারে না সুসীম।

যাই বা না যাই, চিঠিও তো একটা দিতে পারতে ডাকে— প্রজাপতি-মার্কা! বুকপোস্টে দু'পয়সার ডাকটিকিটের বেশী তো কিছু আর খরচ হতো না!

সুসীম চুপ করে থাকে।

অন্য পক্ষ আবার বলে, কি, চুপ করে রইলে যে?

তারপর একটু থেমে আবার সুনন্দা বলে, বুঝতে পেরেছি—

কী?

কেন তুমি আমাকে নিমন্ত্রণ করো নি!

কেন?

আমার উপস্থিতিতে তোমার শ্রাবণী যদি সবার চোখে ছোট হয়ে যায় সেই ভয়ে। কারণ তুমি তো জানই, আমার পক্ষে চুপ করে থাকা সম্ভব হবে না!

তার মানে?

তুমি যে—

কি?

না, থাক।

কেন, শুনিই না?

সত্যি বল তো সুসীম, তুমি যে শ্রাবণীর জীবনে চতুর্থ পুরুষ, সে কথাটা কি সত্যিই তুমি জান না?

শ্রাবণীর আমার পূর্বে আর কোন স্বামী ছিল বলে তো শুনি নি!

কি একটা কথা বললে বল তো সুসীম! বিয়ে করার পর পুরুষ নাকি বোকা হয়ে যায় শুনেছি, কিন্তু তুমি যে দেখছি বিয়ের পর এক রাত্রি বৌয়ের সঙ্গে বাস করেই বোকা হয়ে গেলে!

তাই মনে হচ্ছে বুঝি?

নিশ্চয়ই। নইলে অন্তত তুমি কি করে ভাবলে আজকের দিনে কোন কুমারী মেয়ের জীবনে তার স্বামীই একমেবাদ্বিতীয়ম্ পুরুষ!

ও, এই কথা! কিন্তু যারা আমার বিশেষ পরিচিত তারা যে তোমার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয় তাই বা ভাবছো কি করে?

মানে? গলার স্বরটা তীক্ষ্ণ ধারালো শোনালো সুনন্দার।

চমকে উঠলে যেন মনে হচ্ছে! কিন্তু সত্যি-সত্যিই এতে চমকাবার কি আছে? তুমি তো একটু আগেই বললে কোন কুমারী মেয়ের জীবনে, বিশেষ করে তেত্রিশ বছর বয়স পর্যন্তও যারা কুমারী, তাদের যদি কখনো বিয়ে হয়ই, সেই স্বামীই তার জীবনে প্রথম বা একমেবাদ্বিতীয়ম্ পুরুষ হতে পারে না!

ও, এই কথা! মৃদু হাসির সঙ্গে সুনন্দার কণ্ঠ থেকে কথাটা উচ্চারিত হয়।

যাক্, ওসব কথা যেতে দাও। সুসীম পরক্ষণেই বলে, কাল আমার বৌভাতের উৎসবে যদি আসো তো সত্যই জেনো খুশী হবো।

সত্যি বলছো খুশী হবে?

সত্যি।

সত্যি?

সত্যি, সত্যি, সত্যি। আসবে কিনা বল এখন!

যাবো।

কথা দিলে?

দিলাম।

দুই

মাথাটার মধ্যে তখনো যেন কেমন ঝিম্‌ঝিম্ করছিল সুসীমের। এমন সময় সুসীমের ভগ্নীপতি হরপ্রসাদ সামনে এসে দাঁড়ালেন, সুসীম!

কে? ও আপনি!

পুলিসে ফোন করে এলাম।

পুলিস!

হ্যাঁ। উই মাস্ট ইনফরম দি পুলিস! সর্বাগ্রে পুলিসকেই একটা সংবাদ দেওয়া প্রয়োজন।

হরপ্রসাদের মুখের দিকে তাকিয়ে পুনরায় ঘরের চারিদিকে তাকাতেই লক্ষ্য করলো সুসীম, ইতিমধ্যে অত বড় হলঘরটা কখন যেন একেবারে খালি হয়ে গিয়েছে।

ঘরের মধ্যে সে ও হরপ্রসাদ ব্যতীত ঐ মুহূর্তে তৃতীয় আর কোন প্রাণীই নেই। এবং সোফার উপরে উপবিষ্ট ভঙ্গিতে রয়েছে সুনন্দার মৃতদেহটা। সুনন্দা মৃত! নতুন করে যেন আবার মনে পড়লো সুসীমের, সুনন্দা মৃত! সরু সাদা একটা সিল্ক কর্ডের সাহায্যে গলায় ফাঁস দিয়ে তাকে হত্যা করা হয়েছে।

নিকটবর্তী থানা-অফিসার সাধন দত্ত যখন এসে সুসীমের গৃহে পৌঁছলেন সংবাদটা পেয়ে, রাত তখন প্রায় দেড়টা।

সমস্ত বাড়িটা তেমনি সুসজ্জিত। ঘরে ঘরে তেমনি অত্যুজ্জ্বল সব আলো জ্বলছে। প্রায় দেড়শত আমন্ত্রিত নানা বয়েসী নারী-পুরুষে তখনো বাড়িটা ভর্তি।

শুধু থেমে গিয়েছে সানাই। আর থেমে গিয়েছে অকস্মাৎ কোন যাদুমন্ত্রবলে যেন উৎসব-গৃহের সমস্ত কলহাসি, গুঞ্জন। প্রায় দেড়শ' নরনারী মূক, যেন একেবারে বোবা হয়ে একতলায় সব ভিড় করে রয়েছে। দোতলা থেকে সবাই নীচে নেমে এসেছে।

এমন কি সুসীমের সব আত্মীয়স্বজন ও নববধূ শ্রাবণী পর্যন্ত নীচে চলে এসেছে। সকলের চলচ্ছক্তি তো বটেই, জিহ্বাও যেন আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছে।

আর সুসীম—সে যেন কেমন অসহায়ের মতো নীচের হলঘরের পাশের লাইব্রেরী ঘরটার মধ্যে একাকী একটা সোফার উপরে বসে চোখ বুজে পড়ে আছে।

হরপ্রসাদই করিডোরে থানা-অফিসারের আগমন-প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। পুলিসের কালো রংয়ের ভ্যানটা এসে করিডোরের সামনে দাঁড়াতেই তিনি এগিয়ে গেলেন।

সাধন দত্ত ভ্যান থেকে নেমে হরপ্রসাদকে তাঁর দিকে এগিয়ে আসতে দেখে তাঁকেই প্রশ্ন করলেন, এটাই তো সুসীম নাগের বাড়ি?

হ্যাঁ, আসুন।

কি ব্যাপার বলুন তো?

সুসীম আমার শ্যালক, আজ তার বৌভাতের উৎসব ছিল এই বাড়িতে। তার এক পরিচিতা মহিলা সুনন্দা চ্যাটার্জী আজ এখানে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন। তিনিই নিহত হয়েছেন।

ডেড্ বডি কোথায়?

উপরের হলঘরে—চলুন।

হরপ্রসাদই সাধন দত্তকে সিঁড়ি দিয়ে দোতলার পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন আগে আগে। সাধন দত্ত তাঁর পিছনে পিছনে সিঁড়ি অতিক্রম করে চললেন।

তা নিহত হয়েছে বলছেন?

হ্যাঁ, গলায় সরু একটা সিল্ক কর্ডের ফাঁস লাগিয়ে শ্বাসরুদ্ধ করে ভদ্রমহিলাকে হত্যা করা হয়েছে।

বলেন কি? ফাঁস!

হ্যাঁ।

কোন ডাক্তারকে ডেকেছিলেন?

ডাক্তার একজন এখানে উপস্থিত আছেন।

দু'জন এসে উপরের হলঘরে ঢুকলেন।

মৃতদেহ পরীক্ষা করে সাধন দত্ত অস্ফুট কণ্ঠে কেবল বললেন, হাউ হরিব্‌ল্? সত্যিই যে ফাঁস লাগিয়েই মারা হয়েছে দেখছি! কিন্তু বাড়ি-ভর্তি এত লোকের মাঝখানে এঁকে এমনি ফাঁস লাগিয়ে হত্যা করা হলো, আর কেউ আপনারা ব্যাপারটা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারলেন না?

তাই তো দেখছি—অসহায় ভঙ্গিতে যেন আমতা আমতা করে কথাটা বললেন হরপ্রসাদ।

নট ওনলি মিস্টিরিয়াস—আন্‌বিলিভেব্‌ল্ টু! কিন্তু কে প্রথমে ব্যাপারটা আবিষ্কার করলেন?

তা—তা তো ঠিক জানি না। এখানে আজ যাঁরা উপস্থিত, সম্ভবতঃ তাঁদেরই মধ্যে কেউ।

আজকের উৎসবে আপনাদের এ বাড়িতে এসেছিলেন হয়তো বহু লোক এবং তাঁদের মধ্যে সকলে নিশ্চয়ই নেই?

প্রশ্নটা করে সাধন দত্ত হরপ্রসাদের মুখের দিকে তাকালেন।

না। কারণ যাঁদের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গিয়েছিল, তাঁদের মধ্যে অনেকেই চলে গিয়েছেন। যাঁরা এখনো আছেন তাঁরা এক-চতুর্থাংশ হবেন—

অনেকেরই তাহলে এখনো খাওয়া-দাওয়া হয় নি?

না। এই ব্যাপারের পর—

হুঁ স্বাভাবিক। তাহলে বলতে পারছেন না—কে প্রথম ব্যাপারটা আবিষ্কার করেন?

না।

তা আপনার শ্যালক—এ বাড়ির মালিক সুসীমবাবু কোথায়?

নীচে আছে। বেচারা এমন হতভম্ব হয়ে গিয়েছে—

হবারই তো কথা। তাঁকে একবারটি এ ঘরে ডেকে আনবেন?

নিশ্চয়ই। আমি এখুনি ডেকে নিয়ে আসছি।

হরপ্রসাদ কথাটা বলে সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

সাধন দত্ত হরপ্রসাদের অনুপস্থিতিতে ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন।

হলঘরের যেদিকটায় সোফার উপরে মৃতদেহ ছিল, সেদিকটায় চারটে প্রমাণ-সাইজের স্টীলের গডরেজের আলমারি সামান্য সামান্য ব্যবধানে পাশাপাশি দাঁড় করানো ছিল। এবং সেই আলমারিগুলোর দিকে এগিয়ে যেতেই আরো একটা ব্যাপার সাধন দত্তের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। আলমারির পিছনেই একটি সংলগ্ন বাথরুম এবং বাথরুমের দরজাটা তখনো খোলাই রয়েছে। বাথরুমটা কিন্তু অন্ধকার।

মুহূর্তকাল যেন সাধন দত্ত কি ভাবলেন, তারপরই পকেট থেকে টর্চ বের করে বাথরুমের মধ্যে প্রবেশ করতে যেতেই দরজার পাশে দেওয়ালে বাথরুমের আলোর সুইচটা তাঁর নজরে পড়লো। হাত বাড়িয়ে সুইচটা টিপলেন, কিন্তু খুট্ করে একটা শব্দ হলো মাত্র, আলোটা জ্বললো না বাথরুমের।

হাতের টর্চটা জ্বেলেই সাধন দত্ত তখন বাথরুমের ভিতরটা দেখতে লাগলেন। ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে বড়লোকের বাড়ির বাথরুম। দুটো দরজা বাথরুমের, একটা ঐ হলঘরের সংলগ্ন—যে দরজাপথে এইমাত্র সাধন দত্ত প্রবেশ করেছেন, আর দ্বিতীয় দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ। হাত ধোবার বেসিন, মিরার, দেওয়ালের গায়ে ইউরিন্যাল, কমোড সবই আছে। এমন কি সোপ-কেসে সাবান ও টাওয়েলও আছে।

কিন্তু বাথরুমে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই খুব মৃদু হলেও একটা কেমন মিষ্টি বিজাতীয় গন্ধ নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করেছিল সাধন দত্তর। নাক দিয়ে নিঃশ্বাসের সঙ্গে টেনে টেনে গন্ধটা কিসের অনুভব করবার চেষ্টা করতে করতে আলো ফেলে ফেলে এদিক ওদিক ভাল করে তাকাতে তাকাতে অকস্মাৎ কমোডটার পাশেই সাদা মতো কি একটা সাধন দত্তর নজরে পড়লো।

কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে গিয়ে নীচু জিনিসটা তুলে নিতেই বুঝলেন সেটা একটা রুমাল।

রুমালটা হাতে তুলে নিতেই বুঝতে পারলেন ঐ রুমালটা থেকেই সেই গন্ধটা আসছিল। মিষ্টি গন্ধ—গন্ধটা এবারে কিসের বুঝতে দেরী হলো না সাধন দত্তর। ক্লোরোফরমের মিষ্টি গন্ধ।

রুমালটা পকেটে ঢুকিয়ে আরো কিছুক্ষণ বাথরুমটার চারিদিক ভাল করে পরীক্ষা করে দেখে বাথরুম থেকে বের হয়ে এলেন সাধন দত্ত।

হলঘরে পুনরায় ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই ওদিককার দরজাপথে হরপ্রসাদের সঙ্গে সুসীম এসে ঘরে ঢুকলো।

আপনিই এ বাড়ির মালিক সুসীম নাগ? প্রশ্ন করেন সাধন দত্ত।

হ্যাঁ।

আপনারই বৌভাতের উৎসব আজ এ বাড়িতে ছিল?

হ্যাঁ।

কিন্তু দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন!

সুসীম বসলো।

সাধন দত্ত আবার প্রশ্ন শুরু করলেন।

উনি অর্থাৎ যিনি নিহত হয়েছেন তিনিও শুনলাম, হরপ্রসাদবাবুর কাছে, আজকের আমন্ত্রিতদের মধ্যে একজন ছিলেন!

হ্যাঁ।

ওঁর নাম শুনলাম সুনন্দা চ্যাটার্জী, তাই না?

হ্যাঁ।

কোথায় থাকেন উনি? এই কলকাতায়ই কি?

হ্যাঁ। তিলজলায় থাকে।

বিবাহিতা না অবিবাহিতা?

কুমারী?

হ্যাঁ।

কি করতেন উনি?

ক্যালকাটা গার্লস কলেজের ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপিকা ছিলেন।

আচ্ছা উনি যে মারা গিয়েছেন, সেটা সর্বপ্রথম কে টের পায়?

প্রথমে—প্রথমে বোধ হয় জানতে পারে মৃণাল—

মৃণাল!

আমার বন্ধু। সেও আজ এখানে উপস্থিত আছে।

হরপ্রসাদবাবু, মৃণালবাবুকে একটিবার এ ঘরে ডেকে আনতে পারেন?

মৃণাল আমাদের সঙ্গেই এসেছিল, বাইরে সে দাঁড়িয়ে আছে।

ও, তাই নাকি! হরপ্রসাদবাবু, তাঁকে ডাকুন তো ঘরে।

হরপ্রসাদ বললেন, ডাকছি। কথাটা বলেই হরপ্রসাদ ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন এবং একটু পরেই মৃণালকে নিয়ে হরপ্রসাদ পুনরায় ঐ ঘরে ঢুকলেন।

ডাঃ মৃণাল সেন।

লম্বা-চওড়া রীতিমত বলিষ্ঠ চেহারা মৃণাল সেনের। এবং গায়ের রং শ্যাম হলেও চেহারায়

ও চোখে-মুখে অপূর্ব একটা শ্রী আছে। পরিধানে শান্তিপুরী ধুতি ও আদ্দির পাঞ্জাবি। চোখে কালো মোটা সেলুলয়েডের ফ্রেমের চশমা।

আপনার নাম মৃণাল সেন?

হ্যাঁ।

কি করেন আপনি?

ও ডাক্তার। জবাবটা দিল সুসীমই।

ডাক্তার! ভ্রূ-দুটো যেন মুহূর্তের জন্য কুঞ্চিত হলো সাধন দত্তর।

আপনি শুনলাম ডাক্তার সেন সুসীমবাবুর বন্ধু!

হ্যাঁ, অনেকদিনের বন্ধু আমরা। স্পষ্ট সহজ কণ্ঠে জবাব দেয় মৃণাল।

সুনন্দা চ্যাটার্জীর সঙ্গে নিশ্চয়ই আপনারও পরিচয় ছিল, ডাক্তার সেন?

ছিল।

শুনলাম আপনিই নাকি প্রথম ব্যাপারটা জানতে পারেন?

আমি! কেমন যেন একটু থতমত খেয়ে পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে মৃণাল বলে, হ্যাঁ, আমিই—

ব্যাপারটা আমাকে ডিটেইলস্ বলবেন, ডাক্তার সেন?

অতঃপর মৃণাল যা বললো তা হচ্ছে ঃ

নিমন্ত্রিতদের লাস্ট ব্যাচ তখন তেতলার ছাদে খেতে বসেছে। পাতে লুচি তরকারি পড়েছে, কিন্তু তখনও কেউ খেতে শুরু করে নি। কারণ যারা যারা সেই ব্যাচে বসবে, তাদের মধ্যে সকলে এসে পৌঁছায় নি আসরে।

মৃণালও ঐ লাস্ট ব্যাচে বসবে বলে ছাতে উঠে এসেছিল। এবং সুসীমই ঠেলেঠুলে তাকে পাঠিয়ে দিয়েছিল।

তুই যা, বসে পড় মৃণাল, আমি একবার নীচে যাই। সুসীম বলেছিল।

কেন, তুইও চল না—এই সঙ্গে বসে যাবি!

না রে, এখনো দেখছি কেউ কেউ আসেন নি—

তুইও যেমন! রাত কত হয়েছে জানিস? আর কেউ আসবে না, চল!

না। তুই যা, আমি আরো আধঘণ্টা দেখি।

মৃণাল অতঃপর উপরে চলে যায়। এবং ছাতে যেখানে খাওয়ার জায়গা হয়েছিল সেখানে পৌছে হঠাৎ এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে সুনন্দার কথা মনে পড়ে।

সুনন্দা তো কই তখনো খায় নি!

মৃণাল নীচে নেমে আসে সুনন্দাকে খোঁজবার জন্য। কারণ মৃণালকে সুনন্দা বলেছিল ফিরবার পথে যেন সুনন্দাকে সে সঙ্গে নিয়ে তার বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে যায়। কারণ সুনন্দার নিজের গাড়িটা সেদিন কারখানায় দেওয়ায় তাকে নাকি ট্যাক্সিতে আসতে হয়েছিল।

মনে পড়ে সুনন্দাকে সে ঘণ্টাখানেক আগে হলঘরের আলমারিগুলোর সামনে একটা সোফার উপরে বসে থাকতে দেখে শুধিয়েছিল, কি ব্যাপার, এখানে যে এভাবে দল ছেড়ে চুপচাপ বসে!

সুনন্দা জবাব দিয়েছিল, এমনি।

মনটা কেমন করছে বুঝি?

কেন?

মৃদু হেসে মৃণাল বলেছিল, না এমনিই বলছি—

আশ্চর্য তোমরা মৃণাল পুরুষরা, সত্যি—

কি রকম?

নিজেদের তোমরা এমন একটা উঁচু আসনে বসাতে অভ্যস্ত—

না না—আজকে ঝগড়া নয়, খালি পিস্—সন্ধি—

সুনন্দা হেসে ফেলে।

চল, ওঠো।

কোথায়?

চল বর্মা থেকে আমাদের এক কমন ফ্রেণ্ড্ এসেছে, নীচে তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।

না তুমি যাও, অন্য এক সময় বরং আলাপ করা যাবে। তাছাড়া—

তাছাড়া আবার কি?

আমি একজনের জন্য অপেক্ষা করছি।

বিস্ময়ে পাল্টা প্রশ্ন করে মৃণাল, অপেক্ষা করছো! কার জন্য?

কাল বলবো, আজ নয়।

বেশ। কালই তবে শুনবো।

মৃণাল আর দাঁড়ায় নি!

কিন্তু খাওয়ার পর ছাত থেকে হলঘরে এসে যখন সে ঢুকলো তখন হলঘর একেবারে খালি, কেবল সেই সোফাটার উপরে তেমনি তখনো একাকী বসে আছে সুনন্দা।

রাত তখন প্রায় সাড়ে এগারটা।

সুনন্দা!—বলে ডেকে কাছে এগিয়ে গিয়েই কিন্তু থমকে দাঁড়িয়ে যায় মৃণাল।

অস্বাভাবিক—অস্বাভাবিক মনে হয় সুনন্দাকে। আর একটু কাছে গিয়েই ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে দেরি হয় না মৃণালের। এবং তারপর গায়ে হাত দিতেই সে সুনন্দার মৃত্যু সম্পর্কে স্থিরনিশ্চিত হয়।

তারপর? সাধন দত্ত শুধালেন।

ঠিক সেই সময় বিশাখা এসে হলঘরে ঢোকে।

বিশাখা তখনো ব্যাপারটা ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারে নি।

সে তাই কৌতুক করতে করতে এগিয়ে আসে, কি ব্যাপার, নিভৃতে দু'জনে মুখোমুখি!

ফিরে তাকায় মৃণাল বিশাখার মুখের দিকে। মৃণালের সমস্ত মুখ ফ্যাকাশে রক্তশূন্য। চোখের দৃষ্টি অসহায় বিহ্বল।

চমকে ওঠে বিশাখা, বলে, কি ব্যাপার, মৃণাল?

মৃণাল কোন কথা না বলে নিঃশব্দে শুধু ইঙ্গিতে সুনন্দাকে দেখায়।

বিশাখা সুনন্দার দিকে তাকিয়ে বোকার মতোই তখনো ব্যাপারটা না বুঝতে পেরে পুনরায় প্রশ্ন করে, কি হয়েছে সুনন্দার?

সি ইজ্ ডেড্!

ডেড্?

একটা আর্ত অস্ফুট চীৎকার যেন বের হয়ে আসে বিশাখার কণ্ঠ থেকে।

তারপরই বিশাখা ছুটে ঘর থেকে বের হয়ে যায়। এবং ব্যাপারটা মুহূর্তের মধ্যে সকলের গোচরীভূত হয়ে যায়।

তিন

অতঃপর সাধন দত্ত নিমন্ত্রিতদের মধ্যে যাঁরা ঐ সময় সুসীমের গৃহে উপস্থিত ছিলেন একে একে তাঁদের সকলকেই ডেকে ব্যাপারটা সম্বন্ধে আর কেউ কিছু জানেন কিনা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন।

কিন্তু কারো কাছ থেকেই বিশেষ কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। এবং জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেল, কেউই বড় একটা সুনন্দাকে লক্ষ্য করেন নি।

মাত্র দু'জন ছাড়া।

বিষ্ণু দে আর বিশাখা চৌধুরী।

বিষ্ণু দে ওদের মানে সুসীমদেরই এক বন্ধু। তিনিও সুনন্দাকে চিনতেন। আর বিশাখা চৌধুরী শ্রাবণী, সুসীম ও মৃণালের বান্ধবী। বিশাখাও চিনতো সুনন্দাকে তবে কোন ঘনিষ্ঠ পরিচয় তার সুনন্দার সঙ্গে ছিল না নাকি।

প্রশ্ন করে জানা গেল, বিশাখা চৌধুরী নাকি দুর্ঘটনা জানাজানি হবার প্রায় আধ ঘণ্টাটাক আগে ঐ হলঘরে কাকে ডাকতে এসে সুনন্দাকে ঐ সোফায় বসে থাকতে দেখেছিল এবং সে তখন একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছিল।

আরো একটা ব্যাপার জানা গেল ঐ সঙ্গে যে ঠিক ঐ সময়টাতেই নাকি আমন্ত্রিতদের মধ্যে কে একজন ম্যাজিসিয়ান ভদ্রলোক ঘরের মধ্যে উপস্থিত নরনারীদের নানা ধরনের চমৎকার তাসের খেলা দেখিয়ে সকলকে মুগ্ধ করে রেখেছিলেন।

পাশেই বসেছিল সুসীম ও মৃণাল। সুসীমই হঠাৎ প্রশ্ন করে, তাসের খেলা!

হ্যাঁ।

কে আবার আজ দেখাচ্ছিলেন তাসের খেলা?

বিশাখা জবাব দেয়, তা তো জানি না। তাঁকে চিনিও না, কখনো আগে দেখি নি ভদ্রলোককে।

মৃণাল এবারে শুধায়, কেমন দেখতে ভদ্রলোক ছিলেন মনে আছে তোমার?

মনে আছে বৈকি। বিশাখা জবাব দেয়, ভদ্রলোককে দেখতে অনেকটা ঠিক তোমারই মতো।

আমার মতো?

মৃণাল যেন বিশাখার কথায় বিস্ময়ে কেমন একপ্রকার অভিভূত হয়েই তার মুখের দিকে তাকায়।

বিশাখার কথা তখনো শেষ হয়নি। এবং মৃণাল ও উপস্থিত সকলের বিস্ময়ের আরো কিছু বাকী ছিল।

বিশাখা বলল, শুধু অনেকটা সেই ভদ্রলোক তোমার মতোই বা দেখতে বলছি কেন, তাঁর গলার স্বরটাও মনে পড়ছে এখন যেন তোমারই মতো শুনেছিলাম।

সত্যি বলছো বিশাখা! কেমন যেন প্রায় নিশ্চুপ কণ্ঠে প্রশ্নটা করলো মৃণাল।

সত্যিই বলছি, বিশ্বাস কর। তবে পার্থক্যও কিছু ছিল বৈকি। বেশভূষাটা পর্যন্ত তোমারই মতো হলেও, তাঁর ছিল ফ্রেঞ্চকাট্ দাড়ি ও চোখে কালো কাচের চশমা।

বিশাখার জবানবন্দীটা যেন সকলকে সত্যিই কেমন বিমূঢ় করে দেয়। ম্যাজিক দেখানোর কথাটা আরো দশ-বারোজন নিমন্ত্রিতও সমর্থন করলেন। কিন্তু সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য যে সুসীম ব্যাপারটা ঘুণাক্ষরেও জানে না। কারণ ও-ধরনের চেহারার কোন লোকই তার নিমন্ত্রিতদের লিস্টে নাকি আজ ছিল না।

মৃণালও তাই বললে।

আর বিষ্ণু দে—তিনি বললেন, দুর্ঘটনাটা আবিষ্কৃত হবার বোধ হয় মাত্র মিনিট দশ-পনের আগে কি একটা কাজে ঐ হলঘরের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে তিনি নাকি ঠিক ঐখানে ঐ সোফার উপরে সুনন্দাকে বসে থাকতে দেখেছিলেন অন্য এক ভদ্রলোকের সঙ্গে। এবং সেই ভদ্রলোকের চেহারা নাকি বিশাখা বর্ণিত সেই ম্যাজিসিয়ান ভদ্রলোকের মতোই ছিল।

অর্থাৎ যতদূর জানা যাচ্ছে ঐ বিষ্ণু দে ভদ্রলোকই সুনন্দা চ্যাটার্জীকে শেষ জীবিত দেখেন—যে সময় সুনন্দা তার পার্শ্বে উপবিষ্ট একই সোফায় অনেকটা যাকে প্রায় সেই ম্যাজিসিয়ান ভদ্রলোকের মতই দেখতে তাঁরই সঙ্গে কথা বলছিল।

সাধন দত্ত প্রশ্ন করলেন, ভদ্রলোকের চেহারাটা আপনার ঠিক মনে পড়ছে, মিঃ দে?

হ্যাঁ, বললাম তো, বিশাখা দেবী এইমাত্র যে চেহারার কথা বললেন সেই ভদ্রলোকের চেহারাটাও ঠিক তেমনি ছিল।

বিস্ময়ের ব্যাপার সন্দেহ নেই।

বিভিন্ন ব্যক্তির জবানবন্দী থেকে যা দাঁড়াচ্ছে তাতে করে এইটুকু অন্ততঃ বোঝা যাচ্ছে যে, বিশাখা দেবী ও অন্যান্য অনেকেরই বিবৃত চেহারার কোন এক ভদ্রলোক ঐ দিন ঐ উৎসবে সুসীমের গৃহে উপস্থিত ছিলেন।

কিন্তু কে সে ভদ্রলোক?

সুসীমবাবু বলছেন, অমন চেহারার কেউই তাঁর গৃহে নিমন্ত্রিতদের মধ্যে ছিলেন না।

তবে ভদ্রলোকটি কোথা থেকে এলেন আর কোথায়ই বা গেলেন?

তবে কি সে-ই সুনন্দা চ্যাটার্জীর হত্যাকারী?

সত্যি সত্যি সে হত্যাকারী হলেও, ব্যাপারটা যেন কেমন দুর্বোধ্য। কারণ সেই লোকই যদি সুনন্দাকে গলায় ফাঁস দিয়ে হত্যা করে থাকে তো সুসীমের অপরিচিত হয়েও কোন্ দুঃসাহসে সে এখানে প্রবেশ করেছিল আজ রাত্রে?

আর কেমন করেই বা এত লোকের মাঝখানে, বলতে গেলে এতগুলো লোকের এক রকম চোখের উপরেই সুনন্দাকে হত্যা করে গেল লোকটা?

ইতিমধ্যে রাত্রি শেষ হয়ে এসেছিল। নিমন্ত্রিতরা সকলেই যে যার গৃহে ফিরে গিয়েছেন। সাধন দত্তও মৃতদেহ মর্গে পাঠাবার ব্যবস্থা করে আপাততঃ সুসীমের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে উঠে আবার বসে পড়ে প্রশ্ন শুরু করলেন।

চার

সবাই চলে গিয়েছে।

কেবল সুসীম, শ্রাবণী, ভগ্নীপতি হরপ্রসাদ, সুসীমের বোন সুধা উপরের লাইব্রেরী-ঘরে যেন তখনো বিহ্বল বিমূঢ় হয়ে বসে ছিল।

এ কি অপূর্ব, অকল্পিত বিভ্রাট!

হরপ্রসাদ লোকটি যেমন স্থির ধীর, তেমনি তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন এবং রীতিমত রসিক প্রকৃতির। সুদীর্ঘকাল দুই পুরুষ ধরে ওঁদের পরিবার পাটনা শহরে আছে। হরপ্রসাদ পাটনা হাইকোর্টে ব্যারিস্টার হিসাবে প্র্যাক্‌টিস্ করেন এবং একজন নামকরা ব্যারিস্টার। বয়সে দু'এক বছরের বড়ই হবেন হরপ্রসাদ সুসীম থেকে। কিন্তু তা হলেও উভয়ের মধ্যে অর্থাৎ হরপ্রসাদ ও সুসীমের মধ্যে একটা রসের এবং মধুর প্রীতির সম্পর্ক বরাবরই ছিল। সুনন্দা যে একসময় দীর্ঘদিন ধরে শ্যালক সুসীমের মনোহারিণী ছিল, ব্যাপারটা হরপ্রসাদের বা তাঁর স্ত্রী সুধার অজানা ছিল না।

তাই মধ্যে মধ্যে সুসীমকে একটু রসিকতার সুরেই বলতেন হরপ্রসাদ, দেখ ভায়া, তোমার বান্ধবীটি যখন তোমার মন হরণ করেছেন তখন যে তিনি সত্যি সত্যিই মনোহারিণী সন্দেহ নেই, কিন্তু কি জান ভায়া—

কি?

ঐ মন হারানো ও মন পাওয়া পর্বের মধ্যে একটা মাধুর্য আছে নিঃসন্দেহে, কিন্তু তুমি ব্যাপারটা যেভাবে টেনে টেনে দীর্ঘস্থায়ী করে তুলছো তাতে করে তোমার ওপরে তাঁর আস্থাটা শেষ পর্যন্ত যদি মিইয়েই যায় তাতে করে তাঁকে দোষ দেওয়া যাবে না।

মৃদু হেসে জবাব দিয়েছে সুসীম, না, সে ভয় নেই।

নেই তো?

না।

একটু বেশী স্যাংগুইন-ই যেন তুমি বলে মনে হচ্ছে ভায়া!

তা একটু বৈকি। পুনরায় হাসির সঙ্গেই জবাব দিয়েছে সুসীম তার ভগ্নীপতিকে।

কিন্তু তারপর হঠাৎ যখন তাঁর বিবাহের আট বছর বাদে হরপ্রসাদ শ্যালকের কাছ থেকে চিঠি পেলেন, সুসীমের বিবাহের দিন স্থির, তিনি যেন অবিলম্বে সুধাকে নিয়ে কলকাতায় চলে আসেন—তখনো কিন্তু হরপ্রসাদ ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারেন নি যে পাত্রী সুনন্দা চ্যাটার্জী নয়, শ্রাবণী চৌধুরী!

যাই হোক, স্ত্রী-সহ হরপ্রসাদ অবিলম্বে মানে বিয়ের সাতদিন আগেই কলকাতায় এসে পৌঁছালেন এবং গাড়ি থেকে নেমেই শ্যালককে কৌতুক করে জিজ্ঞাসা করলেন, মন-জানা-জানির পর্ব তাহলে এতদিনে শেষ হলো ভায়া!

যদিও আলাপ ছিল, তবুও সেভাবে জানবার বা বুঝবার চেষ্টাই করি নি কখনো। আর সময় পেলাম কোথায়?

মানে?

মানে পনের দিন আগে পর্যন্তও তো ব্যাপারটা ভাবতে পারি নি।

ভাবতে পারো নি—সময় পেলে না মানে? বারোটা বছর যে একটা যুগ হে—তোমাদের উভয়ের জানাজানি—

ও, তুমি সুনন্দার কথা বলছো বুঝি? কিন্তু সে তো নয়! হরপ্রসাদকে থামিয়ে দিয়েই কথাটা বলে সুসীম।

বিস্ময়ের যেন সত্যিই অবধি থাকে না হরপ্রসাদের। বলেন, সে কি হে? তুমি কি তবে সুনন্দাকে বিয়ে করছো না?

না।

সত্যি বলছো?

সত্যিই।

হরপ্রসাদ এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথা বলছিলেন। এবারে সোফাটায় বসে পড়ে বললেন, দাঁড়াও, দাঁড়াও—তুমি যে ভায়া সত্যি-সত্যিই আমাকে বোকা বানিয়ে দিচ্ছ! রসিকতা করছো না তো?

রসিকতা কেন হবে! হাসতে হাসতে সুসীম বলে, বিয়ে করছি আমি অন্য একটি মেয়েকে—শ্রাবণী চৌধুরী তার নাম।

ও। তা—তাহলে সুনন্দা—

পূর্ববৎ হাসতে হাসতেই সুসীম বলেছিল, সুনন্দা নামটা শুনেই তো বোঝা উচিত ছিল হরপ্রসাদ—সে হচ্ছে দশের নন্দিতা! কোন ব্যক্তিবিশেষের নন্দিতা হতে সে রাজী হবে কেন?

বল কি!

তাই।

কিন্তু—

না হে, তা ছাড়া—

তা ছাড়া?

প্রেম আর বিয়ে ও দুটো বস্তু তো এক নয় হে। একটা হচ্ছে সযতনে ব্যবহার করবার মতো পোশাকী দামী সিফন শাড়ী, অন্যটা আটপৌরে শাড়ি—একান্ত সাংসারিক ঘরোয়া ব্যাপার।

কিন্তু তাহলে তোমার ও সুনন্দার মধ্যে এতদিনকার সম্পর্কটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে! একেবারে ছাড়াছাড়ি নয় তো?

ছাড়াছাড়ি হবে কেন?

তাই তো ভায়া, ব্যাপারটা যেন কেমন গোলমেলে মনে হচ্ছে!

গোলমেলে কেন হতে যাবে?

হ্যাঁ, গোলমালের বৈকি—

না, গোলমেলে কিছু নেই।

বলছো?

হুঁ।

কিন্তু শ্রাবণীকে কি ব্যাপারটা বলেছো?

বলবার প্রয়োজন হয় নি—

প্রয়োজন হয় নি!

না। সে জানে।

জানে মানে?

একটু আগেই তো বললাম, সেও অপরিচিতা ছিল না। সুনন্দার কথা সে সবই জানত।

এ কথাটাও পরে শুনেছিলেন হরপ্রসাদ, সুসীম শেষ পর্যন্ত সুনন্দাকে তার বিবাহে নিমন্ত্রণ পর্যন্ত করে নি।

তাই সেই সুনন্দা যখন বৌভাতের দিন সেজেগুজে এসে হাজির হলো উৎসব-বাড়িতে, হরপ্রসাদ একটু অবাকই হয়েছিলেন। তারপর সুসীম সুনন্দাকে যেভাবে রিসিভ করেছিল—যেন বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হয়েই সে এসেছে, ব্যাপারটা হরপ্রসাদকে যেন আরো একটু বেশী অবাক করে।

আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে হরপ্রসাদ কথাটা সুসীমকে না শুধিয়ে পারেন নি, তবে যে বলেছিলে ভায়া সুনন্দাকে তুমি নিমন্ত্রণ জানাও নি!

মৃদু হেসে সুসীম বলেছিল, কাল রাত্রে নিমন্ত্রণ করেছিলাম—

সত্যি?

সত্যি। হরপ্রসাদ অতঃপর চুপ করেই গিয়েছিলেন।

কিন্তু সুসীমের বোন সুধা সুনন্দাকে আসতে দেখে খুশী হয় নি। আসলে একমাত্র ভাইয়ের সঙ্গে সুনন্দার প্রগাঢ় ঘনিষ্ঠতাটা কোনদিনই প্রীতির চোখে দেখে নি সুধা। কি জানি কেন, সুনন্দাকে আদপেই যেন তার ভাল লাগতো না কোনদিন। সুনন্দার চালচলন বেশভূষা প্রসাধন কথাবার্তা কোনটাই সুধার কোনদিন ভাল লাগে নি।

সুনন্দার সঙ্গে সুধারও আলাপ-পরিচয় ছিল, যেহেতু সুধাও একসময় সুনন্দার সহপাঠিনী ছিল। এবং অতীতে সেই সূত্রেই সুসীমদের বাড়িতে সুনন্দার যাতায়াত শুরু হয়েছিল। সেই সময়ই সুসীমের আলাপ প্রথম সুনন্দার সঙ্গে। এবং ক্রমশ শ্রাবণী, বিশাখা চৌধুরী প্রভৃতির সঙ্গেও তখনই আলাপ হয়।

সুধার তারপর অবিশ্যি বিয়ে হয়ে যাওয়ায় পড়া বন্ধ হয়ে যায়। সে স্বামীর ঘর করতে চলে যায় পাটনা।

প্রথম যেদিন সুধা লক্ষ্য করেছিল, সুনন্দা তাদের গৃহে তার কাছে এলেও তার আকর্ষণটার মূল হচ্ছে সুসীম এবং সুধাদের বাড়িতে এলে বেশীর ভাগ সময় সে সুসীমের ঘরে তার বন্ধুদের সঙ্গেই কাটায়, তখন থেকেই সুধার যেন কেমন ব্যাপারটা ভাল লাগত না।

মুখে কিছু না বললেও, সেই থেকেই সে সুনন্দাকে এড়িয়ে চলতে শুরু করে। এবং ক্রমশ তার মনে যেন সুনন্দার প্রতি একটা বিতৃষ্ণা জমে উঠতে থাকে।

তবে কোনদিনই সে সুনন্দা সম্পর্কে কোন অসন্তোষ প্রকাশ করে নি। কারণ সে জানতো সুসীমের সঙ্গে সুনন্দার একটা প্রগাঢ় ঘনিষ্ঠতা আছে।

বিয়ের ব্যাপারে তাই সে আসতেও চায় নি প্রথমটায়। কিন্তু হরপ্রসাদ বলেছিলেন স্ত্রীকে, ছিঃ সুধা, এ সময় তোমার মনে যাই থাক না কেন, না যাওয়াটা হবে একটা অমার্জনীয়

অপরাধ। তা ছাড়া সে যখন পছন্দ করে বিয়ে করছে, তখন তোমার আমার কি বলবার থাকতে পারে!

একান্ত অনিচ্ছার সঙ্গেই আসতে হয়েছিল সুধাকে। কিন্তু এসে যখন শুনলে সুনন্দা নয়—অন্য একটি মেয়ের সঙ্গে সুসীমের বিয়ে হচ্ছে, তখন সুধা সত্যিই খুশী হয়েছিল। ভারী মনটা তার হালকা হয়ে গিয়েছিল। নতুন উৎসাহে সে বিয়ের ব্যাপারে কোমর বেঁধেছিল।

কিন্তু বৌভাতের উৎসবে সুনন্দাকে আসতে দেখে আবার সুধা যেন একটু ক্ষুণ্ণই হয়েছিল, যদিও সে জানতো না শেষ পর্যন্ত কেন সুসীম সুনন্দাকে না বিয়ে করে শ্রাবণীকে বিয়ে করলো!

সুনন্দা নিহত হওয়ায় হরপ্রসাদ ও সুধা এই কথাগুলি ভাবছিল।

হরপ্রসাদ ও সুধা দুজনের মনের মধ্যেই নানা প্রশ্ন উদিত হতে থাকে, কিন্তু কেউই সুসীমকে মুখ ফুটে কোন প্রশ্ন করতে পারে না।

সুধা কিন্তু শেষ পর্যন্ত চুপ করে থাকতে পারে না, ঘরের পাষাণ-স্তব্ধতা ভঙ্গ করে কতকটা যেন নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করবার মতো কথাটা উচ্চারণ করে, কিন্তু কে হত্যা করলো ওকে অমন করে?

সুধার কণ্ঠ হতে কথাটা উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যেন সহসা ঘরের মধ্যে উপস্থিত সকলে চম্‌কে সুধার মুখের দিকে তাকালো।

কে!

সুধার কণ্ঠ হতে উচ্চারিত কথাগুলোর মধ্যে 'কে' নিষ্ঠুর এই শব্দটা যেন একটা বিষাক্ত ছুঁচের মতো সকলের চেতনাকে বিদ্ধ করে।

সুসীম ভাবে কে, হরপ্রসাদ ভাবে কে, সুধা ভাবছে কে, শ্রাবণীও ভাবে কে?

কয়েকটা স্তব্ধ মুহূর্ত অতিবাহিত হবার পর হরপ্রসাদ কথা বলেন, তার চাইতেও বড় কথা, এই বাড়িতেই বিশ্রী ব্যাপারটা ঘটলো!

সুধা অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে, কিন্তু তার জন্য কি আমরা দায়ী?

দায়ী—আমরা দায়ী কেমন করে? অসহায় কণ্ঠে কথাটা বলে সুসীম সকলের মুখের দিকে তাকায়।

মনে হলো সত্যিই যেন সুসীম একটা অবলম্বন খুঁজছে।

দায়ী আমরা নিশ্চয়ই হয়তো নয়—হরপ্রসাদ বলেন।

হয়তো মানে! কি—কি আপনি বলতে চান হরপ্রসাদবাবু? শ্রাবণী প্রশ্নটা করে।

না না—তাই তো বলছিলাম। আমরা—আমরা দায়ী হবো কেন? কিন্তু পুলিস—

হরপ্রসাদের কথাটা শেষ হলো না, সুধা স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে শুধায়, পুলিস কি?

এ বাড়িতে ব্যাপারটা যখন ঘটেছে, তখন আমাদের তারা—মানে ঐ পুলিস খুব সহজে নিষ্কৃতি দেবে কি?

নিষ্কৃতি দেবে না মানে! এ কি জুলুম নাকি? সুধা যেন তীক্ষ্ণকণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে।

জুলুমের কথা নয় সুধা, কথাটা হচ্ছে আইনের। অদ্ভুত শান্ত কণ্ঠে যেন কথাটার প্রত্যুত্তর দিলেন হরপ্রসাদ।

আইন!

হ্যাঁ, আইন, আইনই জুলুম করবে।

রেখে দাও তোমার আইন, জুলুম করলেই অমনি হলো! প্রতিবাদ জানায় সুধা পুনরায় তীক্ষ্ণকণ্ঠে।

এবারে আর হরপ্রসাদ কোন জবাব দিলেন না। মৃদু হাসলেন মাত্র।

পাঁচ

সুনন্দা চ্যাটার্জীর নিহত হওয়ার ব্যাপারটা আর যার মনেই যেটুকু রেখাপাত করুক বা না করুক—স্বামী-স্ত্রী সুসীম ও শ্রাবণীর মনের মধ্যে কিন্তু কোথায় যেন একটা সূক্ষ্ম চিড় ধরিয়ে দিয়ে গেল।

আনন্দের আকাশে কোথায় যেন একটা কালির বিন্দুর মত মেঘ দেখা দিল। বিবাহের পূর্বে শ্রাবণীর সঙ্গে সুসীমের যে পরিচয়টা ছিল, তার মধ্যে আর যাই হোক ঘনিষ্ঠতা বলতে যা বোঝায় সেরকম সত্যই কিছু ছিল না সুসীমের দিক থেকে।

কিন্তু সুসীম যেটা কোনদিনই বুঝতে পারে নি বা বুঝবার কোন অবকাশ পায় নি সেটা হচ্ছে শ্রাবণীর একটা দুর্বলতা ছিল তার প্রতি।

আর শ্রাবণীও সেটা কোনদিন সুসীমকে বুঝতে দেয় নি।

কারণ সুনন্দার প্রতি সুসীমের মনোভাবটা শ্রাবণীর অজ্ঞাত ছিল না।

সেদিন মাত্র দিন-পনের আগে হঠাৎ যখন সুসীম গিয়ে শ্রাবণীর কাছে বিবাহের প্রস্তাব করেছিল, তখন শ্রাবণী একটু যেন বিস্মিতই হয়েছিল। কয়েকটা মুহূর্ত সে জবাব দিতেও পারে নি।

আমি বুঝতে পারছি প্রস্তাবটা তোমার কাছে খুবই আকস্মিক মনে হচ্ছে শ্রাবণী, তাই এখুনি এই মুহূর্তেই কোন জবাব তোমার কাছে আমি চাই না। তুমি বরং ভেবে দেখো—কাল-পরশু না-হয় আবার আমি আসব!

যাবার জন্য সুসীম পা বাড়ায়।

শোন!

হঠাৎ সেই সময় শ্রাবণী ডাকে।

একটা কথা আমি বুঝতে পারছি না—

কি?

আমার কথা না হয় ছেড়েই দিচ্ছি, কিন্তু কারোরই তো এতদিন জানতে বাকী ছিল না যে তুমি সুনন্দাকেই বিয়ে করবে!

প্রত্যুত্তরে হাসে সুসীম।

হাসছো যে?

কথাটা এতদিন লোকে জানত বটে, মিথ্যাও তুমি বল নি, কিন্তু—

থামলে কেন, বল?

ভুল বোঝা বলে মানুষের একটা ব্যাপারও তো থাকতে পারে!

ভুল?

হ্যাঁ, সবটাই হয়তো একটা ভুলের ওপরই এতদিন দাঁড়িয়ে ছিল—

এই বারো বছর ধরে ভুল?

সারাজীবনেও তো মানুষের কোন কোন ভুল শোধরায় না—তা এ তো বারোটা বছর! তবু একটু বেশী সময়ই নয় কি?

তাই তো তোমাকে সময় দিয়ে যাচ্ছি। জবাব তো আজই এই মুহূর্তেই আমি চাইছি না।

শ্রাবণী অতঃপর কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। কোন কথাই বলে না। সুসীমও চুপ করেই থাকে।

তারপর শ্রাবণী এক সময় বলে, এ রকমটা যে একদিন হবে আমি তা জানতাম।

তুমি জানতে! বিস্ময়ে তাকায় সুসীম শ্রাবণীর মুখের দিকে।

হ্যাঁ, জানতাম। আর তুমি চোখ বুজে না থাকলে এতদিনে সেটা জানতে পারতে।

কি—কি জানতে পারতাম?

জানতে পারতে সে তোমাকে সত্যিই ভালবাসে না। শুধু তোমাকেই বা বলি কেন, কোন পুরুষকে ভালবাসার মতো নারীমনই ওর নেই।

শ্রাবণী!

হ্যাঁ, নারীর যে মন পুরুষকে ভালবাসে, সে মনই যে ওর নারী হয়েও নেই। যাক সে কথা, আমার কথা আমি বলছি না, তুমি বরং আরো কিছুদিন ভেবে দেখ।

ভেবেই আমি তোমার কাছে আজ এসেছিলাম শ্রাবণী।

সত্যি বলছো?

হ্যাঁ।

বেশ, তাহলে তুমি ব্যবস্থা করতে পারো।

আনন্দে সুসীম শ্রাবণীর একটা হাত ধরে ফেলে বলে, সত্যি—সত্যি শ্রাবণী!

সত্যি।

আঃ! তুমি—তুমি আমাকে বাঁচালে। কি নিশ্চিন্ত যে তুমি আমাকে করলে। কিন্তু একটা কথা শ্রাবণী—

বল?

আজ-কালের মধ্যেই কিন্তু চাকরিতে তোমাকে তাহলে ইস্তফা দিতে হবে—

না।

সে কি! বিয়ের পরেও চাকরি করবে?

না, বিয়ের পরে আর করবো না। তবে রেজিগনেশান দেবো বিয়ের পর—এখন নয়।

কি ভেবে এবারে সুসীম বলে, বেশ।

আর একটা কথা—

কি?

বিয়েটা কিন্তু আমাদের রেজিস্ট্রী করে হবে, রাজী তো?

বেশ। আমার আপত্তি নেই।

ঘটনাচক্রে মধুরাত্রি ওদের যাপন করা হয়ই নি।

তাই সুধা পরের দিন রাত্রে নতুন উৎসাহে আবার ঘর সাজিয়েছিল। এবং স্বামীকে বলে এক রাত্রির জন্য এমন কি সানাইয়ের পর্যন্ত ব্যবস্থা করেছিল। সুসীম অনেক বাধা দিয়েছিল, কিন্তু

কান দেয় নি তার কথায় সুধা। রাত্রে নিজের হাতে শ্রাবণীকে সাজিয়ে পাঠিয়েছিল সেই ঘরে।

সুসীম ঘরের কোণে একটা ইজিচেয়ারের উপর বসে ছিল। শ্রাবণী এসে ঘরে ঢুকতেই সে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু শ্রাবণী স্বামীর সঙ্গে কোন কথাই বললো না। ঘরের সংলগ্ন যে ব্যালকনি ছিল সেই ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়াল।

সারাদিন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দেখাও হয় নি—কথাও হয় নি।

শ্রাবণী ঘরে ঢুকেই ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়াতে সুসীম যেন কেমন একটু থতমত খেয়ে যায়। অতঃপর কিছুক্ষণ সে ঘরের মধ্যেই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

তারপর কি ভেবে ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিয়ে ব্যালকনির দিকেই অগ্রসর হয়।

অন্ধকারে শ্রাবণী ব্যালকনির রেলিং ধরে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

বাইরে সানাই তখনো বাজছে।

সুসীম এসে পিছনে দাঁড়াতেও কিন্তু শ্রাবণী ফিরে তাকাল না বা কোন কথা বললো না। তবু কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে সুসীম। কিন্তু শ্রাবণী যখন সাড়া দিলই না, তখন মৃদুকণ্ঠে ডাকে, শ্রাবণী!

শ্রাবণী নিরুত্তর।

সুসীম আবার ডাকল, শ্রাবণী!

তথাপি শ্রাবণী কোন সাড়া দেয় না।

সাড়া দিচ্ছ না কেন শ্রাবণী? তুমি কি কথা বলবে না?

আমি কিছুদিনের জন্য শিলং যেতে চাই—এবং কালই যেতে চাই।

মৃদুকণ্ঠে শ্রাবণী এবারে কথাগুলো বলে।

শিলং!

হ্যাঁ।

ও। তা কালই তুমি যেতে চাও!

হ্যাঁ, এখানে—এ বাড়িতে যেন এক মুহূর্তও আর আমি টিকতে পারছি না।

বেশ। কিন্তু সেখানে—

সেখানে ছোট মাসী আছে আমার, কিছুদিন সেখানে গিয়ে আমি থাকবো।

বেশ। তবে আমি ভাবছিলাম, আমাদের কথা হয়েছিল বিয়ের পর মাসখানেক আমরা মুসৌরী গিয়ে মধুচন্দ্রিমা যাপন করবো—

না না—ওসব এখন থাক!

বেশ তাই হবে, কিন্তু একটা কথা—

কি?

সত্যিই যদি আমাকে কিছু তোমার বলবার থাকে তো বলতে পার।

বলবার! তোমাকে?

হ্যাঁ।

মুহূর্তকাল নিঃশব্দে অন্ধকারে যেন স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে রইলো শ্রাবণী।

তারপর বললো, কিছু বলবার নেই আজ আর তোমাকে— কিছু বলবার আর নেই—

শ্রাবণী!

হ্যাঁ, বলবার যা সেদিনই তো আমি বলেছিলাম তোমাকে, যেদিন বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে আমার কাছে গিয়ে তুমি দাঁড়িয়েছিলে। কিন্তু কেন—কেন সেদিন সত্য কথাটা গোপন করেছিলে বলতে পার?

সত্য কথা গোপন করেছি!

করো নি? সুনন্দাকে যে তুমি ভুলতে পারো নি, কোনদিন পারো না—কথাটা কেন গোপন করেছিলে আমার কাছে সেদিন?

শ্রাবণী, শোন—

কি আর শুনবো—কি আর তুমি বলবে? কিন্তু কেন এমনটা করলে তুমি আমার সঙ্গে? আমি তো কোনদিন তোমার কোন ক্ষতি করি নি, তবে তুমি আমার এতবড় ক্ষতিটা কেন করলে?

শ্রাবণী, বিশ্বাস করো, কোন ক্ষতি তোমার আমি করি নি—

এখনো তাই বলবে?

সত্যি বলছি, বিশ্বাস করো—

বিশ্বাস! আচ্ছা বলতে পারো, সুনন্দাকে যে শেষ পর্যন্ত নিমন্ত্রণ করেছিলে—কথাটা কেন আমার কাছে গোপন করেছিলে?

বলতাম নিশ্চয়ই, কিন্তু বলবার সময় পেলাম কোথায়?

বলবার সময় পাও নি, না? কিন্তু পরশু রাত্রে সুনন্দার সঙ্গে ফোনে কথা বলবার পর যখন সুধার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল তাকেও তো কথাটা বলো নি! জামাইবাবুকেও বলো নি! ইচ্ছা করেই তুমি বলো নি! কিন্তু—

কি বল, থামলে কেন?

না থাক, ভুল যখন আমারই, সে ভুলের প্রায়শ্চিত্তও করতে তো হবে আমাকেই। তুমি শুধু কাল আমার শিলং যাবার ব্যবস্থা করে দাও।

কিন্তু ভেবে দেখ একটু শ্রাবণী, কালই যদি তুমি শিলং চলে যাও, ব্যাপারটা কি সকলের চোখেই বিশ্রী ঠেকবে না?

বিশ্রী ঠেকুক আর না-ই ঠেকুক, আমি যাবোই।

যেও তুমি, আমি বাধা দেব না। তবে জামাইবাবু আর সুধা চলে যাক, তারপর যেও। শুধু আমার এই অনুরোধটুকু তুমি রাখো শ্রাবণী। এখন শোবে চল—

না, তুমি যাও।

শুতে যাবে না?

না।

সুসীম আর অনুরোধ জানাল না। ঘরের মধ্যে চলে গেল।

আর শ্রাবণী ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে রইলো অন্ধকারে।

ছয়

তিনদিন পরে।

বিচিত্র একটা সংবাদ যেন সুসীমকে একেবারে বিমূঢ় করে দেয়।

সকালের দিকে সুসীম নীচে তার বসবার ঘরে একটা চেয়ারে বসে সেদিনকার দৈনিকটার উপর চোখ বুলাচ্ছিল, এমন সময় থানা-অফিসার সাধন দত্ত এসে ঘরে ঢুকলেন।

বসুন, মিঃ দত্ত! কোন খবর আছে নাকি?

আছে।

কি?

একটা বিশেষ ব্যাপারে আলোকসম্পাতের জন্যে আপনার কাছে আসতে হলো আমাকে সুসীমবাবু! সাধন দত্ত বললেন।

কি বলুন তো?

দুদিন ধরে খোঁজখবর নিয়ে যা জানতে পারলাম—

কি?

সুনন্দা দেবীর সঙ্গে গত বারো বছর ধরে তিনজন খুব ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন আপনারা—

তিনজন!

হ্যাঁ, প্রথম হচ্ছেন আপনি—

আমি? হ্যাঁ, তা আমি—মানে আমার সঙ্গে সুনন্দার—

কথাগুলো যেন কেমন এলোমেলো হয়ে যায় সুসীমের।

সাধন দত্ত বলেন, হ্যাঁ আপনি, ডাঃ মৃণাল সেন আর—

কিন্তু—

শুনুন, আরো একজন ছিল—

কে?

নীরেন সেন।

বিস্ময়ে যেন বোবা হয়ে যায় সুসীম, সাধন দত্তর মুখ থেকে নামটা উচ্চারিত হতেই।

সে, মৃণাল ও নীরেন একই বছরে বি. এস-সি. পাস করে। একই কলেজে পড়েছে তারা। তারপর মৃণাল গিয়ে ভর্তি হলো কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে। সে এক বছর এম. এস-সি পড়ে পড়া ছেড়ে বাপের কোলিয়ারীর বিজনেস দেখাশোনা করতে শুরু করে। কারণ হঠাৎ সেই সময় তার বাপের মৃত্যু হয়।

আর বর্মায় এক ধনী টিম্বার-মার্চেন্ট কাকা ছিলেন নীরেনের—তাঁর কাছেই সে চলে যায় ভাগ্যান্বেষণে ঐ সময়ই। সেও আজ প্রায় দশ বছর হতে চললো বৈকি। মনে পড়ে সুসীমের, গত দশ বছরে অবশ্য অনেকবার এসেছে নীরেন কলকাতায় এবং কখনো এক মাস, কখনো বা দু'মাস থেকে গিয়েছে।

সেই নীরেনের সঙ্গে যে সুনন্দার কোন দিন কোন সূত্রে আলাপ ছিল, স্বপ্নেও তা জানতে পারে নি সুসীম। আর সুনন্দার সঙ্গে নীরেনের যদি আলাপই ছিল তো সেকথা কোন দিন তাদের ঘুণাক্ষরে জানতেই বা দেয় নি কেন সে? ব্যাপারটা রীতিমতো বিস্ময়েরই।

এ আপনি কি বলছেন মিঃ দত্ত, নীরেনের সঙ্গে সুনন্দার পরিচয় ছিল? কথাটা শেষ পর্যন্ত সুসীম না বলে পারে না।

মৃদু রহস্যপূর্ণ হাসি হেসে সুসীমের দিকে তাকিয়ে সাধন দত্ত বললেন, কেন, আপনি তো উভয়েরই ঘনিষ্ঠ বন্ধু, আপনি ব্যাপারটা জানতেন না বলতে চান?

বিশ্বাস হয়তো করবেন না আপনি, তবে ব্যাপারটা আমি জানতাম না সত্যিই। আর মৃণালও যে জানে না, তাও আমি জোর করে বলতে পারি।

আপনার এখানে আসার আগে আমি ডাঃ সেনের ওখান হয়েই এসেছি। তিনিও আপনার মতই বললেন, তিনিও জানতেন না কিছু। তাতেই কিন্তু ব্যাপারটা আমার কাছে একটু দুর্বোধ্য মনে হচ্ছে—

কিন্তু কথাটা আপনি জানলেন কি করে?

কতকগুলো চিঠি দেখে।

চিঠি!

হ্যাঁ। চিঠিগুলো গতকাল সুনন্দা দেবীর তিলজলার বাড়ির শোবার ঘর সার্চ করতে গিয়ে পেয়েছি। চিঠিগুলো অবিশ্যি সবই প্রেমপত্র বলা চলতে পারে।

প্রেমপত্র!

হ্যাঁ। চিঠিগুলো লিখেছেন ডাঃ সেন, আপনি ও নীরেনবাবু। তবে বেশীর ভাগ চিঠিই নীরেনবাবুর লেখা।

নীরেনের লেখা!

হ্যাঁ, বর্মার প্রোম থেকে লেখা চিঠি। আর সত্যি কথা বলতে কি, আপনাদের সবার চিঠিগুলো পড়ে নীরেনবাবুর চিঠিগুলোর মধ্যেই যেন বেশী ঘনিষ্ঠতার ইঙ্গিত পেয়েছি।

চিঠিগুলো দেখতে পারি?

একজিবিট হিসাবে চিঠিগুলো আপাততঃ থানায় রয়েছে। মামলার সময় দেখতে পাবেন বৈকি, অবশ্য দেখতে চাইলে! কিন্তু যেজন্যে আমি বিশেষ করে এসেছি সেটা হচ্ছে, সুনন্দা চ্যাটার্জী যেদিন নিহত হয় তার ঠিক আগের দিনই কোন এক সময় সুনন্দা চ্যাটার্জীকে নীরেনবাবু একটা চিঠি লেখেন—

কি চিঠি?

সে চিঠিটার কপি আমার কাছে আছে। বলে পকেট থেকে একটা লেখা কাগজ বের করে সুসীমের হাতে তুলে দিলেন সাধন দত্ত।—দেখুন!

সংক্ষিপ্ত চিঠি।

সোনা,

কালকের ব্যাপারের জন্যে সত্যিই আমি দুঃখিত। বিশ্বাস কর, আমি ছাড়া তুমি এ দুনিয়ার আর কারো হবে এ আমার পক্ষে ভাবাও দুঃসাধ্য। আমি টেম্পার লুজ করেছিলাম একমাত্র সেই কারণেই। যাই হোক, তুমি যখন চেয়েছো তখন সেটা নিশ্চয়ই আমি ফিরিয়ে দেবো। কাল তো তুমি সুসীমের ওখানে আসছোই, কালই সেখানে দিয়ে দেবো। তোমার বাড়িতে গিয়েই দিয়ে আসতে পারতাম, কিন্তু তা পারবো না—কারণ তোমার বাড়ির দরজায় আর কখনো এ জীবনে আমি পা দেবো না, আর আমার বাড়ির দরজাও তোমাকে মাড়াতে দেবো না।

ইতি তোমার—'নী'

চিঠিটা পড়তে পড়তে সুসীমের মনের মধ্যে একটা কথা উঁকি দেয়, তবে কি সেই কারণেই

যেচে নিজে আমন্ত্রণ নিয়ে সুনন্দা তার বৌভাতের উৎসবে এসেছিল?

কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে যায় সুসীম।

মিঃ নাগ!

য়্যাঁ! সাধন দত্তর ডাকে চমকে সুসীম তাঁর দিকে তাকালো।

চিঠিটা আপনার বন্ধু নীরেনবাবুর হাতের লেখা কিনা সেটা প্রমাণসাপেক্ষ। তবে তাঁর অন্যান্য চিঠির সঙ্গে মিলিয়ে আমার তো ধারণা হয়েছে, একই হাতের লেখা—যদিচ হুবহু একেবারে মেলে নি। কিন্তু হাতের লেখার সঙ্গে হুবহু মিল হোক বা না-ই হোক, এ চিঠি যে নীরেনবাবুরই লেখা তার অকাট্য প্রমাণ কিন্তু আমি অন্যভাবেও পেয়েছি।

কি প্রমাণ?

প্রমাণ পেয়েছি, যেদিন চিঠিটা লেখেন নীরেনবাবু তার আগের দিন সন্ধ্যায় তিনি সুনন্দা চ্যাটার্জীর বাড়িতে গিয়েছিলেন।

তাতে কি হলো?

শুনুন, এখনো সব কথা শেষ হয় নি আমার। সেদিন দুজনার মধ্যে কোন কারণে প্রচণ্ড ঝগড়া হয়, মিস্ চ্যাটার্জীর ঝি মনোরমা শুনেছে—

ঝগড়া হয়েছিল?

হ্যাঁ, আর সেই সময় ঝগড়া করে বের হয়ে আসবার মুখে নাকি নীরেনবাবু তাঁকে শাসিয়ে এসেছিলেন, সুনন্দা দেবীকে তিনি হত্যা করবেন!

সত্যি—সত্যি বলছেন?

সত্যিই বলছি—মনোরমা বলেছে।

হঠাৎ ঐ সময় সাধন দত্তর শেষ কথাটা যেন একটা অন্য উপলব্ধি জাগায় সুসীমের মনে। সে চম্‌কে ওঠে এবং ব্যগ্রকণ্ঠে শুধায়, হোয়াট আর ইউ ড্রাইভিং এট্ মিঃ দত্ত!

এখনো বুঝতে পারছেন না? নীরেনবাবুই হত্যা করেছেন সেরাত্রে মিস চ্যাটার্জীকে!

না—দ্যাট্ কাণ্ট্ বি! ইম্‌পসিব্‌ল্! ফ্যানাটিক্!

না, ইম্‌পসিব্‌ল্ বা ফ্যানাটিক্ নয় সুসীমবাবু। গম্ভীর কণ্ঠে কথাটা বলে পকেট থেকে একটা রুমাল বের করে রুমালটা সুসীমের সামনে মেলে ধরেন সাধন দত্ত, আরো প্রমাণ আছে—এই রুমালটা দেখুন, এই রুমালের কোণে সুতো দিয়ে লেখা 'N' অর্থাৎ নীরেনের আদ্যাক্ষর—

কিন্তু—

এই রুমালটা আমি কোথায় পেয়েছি জানেন?

কোথায়?

সেরাত্রে আপনারই এই বাড়িতে। যে হলঘরে মিস্ চ্যাটার্জী নিহত হন, সেই হলঘরেরই সংলগ্ন বাথরুমের মধ্যে। আর—

আর?

রুমালটার মধ্যে ক্লোরোফরমের গন্ধ ছিল!

না না—এসব আপনি কি বলছেন মিঃ দত্ত! আর্ত ব্যাকুল কণ্ঠে যেন কথাগুলো বলতে গিয়ে সুসীম ভেঙে পড়ে।

যা বলছি, মিথ্যা একটি বর্ণও তার মধ্যে নেই। এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, সেক্ষেত্রে নীরেনবাবুই সুনন্দা চ্যাটার্জীকে হত্যা করেছিলেন!

কি বলছেন আপনি? তাহলে কি আপনি নীরেনকে অ্যারেস্ট করছেন?

আপনি যদি আমি হতেন, তাই কি করতেন না! আচ্ছা আমি তাহলে আজকে উঠবো।

সাধন দত্ত উঠে দাঁড়ান।

মিঃ দত্ত!

সাধন দত্ত যাবার জন্য পা বাড়িয়েছিলেন, সুসীমের ডাকে ঘুরে দাঁড়ালেন।

আপনি কি সত্যিই তাহলে বিশ্বাস করেন যে নীরেনই সুনন্দাকে হত্যা করেছে?

প্রত্যুত্তরে নিঃশব্দে মৃদু হাসলেন সাধন দত্ত শুধু।

কিন্তু—কিন্তু আপনার ভুলও তো হতে পারে মিঃ দত্ত!

ভুল?

হ্যাঁ—

না, ভুল আমার হয় নি। গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিলেন সাধন দত্ত।

সাত

কি যেন সেই কবিতাটা?

কিরীটীর প্রশ্নে কেমন যেন বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকায় তার মুখের দিকে, কবিতা!

হ্যাঁ, সেই যে—

In the same hour and hall
The fingers of a hand
Came forth against the wall,
And wrote as if on sand :
The fingers of a man ;—
A solitary hand.

এ যেন ঠিক সেই ব্যালসেজার্‌স্ ফিস্টের সলিটারি হ্যাণ্ডের মতোই সুনন্দা চ্যাটার্জীর মৃত্যুলিপি লেখা হয়ে গেল!

কথাগুলো বলে কিরীটী কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যে এদিক থেকে ওদিক পায়চারি করতে লাগলো।

মৃণাল সেন কিন্তু ভিতরে ভিতরে অস্থির হয়ে ওঠে।

নীরেনের গ্রেপ্তারের সংবাদটা সে জানতো না। সুসীম টেলিফোনে তাকে জানিয়েছিল এবং সেই সঙ্গে জানিয়েছিল নীরেনের সঙ্গে সুনন্দার প্রগাঢ় ঘনিষ্ঠতার কথা, যদিচ সে আগেই কথাটা সাধন দত্তর মুখে শুনেছিল। সংবাদটা শুনে অবধি মৃণালও কম আশ্চর্য হয় নি। কারণ সেও সুসীমের মতোই প্রথম শুনলো যে সুনন্দার সঙ্গে নীরেনের একটা প্রগাঢ় ঘনিষ্ঠতা ছিল!

নীরেন তাদের উভয়েরই বন্ধু, অথচ তারা এতদিন ঘুণাক্ষরেও দুজনের একজনও জানতে পারেনি যে সুনন্দার সঙ্গে তার এতটা ঘনিষ্ঠতা কখন কি ভাবে গড়ে উঠেছিল। ব্যাপারটা জানবার পর মৃণালের যেটা স্বভাবতই মনে হয়েছে সেটা হচ্ছে, নীরেন তাদের কাছ থেকে ব্যাপারটা গোপন করেছে।

কিন্তু কেন? ব্যাপারটা তাদের কাছে গোপন করবার মতো কি এমন কারণ থাকতে পারে নীরেনের?

সুনন্দার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতার কথাটা যদি তারা জানতই, তাতে এমন কি এসে যেতো! বিশেষ করে তাদের দুজনেরই সঙ্গে যখন সুনন্দার পরিচয় ছিল!

সে কি ভেবেছিল, সুনন্দার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতার ব্যাপারটা জানতে পারলে তারা খুশি হবে না? এই পর্যন্ত চিন্তা করেই মৃণাল নিজের কাছেই নিজে কেমন দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

নীরেনকে সামনাসামনি পেলে হয়তো মৃণাল তাকে কথাটা স্পষ্টাস্পষ্টিই জিজ্ঞাসা করতো। কিন্তু সে অবকাশ সে পায় নি। তার কারণ সংবাদটা যখন সে সুসীমের কাছ থেকে জানতে পারলো, তার আগেই নীরেনকে সাধন দত্ত গ্রেপ্তার করেছেন।

নাগালের বাইরে সে—হাজতে।

তবু চেষ্টা করেছিল মৃণাল সাধন দত্তর সঙ্গে দেখা করে নীরেনের সঙ্গে হাজতে দেখা করবার একটা অনুমতি পাওয়ার।

কিন্তু সাধন দত্ত রাজী হন নি।

অথচ সাধন দত্তর যুক্তি যাই হোক না কেন এবং সুনন্দাকে যে নীরেনই হত্যা করেছে সে-সম্পর্কে যতই তিনি স্থিরনিশ্চিত হোন না কেন, মৃণাল কোনমতেই যেন মন থেকে ব্যাপারটা মেনে নিতে পারে নি—সাধন দত্তর যুক্তিটাকে গ্রহণ করতে পারে নি।

তা ছাড়া বন্ধু হিসাবেও নীরেনের এই দুর্দিনে তার পাশে গিয়ে দাঁড়ানো তার কর্তব্য। এই কথাটা ভেবে মৃণাল যখন কোন দিক দিয়ে কোন পথ খুঁজে পাচ্ছিলো না, তখন হঠাৎ তার কিরীটীর কথা মনে পড়ে যায়।

কিরীটী রায়! একসময় তার সঙ্গে মৃণালের যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল।

তীক্ষ্ণ বুদ্ধি লোকটার। সে হয়তো তাকে এ সময় কোন একটা পথ দেখিয়ে দিতে পারে। শুধু কি পথ, কিরীটীর কথা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আরো একটা কথা মৃণালের মনে হয়, নীরেনের এই দুর্দিনে তাকে একমাত্র হয়ত ঐ কিরীটী রায়ই সাহায্য করতে পারে।

পুলিসের অসাধ্য কিছুই নেই।

একবার যখন তারা নীরেনকে সুনন্দার হত্যা-ব্যাপারে সন্দেহ করে গ্রেপ্তার করেছে, তখন সহজে তারা তাকে নিষ্কৃতি দেবে না।

বরং আপ্রাণ চেষ্টাই করবে তাকেই হত্যাকারী প্রমাণিত করতে।

আর তারা নীরেনের বন্ধু হয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকবে!

না, তা উচিত নয়—কর্তব্যও নয়।

পরের দিনই সকালের দিকে মৃণাল কিরীটীর বাড়িতে গিয়ে হাজির হলো।

কি ব্যাপার ডাক্তার? কিরীটী শুধায়।

বিশ্রী একটা বিপদে পড়ে এসেছি তোমার শরণাপন্ন হয়ে।

কি হলো?

সংক্ষেপে ঘটনা বিবৃত করে মৃণাল তখন।

কিরীটী সমস্ত ব্যাপারটা শুনে অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর এক সময় সোফা থেকে উঠে পায়চারি শুরু করে।

আট

সাধন দত্ত যাই বলুন না কেন কিরীটী, আমি কিছুতেই বিশ্বাস করি না নীরেন সুনন্দাকে সেরাত্রে হত্যা করেছে!

কিন্তু তোমার বন্ধুর বিরুদ্ধে যে প্রমাণগুলো সাধন দত্ত হস্তগত করেছেন একটু আগেই তুমি বললে, সেগুলো তো একেবারে কিছু নয় বলে অস্বীকার করতে পারা যাচ্ছে না ডাক্তার—

কি এমন প্রমাণ? সেই চিঠি আর সুসীমের ঘরের বাথরুম থেকে কুড়িয়ে পাওয়া এক কোণে লাল সুতোয় 'এন' লেখা রুমালটা তো! কিন্তু ঐ 'এন' লেখা রুমালটা যে নীরেনেরই, তার প্রমাণ কি? সুসীমের বাড়িতে সেদিন নিমন্ত্রিত বহু লোকের সমাগম হয়েছিল, তাদের অনেকের নামেরই আদ্যাক্ষর খুঁজলে দেখা যাবে হয়ত 'এন'!

শান্তকণ্ঠে কিরীটী পূর্ববৎ পায়চারি করতে করতেই বাধা দিয়ে বলে, তোমার যুক্তির যে সারবত্তা নেই তাও আমি বলছি না ডাক্তার—

তবে?

তুমি যেমন বলছো সেই লাল সুতোয় 'এন' লেখা রুমালটা তোমার বন্ধু নীরেনবাবুর না হয়ে অন্য যাঁরা সে রাত্রে ওখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁদেরও কারো হতে পারে, তেমনি অবিসংবাদিভাবে যে এটা তোমার বন্ধু নীরেনবাবুর নয় তারও কোন অকাট্য প্রমাণ তো তুমি দিতে পারছো না ডাক্তার!

না, তা পারছি না—তবে সে তো নীরেনকে জিজ্ঞাসা করলেই জানা যেতে পারে!

এ যে ছেলেমানুষের মত কথা বলছো!

মানে?

ধর যদি নীরেনবাবু সত্যি কথা না বলেন—

বাঃ, কেন সে মিথ্যে 'না' বলতে যাবে?

কেন যাবে, তাই না? যাবে, হয়ত কোন স্বার্থ থাকলে—

না, না—সত্যি বলছি কিরীটী, নীরেন তাকে কিছুতেই হত্যা করতে পারে না—

আহা, সে তো পরের কথা! আপাততঃ রুমালটার কথাটাই ভাবা যাক না!

রুমালটার কথা আবার কি ভাববো?

কেন, তুমিই তো একটু আগে বললে, সাধনবাবু বলেছেন, রুমালটায় ক্লোরোফর্মের গন্ধ ছিল।

তা তো ছিল। কিন্তু—

কথা হচ্ছে, তাহ'লে কি ভাবে সুনন্দা দেবীকে হত্যা করা হয়েছে? ক্লোরোফর্ম দেবার পরে ফাঁস লাগিয়ে, না ক্লোরোফর্মের সাহায্য হত্যাকারী আদপেই নেয় নি? কেবলমাত্র কোন ব্যক্তিবিশেষের ওপর সুনন্দা দেবীর হত্যার সন্দেহটা আরোপ করবার জন্য ক্লোরোফর্ম মাখিয়ে হত্যাকারী ঐ রুমালটি বাথরুমে ফেলে রেখে গিয়েছিল—

মৃণালের মনে হয়, লোকটা কি আবোল-তাবোল বকছে! কিন্তু মুখে কিছু প্রকাশ করে না।

কিন্তু যাক সে কথা, একটা কথার জবাব দিতে পারো ডাক্তার?

কি?

তোমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়েও নীরেনবাবু সুনন্দার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতার কথাটা তোমাদের দু'বন্ধুর কাউকেই কেন এতদিন জানতে দেয় নি?

বললাম তো একটু আগে, ব্যাপারটা আমাদেরও কম আশ্চর্য, অভিভূত করে নি! কেন যে সে কথাটা গোপন করেছিল—

আচ্ছা এমনও তো হতে পারে—

কি?

তুমি ও সুসীমবাবু দু'জনেই সুনন্দা দেবীকে ভালবাসতে—তাই তোমাদের বন্ধু হলেও সুনন্দার ব্যাপারটা তিনি তোমাদের কাছ থেকে গোপন করে গিয়েছেন?

মৃণাল চুপ করে থাকে।

জান তো, ভালবাসার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বন্ধুত্বের কোন মূল্য নেই! তা ছাড়া আরো একটা কথা—

কি?

সুনন্দা দেবীকে লেখা সেই অদ্ভুত চিঠিটা! বিশেষ করে সাধন দত্ত যখন জোর গলায় বলছেন, সে চিঠি নীরেবাবুরই হাতের লেখা!

হ্যাঁ বলেছেন বটে, তবে—

উঁহু, বেশ জটিল—আর আমার কি মনে হচ্ছে জান?

কি?

এর পশ্চাতে রয়েছে মদনের ফুলশর—

মদনের ফুলশর!

হুঁ। মনে করো কবির সেই অক্ষয় পংক্তি—"পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছো এ কি সন্ন্যাসী!"

তাহ'লে—

Love is jealous, love is selfish ! অবিশ্যি এ-ও আমি সাধন দত্তর মত হলফ করে বলছি না যে তোমার বন্ধু নীরেনবাবুই তোমাদের বান্ধবী সুনন্দা দেবীর হত্যাকারী—

দেখো কিরীটী, ওসব আমি কিছু বুঝি না। আমি আবারও হলফ করে তোমাকে বলছি যে নীরেন নির্দোষ। আর সেটা তোমাকেই প্রমাণ করে দিতে হবে।

কিরীটী মৃদু হেসে বলে, বেশ বেশ, তাই হবে—

কথা দিচ্ছ তুমি?

কথা! বেশ, কথা দিলাম।

মৃণাল অতঃপর যেন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

কিন্তু একটা কথা ডাক্তার—

কি?

তোমার বন্ধু সুসীমবাবু, তাঁর—তাঁরও কি বিশ্বাস নীরেনবাবু সত্যিই নির্দোষ?

নিশ্চয়ই।

বেশ। তবে কাল একবার তোমার বন্ধুর বাড়িটা আমি ঘুরে আসতে চাই।

বেশ তো, ইচ্ছা করলে তুমি অবিশ্যি আজ—এখুনি যেতে পারো। এখুনি তোমাকে আমি সেখানে নিয়ে যেতে পারি—

না, আজ নয়! কাল—কাল বেলা আটটা সাড়ে আটটা নাগাদ তুমি এসো।

মৃণাল অতঃপর বিদায় নিল।

মৃণাল ঘর থেকে বের হয়ে যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই টেলিফোনে সাধন দত্তকে ডাকল কিরীটী।

কে?

সাধনবাবু, আমি কিরীটী রায়।

কি সৌভাগ্য! নমস্কার। কি খবর?

কি করছেন এখন? খুব ব্যস্ত নাকি?

না, না—বসে আড্ডা দিচ্ছি।

তাহলে একবার আসুন না গরীবের গৃহে। সুনন্দা চ্যাটার্জীর মার্ডার কেসটায় আমি একটু ইনটারেস্‌টেড্ ছিলাম—

এখুনি—এখুনি আসছি!

আরো ঘণ্টাখানেক পরে।

কিরীটীর ঘরেই সাধন দত্ত ও সে মুখোমুখি দুজনে বসে সুনন্দা চ্যাটার্জীর হত্যার ব্যাপারটা নিয়েই আলোচনা করছিল। সাধন দত্তর সঙ্গে বছর পাঁচেক পূর্বে ঘটনাচক্রে কিরীটীর আলাপ হয়। এবং সে ঘটনাটা হচ্ছে একটি জাল উইলের ব্যাপার। সেই সময়ই সাধন দত্তর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখে মুগ্ধ হয়েছিল কিরীটী।

তাই মৃণালের মুখে সাধন দত্ত নীরেন সেনকে সুনন্দার হত্যাব্যাপারে সন্দেহ করে গ্রেপ্তার করেছেন শুনে ব্যাপারটাকে আদৌ লঘুভাবে নিতে পারে নি সে। এবং এ-ও বুঝতে পেরেছিল কিরীটী, বিশেষ কোনো কারণ আছে বলেই সাধন দত্ত নীরেন সেনকে গ্রেপ্তার করেছেন।

সাধন দত্তর মুখে তাই আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনাটা শোনবার পর কিরীটী বলে, কেবলমাত্র ঐ রুমাল ও চিঠিটার উপর নির্ভর করে যে আপনি নীরেনবাবুকে গ্রেপ্তার করেন নি, তা আমি জানি সাধনবাবু। তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম—

না মিঃ রায়, আপনি ঠিকই ধরেছেন। সুসীমবাবুকে বা মৃণালবাবুকে আমি বলি নি সব কিছু স্পষ্ট করে। একটু আগে আপনাকে যে মহিলাটির কথা বললাম, বিশাখা, মানে বিশাখা চৌধুরী, সেই মহিলাটি তাঁর জবানবন্দীতে একটা কথা বলেছিলেন। অবিশ্যি সে রাত্রে নয়, পরের দিন সন্ধ্যায় তাঁর ওখানে যখন গিয়েছিলাম—

কি বলেছিলেন তিনি?

রাত তখন সাড়ে দশটা হবে। যে বাথরুমের মধ্যে আমি সে-রাত্রে রুমালটা কুড়িয়ে পেয়েছিলাম, সেই বাথরুমে প্রবেশ করবার আর একটা দরজা ছিল পিছনের বারান্দা দিয়ে। সেই দরজা দিয়ে বাথরুমে ঢুকতে গিয়ে ফিরে আসেন বিশাখা চৌধুরী, বাথরুমে ঐ সময় নীরেন সেনকে পিছনে ফিরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে।

কিন্তু—

শুনুন, আরো আছে। নীরেন পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে থাকলেও ঐ সময় তাঁর হাতে একটা শিশি দেখতে পেয়েছিলেন বিশাখা।

কিন্তু কথাটা তিনি তাঁর প্রথম দিনের জবানবন্দীতে আপনাকে প্রকাশ করেন নি কেন?

সে সময় ব্যাপারটার মধ্যে কোন গুরুত্ব খুঁজে পান নি বলেই সে রাত্রে আমাকে এ সম্পর্কে কিছু বলতে নাকি তিনি ভুলে গিয়েছিলেন।

আচ্ছা সে-সময়, মানে যখন তিনি নীরেন সেনকে দেখতে পান তখন বাথরুমে কি আলো জ্বলছিল?

না, বাথরুম অন্ধকার ছিল। তবে—

কি?

হলঘরের আলোর খানিকটা অংশ বাথরুমের মধ্যে গিয়ে পড়ায় বাথরুমটার মধ্যে অস্পষ্ট একটা আলোছায়া ছিল। তারপর যা বলছিলাম, নীরেন সেন বাথরুম থেকে চলে যাবার পর বিশাখা গিয়ে বাথরুমে ঢুকেই নাকি ক্লোরোফর্মের গন্ধ পেয়েছিলেন।

হুঁ। আচ্ছা ঠিক রাত্রি কটায় যেন সুনন্দা চ্যাটার্জী মৃত আবিষ্কৃত হয়?

সোয়া এগারটা থেকে সাড়ে এগারটার মধ্যে।

বিশাখা চৌধুরী কি নীরেন সেনের পূর্বপরিচিত ছিলেন?

না।

ডাঃ সেন, সুসীম নাগ ও সুনন্দার সঙ্গে নিশ্চয়ই পরিচয় ছিল তাঁর?

সুসীমের সঙ্গে ছিল, তবে এক কলেজে কাজ করলেও সুনন্দার সঙ্গে শুনেছি বিশাখার তেমন হৃদ্যতা বা ঘনিষ্ঠতা ছিল না।

বিশাখা চৌধুরীর বয়স কত হবে?

ত্রিশ-বত্রিশ হবে।

বিয়ে করেছেন?

না।

কি করেন ভদ্রমহিলা?

সুনন্দা চ্যাটার্জীর সঙ্গে একই কলেজে অধ্যাপকের কাজ করেন এই তো বললাম।

তা বিয়ে এখনো করেন নি কেন ভদ্রমহিলা? তিনিও কি ঐ তিনজনের একজনকে ভালোবাসতেন?

সে রকম কোন কিছু তো এখনো জানা যায় নি।

জানা কিন্তু উচিত ছিল। যাক্ বাথরুমের মধ্যে সেরাত্রে পিছন ফিরে স্বল্প আলো-আঁধারিতে যে ব্যক্তি শিশি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি যে নীরেন সেনই, সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই তো আপনার বিশাখা চৌধুরীর?

না।

দৃষ্টিশক্তি খুব প্রখর বলতে হবে ভদ্রমহিলার। কিন্তু আমি ভাবছি—দৃষ্টিশক্তি যার এত প্রখর, তিনি ব্যাপারটা জেনেও সেরাত্রে আপনাকে বলেন কি কেন?

বললাম তো, ব্যাপারটায় প্রথমে উনি তত গুরুত্ব নাকি দেন নি।

কিন্তু স্বাভাবিক ভাবে বিচার করতে গেলে তো দেওয়া উচিতই ছিল, তাই নয় কি মিঃ দত্ত?

তা অবিশ্যি ছিল।

চুরোটটা নিভে গিয়েছিল, সেটায় পুনরায় অগ্নিসংযোগ করে বার-দুই টান দিয়ে কিরীটী ইতিমধ্যে পায়চারি থামিয়ে যে চেয়ারটার উপর উপবেশন করেছিল সেটারই পিছনে হেলান দিয়ে যেন আরাম করে বসল গা ঢেলে দিয়ে।

সাধনবাবু, সকলের কথাই আপনি বললেন, কিন্তু সুসীম নাগের ভগ্নী সুধা দেবী ও সেদিন নিমন্ত্রিত হয়ে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে বিষ্ণু দে ভদ্রলোকটির কথা তো তেমন বিশেষ কিছু বললেন না!

কিরীটীর প্রশ্নে কতকটা যেন বিস্ময়ের সঙ্গেই তাকান সাধন দত্ত তার মুখের দিকে।

কিন্তু কিরীটীর সঙ্গে চোখাচোখি হলো না সাধন দত্তর। কারণ কিরীটী তখন হাত বাড়িয়ে সামান্য ঝুঁকে সম্মুখের ছোট গোল টেবিলটার উপরে রক্ষিত কাচের ছাইদানিটায় হাতের অগ্নিদগ্ধ চুরোটের অগ্রভাগটা ঝাড়ছিল।

সুধা দেবী আর বিষ্ণু দে!

হ্যাঁ, হরপ্রসাদবাবু তাঁর জবানবন্দীতে কি বলেন নি যে তাঁর স্ত্রী সুধা দেবী তাঁর একমাত্র ভাইয়ের সুনন্দা চ্যাটার্জীর সঙ্গে প্রগাঢ় ঘনিষ্ঠতা কোন দিনই তেমন প্রীতির চোখে দেখেন নি?

হ্যাঁ, তাই বলেছিলেন বটে।

তাহলে স্বভাবতই কি আমরা ধরে নিতে পারি না যে আমন্ত্রণ না করা সত্ত্বেও রবাহূতভাবে সুনন্দা চ্যাটার্জীর সেরাত্রের উৎসবে সুসীম নাগের বাড়িতে উপস্থিতিটা সুধা দেবীর কাছে প্রীতির ব্যাপার হয় নি? এবং সুধা দেবী একজন নারী—

কিন্তু—

কি জানেন সাধনবাবু, ঐদিনকার ব্যাপারে সুধা দেবী অবহেলার যোগ্য নন! আর বিষ্ণু দে ভদ্রলোকটি এবং তাঁর জবানবন্দীও অবহেলার বস্তু নয়!

কিন্তু বিষ্ণু দে—

বিশাখা তাঁর জবানবন্দীতে বলেছেন, সুনন্দা চ্যাটার্জীর মৃত্যুর ব্যাপারটা জানাজানি হবার আধঘণ্টাটাক আগে তিনি নাকি ঐ হলঘরে কাকে ডাকতে এসে সোফায় সুনন্দা চ্যাটার্জীর পাশে বসে একজন ভদ্রলোককে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে দেখেছিলেন এবং সেই সময় ম্যাজিসিয়ান ভদ্রলোক তাসের ম্যাজিক দেখাচ্ছিলেন!

এবং বিষ্ণু দে-ও তার মিনিট পনেরো পরে হলঘরে এসে তাই দেখেছিলেন। অর্থাৎ তাহলে কি এই দাঁড়াচ্ছে না যে, বিষ্ণু দে ও বিশাখা চৌধুরী দুজনে ব্যাপারটা দেখেছেন?

হ্যাঁ।

কিন্তু বিশাখা তাঁর জবানবন্দীতে বলেছেন, সেই ম্যাজিসিয়ানের বেশভূষা, এমন কি তাঁর কণ্ঠস্বরটা পর্যন্ত নাকি মৃণাল সেনের মতো!

তা তো বলেছেনই।

কিন্তু সেকথা কি বিষ্ণু দে বলেছেন?

না।

অথচ তাঁর কাছ থেকেও ঐ একই ব্যাপারটা কি আমরা আশা করি না?

তিনি বলেছেন, তিনি নাকি ম্যাজিসিয়ানের কণ্ঠস্বর চিনতে পারেন নি।

মিথ্যে কথা।

কি বলছেন মিঃ রায়?

বললাম তো মিথ্যে কথা। A deliberate and intentional lie! বিষ্ণু, মৃণাল ও সুসীমবাবু তিনজনেই মিথ্যা বলেছেন।

কিন্তু—

এর মধ্যে কোন কিন্তুই নেই, মিঃ দত্ত। নিমন্ত্রণ-বাড়িতে অত লোক তাঁর ম্যাজিক দেখলো, তিনি প্রকাশ্যে সকলের চোখের সামনে হলঘরের মধ্যে ম্যাজিক দেখালেন, অথচ সুসীমবাবু আর মৃণাল তাঁকে দেখলেন না—আপনি কি আমাকে কথাটা বিশ্বাস করতে বলেন?

অবিশ্যি আপনি যা বলছেন—

যুক্তি ছাড়া কিরীটী রায় কথা বলে না।

তাহলে কি আপনার ধারণা নীরেন সেন হত্যাকারী নয়?

ধারণা আমার কিছুই নয়, আর কিছুই এই মুহূর্তে আমি বলছি না। It is too early to say anything! তবে এইটুকু আপনাকে বলতে পারি মিঃ দত্ত—

কি?

জবানবন্দীতে সেরাত্রে তিনজন মিথ্যা কথা বলেছে—

তিনজন!

হ্যাঁ।

কে কে?

সুসীম নাগ, ডাঃ মৃণাল সেন—

আর?

শ্রীমতী বিশাখা চৌধুরী।

নয়

পরের দিন বেলা ন'টা নাগাদ কিরীটী ডাঃ মৃণাল সেনের সঙ্গে সুসীমের গৃহে উপস্থিত হলো।

সুসীম ঐ সময় তার নীচের হলঘরে বসে দরজা বন্ধ করে কতকগুলো পুরাতন চিঠি দেশলাই জ্বেলে একটার পর একটা পোড়াচ্ছিল একাকী।

ভৃত্য এসে দরজায় ধাক্কা দিতে সুসীম শুধায়, কে?

আজ্ঞে দাদাবাবু, আমি দীনু। মৃণালবাবু আর এক ভদ্রলোক এসেছেন, আপনাকে ডাকছেন মৃণালবাবু।

যা, এই ঘরে পাঠিয়ে দে।

যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি সুসীম পোড়া চিঠির ছাইগুলো একত্র করে বাইরে বাগানের মধ্যে ফেলে দেয় জানালাপথে। এবং তখনো যে চিঠিগুলো পোড়ানো বাকি ছিল, সেগুলো একটা বইয়ের আলমারির মধ্যে ঢুকিয়ে রেখে দেয়।

চিঠিগুলো সুনন্দার।

দীর্ঘ বারো বৎসরের আলাপে অনেক চিঠিই লিখেছিল তাকে সুনন্দা। একটি চিঠিও সুনন্দার নষ্ট করে নি সুসীম এতদিন। সযত্নে বাণ্ডিল বেঁধে এতদিন রেখে দিয়েছিল সব চিঠি। কিন্তু আজ সকালে উঠেই কেন যেন মনে হয়েছিল সুসীমের, ওগুলোর প্রয়োজন আজ তার জীবনে ফুরিয়েছে। সুনন্দার স্মৃতি মন থেকে আজ তার মুছে ফেলাই উচিত। সুনন্দা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক আজ তার জীবন থেকে।

আজ থাক শুধু শ্রাবণী।

দরজায় ধাক্কা পড়লো।

সুসীম! মৃণালের গলা শোনা যায়।

সুসীম এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দেয়।

পরিচয় করিয়ে দিই—আমার বন্ধু সুসীম নাগ, আর সুসীম তুমি এঁকে কখনো না দেখলেও আমার মুখে এঁর কথা বহু শুনেছো—কিরীটী রায়!

দুজনে দুজনকে নমস্কার জানায়।

কিন্তু কিরীটীর নামটা শুনে সুসীমের ভ্রূ-দুটো যেন ঈষৎ কুঞ্চিত হয়।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সুসীম যেন মুখে একটা খুশির ভান এনে সাদর অভ্যর্থনা জানায়, বসুন, বসুন মিঃ রায়।

ঘরে ঢুকতেই কাগজ পোড়ার গন্ধটা কিরীটীর নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করেছিল। সে বলে, ঘরে একটা কাগজ পোড়ার গন্ধ পাচ্ছি যেন, মিঃ নাগ!

কাগজ পোড়ার?

হ্যাঁ। বলতে বলতে সহসা নীচু হয়ে ঘরের মেঝে থেকে একটুকরো পোড়া কালো কাগজ তুলে নেয় হাতে কিরীটী, কিছু পোড়াচ্ছিলেন নাকি?

হ্যাঁ—হ্যাঁ, কতকগুলো পুরাতন কাগজপত্র—

হুঁ, জঞ্জাল রেখে তো লাভ নেই!

মৃদুকণ্ঠে যেন কতকটা স্বগতোক্তির মতই কথাগুলো বলে কিরীটী।

কিছু বলছিলেন মিঃ রায়?

না, কিন্তু আপনার লাইব্রেরীতে বেশ ভাল কালেকশন আছে বলেই মনে হচ্ছে মিঃ নাগ!

হ্যাঁ, বাবার লাইব্রেরী এটা। বই পড়ার একটা নেশা ছিল বাবার।

সুসীম মৃদুকণ্ঠে বলে।

আচ্ছা মিঃ নাগ—

বলুন!

নীরেনবাবু মানে আপনাদের বন্ধু নীরেন সেন আপনাদের বান্ধবী সুনন্দা দেবীকে হত্যা করেছে বলে কি আপনার মনে হয়?

স্বাভাবিকভাবে মনে হয় না, তবে—

তবে?

নীরেন আমাদের সহপাঠী বন্ধু বটে, তবে তার সবটুকুই কি আমরা জানি, না সেটা সম্ভব!

তা তো বটেই।

মৃণালকেও আমি তাই বলছিলাম—

চলুন মিঃ নাগ, আপনার সেই হলঘর ও বাথরুমটা একবার আমি দেখতে চাই।

নিশ্চয়ই, চলুন!

প্রথমেই ওরা দোতলার সেই হলঘরে যায়।

হলঘরটির চারপাশে একবার দৃষ্টিপাত করে প্রথমেই প্রশ্ন করে কিরীটী, ঐ যে আলমারিগুলো দেখছি, সেরাত্রে কি ঐভাবেই আলমারিগুলো ছিল মিঃ নাগ?

হ্যাঁ।

ঐভাবেই বরাবর রয়েছে?

না, উৎসবের জন্য আলমারিগুলোকে ঘরের একধারে place করা হয়েছিল জায়গার জন্যে—

আলমারিগুলোর মধ্যে কি আছে?

অফিসের ফাইল, কাগজপত্র।

এটা তাহলে আপনার অফিস-ঘর হিসাবেই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় বলুন।

হ্যাঁ।

কিরীটী লক্ষ্য করে দেখলো আলমারিগুলো স্টীলের।

কিরীটী অতঃপর আলমারিগুলোর পিছনে গিয়ে দেখলো, সেগুলো একেবারে দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড় করানো নয়, আলমারি ও দেওয়ালের মাঝখানে বেশ কিছুটা জায়গার ব্যবধান আছে।

সেদিন এই হলঘরেই বোধ হয় নিমন্ত্রিতদের বসবার জায়গা হয়েছিল?

হ্যাঁ, কিছু সোফা আর চেয়ার পেতে বসবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

সেগুলো সরিয়ে ফেলেছেন মনে হচ্ছে!

হ্যাঁ, নীচের অফিস-ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সুসীম জবাব দেয়।

অতঃপর কিরীটী গিয়ে ইয়েল-লক চাবি দিয়ে দরজা খুলে হলঘরের সংলগ্ন বাথরুমের মধ্যে ঢুকলো। বাথরুমের ও ঘরের মধ্যবর্তী দরজার উপরার্ধে মোটা কাচ বসানো।

সুসীম ও মৃণাল কিরীটীকে অনুসরণ করে।

বাথরুমটা নেহাৎ ছোট নয়। বেশ বড় সাইজের বাথরুম। কিরীটী লক্ষ্য করে, বাথরুমের মধ্যে বেসিনের ঠিক ওপরেই দেওয়ালে যে আয়নাটা রয়েছে সেটা একেবারে দরজাটার মুখোমুখি বসানো।

কিছুক্ষণ সেই আয়নাটার দিকে তাকিয়ে থাকে কিরীটী। তারপর বাথরুমের দরজা দুটো পরীক্ষা করে। দুটো দরজাতেই ইয়েল-লক লাগানো।

মিঃ নাগ!

বলুন।

সেরাত্রে বাথরুমের দুটো দরজাই খোলা ছিল বোধ হয়?

হ্যাঁ, যদি কারো প্রয়োজন হয়—

তা তো বটেই। আচ্ছা মিঃ নাগ, আপনার বান্ধবী বিশাখা দেবী আপনার এ বাড়িতে পূর্বে কখনো এসেছেন?

বহুবার।

আচ্ছা মনে পড়ে আপনার, বাথরুমটা কখনো তিনি ব্যবহার করেছেন কিনা?

তা বোধ হয় করেছে।

সুনন্দা চ্যাটার্জী?

সেও এসেছে এবং বাথরুমও সে ব্যবহার করেছে।

তাহলে দেখছি, এ বাথরুমটা কারোরই অপরিচিত ছিল না!

না, তা ছিল না।

কথা বলতে বলতে কিরীটী বাথরুমটার চারিদিকে ইতস্তত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল।

আবার একসময় কিরীটী বলে, মিঃ নাগ, সেরাত্রের পর এ ক'দিন এই বাথরুমটা কি ব্যবহৃত হয়েছে?

না মিঃ রায়, সেই দুর্ঘটনার পর এই হলঘরের দিকে কেউ আসে নি।

কিন্তু এই বাথরুমটাও কি ব্যবহৃত হয় নি?

না, বাইরে থেকে তালা দেওয়া ছিল। তা ছাড়া—

সুসীমের শেষের কথায় কিরীটী যেন একটু আগ্রহ সহকারেই ফিরে তাকালো সুসীমের দিকে।

সুসীম এবারে যেন ইতস্তত করেই বলে, সেই দুর্ঘটনার রাত্রের পর থেকে এদিকটায় বড় একটা কেউই আসে নি—

কেন?

আমি অবিশ্যি শুনি নি, তবে অনেকেই নাকি এদিকটায় রাত্রে কিসের শব্দ শুনেছে—

সহসা ঐ সময় কিরীটী এগিয়ে গিয়ে ঘরের কোণে মেঝে থেকে একটা কর্কশূন্য এক ড্রাম সাইজের হোমিওপ্যাথিক ঔষধের শিশি পকেট থেকে একটা রুমাল বের করে সেই রুমালটা দিয়ে সন্তর্পণে চেপে ধরে তুলে নিল।

মৃণাল এগিয়ে আসে, বলে, কি?

একটা হোমিওপ্যাথিক ঔষধের শিশি। গায়ে দেখছি লেবেল আঁটা আছে—'থুজা টু হাণ্ড্রেড্' ! শিশিটা দেখছি ফেটে গিয়েছে। এ বাড়িতে রিসেণ্টলি কেউ 'থুজা' ব্যবহার করেছিল বলে জানেন নাকি মিঃ নাগ?

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ তো এ বাড়িতে কেউ ব্যবহার করে না মিঃ রায়!

তবে শিশিটা আপনার বাড়ির বাথরুমের মধ্যে এলো কি করে?

কি জানি! বলতে পারছি না তো!

কিরীটী এবারে মৃণালের মুখের দিকে ফিরে তাকালো, ডাক্তার, তোমার হোমিওপ্যাথিক সম্পর্কে কোন জ্ঞান আছে?

শুনে শুনে কিছু জানি। মৃণাল জবাব দেয়।

হোমিওপ্যাথিক শাস্ত্রে 'থুজা'র ইনডিকেশন কি জান? Undesirable and unwanted growth নাকি রিমুভ করা হয় থুজার সাহায্যে! মৃদু হেসে শিশিটা রুমাল সমেতই জড়িয়ে পকেটে রাখতে রাখতে কথাটা বলে কিরীটী।

তারপর পুনরায় কিরীটী সুসীমের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, এই বাথরুমের চাবি কার কাছে সেরাত্রে ছিল?

বললাম তো এইমাত্র আপনাকে মিঃ রায়, চাবি সেরাত্রে খুলেই রাখা হয়েছিল। তবে পাশেই ক্লোক্‌রুমের ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে চাবিটা রেখে দিয়েছিলাম।

চাবিটা একবার নিয়ে আসুন তো!

এখুনি নিয়ে আসছি—সুসীম বাথরুমের অন্য দ্বারপথে বের হয়ে গেল।

সুসীম বাথরুম থেকে বের হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই কিরীটী পার্শ্বেই দণ্ডায়মান মৃণালের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো, ডাক্তার, তুমি এ ব্যাপারে কাউকে সন্দেহ কর?

মৃণাল একটু অন্যমনস্ক ছিল। তাই একটু চমকেই কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে শুধায়, কোন্ ব্যাপারে?

তোমাদের বান্ধবী সুনন্দা দেবীর হত্যার ব্যাপারে?

কাকে সন্দেহ করবো!

কাকে করবে তা বলি কি করে? তবে করো কিনা সেইটাই শুধু জিজ্ঞাসা করছি!

না।

অর্থাৎ সন্দেহ করতে পারো এমন কোন নাম মনে পড়ছে না, এই তো! বেশ আমি কয়েকটা নাম করি—ধর বিশাখা দেবী, শ্রাবণী দেবী, সুসীম, নীরেন—

কি বলছো কিরীটী, এরা—after all এরা কেন সুনন্দাকে হত্যা করতে যাবে!

তারপরেই যেন দুম্ করে কিরীটী বললে, কিন্তু তুমি?

আমি!

বিস্ময়ে বিস্ফারিত নয়নে তাকায় মৃণাল কিরীটীর মুখের দিকে।

হ্যাঁ তুমি—তুমিও তো পার তাঁকে হত্যা করতে!

কথাটা বেশ স্পষ্ট ও সহজকণ্ঠে কিরীটী বললেও, কৌতুকে যেন তার চোখের পাতা দুটো নাচছিল তখন।

আমি হত্যা করবো সুনন্দাকে!

কেন, অসম্ভব কি?

কি বলছো কিরীটী?

স্বাভাবিক যা, তাই বলছি!

স্বাভাবিক?

কিরীটী বলে, কি জান ডাক্তার, মানুষের অবচেতন মনের অন্ধকার গলিঘুঁজিতে কখন যে কোন্ লিপ্সা নখর বিস্তার করে, তা সে নিজেও টের পায় না। এই ধর না আমার কাছে তোমার আসাটা! কেন তুমি এসেছো আমার কাছে?

কেন—

এসেছো তুমি এ ব্যাপারে কাউকে সন্দেহ করেছো বলেই—

তার মানে?

মানে কি তুমি জান না?

কি বলতে চাও?

বলতে চাই—

কিন্তু কিরীটীর মুখের কথাটা শেষ হলো না, সুসীম এসে ঘরে ঢুকলো।

কি হলো মিঃ নাগ, চাবিটা পেলেন? কিরীটী শুধায়।

আশ্চর্য! চাবিটা তো ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারের মধ্যে পেলাম না মিঃ রায়!

পেলেন না?

না।

সেটা তাহলে বোধহয় খুনীর পকেটেই রয়ে গিয়েছে!

সুসীম বা মৃণাল কিরীটীর কথার কোন জবাবই যেন খুঁজে পায় না। কেবল দুজনে দুজনের মুখের দিকে নিঃশব্দে তাকায়।

কিন্তু এখানে আর নয় সুসীমবাবু, চলুন আপনার এই বাথরুমের পাশের ক্লোক্‌রুমটা একবার দেখবো।

চলুন।

ক্লোকরুমটাও নেহাৎ আকারে একেবারে ছোট নয়। তবে একটু লম্বা প্যাটার্নের। ক্লোক্‌রুমটার মধ্যে অবিশ্যি বেশী কিছু জিনিসপত্র ছিল না। একটা বড় সাইজের ড্রেসিং টেবিল, একটা আলমারি ও গোটাকয়েক স্টীলের কালো রংয়ের ট্রাঙ্ক এবং একটা আলনা।

ঘরের চারিদিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে কিরীটী শুধায়, এ ক্লোক্‌রুমটা যেন মনে হচ্ছে আজকাল আর ব্যবহার হচ্ছে না মিঃ নাগ!

না, বছর দু'য়েক ধরে ওপরের হলঘরটায় অফিস করায় এটা আর ব্যবহার হয় না।

চাবি দেওয়াই থাকতো, না খোলাই থাকতো ঘরটা?

খোলাই থাকে।

খোলা থাকলেও ঘরটা নিয়মিত ঝাড়পোঁছ হয় বলে তো মনে হচ্ছে না?

তা বোধ হয় হয় না।

কিরীটী এবারে ড্রেসিং টেবিলটার দিকে এগিয়ে গেল এবং তার দু'পাশের দুটো টানা টেনে একের পর এক খুললো।

দুটো টানাই একেবারে খালি। টানার হ্যাণ্ডেলে ধুলো জমে ছিল, হাতে সেই ধুলো লাগে কিরীটীর। হাতের ধুলোটা অন্য পকেট থেকে আর একটা রুমাল বের করে মুছতে মুছতে কিরীটী বলে, এ ঘরটা আপনার অনেকদিন মনে হচ্ছে ঝাড়পোঁছ হয় না মিঃ নাগ!

এ ঘরটা তো ব্যবহার হয় না। তাই হয়তো চাকররা—

মনোযোগ দেয় না এ ঘরটায়। স্বাভাবিক। ঠিক আছে, চলুন এবারে বাইরে যাওয়া যাক।

কিরীটীকে নিয়ে সুসীম তার নীচের পারলারে বসালো।

একটু পরে হরপ্রসাদ ও তাঁর স্ত্রী সুধাও এলেন।

দু'চারটে মামুলি কথাবার্তার পর একসময় কিরীটী সকলকে ঘর থেকে বের করে দিয়ে এক এক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলো।

প্রথমেই সুধা।

সুধাকে বলে, আচ্ছা সুধা দেবী, আপনার তো সুনন্দা চ্যাটার্জীর সঙ্গে পরিচয় ছিল?

হ্যাঁ।

কি ধরনের মেয়ে ছিল সে?

নসিয়েটিং! কখনো তাকে আমি স্ট্যাণ্ড করতে পারি নি।

কেন বলুন তো? তাঁর স্বভাব-চরিত্র কি তেমন সুবিধার ছিল না?

তা জানি না, তবে এটা জানি, পুরুষকে নাচানোই ছিল তার স্বভাব। তার কোন—ইংরেজীতে যাকে বলে—প্রিন্‌সিপল চরিত্রে ছিল না।

আচ্ছা সুধা দেবী, সেরাত্রে কে একজন আমন্ত্রিতদের মধ্যে নানা ধরনের তাসের ম্যাজিক দেখাচ্ছিলেন, আপনি তাঁকে দেখেছিলেন?

না।

আর একটা কথা, আপনার দাদার বন্ধু ডাঃ সেন, নীরেন সেন আর বিষ্ণু দে—এঁদের সকলের সঙ্গেই বোধ হয় আপনার পরিচয় ছিল?

ছিল। তবে বেশী আলাপ যদি বলেন তো একমাত্র ডাঃ সেনের সঙ্গেই—

এঁদের তিনজনের মধ্যে কেউ তাসের ম্যাজিক জানেন কি?

কখনো শুনি নি তো!

আচ্ছা আপনি যেতে পারেন। সুসীমবাবু—আপনার দাদাকে এ ঘরে পাঠিয়ে দেন যদি!

দিচ্ছি।

সুধা বের হয়ে গেল ঘর থেকে।

সুসীম নাগ।

দেখুন সুসীমবাবু, কিরীটী বলে, আপনার ও মিস্ সুনন্দা চ্যাটার্জী সম্পর্কে সব কথাই শুনেছি ডাঃ সেনের কাছ থেকে। তাই সে-সব কথা নয়—অন্য কয়েকটা প্রশ্ন আপনাকে আমি করবো। আচ্ছা আপনার বন্ধুদের মধ্যে কাউকে কি আপনি সুনন্দা চ্যাটার্জীর মৃত্যুর ব্যাপারে সন্দেহ করেন?

না।

নীরেনবাবুকে?

না।

আচ্ছা সেই ম্যাজিসিয়ান সম্পর্কে আপনার কি ধারণা?

ব্যাপারটা এখনো আমার কাছে রহস্যপূর্ণ।

কিন্তু there was somebody—এটা তো আপনি স্বীকার করবেনই!

অনেকেই যখন দেখেছে—

হুঁ। আচ্ছা সেরাত্রে শেষ কখন আপনার সুনন্দা চ্যাটার্জীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

রাত পৌনে এগারটা হবে বোধ হয়।

কোথায় দেখা হয়েছিল?

হলঘরের সামনের বারান্দায়।

এক্‌স্যাক্টলি কোথায়?

ঐ দোতলার ক্লোক্‌রুমটার সামনে একা রেলিংয়ে হাত রেখে সে দাঁড়িয়ে ছিল।

কোন কথা হয়েছিল সে-সময় তাঁর সঙ্গে আপনার?

হয়েছিল।

কি কথা?

বলেছিল ঘরের মধ্যে স্টাফি বোধ হওয়ায় সে ঐখানে খোলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে—

আর কোন কথা নয়?

না, তারপরই আমি নীচে চলে যাই।

যদি কিছু মনে না করেন তো একটা কথা জিজ্ঞাসা করতাম—

করুন!

সুনন্দা চ্যাটার্জীকে শেষ পর্যন্ত কেন আপনি বিয়ে করলেন না?

মুহূর্তকাল চুপ করে থাকে সুসীম, তারপর মৃদুকণ্ঠে বলে, আজ আর সে কথা আপনাকে বলতে আমার কোন বাধা নেই মিঃ রায়। দেহেই সে শুধু নারী ছিল, মনে ছিল সে এক বিচিত্র জীব। না নারী, না পুরুষ। অন্ধের মত আমি ছুটে বেড়িয়েছি তার পিছনে পিছনে—একটা-আধটা দিন নয়, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর—তবু জানতে পারি নি তার আসল পরিচয়টা—চিনতে পারি নি তার আসল চেহারাটা। তবু—তবু আজ অস্বীকার করবো না আপনার কাছে মিঃ রায়, তাকে আমি ভালবাসতাম। জীবনে কাউকে আমি অমন করে বুঝি ভালবাসি নি—

শেষের দিকে গলাটা ধরে আসে সুসীমের। চোখের কোল দুটো ছলছল করে ওঠে। মানুষের জীবনটা সত্যিই কি বিচিত্র মিঃ রায়, সুসীম বলতে থাকে, নইলে দেখুন বারোটা বছর তো অপেক্ষা করেছিলাম ওকে নিয়েই ঘর বাঁধবো বলে—

আপনি তাঁকে ভুল বোঝেন নি তো মিঃ নাগ! কিরীটী বলে।

ভুল! না মিঃ রায়, ভুল বুঝি নি। আর ভুল বুঝি নি বলেই শ্রাবণীকে শেষ পর্যন্ত বিয়ে করেছি। তার পরিচিতজনেরা সবাই জানতো এবং বলেছেও চিরদিন, ওর চোখে নাকি একটিমাত্র দৃষ্টিই আছে—ব্যঙ্গের দৃষ্টি। ও নাকি শুধু জানে ব্যঙ্গ করতেই। কিন্তু আমি জানি তা নয়, সেটা ওর বাইরের একটা খোলস ছিল মাত্র। আসলে ও ছিল ক্লীব—না পুরুষ, না নারী—আর সেইটাই যে মুহূর্তে জানতে পারলাম, সেই রাত্রেই সোজা ওর বাড়ি থেকে বের হয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম শ্রাবণীর কাছে—তাকে প্রস্তাব জানিয়েছিলাম। তাই তো নীরেনের ব্যাপার যখন শুনলাম, প্রথমেই আমার মনে হয়েছিল নীরেন এত বড় ভুলটা করলো কি করে!

আচ্ছা মিঃ নাগ—

বলুন?

নীরেনবাবুর সঙ্গে সুনন্দা দেবীর ঘনিষ্ঠতার ব্যাপারটা কি সত্যিই আপনি জানতেন না?

না।

কোন কারণে আপনার কোনরকম সন্দেহও হয় নি?

না।

আচ্ছা আর একটা কথা, নীরেনবাবুকে তো আপনি এ ব্যাপারে সন্দেহ করেন না—কিন্তু

আর কারো ওপরে কি আপনার সন্দেহ হয়?

না।

ডাঃ সেনকে?

য়্যাঁ! মৃণালকে? না।

আপনি তো নিশ্চয়ই চান যে সুনন্দা দেবীর হত্যাকারী ধরা পড়ুক!

চাই বৈকি—

আচ্ছা এবারে তাহলে আমি উঠবো মিঃ নাগ আজকের মতো—তবে আবার হয়তো আমি আসবো—আবার হয়তো বিরক্ত করবো আপনাদের।

না, না—বিরক্তির কি আছে! যখনই প্রয়োজন হবে আসবেন—

ধন্যবাদ।

কিরীটী উঠে দাঁড়ালো।

দশ

গাড়িতে উঠে কিরীটী মৃণালকে সম্বোধন করে বলে, বিশাখা দেবী কোথায় থাকেন মৃণাল?

শ্যামবাজারে।

এখন গেলে তাঁর সঙ্গে দেখা হতে পারে?

তা হয়তো হতে পারে, কারণ এখন তো তার গ্রীষ্মের ছুটি চলেছে!

কিরীটী হীরা সিংকে নির্দেশ দেয় শ্যামবাজারের দিকে গাড়ি চালাতে।

শ্যামবাজারে রামধন মিত্রের লেনে বিশাখা থাকে। মৃণালই হীরা সিংকে নির্দেশ দিয়ে নিয়ে এল বিশাখার বাড়িতে।

একটা দোতলা বাড়ির দোতলার তিনখানা ঘর নিয়ে বিশাখা থাকে।

ছোট সংসার। বিশাখা, তার বিধবা মা ও একটি বেকার জুয়াড়ী ভাই জগদীন্দ্র। বিশাখার চাকরির আয় থেকেই সংসার চলে।

বিশাখার সব কিছু পরিচয়ই কিরীটী মৃণালকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করে গাড়িতেই জেনে নেয়। বিশেষ করে যেটা সাধন দত্তও তাকে জানাতে পারেন নি।

ইন্‌টারমিডিয়েট্ পড়তে পড়তেই শোনা যায় বিশাখা নাকি কোন একজনকে রেজেস্ট্রী করে বিয়ে করেছিল। কিন্তু বিয়ে করলেও প্রকাশ্যে সেই স্বামীকে নিয়ে বিশাখা ঘর করে নি।

কিরীটী শুধিয়েছিল, কেন?

বিশাখার জীবনে সে এক চরম দুঃখের কাহিনী কিরীটী। কেবল দুঃখের কেন লজ্জারও। ব্যাপারটা একমাত্র আমি ছাড়া আর কেউ জানে না অনাত্মীয়ের মধ্যে। আর আপনার জনেদের মধ্যে একমাত্র জানেন ওর মা।

কিন্তু দুঃখের কাহিনী বলছো কেন ডাক্তার?

বিশাখার মুখেই শুনেছি, লোকটা শুধু পাষণ্ডই নয়, হৃদয়হীন নিষ্ঠুরও। আমি অবিশ্যি আলফ্রেড্‌কে চোখে কখনো দেখি নি, নামটা শুনেছি।

লোকটার নাম আলফ্রেড্ বলছো—

হ্যাঁ, ক্রিশ্চান। শুনেছি, মাত্র একটা বছর নাকি স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিল বিশাখার।

তারপর বুঝি ডিভোর্স হয়ে গেল?

না, ডিভোর্স আজ পর্যন্ত হয় নি।

কেন?

সেও এক দুর্বোধ্য ব্যাপার। কারণ জিজ্ঞাসা করেও জবাব পাই নি বিশাখার কাছ থেকে। যাই হোক, আলফ্রেডের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার পর বিশাখা ক্রমে এম. এ. পাস করে, তারপর অধ্যাপিকার চাকরি নেয়।

বিশাখা দেবীর বিবাহের ব্যাপারটা মিস্ চ্যাটার্জী জানতেন না?

যতদূর জানি জানতো না।

সুসীমবাবু—তোমার বন্ধুও না?

না।

মৃণালের অনুমান মিথ্যে হয় নি। বিশাখা বাড়িতেই ছিল।

মৃণালের মুখে কিরীটীর পরিচয় পেয়ে বিশাখা তাকে সমাদরে অভ্যর্থনা করে বসতে দিল। ছোটখাটো দেখতে এবং রোগা চেহারার শ্যামলা মেয়েটি প্রথম দর্শনেই যেন কিরীটীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। চোখে-মুখে একটা তীক্ষ্ণ বুদ্ধির দীপ্তি। বয়েস বিশাখার যাই হোক না কেন, কুড়ি-বাইশের বেশী বলে মনে হয় না। যে ঘরে কিরীটী ও মৃণালকে বিশাখা বসতে দিয়েছিল সে ঘরটিতে সামান্য আসবাবের মধ্যে যেন একটা পরিচ্ছন্ন রুচির বিকাশ।

বিশাখা বলে, চা নিয়ে আসি?

কিরীটী বাধা দেয়, না বিশাখা দেবী, এ সময় চায়ের জন্য আপনি ব্যস্ত হবেন না, বসুন। ডাক্তার সেন আমার পরিচয়টা আপনাকে দিল বটে, তবে এ সময় আমার এখানে আসার উদ্দেশ্যটা ব্যক্ত করলো না।

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে বিশাখা কিরীটীর মুখের দিকে চোখ তুলে তাকালো।

এগার

কিরীটী বোধহয় মুহূর্তের জন্য ভাবে, ঠিক কি ভাবে কেমন করে তার বক্তব্যটা সদ্যপরিচিতা এক ভদ্রমহিলার কাছে ব্যক্ত করবে!

কি ভাবে কোথা থেকে শুরু করে বিশাখা চৌধুরীর কাছে যেটুকু জানবার জেনে নেবে!

দেখুন বিশাখা দেবী, ডাক্তার সেন আপনার পরিচিত এবং আমারও পরিচিত। সেই সূত্রেই অবিশ্যি এই অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করতে এলাম—

বিশাখা সঙ্গে সঙ্গে কিরীটীর কথার জবাব দেয় না।

নিঃশব্দে কেবল কিরীটীর মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

অবিশ্যি আজ এই সময় না হলেও কাল বা পরশু যখনই হোক আপনার কাছে আমাকে আসতে হতো, কারণ—

মৃদুকণ্ঠে বাধা দিয়ে বিশাখা বললে, আপনি অত কিন্তু করছেন কেন মিঃ রায়, আপনি কেন এসেছেন তা আমি বুঝতে পেরেছি—

পেরেছেন?

তা পেরেছি বৈকি। সুনন্দার মৃত্যু সম্পর্কেই বোধ হয় কিছু জিজ্ঞাস্য আছে আমার কাছে আপনার!

ঠিক তাই। তবে—

অবিশ্যি সত্যি কথাই বলছি, আপনি যখন এসেছেন এবং আপনি যখন ডাঃ সেনের বন্ধু, তখন অনুমানই করে নিয়েছি সুনন্দার মৃত্যুর রহস্যের সন্ধানের ভারটা আপনার বন্ধুর অনুরোধেই হয়ত আপনি হাতে নিয়েছেন। তাই নয় কি?

কিরীটী বিশাখার শেষ কথাতেই বুঝতে পারে, মেয়েটি বুদ্ধিমতী।

মৃদু হেসে কিরীটী বলে, অনুমান আপনার মিথ্যে নয় বিশাখা দেবী। সেনের অনুরোধেই যেমন এ ব্যাপারে আমি হাত দিয়েছি, তেমনি সেই ব্যাপারেই এ সময়ে আপনার এখানে আমার আসা। কিন্তু আপনিও কি চান না বিশাখা দেবী—

কি?

সে রাত্রে অমন নৃশংসভাবে যে আপনাদের পরিচিতা সুনন্দা চ্যাটার্জীকে হত্যা করেছে সে ধরা পড়ুক!

চাই বৈকি। কিন্তু আমি ঠিক আপনাকে যে সে ব্যাপারে কিভাবে সাহায্য করতে পারি, সেটাই এখনো বুঝে উঠতে পারছি না!

সে-রাত্রে সুনন্দা দেবীর হত্যার ব্যাপারটা রহস্যে আবৃত হয়ে আছে নিঃসন্দেহে। আর সাহায্যের কথা বলছেন! কার কাছে যে কিভাবে সাহায্য পাবো, কে কতটুকু সূত্র আমার হাতে তুলে দেবেন তাও আগে থাকতে বলা দুষ্কর। তবু আপনারা সে-রাত্রে যাঁরা অকুস্থানে উপস্থিত ছিলেন—

উপস্থিত শুধু আমরা কজনাই তো নয় মিঃ রায়, নিমন্ত্রণ-বাড়িতে সে রাত্রে প্রায় পাঁচশ' জন উপস্থিত ছিলেন।

তা অবিশ্যি ছিলেন কিন্তু সুনন্দা চ্যাটার্জীর পরিচিত আপনারা যে ক'জন ছিলেন, আপাততঃ তাঁদের যা বলবার তা জানতে পারলেই মনে হচ্ছে হয়তো আমার কাজটা অনেক দূর এগিয়ে যাবে।

আপনি সত্যিই কি তাই মনে করেন মিঃ রায়?

প্রশ্নটা করে সোজাসুজি স্পষ্ট দৃষ্টিতে যেন তাকিয়ে থাকে বিশাখা কিরীটীর মুখের দিকে।

কিরীটীর সে চোখের দিকে তাকিয়ে মনে হয়, কিসের একটা চাপা উত্তেজনা যেন সেই দুই চোখের দৃষ্টিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

তাই আমার মনে হয় বিশাখা দেবী!

চোখে চোখ রেখেই স্পষ্ট কণ্ঠে কিরীটী জবাবটা দিল।

অবিশ্যি আমি অস্বীকার করবো না মিঃ রায়, আপনি কেসটা হাতে নিয়েছেন জেনে আমি আনন্দিতই হয়েছি—

সত্যি আনন্দিত হয়েছেন?

নিশ্চয়ই, কারণ—বলতে বলতে থেমে যায় বিশাখা।

কিরীটী মৃদুকণ্ঠে তাগিদ দেয়, কই, বললেন না কারণটা কি?

কারণ আমার ধারণা, পুলিসের সাধ্যও নেই ঐ দুর্বোধ্য ব্যাপারের কোন মীমাংসাতেই পৌঁছানো!

কেন?

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ওদের কর্মদক্ষতা তো জানতে আর কারো বাকী নেই!

না, না—এ আপনি কি বলছেন বিশাখা দেবী? সাধনবাবু খুব কম্‌পিটেন্ট লোক—

তা হবেন হয়তো—

হবেন নয়, সত্যিই দেখবেন এ রহস্যের মীমাংসা তিনি করবেনই।

তাই বুঝি সর্বাগ্রে নীরেনবাবুকে অ্যারেস্ট করে বসে আছেন!

কান্নার স্বরে একটা যেন স্পষ্ট ব্যঙ্গ ঝরে পড়ে বিশাখার কণ্ঠ থেকে।

অ্যারেস্ট করবার কারণ আছে বলেই হয়ত তাঁকে অ্যারেস্ট করেছেন—

কি এমন অকাট্য প্রমাণ তার বিরুদ্ধে পেয়েছেন তিনি বলুন তো?

তা কেমন করে বলবো বলুন, তবে পেয়েছেন বৈকি নিশ্চয়ই কিছু!

কিছু পান নি। রামের অপরাধে শ্যামকে ধরতেই ওরা অভ্যস্ত।

না বিশাখা দেবী, আমি দেখছি পুলিসের ওপরে আপনার তেমন আস্থা নেই! কিন্তু আপনি হয়তো জানেন না, এর চাইতেও অনেক জটিল ও দুর্বোধ্য ব্যাপারেরও তারা মীমাংসা করতে পারে ও করেছে, এমন নজিরের অভাব নেই! সে কথা যাক, অসময়ে এসে আপনাকে বেশী আটকে রেখে বিব্রত করবো না। গোটা তিন-চার প্রশ্নের জবাব কেবল আপনার কাছ থেকে চাই—

বলুন, সাধ্যমত আমি আপনাকে সাহায্য করতে চেষ্টা করবো।

বিশাখা দেবী, আপনি দুর্ঘটনার রাত্রে আপনার জবানবন্দীতে বলেছেন, দুর্ঘটনাটা প্রকাশ হওয়ার আধ ঘণ্টাটাক আগে আপনি নাকি হলঘরে কাকে ডাকতে এসে একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে সুনন্দা চ্যাটার্জীকে একটা সোফার ওপরে পাশাপাশি বসে কথাবার্তা বলতে দেখেছিলেন—

দেখেছিলাম।

কে সে ভদ্রলোক? তাঁকে চিনতে পেরেছিলেন?

না। তাঁকে আমি পূর্বে কখনো দেখি নি।

কি রকম দেখতে?

রোগা, লম্বা এবং পরিধানে ধুতি-পাঞ্জাবি ছিল। আর—

আর?

চোখে কালো কাচের চশমা ছিল।

হুঁ। আর একটা কথা, সে-রাত্রে হলের মধ্যে যিনি ম্যাজিক দেখাচ্ছিলেন, তাঁকে আপনি ও বিষ্ণুবাবু দুজনেই দেখেছিলেন—

বিষ্ণুবাবু দেখেছিলেন কিনা জানি না, তবে আমি দেখেছি।

যাক্ সে কথা, আপনি বলেছেন তাঁর গলার স্বরটা নাকি অবিকল আমাদের ডাক্তারের গলার স্বরের মতো বলেই সে-রাত্রে আপনার মনে হয়েছিল!

মুহূর্তের জন্য কিরীটীর পার্শ্বে উপবিষ্ট মৃণালের দিকে তাকিয়ে বিশাখা বলে, হ্যাঁ বলেছিলাম।

যা বলেছেন আপনি, সে-সম্পর্কে আপনার কোনরকম মতদ্বৈধ নেই—You are sure !

তাই মনে হয়েছিল সে-সময়—

কিন্তু ভদ্রলোক দেখতে কি ডাক্তারের মতো ছিলেন?

সেই রকমই।

অতঃপর কয়েকটা মুহূর্তের জন্য একটা স্তব্ধতা।

বিশাখা দেবী, শুনেছি আপনি নিহত মিস্ চ্যাটার্জীর সঙ্গে একই কলেজে অধ্যাপনার কাজ করতেন—কথাটা কি সত্যি?

সত্যি।

কতদিন একত্রে একই কলেজে অধ্যাপনার কাজ করছেন আপনারা?

তা বছর চার হবে।

A prety long time—কি বলুন!

তাই।

আপনাদের উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ছিল নিশ্চয়ই?

না। তীক্ষ্ণকণ্ঠে জবাব দেয় বিশাখা।

ঘনিষ্ঠতা ছিল না, অথচ বলছেন একই কলেজে দু'জনে আপনারা দীর্ঘ চার বছর ধরে—

তা করলেই বা!

না, তাই বলছিলাম—একই কলেজে দীর্ঘ চার বছর ধরে কাজ করেও আপনাদের পরস্পরের মধ্যে কোন ঘনিষ্ঠতা ছিল না—rather strange !

কেন, এতে strange হবার কি থাকতে পারে?

তা একটু মনে হয় বৈকি! কিরীটী বলে।

মনে হবার তো কোন কারণ নেই।

কিন্তু বিশাখা দেবী—

বিশাখা কিরীটীকে কথা শেষ করতে দিল না, সে বললে, আমি তাকে ঘৃণা করতাম—সমস্ত অন্তর দিয়ে ঘৃণা করতাম।

কণ্ঠস্বরে বিশাখার যেন একটা তিক্ত ঘৃণা আর অবরুদ্ধ আক্রোশ ঝরে পড়লো।

ঘৃণাই যে শুধু আপনি তাকে করতেন বিশাখা দেবী তাই নয়, মনে হচ্ছে আক্রোশও ছিল তার প্রতি আপনার একটা!

বিচিত্র নয়। যদি জানবার আপনার সৌভাগ্য হতো মিঃ রায়, কি নীচ মন আর কুৎসিত চরিত্র তার ছিল—she was not only a vamp, a filthy snake too ! স্বাভাবিক ভাবে একজন মানুষ আর একজন মানুষের ঐ ধরণের বীভৎস মৃত্যুতে দুঃখ পায়, আমিও পেয়েছি—তবু বলবো, she deserved it ! Rather I should say, she has been rightly served !

কথাগুলো একটানা বলে অন্যদিকে মুখ ফেরালো বিশাখা।

মৃণাল বোধ হয় সহ্য করতে পারে না আর, কি যেন বলবার চেষ্টা করে, কিন্তু বিশাখা—তুমি—

একটা থাবা দিয়ে যেন সঙ্গে সঙ্গে মৃণালের বক্তব্য থামিয়ে দিল বিশাখা।

বললে, থাম থাম মৃণাল—তোমাদের ক' বন্ধুর কাছে সে demi-goddess ছিল জানি।

পুরুষ তোমরা, তাই তার সত্যিকারের বীভৎস চেহারাটা কখনো তোমাদের চোখে পড়ে নি—পড়লে বুঝতে how obscene and how filthy she was !

অকস্মাৎ ঐ সময় কিরীটী ধীর শান্ত কণ্ঠে কথা বলে ওঠে, বিশাখা দেবী, সুনন্দা চ্যাটার্জীর নিহত হওয়ার ব্যাপারে আপনি কি তাহলে কাউকে সন্দেহ করেন?

সন্দেহ!

হ্যাঁ।

সন্দেহের কথা যদি বলেন মিঃ রায় তো বলবো, সকলকেই আমি করি—এমন কি নিজেকে পর্যন্ত আমি সন্দেহ করি!

নিজেকেও আপনি সন্দেহ করেন?

নিশ্চয়ই। কারণ many a time I sincerely wished that I could kill her ! কত সময় মনে হয়েছে তাকে আমি হত্যা করি—strangle her to death !

অবরুদ্ধ একটা উত্তেজনায় যেন হাঁপাতে থাকে বিশাখা।

সঙ্গে সঙ্গেই কিরীটী আর কোন প্রশ্ন করে না বিশাখাকে। একটু সময় দেয় যেন।

বিশাখা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বসেছিল।

বেশ কিছুক্ষণ একটা স্তব্ধতার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হবার পর একসময় আবার মৃদুকণ্ঠে কিরীটী বলে, বিশাখা দেবী, আজ আর আপনাকে বিরক্ত করবো না বেশী। একটি মাত্র প্রশ্ন আপনাকে আমার আর করবার আছে।

বিশাখা ফিরে তাকালো কিরীটীর মুখের দিকে।

একটু আগে আপনি ডাক্তারকে বললেন, তোমাদের ক'বন্ধু—বন্ধু বলতে কাকে কাকে আপনি exactly mean করছেন?

কেন, ওরা বিশেষ তিনজন—যারা ওদের বন্ধুমহলে Three Musketeers বলে পরিচিত!

Three Musketeers !

হ্যাঁ—মৃণাল, সুসীম আর নীরেন!

নীরেনবাবুকে তাহলে আপনি চিনতেন?

চিনতাম বৈকি।

Excuse me, আর একটি কথা—নীরেনবাবুর সঙ্গে যে সুনন্দা চ্যাটার্জীর পরিচয় ছিল, আপনি কি তা জানতেন?

কেন জানব না, খুব জানতাম!

তুমি জানতে বিশাখা? মৃণাল বিশাখার দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা করে।

জানতাম বৈকি। কেন, তুমি জানতে না?

না।

আশ্চর্য! সে বর্মা থেকে এলে তো তার বেশীর ভাগ সময় ওর বাড়িতেই কাটত। দুনিয়াসুদ্ধ সবাই ব্যাপারটা জানত, আর বলতে চাও তুমিই জানতে না—nonsense !

সত্যিই আমি জানতাম না, মৃণাল বলে, আর সুসীমও জানত না।

Another hypocrite—কাজে এক—মুখে আর!

কি বলছো বিশাখা?

হ্যাঁ, হ্যাঁ—another hypocrite হচ্ছে তোমাদের ঐ সুসীম নাগ!

চল হে ডাক্তার, এবারে ওঠা যাক। ওঁকে অনেকক্ষণ বিরক্ত করেছি। বলতে বলতে কিরীটী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়।

বারো

ঐদিনই সন্ধ্যাবেলা।

কিরীটীর বাড়িতে তার দোতলার বসবার ঘরে সাধন দত্ত আর কিরীটী দুটো চেয়ারে মুখোমুখি বসে সুনন্দা চ্যাটার্জীর হত্যা-ব্যাপার নিয়েই আলোচনা করছিলেন।

সাধন দত্ত বলছিলেন, সেদিন উৎসবের রাত্রের সেই ম্যাজিসিয়ান ভদ্রলোকের ব্যাপারটার কিছুতেই কোন সলুশনে যেন আমি আসতে পারছি না মিঃ রায়! ব্যাপারটা so mysterious—

কিরীটী মৃদু হেসে বলে, মিস্টিরিয়াস!

নয়? একঘর নিমন্ত্রিতের মধ্যে লোকটা ম্যাজিক দেখিয়ে গেল, আর ব্যাপারটা বাড়ির লোকেদের কারোরই নজরে পড়ল না—এমন কি ডাঃ সেনেরও নয়!

নজরের কথা ছেড়ে দিন মিঃ দত্ত, তবে আপনি ব্যাপারটার মধ্যে যতখানি গুরুত্ব আরোপ করছেন, আমার মনে হয় তার কিছুই নয়—

তার মানে? কি আপনি বলতে চান মিঃ রায়?

আমার তো মনে হয় ব্যাপারটা নিছক একটা joke—কৌতুক ছাড়া কিছুই নয়।

কি বললেন, joke—কৌতুক!

হ্যাঁ, joke—বাংলা ভাষায় যাকে কৌতুক বলে।

তার মানে?

মানেটা খুবই সহজ। আমি বলতে চাই, there was no intention behind! সেদিনকার উৎসবের মধ্যে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যেই হয়ত কেউ ম্যাজিসিয়ান সেজে খানিকটা কৌতুক—বলতে পারেন নিছক খানিকটা আনন্দ সৃষ্টি করবারই চেষ্টা করেছিলেন মাত্র। যদিচ ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত সুনন্দা চ্যাটার্জীর আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিত মৃত্যুতে ঘোরালো হয়ে ওঠায় বেচারী ম্যাজিসিয়ান হয়তো শেষ পর্যন্ত আত্মগোপন করতে এক প্রকার বাধ্য হয়েছেন।

কিন্তু—

তবে এটুকু আপনাকে বলতে পারি মিঃ দত্ত, ব্যাপারটা নিতান্তই যাকে বলে কাকতালীয়। সুনন্দা চ্যাটার্জীর মৃত্যুর সঙ্গে সত্যিই আমার মনে হয় কোন যোগ নেই। কিন্তু সে কথা যাক, আপাততঃ সব কিছু শুনে সকলের সঙ্গে কথা বলে ও অকুস্থান ঘুরে যে কথাগুলো আপনাকে আমি বলতে চাই—

কি, বলুন?

বিশাখা বিবাহিত, সে কথাটা আপনি বোধ হয় জানেন না!

সে কি? তার তো জানি বিয়েই হয় নি?

না, সে বিবাহিত। তার স্বামী হচ্ছে একজন ভারতীয় ক্রিশ্চান—আলফ্রেড্ ঘোষ। ইস্টার্ন রেলওয়েতে চাকরি করে—গার্ড।

সত্যি বলছেন!

তাই তো শুনলাম।

বিবাহিত—তবু নিজেকে কুমারী বলে চালাচ্ছে। এ যে রীতিমত জটিল বলে মনে হচ্ছে!

সেই জটিলতার কারণটাই তো খুঁজে বের করতে হবে আপনাকে মিঃ দত্ত!

কিন্তু কেমন করে?

সে খুব শক্ত হবে না। আগে আপনি একটা খোঁজ নিন তো!

কিসের খোঁজ নেবো?

রেলওয়ে গার্ড মিঃ আলফ্রেড্ ঘোষ সম্পর্কে details খবরাখবরটা যোগাড় করুন তো।

বেশ।

দ্বিতীয়তঃ, প্রোমে নীরেন সেন সম্পর্কে যাবতীয় সংবাদ আপনাকে সংগ্রহ করতে হবে।

করবো। আর কিছু?

না, আপাততঃ আর কিছু নয়। ঐ সংবাদগুলো আমাকে আপনি যত তাড়াতাড়ি পারেন সংগ্রহ করে দিন।

বেশ, দেবো।

হ্যাঁ, আর আগে যা বলেছি—যাবার পথেই কিন্তু সে কাজটা সেরে যাবেন মিঃ দত্ত!

সাধন দত্ত বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছেন প্রায় ঘণ্টা-দুই পূর্বে।

কিরীটী সোফাটার উপরে হেলান দিয়ে চোখ বুজে ছিল। ঘরের আলোটা সাধন দত্ত চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নিভিয়ে দিয়েছিল কিরীটী। জংলী এসে অন্ধকার ঘরের দরজার সামনে দাঁড়ালো, কিন্তু ঘর অন্ধকার থাকায় ইতস্তত করে—ডাকবে কি ডাকবে না!

কিন্তু জংলীর পদশব্দ কিরীটীর শ্রুতিগোচর হয়েছিল, সে প্রশ্ন করে, কি রে জংলী?

একজন মেয়েছেলে দেখা করতে চায়!

কিরীটী মুহূর্তকাল যেন কি ভাবলো; তারপরে মৃদুকণ্ঠে বললে, ঘরের আলোটা জ্বেলে দিয়ে এ-ঘরেই পাঠিয়ে দে তাকে।

ঘরে ঢুকে আলোটা জ্বেলে দিয়ে জংলী নীচে চলে গেল।

একটু পরেই পদশব্দ শোনা গেল ঘরের দরজার সামনে।

আসুন বিশাখা দেবী!

সত্যি, বিশাখাই ঘরে প্রবেশ করলো।

সর্বাঙ্গে একটা চাদর জড়ানো ছিল বিশাখার এবং সেই চাদরের সাহায্যেই মাথায় ঈষৎ অবগুণ্ঠন তোলা ছিল।

বসুন বিশাখা দেবী!

বিশাখা কিরীটীর মুখোমুখি ছোট সোফাটার উপরে উপবেশন করলো।

জানতাম আপনি আসবেন, আপনার আগমন প্রতীক্ষাই করছিলাম আমি এতক্ষণ।

আমি আসবো আপনি জানতেন!

জানতাম।

কথাটা বলে হঠাৎ যেন কিরীটী স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো।

বিশাখাও স্তব্ধ, কিরীটীও স্তব্ধ।

উভয়ের মধ্যখানে যেন একটা স্তব্ধতার পাষাণভার।

বেশ কিছুক্ষণ পরে বিশাখাই প্রথমে কথা বলে, কিরীটীবাবু!

বলুন?

এইমাত্র আপনি যা বললেন তা কি সত্যি?

কি সত্যি বিশাখা দেবী?

আমি যে এ-সময় আসবো আপনি জানতেন!

সত্যিই জানতাম বিশাখা দেবী। আর আপনি কেন এসেছেন তাও জানি।

জানেন?

জানি।

তারপর একটু থেমে কিরীটী বলে, থানা-অফিসার মিঃ দত্ত আপনার কাছে গিয়েছিলেন, তাই না?

হ্যাঁ, কিন্তু আশ্চর্য—আপনি জানলেন কি করে!

কারণ আমিই তাঁকে যেতে বলেছিলাম।

আপনি যেতে বলেছিলেন?

হ্যাঁ।

কিন্তু কেন?

সে কথা যাক, আপনি বরং যা বলতে এসেছেন বলুন।

জবাবে বিশাখা অতঃপর কিছুক্ষণ চুপ করেই থাকে।

কেবল নিঃশব্দে শাড়ির আঁচলের পাড়ের একটা অংশ টেনে টেনে সোজা করতে থাকে।

কই, বললেন না?

মিঃ রায়!

বলুন?

আচ্ছা সত্যিই কি আপনি মনে করেন—

কি?

মানে বলছিলাম, নীরেনের ফাঁসি হবে!

কাউকে কেউ হত্যা করলে, প্রচলিত আইনে সেই শাস্তিই তো তার প্রাপ্য—to be hanged by neck till death!

সহসা যেন আর্তকণ্ঠে একটা চাপা উদ্বেগ প্রকাশ পায়, না, না—তা হতে পারে না! আমি বলছি নীরেন নির্দোষ—সে হত্যা করে নি! আপনি বিশ্বাস করুন মিঃ রায়—

নির্দোষিতা তো তার এমনি প্রমাণিত হবে না বিশাখা দেবী, তার জন্য রীতিমত প্রমাণ চাই।

অসহায় দৃষ্টিতে তাকালো বিশাখা কিরীটীর মুখের দিকে। উদ্বেগ আর আশঙ্কায় বিশাখার সমস্ত মুখখানা কেমন যেন করুণ মনে হয়।

বিহ্বল কণ্ঠে বিশাখা বলে, প্রমাণ!

হ্যাঁ, প্রমাণ। বিশাখা দেবী, নীরেনবাবুর যদি ফাঁসিই হয়, তাতে আপনার কি? তিনি তো আপনার কেউই নন?

বিশাখার চোখের কোল দুটো ছলছল করে ওঠে।

উপরের পাটির দাঁত দিয়ে সে তার নীচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরে।

কেউ নয়—সত্যিই তো, সে আমার কে? কেউ তো নয়! কথাগুলো যেন কতকটা আত্মগতভাবে বলে বিশাখা এবং দু'চোখের কোল বেয়ে দু'ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ে।

তারপরই হঠাৎ উঠে দাঁড়ায় সোফা থেকে বিশাখা, বলে, আমি যাই—

কিন্তু যেজন্য এসেছিলেন বিশাখা দেবী, কই সে-সম্বন্ধে তো কিছু বললেন না!

কিছু না মিঃ রায়, আমি—আমি যাই—

পা বাড়ায় বিশাখা ঘর থেকে বের হয়ে যাবার জন্যে।

দাঁড়ান বিশাখা দেবী, শুনুন!

ঘুরে দাঁড়ালো বিশাখা কিরীটীর সে-ডাকে।

নীরেনবাবু সম্পর্কে আপনি আমাকে যা বলতে এসেছিলেন, নির্ভয়ে এবং নিঃসঙ্কোচেই আপনি আমাকে তা বলে যেতে পারেন।

বিশাখা কেমন যেন অসহায় বোবাদৃষ্টিতে কিরীটীর মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

বসুন—বসুন ঐ সোফাটায়।

বিশাখা বসে পড়লো।

আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, সব কথা যদি আপনি আমার কাছে অকপটে স্বীকার করেন তো নিশ্চয়ই তাঁকে আমি—

মিঃ রায়!

হ্যাঁ কথা দিচ্ছি, আমি তাঁকে নিশ্চয়ই ফাঁসির দড়ি থেকে বাঁচাবো।

পারবেন—সত্যি বলছেন পারবেন?

পারবো। কিন্তু তার আগে সব কথা আপনাকে আমার কাছে স্বীকার করতে হবে।

অকস্মাৎ দু'হাতে মুখ ঢেকে যেন কান্নায় একেবারে ভেঙে পড়ে বিশাখা, জানি না—আমি কিছু জানি না—কিছু জানি না—

অতঃপর মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে কিরীটী বললে, কিছু জানেন না?

না, না, না—

বেশ, আমার কয়েকটা প্রশ্নের সত্য জবাব দিন অন্তত! সেরাত্রে কাকে আপনি দেখেছিলেন সুসীমবাবুর বাড়ির হলঘরে সুনন্দা চ্যাটার্জীর পাশে বসে কথা বলতে? বলুন, জবাব দিন?

জানি না, জানি না—চিনতে পারি নি—তাকে আমি চিনতে পারি নি—

কিন্তু আমি বলছি আপনি জানেন এবং চিনতে পেরেছিলেন তাকে। বলুন সত্যি কিনা?

না, না—

নীরেনবাবু, তাই না!

না, না—

হ্যাঁ, তিনি নীরেনবাবুই। বলুন সত্যি কিনা?

অশ্রুভেজা চোখ তুলে তাকালো বিশাখা কিরীটীর মুখের দিকে।

আর একটা কথা, আপনার স্বামী আলফ্রেড্ ঘোষ এখন কোথায়?

জানি না—

জানেন। বলুন তিনি কোথায়? সে রাত্রে তিনি কলকাতায় ছিলেন, তাই না?

মাথা নিচু করলো বিশাখা।

আলফ্রেড্ ঘোষের সঙ্গে তো আপনার কোন সম্পর্কই নেই, সত্যি কিনা?

সত্যি।

কতদিন হলো আপনাদের separation হয়েছে?

ছ'বছর।

তা এখনো ডিভোর্স হয় নি কেন? কারণটা কি?

কারণ কিছুই নেই—

নিশ্চয়ই আছে। কি কারণ বলুন?

বলতে পারবো না—আমি বলতে পারবো না! বলতে বলতে আবার দু'হাতে মুখ ঢাকলো বিশাখা।

একটু থেমে কিরীটী বললে, আপনি না বললেও আমি তা ঠিক জানতে পারবো বিশাখা দেবী—

আমি—আমি যাই—

আসুন।

বিশাখা অতঃপর সোফা থেকে উঠে টলতে টলতে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

একটু পরেই পাশের ঘর থেকে সাধন দত্ত এসে ঐ ঘরে ঢুকলেন।

আশ্চর্য দাওয়াই বাতলেছিলেন তো মিঃ রায়! দত্ত বলেন।

মৃদু হেসে কিরীটী বলে, আশ্চর্যের কিছুই নেই এতে মিঃ দত্ত—

আশ্চর্য নয়! কি বলেন, একেবারে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসেছে!

আসবেই তো—

আপনি জানতেন ও আসবে?

জানতাম। এ যে যাকে বলে প্রাণের টান! একটু চোখ খোলা থাকলে আপনিও ব্যাপারটা বুঝতে পারতেন মিঃ দত্ত।

কি বলছেন!

হ্যাঁ তাই, আজ সকালে ওর বাড়িতে গিয়ে ওর সঙ্গে কথা বলতে বলতে যে মুহূর্তে ওর হাতের আংটিটার প্রতি আমার নজর পড়েছিল—

আংটি!

হ্যাঁ, ওর ডান হাতের অনামিকায় যে নাম মিনা করা আছে—সে নামটা হচ্ছে নীরেন!

আশ্চর্য, আপনি তাও দেখেছেন?

ভাল করে চোখ মেলে সব না দেখলে বুঝবো কি করে?

কথাটা বলে উঠে গিয়ে কিরীটী ঘরের কোণে ফোন ডায়েল করতে শুরু করে এবং নিম্নকণ্ঠে কার সঙ্গে যেন ফোনে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলে।

ফোনে কথা বলা শেষ করে কিরীটী পুনরায় এসে নিজের জায়গায় বসতেই সাধন দত্ত বলেন, বিশাখা দেবীর কথাবার্তা শুনে এবারে তো আপনি মানবেন নিশ্চয়ই যে, নীরেনবাবুই সেরাত্রে সুনন্দা চ্যাটার্জীকে হত্যা করেছিলেন গলায় সিল্ককর্ডের ফাঁস দিয়ে!

তা যদি বলেন তো বিশাখাই বা হত্যাকারিণী নয় কেন?

কি বললেন?

বলছিলাম বিশাখাও তো হত্যা করে থাকতে পারে সেরাত্রে সুনন্দা চ্যাটার্জীকে। কেবল বিশাখাই বা বলি কেন, সুসীমবাবু এবং আমাদের ডাঃ সেনও সেরাত্রে সুনন্দাকে হত্যা করে থাকতে পারে।

কিরীটীর শেষের কথায় কেমন যেন বিস্ময়ে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে চেয়ে থাকেন সাধন দত্ত ওর মুখের দিকে।

সুনন্দার মৃত্যুটা অত্যন্ত জটিল মিঃ দত্ত এবং হত্যাটা পূর্ব-পরিকল্পিত। হত্যাকারী অত্যন্ত কৌশলে সেরাত্রে হত্যা করলেও হত্যা করবার জন্য সে পূর্ব হতেই প্রস্তুত করেছিল নিজেকে। তারপর একটু থেমে আবার বলে, না মিঃ দত্ত, ব্যাপারটা অত সহজ নয়। সুনন্দাকে হত্যার উদ্দেশ্যটা যে সেরাত্রে হত্যাকারীর কি ছিল, সেটাই এখনো আমার কাছে স্পষ্ট হয় নি। যদি একটা ব্যাপারে কারো সাহায্য পেতাম—

কি?

সুনন্দার অতীত জীবনটা যদি জানতে পারতাম! কিন্তু মৃণাল সুসীমবাবু বা নীরেনবাবু — কেউই কিছু বলবে না আমি জানি!

কথাগুলো বলতে বলতে সহসা যেন কিরীটীর কণ্ঠস্বর পরিবর্তিত হয়ে যায়, স্পষ্ট ও দৃঢ়কণ্ঠে সে বলে, কিন্তু বলতে তাদের হবেই একদিন—সব কথা বলতে তাদের হবেই!

আবার যেন সঙ্গে সঙ্গে কিরীটীর কণ্ঠস্বর ঝিমিয়ে আসে, কতকটা যেন আপন মনেই বলে, কিন্তু কেমন করে—কেমন করে—

ঢং ঢং ঢং। ঐ সময় দেওয়াল-ঘড়িতে রাত্রি এগারটা ঘোষিত হলো।

সাধন দত্ত বলেন, রাত এগারটা, আমি উঠলাম।

সাধন দত্ত উঠে পড়লেন।

কিরীটী তার ঘরের মধ্যে পায়চারি করছিল।

সেরাত্রে দুর্ঘটনার স্থানে উপস্থিত যারা ছিল, তাদের মধ্যে বিশেষ দুটি লোকের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়ানো এখনও তার বাকী আছে।

বিষ্ণু দে আর আলফ্রেড্ ঘোষ। ট্র্যাফিক্ সুপারিনটেনডেন্ট মিঃ এলিসকে একটু আগে সে আলফ্রেড্-এর বিষয়ে কাল তাকে জানাবার জন্য ফোন করে দিয়েছে।

আর বিষ্ণু দে—সে বর্তমানে কলকাতায় নেই।

দুর্ঘটনার পরের দিনই সে ইন্‌সুরেন্স্ কোম্পানির একটা জরুরী কাজে দিল্লীতে গিয়েছে। জানা গিয়েছে, সে নাকি পরশু-তরশু ফিরছে।

কৃষ্ণা এসে ঘরে ঢুকলো।

কি হলো, আজ সারাটা রাত্রি পায়চারি করেই কাটাবে নাকি?

সুনন্দা চ্যাটার্জীর হত্যার ব্যাপারে একটা মীমাংসা আমি কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছি না কৃষ্ণা!

মেয়েদের মন—ও যদি এত সহজেই তুমি বুঝতে! চল, রাত দুটো বাজে—শোবে চল।

চম্‌কে ওঠে কিরীটী স্ত্রীর কথায়, বলে, কি—কি বললে? মেয়েদের মন!

হ্যাঁ, হ্যাঁ—চল।

কিন্তু কৃষ্ণা, সুসীমবাবুর সেদিনকার সব কথাও তো তোমাকে আমি বলেছি সুনন্দা চ্যাটার্জী সম্পর্কে—

তোমার সুসীমবাবুর কথা আর বলো না, আস্ত একটি গর্দভ! নইলে এত বড় ভুলটা সে কি করে করলো?

ভুল!

নয়? সুনন্দা তাকেই জেনো ভালবাসত—

তাই যদি হবে তো—

তাকে বিয়ে করলো না কেন, এই তো? কিন্তু—

কিন্তু কি কৃষ্ণা!

কৃষ্ণা মৃদু হেসে বলে, কিন্তু এখন থাক! চল তো শোবে। ঘুমে আমার চোখ ভেঙে আসছে—চল!

তের

আরো দুদিন পরে।

ফ্রি স্কুল স্ট্রীটের একটা পুরাতন ফ্ল্যাট্‌বাড়ির সামনে এসে সাধন দত্ত আর কিরীটী তার গাড়ি থেকে নামলো।

রাত তখন প্রায় সোয়া এগারটা হবে। পাড়াটা ইতিমধ্যেই যেন নিঝুম হয়ে গিয়েছে।

পুরাতন চারতলা ফ্ল্যাট্‌বাড়ি। একতলায় সব দোকান। দোকানের দরজা অনেক আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। উপরে দোতলা, তিনতলা ও চারতলায় সর্বসমেত বারোটি ফ্ল্যাট্।

ছোট ছোট ফ্ল্যাট। বেডরুম ও সিটিংরুম নিয়ে মাঝারি সাইজের দু'খানা করে ঘর, বাথরুম, কিচেন আর সামনে এক চিলতে করে ব্যালকনি। মাঝখান দিয়ে সিঁড়ি উঠে গিয়েছে বরাবর একতলা থেকে চারতলা শেষ হয়ে সেই চারতলার ছাত পর্যন্ত। নানা ধরনের ভাড়াটে এসে ভিড় করেছে ফ্ল্যাট্‌গুলোতে। তবে বেশীর ভাগই সব ভারতীয় ক্রিশ্চান ও অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান।

রাত সোয়া এগারোটা হলেও সব ফ্ল্যাটের তখনো আলো নিভে যায় নি। হাসি গান ও বাজনার শব্দ শোনা যাচ্ছে কোন কোন ফ্ল্যাটে। অনেক দিনের পুরাতন বাড়ি, তার উপরে বোধ হয় অনেক বছর কোন সংস্কারও হয় নি।

বহু জায়গায় সিঁড়ির সিমেণ্ট চটে ইট বের হয়ে পড়েছে। কাঠের রেলিংটায় যে কত ময়লা আর ধুলো, তেল আর ঘাম জমে জমে বিচিত্র এক রূপ নিয়েছে তা বলা দুঃসাধ্য! দেওয়ালের চুনকামের অবস্থাও তাই। বাড়িটার মধ্যে আলো বাতাস খুব বেশী খেলে বলেও মনে হয় না। একটা ভ্যাপসা সোঁদা সোঁদা গন্ধ সর্বত্র।

গেট খোলাই ছিল। কেবল এক পাশে একজন মুসলমান দারোয়ান খাটিয়ার উপর বসেছিল।

ওদের দেখে, বিশেষ করে সাধন দত্তর গায়ে পুলিসের ইউনিফর্ম তাকে যেন তটস্থ করে তোলে। সঙ্গে সঙ্গে খাটিয়া ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় সে।

আলফ্রেড্ ঘোষ এই বাড়িতে থাকে? সাধন দত্তই প্রশ্ন করেন।

হ্যাঁ সাব্, যাইয়ে না—তিনতল্লামে পাঁচ নম্বর ফ্ল্যাট্।

সাব্ হ্যায়?

জী।

কিরীটী আর সাধন দত্ত সিঁড়ি দিয়ে উঠে যান।

উঠেই সোজা বাঁদিকে পাঁচ নম্বর ফ্ল্যাট্। দরজার গায়ে কলিং বেল ছিল। কলিং বেলের বোতামটা টেপেন সাধন দত্ত।

একটু পরেই দরজাটা খুলে গেল। কিন্তু সম্পূর্ণ নয়—অর্ধেক খোলা দরজার ফাঁকে একটা কুৎসিত পুরুষের মুখ উঁকি দিল, হুস দ্যাট্!

ভারী কর্কশ কণ্ঠস্বর।

মিঃ আলফ্রেড ঘোষ? সাধন দত্তই প্রশ্ন করেন।

ইয়েস!

মে আই কাম্ ইন্?

কিন্তু কি দরকার তোমার এত রাত্রে একজন ভদ্রলোকের কাছে, জানতে পারি কি অফিসার?

দরকার একটা আছে বৈকি মিঃ ঘোষ!

কয়েকটা মুহূর্ত ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে রইলো সাধন দত্তর মুখের দিকে আলফ্রেড্।

সিঁড়ির স্বল্প আলো-আঁধারে পুলিসের ইউনিফর্ম পরিহিত সাধন দত্তর মুখের দিকে তাকিয়ে বোধ হয় আলফ্রেড্ কিছু ভাবে।

তার ঘরের দরজায় পুলিস সাধন দত্তর ঐ মুহূর্তে এসে আবির্ভূত হওয়ার ব্যাপারটা অভূতপূর্ব তো বটেই, আকস্মিকও!

এবং তাকে যে খানিকটা ধূর্ত শিকারী বিড়ালের মত সন্দেহযুক্ত করে তুলেছে, কিরীটী ঐ মুহূর্তে লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে সে কথাটা বেশ বুঝতে পারে।

তবু ওরা দুজনেই অপেক্ষা করে।

কিরীটী আর সাধন দত্ত। কারণ কিরীটী বার বার করে আসবার সময় সাধন দত্তকে বলেছিল, আলফ্রেড্‌কে যেন কোনরকম হুমকি দিয়ে বা জোরজবরদস্তি করে আগে থাকতেই ভয় দেখানো না হয়।

যাই হোক, আলফ্রেড্ ব্যাপারটা কোন রকম অনুমান করতে পারুক আর নাই পারুক, ওদের ঘরে ঢুকতে না দেওয়া অসমীচীন ও যুক্তিযুক্ত হবে না বুঝতে পেরেই হয়ত দরজাটা সম্পূর্ণ খুলে দরজা থেকে এক পাশে সরে দাঁড়াল এবং মৃদু কণ্ঠে চাপা বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠেই অনিচ্ছাকৃত আহ্বান জানাল, কাম!

আগে সাধন দত্ত ও তার পশ্চাতে কিরীটী ঘরে প্রবেশ করলো।

সমস্ত ঘরটা যেন অগোছাল, অপরিচ্ছন্ন।

একধারে গোটাচারেক বহু পুরাতন জীর্ণ সোফা ও সামনে তার একটা গোল টেবিল, অন্যদিকে একটা পুরাতন হ্যাট্-র‍্যাক ও একটা বহুকালের রংচটা অর্গান বোধ হয়।

দেওয়ালে খানকতক কুৎসিত ভঙ্গির ছবিওয়ালা ক্যালেণ্ডার ঝুলছে। ঘরের মধ্যে সর্বসমেত গোটা-দুই মাত্র জানালা। মলিন জীর্ণ নেটের পর্দা দেওয়া। দুটি দরজার একটি সদর, অন্যটি বোধহয় ওপাশের ঘরে প্রবেশের মধ্যবর্তী দরজা।

একটি জীর্ণ মলিন পিংক কালারের পর্দা ঝুলছে সেই দ্বারপথে। মেঝেতে জীর্ণ মলিন একটা কার্পেট বিস্তৃত।

সমস্ত ঘরটা জুড়ে একটা যেন ঘিন্‌ঘিনে ভাব।

ঘর শুধু নয়, কিরীটী দেখছিল আলফ্রেড্ লোকটাও যেন অনুরূপ দেখতে।

বেঁটে গুণ্ডা প্যাটার্নের চেহারা লোকটার। মাথার চুল রুক্ষ, কাঁচায়-পাকায় মেশানো। মুখময় ছোট ছোট দাড়ি। বোধ হয় দিন-দুই ক্ষৌরি হয় নি লোকটার। তোবড়ানো গাল। টিয়াপাখীর ঠোঁটের মতো নাকটা যেন বেঁকে সামনের দিকে ঝুলে পড়েছে। রোমশ ভ্রূ। পরিধানে একটা স্ট্রাইপ দেওয়া স্লিপিং পায়জামা ও গায়ে জীর্ণ মলিন একটা ঝলঝলে অনুরূপ রাত্রিবাস।

বসতে পারি? সাধন দত্তই ইংরাজীতে শুধান।

বসুন।

পরিষ্কার বাংলায় জবাব দিল আলফ্রেড্।

তুমি এখানে বুঝি একাই থাক মিঃ ঘোষ? সাধন দত্ত আবার প্রশ্ন করলেন।

সে খবরে তোমার কোন দরকার আছে কি অফিসার? এই আনআর্থলি আওয়ারে একজন নিরীহ ভদ্রলোকের বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটাতে এসেছো কেন সেইটুকুই সর্বাগ্রে জানালে বাধিত হবো।

নিশ্চয়ই। আমরা এসেছি একটা মার্ডার কেসের তদন্তের ব্যাপারে।

হোয়াট? কি বললে?

বললাম তো, একটা হত্যার তদন্তের ব্যাপারে—

কিন্তু—

দিন-দশেক পূর্বে ভবানীপুর অঞ্চলে একটা মার্ডার হয়, তুমি বোধ হয় সংবাদপত্রে পড়ে থাকবে মিঃ ঘোষ—

সংবাদপত্র আমি পড়ি না।

পড় না!

না।

কখনো পড়ো না?

না। যত সব মিথ্যা খবর—আর ট্রাস্ খবর!

ও। তা ভবানীপুরে দিন-দশেক আগে অধ্যাপিকা সুনন্দা চ্যাটার্জী নামে এক মহিলা নিহত হন, তাঁরই অর্থাৎ সেই কেসেরই তদন্তের ব্যাপারে এসেছি আমরা।

কয়েক মুহূর্ত অতঃপর ঘোষ যেন স্তব্ধ হয়ে থাকে।

তারপর মৃদু কণ্ঠে বলে, কিন্তু তুমি বলছো ভবানীপুর না কোথায় দিন দশেক আগে কে একজন মার্ডারড হয়েছে, তার জন্যে আমার কাছে আসবার তোমার কি প্রয়োজন হলো বুঝতে পারছি না তো!

তুমি অধ্যাপিকা সুনন্দা চ্যাটার্জীকে চিনতে না?

নো, নেভার! নেভার হার্ড দি নেম্ ইভেন্!

নামও শোন নি কখনো তাঁর? প্রশ্ন করলো এবারে কিরীটীই।

সিওরলি নট্! হু ইজ সী?

পরিচয় তো দিলাম একটু আগে! আবার কিরীটী বললে।

আমিও তো বললাম, জীবনে তার নামই আমি কখনো শুনি নি।

অথচ আমরা জানি, যেরাত্রে বকুলবাগান রোডে সুসীম নাগের বাড়িতে সুনন্দা চ্যাটার্জী নিহত হন, তুমি সেরাত্রে সেখানে উপস্থিত ছিলে!

আর ইউ ম্যাড্? আই নেভার ইভেন্ হার্ড অফ দেম্! তাছাড়া কবে বললে, দশ দিন আগে?

হ্যাঁ, গত ষোলই জুন—কিরীটী বলে।

লেট্ মি রিকলেক্ট! ইয়েস্ ইয়েস্, আই ওয়াজ অন ডিউটি দ্যাট্ নাইট!

ডিউটিতে ছিলে?

অফ্ কোর্স! ইয়েস—আই নাউ ডিসটিংকট্‌লি রিমেম্বার—আই ওয়াজ অন্ ডিউটি দ্যাট্ নাইট!

কিন্তু আমি বলছি, ইউ ওয়্যার প্রেজেন্ট্ দেয়ার দ্যাট্ নাইট! গম্ভীর কণ্ঠে যেন কিরীটী প্রতিবাদ জানাল।

নন্‌সেন্স! এনিথিং মোর হ্যাভ্ ইউ গট্ টু সে? ইফ্ নট্, ডোণ্ট্ ওয়েস্ট্ মাই টাইম! বাজ্ অফ্—

শোন মিঃ আলফ্রেড্ ঘোষ, উপযুক্ত প্রমাণ আছে আমাদের কাছে যে সে রাত্রে তুমি সে বাড়িতে উপস্থিত ছিলে।

ড্যাম্ রট্!

নো মিঃ ঘোষ, তোমার বৌ সাক্ষী দেবে—

হোয়াট্? মাই ওয়াইফ্?

কথাটা হঠাৎ শোনামাত্রই ইলেকট্রিক শক্ খাওয়ার মতই চম্‌কে ওঠে বলে মনে হয় আলফ্রেড্ ঘোষ।

হ্যাঁ, তোমার স্ত্রী—বিশাখা ঘোষ।

হঠাৎ যেন কিরীটীর শেষের কথায় জোঁকের মুখে নুন পড়লো।

বিশাখা নামটা কিরীটীর মুখ থেকে উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই আলফ্রেডের মুখের চেহারাটা একেবারে সত্যি-সত্যিই কেমন যেন মুহূর্তে বদলে গেল।

কয়েকটা মুহূর্ত সে কোন কথাই অতঃপর বলতে পারে না।

তারপর একসময় আমতা আমতা করে বলে, বিশাখা!

হ্যাঁ বিশাখা ঘোষ, তোমার স্ত্রী। কঠিন কণ্ঠে কিরীটী জবাব দেয়।

কিন্তু ততক্ষণে আলফ্রেড্ নিজেকে সামলে নিয়েছে, হঠাৎ হো হো করে ঘর ফাটিয়ে হেসে ওঠে।

আমার ওয়াইফ্! বিশাখা! ইয়েস্, ওয়ান্স আপন এ টাইম দ্যাট্ বীচ্ ওয়াজ মাই ওয়াইফ—কিন্তু অনেক কাল আমাদের ডিভোর্স হয়ে গিয়েছে—

না। কঠিন কণ্ঠে কিরীটী জবাব দেয়, তোমাদের ডিভোর্স এখনও হয় নি।

কিরীটীর কথার সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় দপ্ করে যেন হাসির শেষ রেশটুকুও নিভে গেল আলফ্রেডের মুখের উপর থেকে।

এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো মিঃ আলফ্রেড্ ঘোষ, সব কিছু সংবাদ নিয়েই আমরা এসেছি তোমার কাছে!

হ্যাঁ, না—হয় নি বটে আজো ডিভোর্স, কিন্তু—কিন্তু, তার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্কই নেই, তাকে আমি সম্পূর্ণ মুক্তি দিয়েছি।

মুক্তিই যদি দিয়ে থাক তো ডিভোর্স আজো তোমাদের হয় নি কেন?

হয় নি মানে হয় নি—এমনিই হয় নি!

তাই কি? না অন্য কোন গুরুতর কারণ আছে?

কারণ! কি কারণ?

যে হাঁস সোনার ডিম দেয়, তাকে যে হত্যা করা যায় না!

কি বললে?

বলছিলাম যে হাঁস সোনার ডিম দেয়, তাকে কি হত্যা করা যায়? মিঃ ঘোষ, মাইনে তো তুমি পাও তিনশ থেকে সাড়ে তিনশ সব মিলিয়ে, তাই না?

হ্যাঁ।

তাহলে লয়েডস্ ব্যাঙ্কে তোমার অ্যাকাউণ্টে গত তিন বছরে চোদ্দ হাজার টাকা কোথা থেকে এলো?

সে—সে আমি, মানে—আই হ্যাভ্ আরন্ড দ্যাট্ মানি!

আরন্ড! বাট্ হাউ? কাম্—কনফেস্ এভ্রিথিং! গোপন করার চেষ্টা করলে জেনো বিপদই ডেকে আনবে—

আমাকে—আমাকে, মানে—হ্যাঁ, আমাকে একজন টাকাটা দিয়েছে—

কে দিয়েছে? তোমার স্ত্রী নিশ্চয়?

হ্যাঁ।

ঠিক সেই সময় সাধন দত্ত বললেন, ইউ আর আণ্ডার অ্যারেস্ট্ মিঃ ঘোষ!

অ্যারেস্ট্! বাট্ হোয়াট্ ফর্?

যথাসময়েই জানতে পারবে।

চৌদ্দ

আলফ্রেড্ ঘোষকে গ্রেপ্তার করবার পরের দিনের ঘটনা।

বিষ্ণু দে কলকাতায় ফিরে এলো।

মৃণাল সমস্ত ব্যাপারটাই জানত, তার মুখ থেকেই বিষ্ণু দে সব শুনলো। এবং এও সে শুনলো মৃণালের মুখেই যে, সুনন্দা চ্যাটার্জীর হত্যার ব্যাপারে কিরীটী তাদের সকলকেই নাকি সন্দেহ করেছে। এবং মৃণালকে কিরীটী বলে রেখেছে, বিষ্ণু দে কলকাতায় ফিরে এলেই তার সঙ্গে কিরীটী একবার দেখা করতে চায়।

বিষ্ণু দে বললে, কিন্তু আমি—আমি তার সঙ্গে দেখা করে কি করবো?

দেখা করা তোমার কর্তব্য। মৃণাল বলে।

কর্তব্য বলছো! শুধায় বিষ্ণু দে।

হ্যাঁ।

কিন্তু কেন?

কারণ সেই দুর্ঘটনার রাত্রে আমরা সেখানে উপস্থিত ছিলাম—

কিন্তু আমরা ছাড়াও তো সে রাত্রে সেখানে আরো অনেকেই উপস্থিত ছিল।

তা অবিশ্যি ছিল, তবে আমরা তার অর্থাৎ সুনন্দার বিশেষ পরিচিত ছিলাম।

তাতে কি এমন অপরাধ হলো?

অপরাধ কিছু নয়—

তবে?

হয়তো আমাদের মত তোমাকেও তাঁর কিছু জিজ্ঞাস্য থাকতে পারে। চলই না, একবার দেখা করে আসবে।

বলছো চল, কিন্তু সত্যি বলছি মৃণাল, ব্যাপারটা আমার কেন যেন আদপেই ভাল লাগছে না!

স্পষ্ট একটা বিরক্তিই যেন বিষ্ণু দের কণ্ঠস্বরে প্রকাশ পায়।

ভাল লাগালাগির প্রশ্ন তো এখানে নয়, দেখা করাটা তোমার কর্তব্য।

বেশ, তাহলে সুসীমকেও ডেকে পাঠাও।

সুসীম!

হ্যাঁ, যেতে হয় একসঙ্গে তিনজনই যাবো—

মৃণাল উঠে গিয়ে ঘরের কোণে রক্ষিত ফোনের রিসিভারটা তুলে সুসীমের নম্বরে ডায়েল করতে যাবে, এমন সময় দরজার গোড়ায় সুসীমকে দেখা গেল।

এই যে মৃণাল, বিষ্ণু তোমরা দুজনেই আছো—এদিকে কাল রাত্রে একটা সাংঘাতিক ব্যাপার—

আবার সাংঘাতিক ব্যাপার কি হলো? মৃণাল শুধায়।

কাল রাত্রে বিশাখার life-এর ওপরে নাকি একটা attemept হয়েছিল—

সে কি!

দুজনেই সুসীমের কথায় চমকে ওঠে।

হ্যাঁ। But thank God, she has narrowly escaped! একটুর জন্য বেঁচে গিয়েছে—

কিন্তু ব্যাপারটা কি একটু খুলে বলবে? অধীর কণ্ঠে মৃণালই প্রশ্ন করে।

ঘুমন্ত অবস্থায় তার গলাতে ফাঁস দিয়ে—

ফাঁস! অর্ধস্ফুট একটা চিৎকার করে ওঠে যেন বিষ্ণু দে।

হ্যাঁ, ফাঁস পরানো হয়েছিল। তবে হঠাৎ বিশাখার ঘুম ভেঙে যাওয়ায় আততায়ীকে ধাক্কা দিয়ে সে ফেলে দেয়—

বল কি সুসীম, how horrible! যা বলছো সত্যি? বিষ্ণু শুধায়।

সত্যি।

তারপর? মৃণাল শুধায়।

তারপর আর কি, হত্যাকারী উধাও হয়ে যায়!

দেখেছিল—মানে দেখতে পেয়েছিল বিশাখা হত্যাকারীকে?

না। ঘরের আলো নেভানো ছিল—

মৃণালই এতক্ষণ কথা বলে যাচ্ছিল। বিস্ময়ে হতভম্ব বিষ্ণু নিঃশব্দে শুনছিল, এবারে বিষ্ণু প্রশ্ন করলো, কিন্তু তুমি—তুমি সে কথা জানলে কি করে সুসীম?

আমি?

হ্যাঁ।

আমি বিশাখার বাড়িতে গিয়েছিলাম আজ সকালে, দেখি বেচারা আকস্মিক ঘটনায় আর ভয়ে একেবারে যেন সিঁটিয়ে রয়েছে।

তা তো হবারই কথা। মৃণাল সহানুভূতির সঙ্গে জবাব দেয়।

কিন্তু আমি তো মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না মৃণাল, বিশাখার উপরে আবার হত্যার attempt হলো কেন!

মৃণাল সহসা যেন কোন জবাব দিতে পারে না। সুসীম, মৃণাল ও বিষ্ণু অতঃপর তিনজনই যেন কেমন মুহ্যমানের মত বসে থাকে।

একটু আগে যে মৃণাল ও বিষ্ণু কিরীটীর ওখানে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল, ঐ মুহূর্তে যেন সে কথাটাও তারা বিস্মৃত হয়।

একে তো সুনন্দার সেরাত্রে আকস্মিক হত্যার ব্যাপারটাই সকলকে কেমন স্তম্ভিত বিমূঢ় করে দিয়েছে, তার ওপর এই নতুন দুঃসংবাদ। ভেবে পায় না যেন ওরা, হঠাৎ বিশাখার ওপরই বা আবার কেন অ্যাটেমপ্ট নেওয়া হলো!

আর কেই বা নিল? তবে কি এও সুনন্দার হত্যাকারীরই কাজ? কিন্তু কেন?

সুনন্দাকেই বা কেন হত্যা করা হলো, আবার বিশাখার উপরেই বা গতরাত্রে হত্যার প্রচেষ্টা হলো কেন?

ঘটনাপ্রবাহ কোথায় চলেছে?

সত্যি, ব্যাপারটা শুধু আকস্মিকই নয়—রীতিমত একটা চিন্তারও বৈকি।

পনের দিনও হয় নি, মৃত্যু তাদের একজনকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছে, এবং সেই দুশ্চিন্তা আর আশঙ্কা এখনো যেন একটা দুঃস্বপ্নের মতো তাদের ঘিরে রয়েছে; ইতিমধ্যেই আবার মৃত্যুর কালো ছায়া তাদের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল।

কেন—কেন এ মৃত্যুর পদসঞ্চার!

বিষ্ণু দে আর মৃণাল সেন দুজনকেই যেন স্তব্ধ বিমূঢ় করে দিয়েছে সুসীমের দেওয়া সংবাদটা। হত্যাকারী তাদের মধ্যে থেকে একজনকে হত্যা করে নিশ্চিন্ত হয় নি, আবার সে তার মৃত্যুফাঁস হাতে রাত্রির অন্ধকারে অলক্ষ্যে আর একজনের পশ্চাতে এসে গতরাত্রে দাঁড়িয়েছিল!

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে সুসীমই আবার কথা বলে, শ্রাবণী ভয়ানক ভয় পেয়ে গিয়েছে সংবাদটা শুনে। সে আর এক মুহূর্ত কলকাতায় থাকতে চায় না। শিলং-এ তার এক মাসী আছেন, ভাবছি কালই তাকে পাঠিয়ে দেবো সেখানে। যাক্, কিছুদিন সেখানে গিয়েই না হয় থেকে আসুক।

মৃণাল বলে, সেই ভাল, তাকে সেখানেই পাঠিয়ে দাও সুসীম।

সেই ব্যবস্থাই করছি।

কিন্তু কিরীটী রায়কে সর্বাগ্রে গতরাত্রের সংবাদটা দেওয়া প্রয়োজন। মৃণাল বলে।

ঠিক বলেছো মৃণাল।

এক কাজ করলে হয় না! মৃণাল সুসীমের মুখের দিকে চেয়ে শুধায়।

কি?

ফোন করে এখানেই একবার কিরীটী রায়কে আসতে বললে হয় না!

সেই ভালো, তাই বরং ফোন করে দাও। সুসীম সায় দেয়।

মৃণাল উঠে পড়লো কিরীটীকে ফোন করতে।

পনের

বিষ্ণু দের মনটা অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল। মনের মধ্যে উৎসবের সেই রাতটার কথাই বার বার যেন ভেসে উঠছিল।

উৎসবের আনন্দের মধ্যে সুনন্দার আকস্মিক মৃত্যুটা এবং সমস্ত ঘটনার নাটকীয় বীভৎসতাটা আজো সে যেন ভুলতে পারছে না।

দিল্লীতে তার যাবার কথা ছিল আরো কয়েকদিন পরে, কিন্তু এক মুহূর্তও সে যেন আর টিকতে পারছিল না কলকাতা শহরে।

পরের দিনই তাই সে কলকাতা ছেড়ে চলে গিয়েছিল।

কিন্তু দিল্লীতে গিয়েও স্বস্তি পায় নি এক মুহূর্ত বিষ্ণু।

সর্বক্ষণ যেন সেই দুঃস্বপ্নটা জাগরণে ও নিদ্রায় তাকে তাড়া করে নিয়ে ফিরেছে। সুনন্দার সঙ্গে পরিচয় ছিল বটে বিষ্ণুর, কিন্তু সুসীম বা মৃণালের মতো ঘনিষ্ঠতা ছিল না। নিঃসন্দেহে ভাল লাগতো সুনন্দাকে বিষ্ণুর, কারণ সুনন্দার ছিল একটা বিচিত্র আকর্ষণ। যে আকর্ষণকে বিষ্ণু দে কেন, অনেকেই কাটিয়ে উঠতে পারে নি। সে-ও কাটিয়ে উঠতে পারে নি। সুনন্দাকে মনে মনে হয়তো কিছুটা ভালবেসেছিল বিষ্ণু—তাই সে সুনন্দার নিষ্ঠুর মৃত্যুতে আঘাত পেয়েছিল মনে।

দিল্লীতে বসে কয়েকদিন ধরে বিষ্ণু অনেক ভেবেছে, কে সুনন্দাকে অমন করে হত্যা করলো! কিন্তু ভেবে-ভেবেও কোন কূলকিনারা পায় নি ব্যাপারটার।

মৃণাল ঘরে ফিরে এসে বললে, কিরীটী এখুনি আসছে।

তার পরের আধঘণ্টা সময় যেন ওদের একটা বিচিত্র স্তব্ধতার মধ্যে অতিবাহিত হয়।

সকলের মধ্যেই একটা বিশেষ উত্তেজনা যেন পরিলক্ষিত হয়, অথচ কেউ কিছু বলছে না। মধ্যে মধ্যে এ ওর মুখের দিকে তাকায়। কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করে তিনজনই।

প্রত্যেকেই যেন ভাবছে তখন।

মৃণালও ভাবছিল সুনন্দার কথাটাই। এবং গত ক'দিন ধরে সর্বক্ষণই প্রায় সে ভাবছিল বুঝি সুনন্দার কথাটা।

সুনন্দার মৃত্যুর ব্যাপারটা সত্যিই তাকে যেন বিস্ময়াবিভূত করে দিয়েছে।

কিরীটী স্পষ্টাস্পষ্টি তাকে মুখে কিছু না বললেও তার হাবভাব কথাবার্তা সব কিছুর মধ্যেই যেন মৃণালের মনে হয়েছে, কিরীটী তাদের ক'বন্ধুকে কেমন একটু সন্দিগ্ধভাবেই দেখতে শুরু করেছে।

সত্যিই তো—সন্দেহ হবারই তো কথা!

তাদের সকলের সঙ্গেই যখন ছিল সুনন্দার এতদিনকার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ও পরিচয়, তখন কতকটা স্বাভাবিকভাবেই তো তাদের উপরে সন্দেহ এসে পড়তে পারে।

তারপর নীরেনের ব্যাপারটা।

নীরেন তাদের এমন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল, অথচ তারা কেউ ঘুণাক্ষরেও জানতে পারে নি কখন ইতিমধ্যে তার ও সুনন্দার মধ্যে পরিচয় ঘটলো এবং সেই পরিচয় ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হলো। এবং সুনন্দার আকস্মিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে, সুনন্দার ঘরের টেবিলের টানার মধ্যে নীরেনের চিঠিগুলো ঐভাবে আবিষ্কৃত না হলে হয়তো ব্যাপারটা আজও ওরা জানতে পারতো কিনা সন্দেহ।

বিশাখা অবিশ্যি ওদের ঘনিষ্ঠতার ব্যাপারটা জানত, কিন্তু কই বিশাখাও তো এতদিন ওদের কিছু জানতে দেয় নি! বিশাখারই বা ব্যাপারটা গোপন করার কি কারণ থাকতে পারে? যতদূর মনে হয়, বিশাখা হয়তো ইচ্ছা করেই ব্যাপারটা গোপন করে গিয়েছে!

কিন্তু কেন? বিশেষ করে বিশাখা যখন অমন তীব্রভাবে সুনন্দাকে ঘৃণা করতো!

আশ্চর্য বিশাখার সুনন্দার প্রতি এতটা ঘৃণার ব্যাপারটাও এতদিন জানত না মৃণাল!

কখনো কোন প্রসঙ্গেই কথাটা সে ইতিপূর্বে প্রকাশ করে নি!

সেদিন বিশাখার মুখে আচমকা কথাগুলো শুনে মৃণালের তাই বুঝি বিস্ময়ের অবধি ছিল না। সে যেন চমকে উঠেছিল বিশাখার মুখে কথাগুলো শুনে। কিন্তু কেন যে এই তীব্র ঘৃণা, সেটাই এখন পর্যন্ত ভেবে কিছু পায় নি মৃণাল।

কি এমন কারণ থাকতে পারে বিশাখার সুনন্দার প্রতি ঐ তীব্র ঘৃণার? তবে কি বিশাখাও মনে মনে নীরেনকেই ভালবাসত?

ব্যাপারটা যেন সব কিছু কেমন জট পাকিয়ে তোলে।

এতদিন জেনে এসেছে সুনন্দার মৃত্যুর পূর্বে পর্যন্ত সুনন্দা সুসীমকেই সর্বাপেক্ষা বেশী ভালবাসত, অথচ এখন স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে ব্যাপারটা আসলে তা নয়।

সুনন্দা ভালবাসত সব চাইতে বেশী নীরেনকেই। আবার এতদিন মনে হয়েছে মৃণালের, বিশাখা বুঝি এসব ভালবাসাবাসির মধ্যে আদৌ ছিল না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে তা নয়, বিশাখাও বোধ হয় নীরেনকেই ভালবাসত।

কিন্তু নীরেন—নীরেন কি সে কথা জানত? চকিতে ঐ সময় একটা চিন্তা মৃণালের মনের মধ্যে উঁকি দিয়ে যায়। তবে কি সুনন্দার ঐ নিষ্ঠুর হত্যার মূলে ছিল ভয়াবহ একটা কুটিল হিংসা!

শিউরে ওঠে যেন মৃণাল কথাটা মনে হতেই।

তবে—তবে কি বিশাখাই হত্যা করেছে সুনন্দাকে?

সুসীমের মনের মধ্যেও বিচিত্র চিন্তা তরঙ্গ তুলে যাচ্ছিল।

মনে হচ্ছিল তার, এর চাইতে শেষ পর্যন্ত বিয়েটা না করলেই বোধ হয় ভালো হতো।

শ্রাবণীকে বিয়ে করে সুনন্দাকে সে জব্দ করতে চেয়েছিল। শেষ পর্যন্ত সুনন্দা মরে এখন মনে হচ্ছে সে-ই বেশী জব্দ হয়েছে। জীবনটাকে যেন আরো বিষময় করে তুলেছে তার স্ত্রী শ্রাবণী।

সে-রাত্রি থেকে শ্রাবণীর যেন অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটেছে। গতরাত্রে তো স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে শেষ পর্যন্ত রীতিমত একটা ঝগড়াই হয়ে গিয়েছে। শ্রাবণীর নাকি সারাটা রাত ঘুম হয় না। সর্বক্ষণ মনে হয় এক অশরীরী নারী যেন তার আশেপাশে ঘুরছে।

শ্রাবণী বলে, পারছি না—এখানে আর এক মুহূর্তও আমি টিকতে পারছি না। আমাকে তুমি এখান থেকে যেতে দাও, নচেৎ নিশ্চয়ই আমি পাগল হয়ে যাবো!

শ্রাবণীর ঈদৃশ আচরণে শেষ পর্যন্ত সুসীমের ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছিল।

সুসীম বেশ একটু কড়াভাবেই বলেছিল, এটা তোমার সত্যিই কি একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে না শ্রাবণী!

কি বলতে চাও তুমি? স্পষ্ট তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্নটা করে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়েছিল শ্রাবণী।

তা নয় তো কি! এতগুলো লোক আমরা এ বাড়িতে রয়েছি, একা তুমিই কেবল টিকতে পারছো না! কিন্তু কেন বলতে পারো? আর এ সময় হঠাৎ দুম করে তুমি চলে গেলে লোকেই বা ভাববে কি?

এর মধ্যে লোকের ভাবাভাবির কি থাকতে পারে শুনি?

থাকতে পারে বৈকি। তাছাড়া আমি বলেছিই তো, দুটো দিন সবুর কর, আমি নিজে গিয়ে তোমাকে শিলং-এ রেখে আসবো।

না, আমাকে তুমি ছেড়ে দাও।

দুটো দিনও তুমি অপেক্ষা করতে পারবে না?

না, না—

সত্যি আমি আশ্চর্য হচ্ছি শ্রাবণী, আমার মনের এই অবস্থা—

মনের এ অবস্থা যে তোমার হবে সে তো তুমি জানতেই।

কি বললে?

ঠিকই বলছি। ভুলতে যদি তাকে পারবেই না জানতে, তবে কেন আমাকে নিয়ে ছেলেখেলা করতে গিয়েছিলে বলতে পার?

শ্রাবণী!

হ্যাঁ, হ্যাঁ—কার কাছে তুমি কি ঢাকা দিতে চাইছো? এ নাটক সৃষ্টি করবার আমাকে নিয়ে তো কোন প্রয়োজনই ছিল না!

তুমি থামবে শ্রাবণী?

তিক্ত একটা চাপা তিরস্কারের মতই যেন কথাটা বলে ওঠে সুসীম।

কি, চোখ রাঙাচ্ছ—কিন্তু সে সুযোগ আমি তোমাকে দেব না। শোন, কালই আমি চলে যাচ্ছি—

ঠিক আছে, যেও।

রাগ করেই অতঃপর সুসীম ঘর থেকে বের হয়ে এসেছিল। এবং বাকী রাতটা সে পথে পথেই ঘুরে বেড়িয়েছে উদ্‌ভ্রান্তের মত।

সকালে গৃহে ফিরেই টের পেয়েছে সুসীম, আজই চলে যাবে শ্রাবণী। সব কিছুর তোড়জোড় সে দেখে এসেছে। ওকে গৃহে ফিরতে দেখে ওর বোন সুধা ঘরে এসে ঢুকল। মাথার চুল রুক্ষ, ক্লান্ত বিপর্যস্ত চেহারা সুসীমের।

দাদা!

কি?

সারারাত কাল কোথায় ছিলে?

সুসীম কোন জবাব দেয় না বোনের প্রশ্নের।

তোমরা কি শুরু করেছো জানি না! এদিকে বৌদি দেখছি সব গোছগাছ করে ফেলেছে—আজই রাত্রে সে নাকি শিলং-এ তার মাসীর ওখানে যাচ্ছে!

ভুল হয়ে গিয়েছে সুধা, জীবনে বোধ হয় এত বড় ভুল আর হয় নি আমার। আর ভুল যখন হয়েছেই, তার প্রায়শ্চিত্ত আমাকে করতে হবে বৈকি।

বৌদি আর ফিরবে না শুনলাম দাদা!

আমি জানি—

তুমি জান?

হ্যাঁ, জানি।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে সুধা। ভাইয়ের মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

তারপর এক সময় মৃদুকণ্ঠে আবার ডাকে, দাদা!

কি?

কি হয়েছে আমাকে বলবে?

আমাকে বিরক্ত করিস না সুধা, আমাকে একটু একা থাকতে দে।

সুধা বের হয়ে যায় ঘর থেকে।

কিন্তু সুসীমও ঘরে থাকতে পারে না। সে-ও বের হয়ে পড়েছিল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই।

ষোল

কিরীটী এসে ঘরে ঢুকলো।

সুসীমের সঙ্গে কিরীটীর পূর্বেই পরিচয় হয়েছে, বিষ্ণু দের সঙ্গে কিরীটীর পরিচয় করিয়ে দিল মৃণালই।

কিরীটী বললে, ভালই হয়েছে ডাক্তার, তুমি আমাকে এখানে ডেকে পাঠিয়েছো। আমিও চাইছিলাম তোমাদের তিনজনকে একসঙ্গে মিট্ করতে।

ফোনে আমি সে-সময় সব কথা তোমাকে বলি নি কিরীটী। কাল রাত্রে আর একটা দুর্ঘটনা প্রায় ঘটে গিয়েছিল আর কি—

জানি। মৃদুকণ্ঠে কিরীটী বলে।

জানো! সবিস্ময়ে তাকায় মৃণাল কিরীটীর মুখের দিকে।

হ্যাঁ, জানি। বিশাখা দেবীর ওপরে কাল রাত্রে অ্যাটেম্পট্ হয়েছিল, এই তো?

হ্যাঁ। কিন্তু তুমি—

বিশাখা দেবী সকালেই আমাকে ফোন করে জানিয়েছেন। অবিশ্যি ঐ ধরনের একটা কিছু যে শীঘ্রই ঘটবে, বিশেষ করে আলফ্রেডের গ্রেপ্তারের পর, সেটা আমি কতকটা অনুমান করেছিলাম।

তুমি অনুমান করেছিলে?

হ্যাঁ। শুধু তিনি কেন, আমি অনুমান করেছিলাম তোমাদের যে কোন একজনের ওপরেও

হয়তো হত্যাকারী অ্যাটেম্পট্ নিতে পারে। কিন্তু যাক সে কথা, তুমি জানলে কি করে? তোমাকেও বুঝি বিশাখা দেবী ফোন করেছিলেন?

না, না—সুসীমই তো এসে একটু আগে বললে!

সুসীমবাবু?

বিস্ময়ে কিরীটী সুসীমের মুখের দিকে তাকাল।

সুসীমও তাকায় কিরীটীর মুখের দিকে।

Is it true, সুসীমবাবু?

কিরীটী প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ, আমি সকালে ওর বাড়িতে গিয়েছিলাম, গিয়ে শুনি সব। সুসীম বললে।

মৃদু হেসে কিরীটী বলে, ও, তাই বলুন। আপনি তাহলে গিয়েছিলেন আজ সকালেই বিশাখা দেবীর বাড়ি!

হ্যাঁ।

যাক সেকথা। অ্যাটেম্পট্ হয়েছিল—শেষ পর্যন্ত কিছু তো ঘটে নি!

কিরীটী একটু যেন তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই কথাটা বলে।

সুসীম বলে, কিন্তু কি বলছেন আপনি মিঃ রায়, কিছু ঘটে নি বটে, তবে ঘটতে তো পারত!

তা হয়তো পারত, তবে ঘটে নি যখন—

তুমি যাই বল কিরীটী, আমার কিন্তু ব্যাপার দেখে কেমন হাত-পা পেটে সেঁধুবার যোগাড় হয়েছে!

ভয় নেই। মৃদু হেসে কিরীটী বোধ করি মৃণালকে সান্ত্বনাই দেয়।

ভয় নেই?

না।

আবার একসময় কিরীটী বলে, সেরাত্রের আপনাদের সকলের বক্তব্যই অবিশ্যি কিছু সাধন দত্তর কাছ থেকে এবং কিছু আপনাদের মুখ থেকেও শুনেছি, তবু আরো কিছু আমার আপনাদের সকলকেই জিজ্ঞাস্য আছে।

কিরীটীর মুখের দিকে তিনজনেই প্রায় একই সঙ্গে তাকালো।

কিরীটীও নিঃশব্দে সকলের মুখের উপরে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বললে, আপনারা হয়তো জানেন না এখনো, সুনন্দা চ্যাটার্জীর মৃতদেহের ময়নাতদন্ত থেকে একটা বিশেষ ব্যাপার জানা গিয়েছে—

কি—কি জানা গিয়েছে? মৃণালই প্রশ্ন করে।

যদিও তাঁর গলায় সরু সিল্ক-কর্ডের ফাঁস ছিল এবং মৃত্যুর কারণও যদিচ শেষ পর্যন্ত ফাঁসের দ্বারা স্ট্র্যাংগল করে শ্বাসরোধ করেই, তথাপি আরও কিছু আছে, ফাঁস দেবার পূর্বে she was given morphine—

সে কি! চমকে প্রশ্ন করে মৃণাল।

হ্যাঁ ডাক্তার। মরফিনের সাহায্যে তাঁকে কিছুটা আধো ঘুমন্ত আধো জাগ্রত অবস্থার মধ্যে

এনে পরে তাঁর গলায় হত্যাকারী ফাঁস লাগিয়েছে। ফাঁস দেবার মুহূর্তে অবিশ্যি হত্যাকারী আরো কিছুটা কসাস হয়েছিল একটা ক্লোরোফরমের হুইপ্ দিয়ে।

সকলেই স্তব্ধ হয়ে কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

কিরিটী বলতে থাকে, হত্যাকারী যে শুধু কসাই ছিল তাই নয়, রসিকও বটে!

রসিক!

হ্যাঁ ডাক্তার, রসিকজন। হোমিওপ্যাথরা শুনেছি 'থুজা' ঔষধের সাহায্যে unwanted, undesirable growthকে ধ্বংস করেন, এক্ষেত্রে হত্যাকারী 'থুজা'র শিশিতে ক্লোরোফরম এনে বোধ হয় সেই কথাটাই বলতে চেয়েছিল। তোমরা হয়তো হত্যাকারীর রসিকতাটা ধরতে পারো নি মৃণাল, কিন্তু তার জন্য আক্ষেপের কারণ নেই, কারণ সে রসের সন্ধানটা যখন আমি অন্তত পেয়েছি, সে-সব কথা—যাক কারণ যথাসময়েই সব কিছুর ব্যাখ্যা আমি সকলের কাছে করবো, এখন যে জিজ্ঞাস্যগুলো আপনাদের কাছে আমার আছে সুসীমবাবু, সেগুলোই শেষ করে নেওয়া যাক।

পূর্ববৎ কিরীটীর মুখের দিকেই সকলে তখনো চেয়ে আছে যেন বোবা দৃষ্টিতে।

কিরীটী বলে, ময়না-তদন্ত থেকে জানা গিয়েছে সম্ভবত রাত এগারটা থেকে সোয়া এগারটার মধ্যেই সুনন্দা চ্যাটার্জী নিহত হয়েছিলেন। ডাক্তার তুমিই প্রথম বল, ঠিক ঐ সময়টাতে তুমি সেরাত্রে কোথায় ছিলে এবং কি করছিলে?

আমি!

হ্যাঁ, মনে করে বল। মানে সুনন্দা চ্যাটার্জীর মৃত্যুর ব্যাপারটা জানাজানি হবার আধঘণ্টা পূর্বে—

আমি তখন ওপরের ছাতে নিমন্ত্রিতদের খাওয়ার তদারক করছিলাম।

কেউ তার সাক্ষী আছে?

সাক্ষী!

হ্যাঁ, witness—কারণ তা না-হলে তুমি যে সত্য কথা বলছো তার প্রমাণ হবে কি করে?

কেন সুসীম—সুসীমই তো জানে। সে-সময় সে একবার ছাতে গিয়েছিল।

কথাটা কি সত্য সুসীমবাবু? সুসীমের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে কিরীটী।

সত্যি। মৃদুকণ্ঠে সুসীম বলে।

তারপরই বোধ হয় ডাক্তার তুমি নেমে এসেছিলে নীচের হলঘরে তোমার বান্ধবীকে ডাকতে!

হ্যাঁ।

আচ্ছা রাত দশটা থেকে পৌনে এগারটার মধ্যে তুমি কোথায় ছিলে?

সে সময় আমি—আমি বোধ হয় হলঘরেই ছিলাম—

হলঘরে সে-সময় কাকে কাকে তুমি দেখেছো?

অনেকেই ছিল। তার মধ্যে বিষ্ণুকেও আমি দেখি—

বিষ্ণুবাবুকে তুমি দেখেছিলে?

হ্যাঁ, বিষ্ণু তখন সোফায় উপবিষ্ট সুনন্দার সঙ্গে দাঁড়িয়ে বোধ হয় কথা বলছিল—তাই না বিষ্ণু?

বিষ্ণুর মুখটা যেন সহসা ঐ কথায় কেমন ফ্যাকাশে হয়ে যায়, সে আমতা আমতা করে বলে, আমি—কই আমি তো—

বাঃ, মনে নেই তোমার! তারই কিছুক্ষণ পরে তো তুমি হরপ্রসাদবাবুকে হলঘরের সামনে বারান্দায় দাঁড়িয়ে বলছিলে, তোমার মাথাটার মধ্যে যেন কেমন করছে—

হ্যাঁ, হ্যাঁ—মনে পড়েছে বটে, ঠিক কেমন যেন আমার তখন শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। বোধ হয় ভিড়ে আর গরমে—

গরমে নয় বিষ্ণুবাবু, তখন অন্য কারণে আপনার শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল!

সকলেই কিরীটীর কথায় চমকে যেন তার মুখের দিকে তাকায়। কিন্তু কিরীটী যেন খেয়ালই করে না ব্যাপারটা। সে পুনরায় বিষ্ণু দে-কেই প্রশ্ন করে, মিঃ দে, বিশাখা দেবীর সঙ্গে আপনার কতদিনের পরিচয়?

তা বছর চার-পাঁচ হবে—

আর সুনন্দা দেবীর সঙ্গে?

ঐ রকমই হবে

সুসীমবাবু, আপনার বিশাখা দেবীর সঙ্গে কতদিনের পরিচয়?

বছর বারো-তেরো হবে। তারা একসময় আমাদের প্রতিবেশী ছিল।

তাহলে সুনন্দা দেবীর আগেই বিশাখা দেবীর সঙ্গে আপনার পরিচয় ছিল?

হ্যাঁ।

আচ্ছা মিঃ নাগ, বিশাখা দেবী ও আলফ্রেড্ ঘোষের বিবাহ-বিচ্ছেদ আজও হয় নি কেন বলতে পারেন?

না।

যাকগে ওদের কথা, এবারে যে নির্দিষ্ট সময়টা সম্পর্কে একটু আগে ডাক্তার সেনকে প্রশ্ন করলাম, তখন আপনি কোথায় ছিলেন—কি করছিলেন?

আমি তো কখনো বেশীক্ষণ এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকি নি। একবার ওপরে, একবার নীচে—সারা বাড়িময় আমাকে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। তাই আপনি যা প্রশ্ন করেছেন তার উত্তর এখন ঠিকভাবে বলা আমার পক্ষে তো সম্ভব নয় মিঃ রায়! সুসীম জবাব দেয়।

তা তো ঠিকই। আপনি যখন সে-রাত্রের উৎসবের ছিলেন হোস্ট। আচ্ছা রাত ঠিক দশটা থেকে সাড়ে দশটার মধ্যে আপনি সেরাত্রে কোথায় ছিলেন মনে করে বলতে পারেন?

মৃদু হেসে সুসীম এবারেও বলে, না।

কিরীটী অতঃপর কিছুক্ষণ যেন কেমন গুম হয়ে বসে থাকে।

তারপরই হঠাৎ সে দাঁড়িয়ে উঠে বলে, আমি চললাম। কিন্তু একটা কথা যাবার আগে বলে যেতে বাধ্য হচ্ছি ডাক্তার, তোমরা কেউ আমার প্রশ্নের জবাবে সত্য যা তা বললে না!

কি বলছো কিরীটী? মৃণাল বলে।

ঠিকই বলছি, সত্য বলো নি। কারণ তোমাদের সকলের মনেই পাপ আছে।

পাপ!

হ্যাঁ, পাপ। কিন্তু সে পাপের হাত থেকে নিষ্কৃতিও পাবে না কেউ জেনো। গরল যেমন মানুষের সমস্ত দেহ জুড়ে একদিন ফুটে ওঠে বীভৎস ভয়ঙ্কর হয়ে—পাপও ঠিক তেমনি চাপা থাকে না—চাপা দেওয়া যায় না।

কথাগুলো বলে কিরীটী আর এক মুহূর্তও দাঁড়ালো না, ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

সতেরো

পরের দিন রাত্রি প্রায় তখন এগারোটা।

আগের দিনই দ্বিপ্রহরে শ্রাবণী শিলং রওনা হয়ে গিয়েছে। হরপ্রসাদ ও সুধা দেবীও পাটনা রওনা হয়ে গিয়েছেন ঐদিন। অত বড় বাড়িটায় একা ছিল সুসীম। বাড়িটা যেন একেবারে নিঝুম।

এতকলার লাইব্রেরী ঘরে বসে একটা বই পড়ছিল সুসীম।

ঘরের দরজাটা ভেজানোই ছিল। সহসা একটা মৃদু শব্দ কানে আসতেই দরজাটার দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে যেন স্তব্ধ হয়ে গেল সুসীম।

ধীরে ধীরে দরজার পাল্লা দুটো খুলে যাচ্ছে।

কে—কে ওখানে?

দরজাটা একেবারে খুলে গেল, মৃণাল এসে এদিক-ওদিক ভীত শঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে ঘরের মধ্যে ঢুকলো। এবং ঢুকেই দরজাটা ভিতর থেকে ভেজিয়ে দিল।

কি ব্যাপার মৃণাল, এত রাত্রে?

ওষ্ঠের উপর আঙুলের সঙ্কেতের ইশারা জানিয়ে নিম্নকণ্ঠে মৃণাল বললে, চুপ!

কি হয়েছে কি?

আমি—আমি ভুল করেছি সুসীম—

ভুল!

হ্যাঁ, ভুল—কিরীটীকে এই ঘটনার মধ্যে টেনে নিয়ে এসে!

কিন্তু—

আজ দুপুরে সে আমার ওখানে এসেছিল। তার কথাবার্তায় বুঝলাম—

কি—কি বুঝলে? উৎকণ্ঠায় যেন ভেঙে পড়ে সুসীমের গলার স্বর।

সুনন্দার হত্যার ব্যাপারে সে আমাকেই সন্দেহ করছে। কিন্তু তুমি—তুমি তো জান সুসীম—

আমি—আমি কি জানি?

সুনন্দাকে আমি ভালবাসতাম সত্যি এবং আমার চাইতেও সে তোমাকে ভালবাসে জেনে আজ আর অস্বীকার করবো না, আক্রোশও হয়েছিল আমার প্রচণ্ড তার ওপরে, হত্যাই তাকে আমি করতে চেয়েছিলাম—কিন্তু সুনন্দার ঘরে যে চিঠি পাওয়া গিয়েছে, সে চিঠি আমি লিখি নি—

কে বলেছে সে চিঠি তুমি লিখেছো?

কিরীটী।

ননসেন্স্! ওটা একটা হামবাগ! বোস বোস তুমি।

ঠিক সেই মুহূর্তে ভেজানো দরজাটা পুনরায় খুলে গেল। এবং ঘরে প্রবেশ করলো বিষ্ণু দে।

এ কি! বিষ্ণু, তুমি এত রাত্রে? সুসীম প্রশ্ন করে।

কেন, তুমিই তো রাত এগারটায় কি জরুরী ব্যাপারে আমাকে এখানে আসতে বলেছো সুসীম!

আমি তোমাকে আসতে বলেছি! কই না তো!

বাঃ রে, তুমি ফোনে বললে, তুমি জান সুনন্দাকে কে হত্যা করেছে—কিন্তু তুমি বিশ্বাস করো সুসীম, আমি তাকে হত্যা করি নি। তবে—

কি? বিষ্ণুর মুখের দিকে তাকায় সুসীম।

রাত ঠিক দশটায় সে-রাত্রে আমি সুনন্দাকে এক গ্লাস ঠাণ্ডা সরবৎ এনে দিয়েছিলাম—

সরবৎ এনে দিয়েছিলে?

হ্যাঁ।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বিষ্ণু বলতে থাকে, সে সরবৎটা শেষ করে আমাকে বলেছিল, আমার সঙ্গে নাকি তার কি কথা আছে। কিন্তু গ্লাসটা রেখে ফিরে আসতে আমার কয়েক মিনিট দেরি হয়েছিল, এসে দেখি সে হলঘরে নেই—

তুমি—তুমি তাকে সে-রাত্রে সরবৎ খাইয়েছিল বিষ্ণু? মৃণাল শুধায়।

হ্যাঁ, হ্যাঁ—কিন্তু সে সরবতের মধ্যে কিছু ছিল না, আমি হলফ করে বলতে পারি।

তোমার কথাটা কিরীটী রায় বিশ্বাস করবে ভাবো—

মৃণালের কথা শেষ হলো না। দরজা ঠেলে এসে ঘরে ঢুকলো বিশাখা, এই যে বিষ্ণু তুমি—তুমি কিরীটী রায়কে বলেছো যে আমি সেরাত্রে সুনন্দাকে হত্যা করেছি!

ঘরের মধ্যে যেন বজ্রপাত হয়েছে সহসা।

একটা পাষাণভার স্তব্ধতা।

আমি বলেছি! বিষ্ণু কোনমতে শুধায়।

হ্যাঁ, হ্যাঁ—তুমি—

বিশাখার কথা শেষ হলো না, হঠাৎ ঘরের মধ্যে সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি নারী-কণ্ঠস্বর যেন কোন অদৃশ্য অলক্ষ্য থেকে ভেসে এলো, হ্যাঁ তুমি—তুমিই হত্যা করেছো সুনন্দাকে বিশাখা!

কে? কে? কে?

একসঙ্গে সকলেই চিৎকার করে ওঠে।

কে—কে ও কথা বললে?

কিন্তু কোথায় কে, কেউই তো নেই ঘরে!

অকস্মাৎ সঙ্গে সঙ্গেই যেন একটা ভয়ের অনুভূতি সকলের মেরুদণ্ড দিয়ে শির্ শির্ করে বয়ে যায়।

সকলেই ওরা পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকায় কি এক অসহায় আতঙ্ক-বিহ্বল দৃষ্টিতে। ঠিক সেই মুহূর্তে আবার যেন অলক্ষ্য থেকে সেই অচেনা কণ্ঠস্বর ভেসে এলো স্পষ্ট, সুসীম, মৃণাল, বিষ্ণু, বিশাখা—এত তাড়াতাড়ি আমাকে তোমরা ভুলে গেলে! আমি কে, তাই না? আমি সুনন্দা—সুনন্দা—

কথাগুলো শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা সুমিষ্ট হাসির লহরী যেন ঘরময় ছড়িয়ে পড়লো।

আতঙ্কিত দৃষ্টি নিয়ে ওরা একে অন্যের মুখের দিকে তাকায় আবার। ঘরের মধ্যে সব ক'টি প্রাণীই যেন একেবারে বোবা হয়ে গিয়েছে।

টুক্...টুক্...টুক্...

ঘরের ভেজানো দরজার গায়ে মৃদু 'নক্' পড়লো।

এবং ভেজানো দরজার ওপাশ থেকে কিরীটীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, ভিতরে আসতে পারি সুসীমবাবু?

বাক্‌শক্তি ওদের সকলের তখন যেন একেবারে এতটুকুও অবশিষ্ট নেই।

কেউ সাড়া দেয় না। সবাই যেন বোবা।

ধীরে ধীরে কিরীটী ও সাধন দত্ত ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করলেন।

নমস্কার। এই যে আপনারা সকলেই দেখছি এখানেই জমায়েত হয়েছেন! ভালোই হলো—we can have a frank discussion amongst ourselves!

বাধা দিয়ে কিরীটীকে সাধন দত্ত বললেন, কিন্তু কর্তব্যটা চুকিয়ে নিলে হতো না আগে মিঃ রায়?

একটু অপেক্ষা করুন মিঃ দত্ত। তারপরই মৃণালের দিকে তাকিয়ে কিরীটী বললে, মিঃ দত্ত এসেছেন সুনন্দা চ্যাটার্জীর হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করতে—

সুনন্দার হত্যাকারী!

হ্যাঁ, ডাক্তার। এভাবে আজ এই রাত্রে এইখানে তোমাদের সকলকে এই ঘরে একত্রিত করার মূলেও ছিল ওঁর কৌশল। It is not an accident! কারণ উনি চেয়েছিলেন সকলের সামনে থেকেই হত্যাকারীর মুখোশ খুলে দিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাবেন আজ এখান থেকে—

আমাদের মধ্যে থেকে! সুসীমই এবারে প্রশ্নটা করে।

হ্যাঁ সুসীমবাবু, প্রমাণিত হয়েছে যে এই মুহূর্তে এখানে আপনারা যে চারজন উপস্থিত আছেন, তারই মধ্যে একজন সেরাত্রে সুনন্দা দেবীকে হত্যা করেছেন।

আমাদের মধ্যেই একজন?

কথাটা বলে সুসীম যেন ফ্যাল্‌ফ্যাল করে চেয়ে থাকে কিরীটীর মুখের দিকে।

হ্যাঁ, আপনাদের মধ্যেই একজন—

সুসীম, বিশাখা, মৃণাল ও বিষ্ণু পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়। সকলের চোখেই যেন একই প্রশ্ন, কে—কে? কে হত্যা করেছে সেরাত্রে সুনন্দাকে?

কে? কে?

হঠাৎ বিষ্ণু দে চিৎকার করে ওঠে, না, না—এ torture! Unbearable torture! এ অসহ্য—অসহ্য—

থাম বিষ্ণু! তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রতিবাদ জানায় সুসীম, মিঃ রায় যা বলছেন তাই যদি সত্যি হয় তো কেন আমরা স্বীকার করছি না কে আমাদের মধ্যে সেরাত্রে সুনন্দাকে হত্যা করেছি? Come, speak out! মৃণাল, বিষ্ণু—চুপ করে থেকো না, দোহাই তোমাদের—এর চেয়ে জঘন্য, এর চেয়ে কলঙ্কের ব্যাপার হতে পারে না। আমরাই আমাদের একজন প্রিয় বান্ধবীকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছি—কিন্তু কেন, কেন হত্যা করেছি—

হত্যা করা হয়েছে তাকে এইজন্য যে—because she knew something!

কী জানতে পেরেছিল সে?

কিন্তু সেটা তো হত্যার উদ্দেশ্য। কি ভাবে সেরাত্রে হত্যাকারী সুনন্দা দেবীকে হত্যা করেছিল, সেই আলোচনাতেই আগে আসা যাক। কিরীটী বললে।

পাথরের মতোই যেন সবাই ঘরের মধ্যে বসে থাকে। শ্বাসরোধকারী একটা স্তব্ধতা।

কিরীটী বলতে লাগলো, হত্যাকারী দুঃসাহসী নিঃসন্দেহে। প্রচণ্ড risk-ও নিয়েছিল সে এবং successfulও হয়েছিল। তবু—তবু সে দুজনার চোখকে ফাঁকি দিতে পারে নি—ছদ্মবেশ নেওয়া সত্ত্বে।

ছদ্মবেশ! মৃণাল প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ ছদ্মবেশ। সব কিছুই আমি explain করবো। রাত দশটা থেকে সাড়ে দশটার মধ্যে সেরাত্রে সরবতের সঙ্গে মরফিন প্রয়োগ করে নেশাগ্রস্ত সুনন্দাকে কৌশলে বাথরুমের মধ্যে নিয়ে গিয়ে, ক্লোরোফরমের হুইপ্ দিয়ে গলায় ফাঁস পরিয়ে দিয়েছিল হত্যাকারী।

কিন্তু তা কি করে সম্ভব? মৃণালই পুনরায় প্রশ্ন করে।

বুঝতে পেরেছি তুমি কি বলতে চাও। ফাঁস দেওয়ার পরে তাকে বাথরুম থেকে বের করে এনে সোফার ওপরে বসিয়ে নিজে তার পাশে বসে হত্যাকারী ফাঁসটা টাইট্ করে দেয়। ঘুমে তখন মরফিনের ও ক্লোরোফরমের ক্রিয়ায় ঢলে পড়েছে সুনন্দা—প্রতিবাদ জানাবার বা চিৎকার করবারও বেচারীর তখন আর কোন ক্ষমতা ছিল না।

তবে কি—

হ্যাঁ মৃণাল, বিষ্ণু দে ও বিশাখা দেবী সেরাত্রে সুনন্দার পাশে বসে যে ব্যক্তিটিকে তার সঙ্গে কথা বলতে দেখেছিলেন—সে-ই সুনন্দার হত্যাকারী। এবং সুনন্দা was dead at that time—

না, না—তা কেমন করে হবে! আমি যে তার পরেও তার সঙ্গে কথা বলেছি কিরীটী! মৃণাল বলে।

না, তুমি কথা বললেও তার কোন জবাব পাও নি। কঠিন কণ্ঠে কিরীটী বলে, it was a deliberate lie—মিথ্যা, সে তখন already মৃত—নিহত! তাই আমি বলেছিলাম সেদিন, সবাই তোমরা তোমাদের জবানবন্দীতে মিথ্যা কথা বলছো!

সবাই স্তব্ধ, নির্বাক।

কিরীটী আবার বলে, তুমি, বিষ্ণুবাবু, বিশাখা দেবী—বলুন, বলুন বিষ্ণুবাবু চিনতে পারেন নি সেদিন আপনি সুনন্দা দেবীর পার্শ্বে উপবিষ্ট ব্যক্তিটিকে? বিশাখা দেবী, আপনি চিনতে পারেন নি?

বিশাখা যেন হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রোগিণীর মতো চেঁচিয়ে উঠে প্রতিবাদ করে, না, না, না—পারি নি—পারি নি—

পেরেছেন! You did!

না—না—না—

হ্যাঁ পেরেছেন, বলুন—বলুন সে কে? বলতে আপনাকে হবেই বিশাখা দেবী। আর সেরাত্রে বাথরুমের মধ্যেও যাকে দেখেছিলেন, তাকেও আপনি চিনেছিলেন। কেন বুঝতে পারছেন না আপনি, আপনি সেরাত্রে তাকে চিনতে পেরেছিলেন বলেই গতরাত্রে আপনাকে হত্যাকারী আক্রমণ করেছিল—

না, না, না—তবু চেঁচাতে থাকে বিশাখা।

কঠিন ঋজুকণ্ঠে এবারে কিরীটী বলে, চিনতে পারেন নি—সুসীমবাবুকে আপনি চিনতে পারেন নি এখনো বলছেন?

সুসীম!

মৃণালের কণ্ঠ থেকে যেন একটা অস্ফুট আর্তনাদ বের হয়ে এলো।

হ্যাঁ, সুসীমবাবুই।

কথাটা বলেই কিরীটী পুনরায় বিষ্ণু দের দিকে ফিরে তাকিয়ে কঠিন কণ্ঠে বলে, বিষ্ণুবাবু, সেরাত্রে কার কাছ থেকে আপনি সুনন্দা দেবীর জন্য সরবৎ চেয়ে এনেছিলেন?

আমি!

হ্যাঁ।

বিশাখা দিয়েছিলো—

বিশাখা দেবী, কথাটা কি সত্যি?

বিশাখা জবাব দেয় না।

তার মাথাটা তখন প্রায় বুকের কাছে ঝুলে পড়েছে।

আঠারো

হ্যাঁ, সুসীমবাবুই।

পরের দিন মৃণালের বাসায় বসেই বলছিল কিরীটী, সুসীমবাবুই যে সেরাত্রে সুনন্দা দেবীকে হত্যা করেছেন, সেটা আমার মনই বলেছিল। কারণ তাঁর মতো সুনন্দা দেবীকে হত্যা করার সুযোগ সেদিন ঐ উৎসবের বাড়িতে আর কারো ছিল না। কিন্তু হত্যা করবার কারণ বা উদ্দেশ্যটা তখনো আমি খুঁজে পাই নি। এবং উদ্দেশ্যটা যে মুহূর্তে আমি খুঁজে পেলাম, সেই মুহূর্তেই ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু উদ্দেশ্যটা কি? সুনন্দাকে তার মতো কেউ তো ভালবাসত না! মৃণাল বললে।

কথাটা মিথ্যা নয়। কিন্তু যে মুহূর্তে তিনি জানতে পেরেছিলেন, সুনন্দা তাঁকে নিয়ে শুধু খেলাই করে এসেছে দীর্ঘদিন ধরে—সেই হতাশা আর পরাজয়ের অপমান তাঁকে উন্মাদ করে তুলেছিল।

খেলাই করে এসেছে সুনন্দা তাকে নিয়ে!

হ্যাঁ ডাক্তার—নির্মম খেলা। কারণ সুনন্দা ভালবাসত সত্যিকারের—

কাকে?

নীরেন সেনকে। আর নীরেনের সঙ্গে তার বিবাহও হয়ে গিয়েছিল এক বছর পূর্বে।

সে কি!

রেজিস্টারার্স অফিসে খোঁজ নিলেই ব্যাপারটা তুমি জানতে পারবে ডাক্তার—

কিন্তু এটা তো বুঝতে পারছি না কিরীটী, সে-কথাটা কেন তবে তারা গোপন করে রেখেছিল!

দুটি কারণে। এক হচ্ছে—সুনন্দা ব্রাহ্ম, নীরেনের কাকা—যিনি অবিবাহিত এবং প্রচুর সম্পত্তির মালিক, তিনি নীরেনের বিবাহটা মেনে নিতেন না এবং বিবাহ করলে নীরেনকে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি থেকে তিনি বঞ্চিত করতেন। নীরেনের পক্ষে ঐ বিরাট fortuneকে অস্বীকার করার ক্ষমতা ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, বিশাখা আর তার স্বামী আলফ্রেডের ভয়ে—

ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলাম না তো মিঃ রায়!

আলফ্রেড্, বিশাখা, সুসীম আর নীরেনের একটা চোরাই মাদক দ্রব্যের ব্যবসা ছিল। বর্মার

ভিতর দিয়ে চীন ও ভারতবর্ষের মধ্যে চোরাই আফিমের কারবার চালাচ্ছিল ওরা। বেচারী সুনন্দা সে কথাটা জানতো না—

বলো কি!

হ্যাঁ। পরে অবিশ্যি কিছুদিন আগে জানতে পেরে ও চুপ করে ছিল। এদিকে সুসীম নীরেন ও সুনন্দার সম্পর্কটা জানতো না। শ্রাবণীকে বিয়ে করার কিছুদিন আগে ব্যাপারটা জানতে পেরে সুনন্দাকে যখন সে বলে তার মুখোশ সে খুলে দেবে, সুনন্দা তখন মরীয়া হয়ে সুসীমকে বলে, তাহলে সে-ও সুসীমের চোরাকারবারের ব্যাপারটা প্রকাশ করে দেবে। ওদের দুজনের মধ্যে যেদিন কথা-কাটাকাটি হয়, ঠিক সেইদিনই ঘটনাচক্রে আলফ্রেড্ সুনন্দার বাড়িতে তার পাশের ঘরে উপস্থিত ছিল। সে-ই তার জবানবন্দীতে সব কথা বলেছে—প্রকাশ করে দিয়েছে। আর তার মুখ থেকে সব কথা শোনবার পরই সুনন্দাকে হত্যার উদ্দেশ্যটাও আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে। একে তো নীরেনের ব্যাপার নিয়ে সুনন্দার প্রতি আক্রোশ ছিলই সুসীমের, তার উপরে ঐ চোরাকারবার—কাজেই তখন সুনন্দাকে এ পৃথিবী থেকে অবিলম্বে সরিয়ে ফেলা ছাড়া অন্য পথ আর ছিল না সুসীমের।

কিন্তু সুনন্দাকে যে সুসীমই হত্যা করেছে তার প্রমাণ?

মোক্ষম দুটি প্রমাণ আছে।

কি প্রমাণ?

প্রথমতঃ, থুজার শিশিতে সুসীমের finger-print পাওয়া গিয়েছে, আর রুমালটা—

কোন্ রুমাল?

যেটা সুসীমবাবুর বাথরুমে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন মিঃ দত্ত। সুসীমের দুটো নাম ছিল তুমি বোধ হয় জান—

দুটো নাম!

হ্যাঁ, দুটো নাম। একটা ডাকনাম, অন্যটা পোশাকী নাম। ডাকনামটা হচ্ছে নাড়ু আর পোশাকী নামটা হচ্ছে সুসীম। আর সেই নাড়ুরই আদ্যক্ষর ইংরেজী 'এন' রুমালের কোণে লেখা! সুসীমের পরিধেয় বস্ত্র ও রুমাল ইত্যাদিতে ঐ 'এন'ই ব্যবহার করতো সে অনেকদিন ধরে। সুধা দেবীর মুখ থেকেই পরশু আমি সংবাদটা পেয়েছিলাম। সুসীম চমৎকার ভাবে সমস্ত ব্যাপারটা সাজিয়েছিল—যাতে করে নীরেনকেই পুলিস সন্দেহ করে এবং তার পক্ষেও এক ঢিলে দুই পাখী মারা হয়! অবিশ্যি আলফ্রেডের স্বীকারোক্তি না পেলে এবং সুসীম সেরাত্রে বিশাখাকে হত্যার চেষ্টা না করলে এত দ্রুত আমার মীমাংসায় পৌঁছানো সম্ভবপর হতো না। অবিশ্যি আরো একজন সুসীমকে সন্দেহ করেছিল—

কে?

সুসীমের নব-বিবাহিত স্ত্রী—

শ্রাবণী!

হ্যাঁ।

আশ্চর্য!

এতে তো আশ্চর্যের কিছু নেই ডাক্তার। নারীর ব্যাপারে নারীর মনই সর্বাগ্রে সন্দিগ্ধ হয়। শ্রাবণীও ঠিক সেই কারণেই অর্থাৎ সন্দেহ হওয়ায় কলকাতা থেকে সরে যায়।

সবশেষে কিরীটী বলছিল, বিচিত্র দুটি চরিত্র তোমাদের ঐ সুসীম আর বিশাখা! বলতে

ইচ্ছা করে—যেমন দেবা তেমনি দেবী! আলফ্রেডের টাকার প্রয়োজন ছিল, কারণ সে ছিল নেশার দাস আর জুয়াড়ী—সে টাকা যোগাত সুসীম, বিনিময়ে বিশাখাকে তুলে দিয়েছিল আলফ্রেড্ সুসীমের হাতে।

সত্যি বলছো!

হ্যাঁ। কিন্তু বিশাখা ভালবাসত নীরেনকে—

Is it!

তাই সুনন্দার জন্য বিশাখার পক্ষে নীরেনকে পাওয়া সম্ভবপর ছিল না বলেই সুনন্দার প্রতি বিশাখার একটা আক্রোশ ছিল। সেই কারণেই ছদ্মবেশে সুসীমকে চিনতে পেরেও বিশাখা সেরাত্রে মুখ খোলে নি।

কিন্তু বিষ্ণু—বিষ্ণু কেন মুখ খোলে নি? সে কেন সব প্রকাশ করে নি?

ভয়ে। আসলে লোকটা প্রচণ্ড ভীরু—

একটা কথা, নীরেনের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল কেন সুনন্দার দুর্ঘটনার আগের রাত্রে?

কারণ এ তো সোজা কথা! সুনন্দা নীরেনদের চোরাই কারবারের ব্যাপারটা জানতে পেরেছিল বলে—

কি করে?

বিশাখার একখানা চিঠিতে। আক্রোশের বশে নীরেনের প্রতি সুনন্দার মনটা বিগড়ে দেবার জন্যে মরীয়া হয়ে শেষ পর্যন্ত সে সুনন্দাকে একটা চিঠি দিয়েছিল—

তারপর?

দুজনের ঝগড়া হতে সুনন্দা বলেছিল, নীরেনের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক আর নেই। সে-ও যেন নীরেনকে লেখা তার চিঠিগুলো ফেরত দেয় এবং সেও ফিরিয়ে দেবে তাকে লেখা নীরেনের চিঠিগুলো। তারপর তাদের গোপনে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। কিন্তু নীরেন চিঠি দিয়ে জানায়, সেগুলো সে ফেরত দেবে, তবে সে বিশাখার চিঠিটাও চায়। কিন্তু—

কি?

বেচারী সুনন্দা সত্যিই ভালবাসত নীরেনকে। তাই সে চেয়েছিল সুসীমের বাড়িতে এসে সুসীমের সামনেই সব কিছুর একটা মুখোমুখি মীমাংসা করে নেবে। তাই যেচে সে নিমন্ত্রণ নিয়েছিল সুসীমের। বেচারী তখন স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি, সুসীমের বাড়িতে সেরাত্রে যাওয়া মানেই মৃত্যুর ফাঁসে গলা এগিয়ে দেওয়া। কারণ সুসীমকে ফোন করার পরই সে তার plan স্থির করে ফেলে মনে মনে। অবিশ্যি সুসীম গোড়াতেই একটা মারাত্মক ভুল করেছিল—

ভুল!

হ্যাঁ।

কি ভুল?

শ্রাবণীকে ঝোঁকের মাথায় হঠাৎ বিয়ে করে—

সত্যিই আশ্চর্য! মৃণাল বলে।

প্রেম আর ঈর্ষা এমন দুটি বস্তু ডাক্তার, যার মধ্যে আশ্চর্য বলে কিছু নেই। কারণ যা কিছু ঘটেছে সেরাত্রে, সব কিছুর মূলেই ছিল ঐ প্রেম আর ঈর্ষা। সবটাই সেই পঞ্চশরের কীর্তি।

॥ সপ্তম খণ্ড সমাপ্ত ॥

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

কিরীটী অমনিবাস

নীহ
কি
অ